সমে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

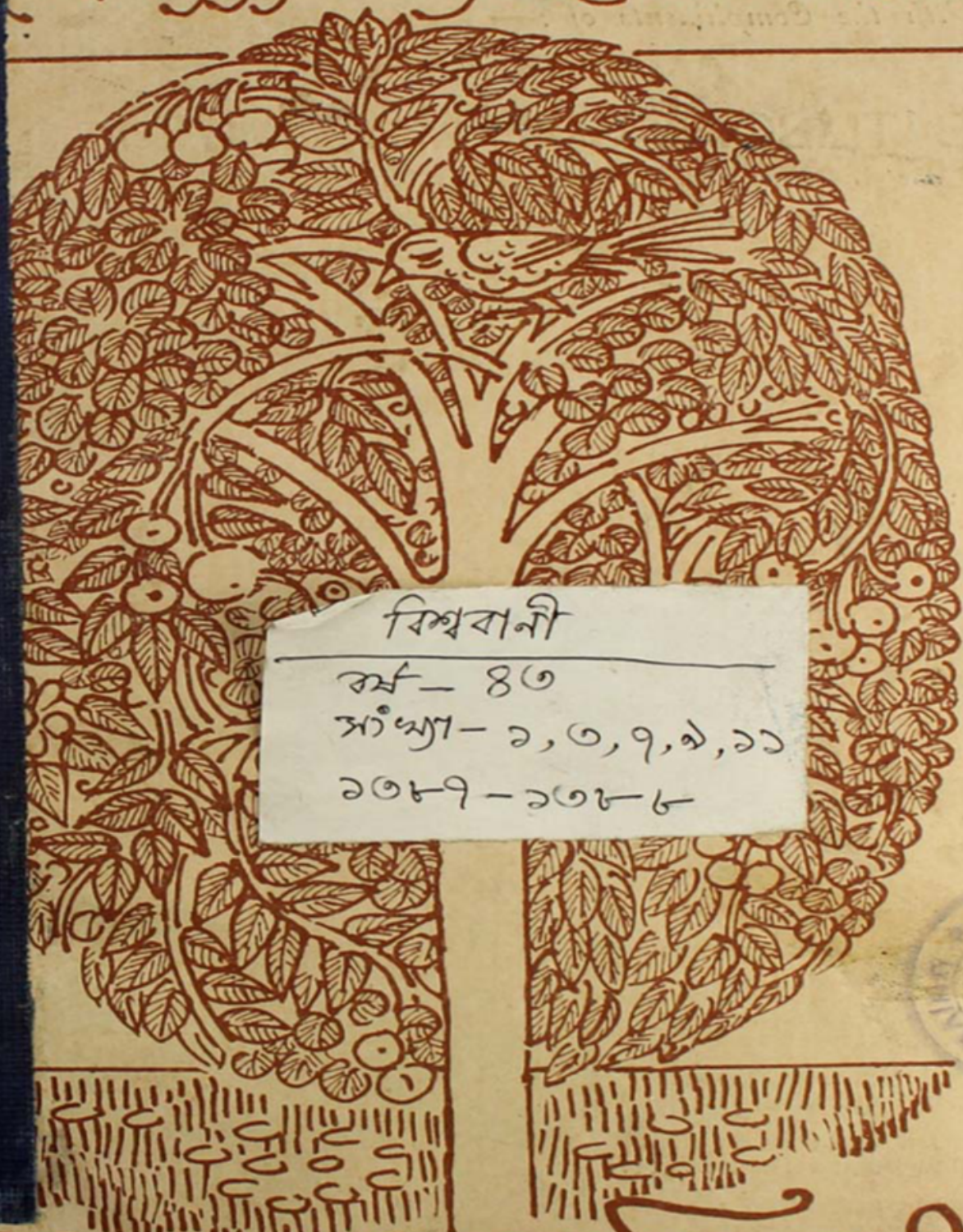

বিশ্ববানী
বর্ষ — ৪৩
সংখ্যা — ১, ৩, ৭, ৯, ১১
১৩৮৭ — ১৩৮৮

দক :
সদাত্মানন্দ
প্রকাশানন্দ
সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ লোক

স্বামী অভেদানন্দ
প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববানী

তেতাল্লিশ বর্ষ - প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৩৮৭

With the Compliments of :—

BATLIBOI & COMPANY LIMITED

Regd. Office : P. O. Box 190A V. B. Gandhi Marg
Fort, Bombay-400 023

MACHINERY DIVISION :
26, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700 001

Tel : 23-8831/4
Telex : 021-7289
Cables : BATLIBOICO

প্রহরীবিহীন লেভেল-ক্রসিং পার হবার এটিই সঠিক নিয়ম

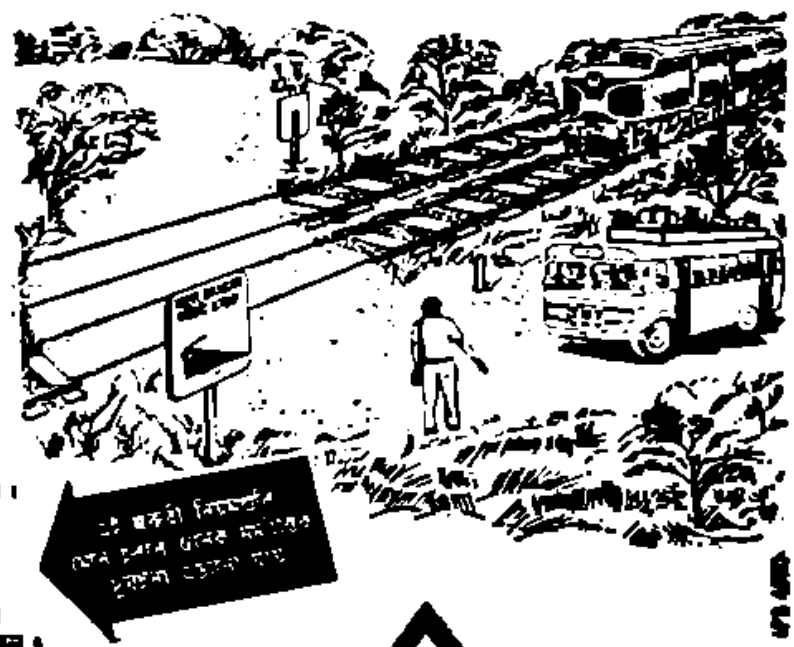

১. [illegible] যে 'স্টপ বোর্ড আছে সেখানে গাড়ী থামান।

২. কণ্ডাক্টর/ড্রাইভার বাস থেকে নেমে লাইন বরাবর দুধারেই তাকিয়ে দেখুন কোনও ট্রেন আসছে কিনা।

৩. যদি ট্রেন আসতে দেখেন তা হলে ট্রেন নিরাপদ দূরত্বে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৪. ট্রেন চলে যাবার পর, অথবা কোনও ট্রেন না এলে ড্রাইভার গাড়ী চালু করবেন এবং লাইন পার হবেন।

মোটর যান আইন অনুযায়ী প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং পার হবার সময় সমস্ত গাড়ীর ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরদের নিরাপত্তার এই নিয়মগুলি অবশ্যই মেনে চলবেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা-একটি প্রতিশ্রুতি

বিংশ শতাব্দীর শেষ যামে শেষ সলতেটুকু না জ্বেলে না হয় একটা প্রার্থনাই রাখলাম। এই কলকাতা শহরটার জন্য শুভ কামনার প্রার্থনা।

শহরে সমস্যা নিয়ে অবিশ্বাসীরা তর্ক বিতর্ক করুন বা কবিরা কবিতাই লিখুন। শহর কলকাতার উচ্চবিত্তদের জন্য থাকুক আরও উচ্চাশা কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের জন্য যেন রুটিও থাকে।

বিদেশী পর্যটকদের কাছে এখনও কলকাতার একটা বিরাট মোহ আছে। শরীর মুখে ছাই দিয়ে ধ্বংসের চিহ্ন, নোংরা, জঞ্জাল আর ভাঙ্গচুর রাস্তা ছাড়া শহরের আর কি আছে দেখার মত? এ ছবিও পর্যটকেরা ক্যামেরায় ধরে রাখেন। এটাই কি কলকাতার আসল ছবি? এ দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দরকার।

কি বিদেশী পর্যটক, নগর পরিকল্পনাবিদ্, ঐতিহাসিক বা গবেষণাকারী সকলের কাছে শহরের আকর্ষণ অনেক, কারণ কলকাতা শুধু শিক্ষাই দেয়না বুঝি বা শিক্ষার ত্রুটিকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কলকাতার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের গৌরবময় দৃষ্টান্ত। এখানে জীবনযুদ্ধ যেন ইতিহাস।

আজ কিছু নতুন কথা ভাবতে হবে। শুধু শহরে সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে নয়, প্রশস্তি গেয়ে নয় সমাজের দুর্বল মানুষের কাছে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ তুলে ধরতে হবে। পরিকল্পনা নিতে হবে নতুন নতুন উপনগরীর যেখানে এঁরা সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারেন। সেই প্রচেষ্টাই আজ চলছে। এর অংশীদার সি, এম, ডি, এ, আমি, আপনি, সবাই।

আরো জানতে হলে লিখুন

জনসংযোগ বিভাগ,

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি

(সি, এম, ডি, এ)

৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭।

আমরা কথা দিচ্ছি জবাব পাবেন।

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা 'বিশ্ববাণী' অফিস হইতে সংগ্রহ করিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।
- **বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।**
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারনে হউক পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- **বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০ টাকা (১০%) কমিশন পাইবেন।**
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank-এর চেক পাঠাইলে Bank Charges-বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

অফিসের সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০ মি: থেকে ৬-৩০ মি:

ফোন : ৫৫-১৮০০

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ফাল্গুন, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ন
শ্রীরমণীরঞ্জন সোদার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।
শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ভাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯ ।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিমলকৃষ্ণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

দুলালের
তালমিছরী

বিশ্ববাণী

ফাল্গুন, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	নববর্ষে নিবেদন	১	
২।	বাণী ও বিচার	২	
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণগীতি	১৭	শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস
৪।	বেদান্ত ও সনাতন ধর্ম	১৮	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৫।	ভারত সংস্কৃতি ধারায় কৃষ্ণচেতনা	২১	ডক্টর শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৬।	ভারত শিল্প	২৫	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭।	পূর্বরাগ	২৭	শ্রীআশুতোষ ঘোষ

WELCOME AWAITS YOU AT—

THE CHARTERED BANK

(INCORPORATED IN ENGLAND BY ROYAL CHARTER 1853)

(A member of Standard Chartered Bank Group)

Where services is taken into account :

4, Netaji Subhas Road, Calcutta-1 — 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1

31, Chowringhee Road, Calcutta-16

208, Rashbehari Avenue, Gariahat, Calcutta-29 (with Safe Deposit Locker facilities)

10, Nirmal Chunder Street, Bowbazar, Calcutta-12

21/A, R. G. Kar Road, Shyambazar, Calcutta-4

67, Cossipore Road, Calcutta-36 (with Safe Deposit Locker facilities)

Phone : 26-7168

With Best Compliments of :—

CHATTERJEE BROTHERS

NO. 7, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1

DEALERS IN PHILIPS LAMPS AND RADIO

DISTRIBUTOR OF VENUS WATER HEATER &

ALL KINDS OF ELECTRICAL GOODS.

ফোন : ৪৪-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রদাসপল্লী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সজ্জার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ নিবাস'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৪৪,৪৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২৮·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙালী	৮·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙালী	৬·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	৮·০০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৩·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	৬·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	২০·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিধান বাংলা অভিধান)	

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৮।	নেপালের জাতীয় কবি— আচার্য ভানুভক্ত	৩২	শ্রীঅচর সেন
৯।	কবি-সৈনিক গুরুগোবিন্দ সিং ও তৎকালীন ভারত-রাষ্ট্র	৩৫	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন
১০।	প্রাণ ও তাহার নিরাময় শক্তি	৩৯	স্বামী পরমাত্মানন্দ
১১।	সংসঙ্গ	৪২	শ্রীঘটলচন্দ্র দাশ
১২।	কালিদাস সাহিত্যে সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ প্রসঙ্গ এবং লোকবিশ্বাস	৪৩	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
১৩।	হিমালয়ের পথে—যমুনোত্রী	৪৯	শ্রীবিশ্বজিত দাস
১৪।	মিউরাল্‌স্-চিত্র ভাবনায় সিরামিক প্রসঙ্গ	৫১	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৫।	গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	৫৬	শ্রীতপন কবিরাজ
১৬।	ঠাকুর পূজা (গান)	৫৯	শ্রীশচীন্দ্রনাথ হরিপা
১৭।	সংঘবার্তা	৫৯	

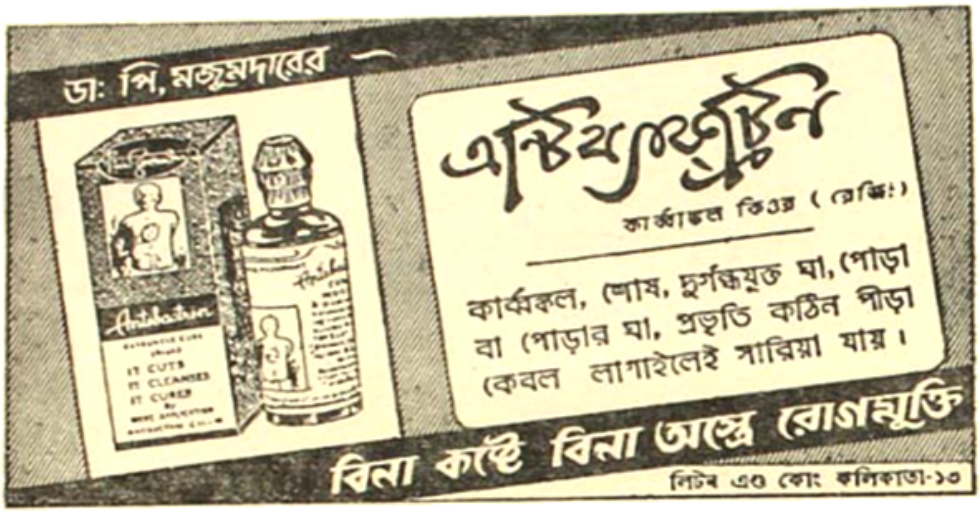

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR ATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMA

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANA

Hd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

স্বামী অভেদানন্দ

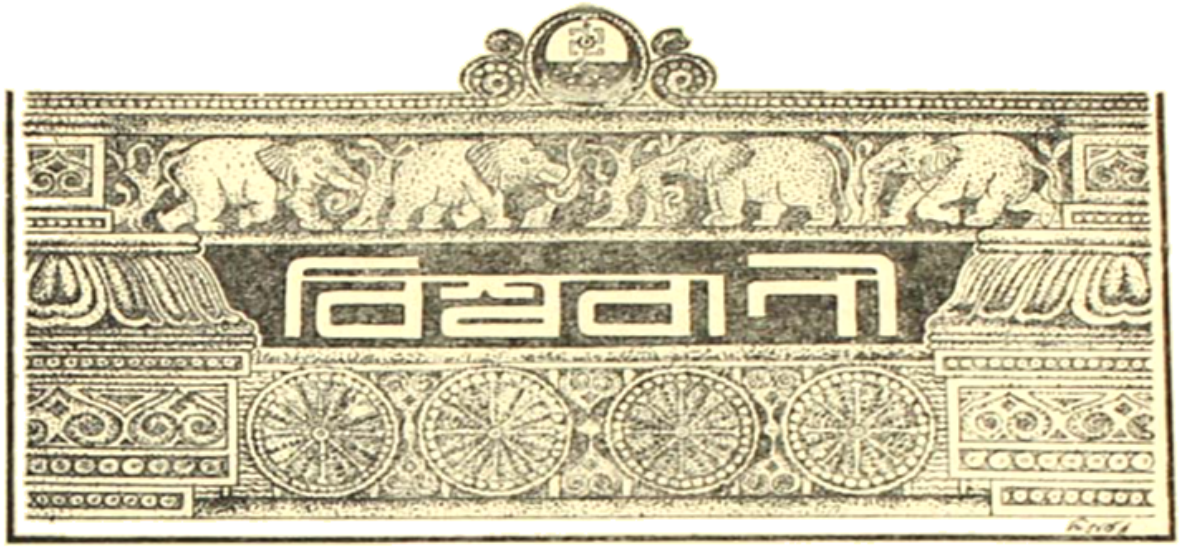

তেতাল্লিশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৮৭

।। নববর্ষে নিবেদন ।।

ফাল্গুন ১৩৮৭তে বিশ্ববাণী ৪৩-তম বর্ষে পদার্পণ করলো। ধর্মীয় ও বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক পত্রিকারূপে 'বিশ্ববাণী' বিগত বৎসরে আদরণীয় হয়েছে আরও বহু নূতন পাঠক-পাঠিকার কাছে, সমাদৃত হয়েছে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী জনসাধারণের কাছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল ধর্ম, সাধনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে 'বিশ্ববাণী' উপস্থিত হয়েছে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে—যাঁরা সমাদর করেছেন তাকে সমাদরে। 'বিশ্ববাণী' তার নিজস্ব মৌলিক সম্পদে জয় করেছে সর্বশ্রেণীর মানুষের হৃদয়, এবং প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছে সকল পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তে। বহু দুরতিক্রম্য বাধা-বিঘ্ন-সত্ত্বেও এই পত্রিকা উপস্থাপন করেছে পাঠকের মনে অপর্যাপ্ত খোরাক, যার জন্য পাঠকবর্গকে নতুন কোন ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি বিগত দুই বৎসরকাল যাবৎ। এই বর্ষেও পাঠকবর্গের সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আশা করি যে, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি বহনকারী এই সাংস্কৃতিক পত্রিকাটির নবযাত্রাটিকে কালজয়ী ক'রে তোলার জন্য সহযোগিতা করবেন পাঠকবর্গ বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষের সাথে।

অনেক গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক মনীষীগণ বিশ্ববাণীর উপাদান জুগিয়েছেন ও সমৃদ্ধ করেছেন বিশ্ববাণীর কলেবরকে। তাই শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানিয়েই আমরা ক্ষান্ত নই, নীরবে নিভৃতে যাঁরা সর্বসাধারণের কল্যাণে বিনা প্রতিদানে বিশ্ববাণীর সম্ভার জুগিয়েছেন, যে-সকল উদার বিজ্ঞাপনদাতাদের সাহায্য আমাদের সেবাকার্যকে সম্ভব করেছে তাঁদের এবং সর্বোপরি নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আগ্রহশীল সুধী-পাঠকবর্গকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহানুভূতিই বিশ্ববাণীর সহায় ও সম্বল এবং সেটিই পত্রিকার ভবিষ্যৎ নবযাত্রাকেও করবে অব্যাহত। পরিশেষে সর্বযজ্ঞের হোতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাই তিনি এই সমবেত চেষ্টাকে সফল ও সার্থক করুন।

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(দশমাংশ)

॥ তিনিই সব হয়েছেন ॥

"তিনিই সব হয়েছেন"—এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বাত্মক-দৃষ্টি ও ব্রহ্মদৃষ্টি। ব্রহ্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মানুভূতি এককথা। ব্রহ্মানুভূতিই মুক্তি বা মুক্তির উপলব্ধি। মুক্তি জীবনসিদ্ধির অবস্থা। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের ভাস্বরূপ-দীপিকায় (আনন্দাশ্রম-সংস্করণ) আচার্য বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : "সচ্চিদানন্দরূপং হি ব্রহ্ম তত্র প্রমাণৈঃ প্রমীয়মাণেষু সর্বেষ্বপি বস্তুষু সত্যং জ্ঞানমানন্দং চ বিশিষ্টমতো ব্রহ্ম সর্বপ্রত্যয়বেদ্যম্। বাচম্। সপ্রপঞ্চমেব ব্রহ্ম সর্বৈঃ প্রত্যাত্মৈর্বেদ্যতে। ...তস্মাদদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমনন্যলভ্যত্বাদুপনিষদোবিষয় ইতি সিদ্ধম্। এতদেবাভিপ্রেত্য ভগবান্ বাদরায়ণঃ সূত্রয়ামাস—শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি"। শাস্ত্রই যোনি বা কারণ ব্রহ্মবস্তুকে জানার জন্য। এই শাস্ত্র উপনিষৎ বা বেদান্ত—'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্'। বেদান্ত বা উপনিষৎ তাই ব্রহ্মজ্ঞানবিদ্ধ ও উপলব্ধিবান ঋষি ও সাধকদের অনুভূতির বস্তু।

উপনিষৎ-অনুশীলনের ফল কি? বিদ্যারণ্য-মনীশ্বর[১] তৈত্তিরীয়-উপনিষদের দীপিকায় এ'প্রশ্নই করেছেন : "অথ কিং ফলমিত্যত্রোত্তরমুচ্যতে। উক্তবিষয়স্যাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মতত্ত্বস্যাভিব্যক্তিঃ সাক্ষাৎফলম্। তচ্চ বৃহদারণ্যকে দর্শিতম্। ...জগৎকারণং পরমাত্মানং বেদান্তমহাবাক্যৈস্ত্বং পদার্থৌ। ...জীবাত্মানমেব পরমাত্মত্বেন বেদান্তমহাবাক্যৈঃ পদত্যাগেনার্থঃ। পরমাত্মা হি সর্বস্যজগত-উপাদানম্"। প্রথম ফল অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুভূতি : "এতাদৃশাদ্বিতীয়ত্ববোধঃ প্রথম ফলম্। তত্ত্বোধাদূর্ধ্বমবিদ্যা নিবর্ততে। এতচ্চাহুর্ঋষিনৈকরাত্মায়তে। এতদ্ধো (এতদ্ বৈ) বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্যেতি"। 'গুহা' অর্থে বুদ্ধি—যে বুদ্ধি অন্তঃকরণের অন্যতম বৃত্তি বা কার্য। এই বুদ্ধিতে সাক্ষীস্বরূপ জ্যোতিষ্মান আত্মা বিরাজমান এবং এই বুদ্ধিভাস্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকেই বোধে বোধ-রূপে উপলব্ধি করেন অজ্ঞানমুক্ত সাধকগণ।

বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর তৈত্তিরীয়-উপনিষদের দীপিকায় পুনরায় বলেছেন : "গুহা বুদ্ধিস্তস্যাং নিহিতং সাক্ষিত্বেনাবস্থিতমেতদ্ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং যো বেদ স পুমানিহ দেহে বর্তমান এব সন্নবিদ্যাগ্রন্থিং বিস্রংসয়তি"। এই অমৃততত্ত্ব ব্রহ্মের উপলব্ধিতে হৃদয়গ্রন্থি অজ্ঞানবন্ধন ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূর হয় ও সকল স্বার্থদুষ্ট কর্ম ক্ষীণ বা নষ্ট হয় এবং পরম ব্রহ্মকে তখন দর্শন করা যায় উপনিষদেও আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

১। অনেকে বলেন 'ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর', আবার অনেকের মতে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন ব্যক্তি।

বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর এ'প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়-দীপিকায় বলেছেন : "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে ইতি। পরমুৎকৃষ্টং জগৎকারণমজ্ঞান-মপাবরমধর্মং যস্মাৎপরমাত্মনঃ সোঽয়ং পরাবরঃ। যদ্বা পরশ্চাসাবরশ্চেতি পরাবরঃ সর্বাত্মক ইত্যর্থঃ। পরাবরে তস্মিন্ পরমাত্মনি সাক্ষাৎকৃতে সতি হৃদয়গ্রন্থির্ভিদ্যতে। হৃদয়মন্তঃকরণং লিঙ্গশরীরং তচ্চৈতন্যজ্ঞায়াব্যাপ্তত্বেন চৈতন্যমহং কর্তেতি প্রতিভাসমানং তর্কশাস্ত্রে পূর্বমীমাংসায়াং চ মুখ্যাত্মত্বেনাঙ্গীকৃতম্।...অজ্ঞাতস্য শক্তিরূপস্যারোপিতেন রজতেন সহ যথৈকীভাবস্তদ্বদ্-শাস্ত্রোপদেশরহিতঃ সর্বোঽপি জন্তুরজ্ঞানাবৃতচিদানন্দৈকরসমাত্মতত্ত্বং কর্তৃত্বাদ্যশেষস্বরূপবিবক্ষয়া ব্যবহরতি।...সত্যপি ব্যবহারে যথাপূর্বমজ্ঞাতাভাবাৎ। তত এব শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসায়াং ভগবদ্-ভাষ্যকারস্য আহুঃ। নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্।...হৃদয়গ্রন্থৌ ভিন্নে সর্বসংশয়া-শ্ছিদ্যন্তে"। হৃদয়গ্রন্থিরূপ অজ্ঞান দূর (নষ্ট) হলে আর শত-সহস্র শাস্ত্রেও কোন সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না—'হৃদয়গ্রন্থিরহিতস্য শাস্ত্রসহস্রৈরপি ন তে সংশয়া উৎপাদয়িতুং শক্যন্তে'। সংশয়ই ভেদবুদ্ধি ও অজ্ঞান সৃষ্টি করে, সুতরাং সন্দেহ বা সংশয় (destructive doubt) নষ্ট হলে বুদ্ধিসাক্ষী পরমাত্মাকে উপলব্ধি ('বোধে বোধ') করা যায়—যেমন মেঘের আবরণ সরে গেলে স্বয়ংপ্রকাশমান সূর্যকে দেখা যায়। মুক্তিরূপ স্বয়ংপ্রভ সর্বব্যাপক চৈতন্যের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যই তাই।

॥ বোধে বোধ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার (৪।২০) শ্লোকে নিত্যতৃপ্ত, নিরাশ্রয় ও জ্ঞানদীপ্ত সাধকের অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে এ'কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন—

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

সমাগ্‌দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানদীপ্ত ও আত্মতৃপ্ত সজ্ঞানী। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁকে বলেছেন : "কর্মণি ফলে চাসঙ্গং কর্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ ত্যক্ত্বা অকর্তৃভোক্তৃত্বাত্মসম্যগ্‌দর্শনেন বাধিত নিত্যতৃপ্তঃ পরমানন্দস্বরূপলাভেন সর্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষঃ...এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং ...নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনেন (দ্বৈত-) বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ"। ব্রহ্মোপলব্ধির বা সম্যগ্‌দর্শনের পর কর্তৃত্বাভিমান ('অহং'-রূপ অস্মিতা বা অজ্ঞান) থাকে না ব'লে সাধক তখন সর্বত্রই (সর্বভূতে ও সর্ববস্তুতে) ব্রহ্মচৈতন্যের স্ফুরণ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেন এবং আপনাতে (পূর্ণস্বরূপ আত্মাতে) আপনি তৃপ্ত থাকেন।

আচার্য শঙ্কর মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বে অনুরূপ কথাই বলেছেন গীতা (৪।২০)-ভাষ্যে। তিনি বলেছেন : "নিষ্কর্মা সংন্যাসী জীবনমাত্রাচেষ্টঃ সন্ কর্মণি প্রবর্ততে...। কর্মণি তৎকালে চ সঙ্কল্পরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ লোকসংগ্রহার্থং পূর্ববৎ কর্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম অকর্মৈব সম্পদ্যতে। বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম পরমার্থতোঽকর্মৈব তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ"। আচার্য আনন্দগিরি টীকায় অনুরূপ কথাই

বলেছেন : 'শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং', 'অভিমানবর্জিতং' সকল কর্ম করেন ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ কামনার সংসারে বাস করেও। অজ্ঞানলেশ বা অজ্ঞানের ফলরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত পার্থিব শরীর তখন থাকলেও 'আমার শরীর' এই অভিমান তখন থাকে না বলে ('অশরীরত্বাৎ') তিনি মুক্ত। মুক্ত অর্থে অজ্ঞানরূপ বন্ধনমুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ('যেন জাত ইব') সেকথা বলেছি। একই সর্বব্যাপক মহাচৈতন্যের সাগর থেকে রূপ ধারণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং আপনার পরমাত্মরূপ-সম্বন্ধে তিনি সচেতন থেকেই পৃথিবীতে তাঁর সকল লীলাকর্ম করেছিলেন। লীলাকর্মের স্তরে স্তরে ও জীবনের প্রতিটি কর্মে শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মতোই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত সকল-কিছুর মধ্যে ছিলেন নির্বিকার চিত্তে। সেই অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেই আপন ('বন্ধুরৈব স্নুটুম্বকম্'), সুতরাং অফুরন্ত ভালবাসা ও করুণাস্পর্শ দিয়ে তিনি সকলকে ও সকল পার্থিব-বস্তুকে এক চৈতন্যসাগরের বিন্দু-বিন্দু হলেও সিন্ধুরূপেরই প্রকাশ দেখতেন। সাধুও তখন সাধু এবং অসাধুও তখন সাধু,—এক ও অখণ্ড চৈতন্যেরই সকলে পূর্ণপ্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার তখনকার নিজের অবস্থাসম্বন্ধে বলেছেন : "গাড়ী ক'রে (চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে) যাচ্ছি—বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা।[১] দেখলাম—সাক্ষাৎ-ভগবতী। দেখে প্রণাম করলাম" (অন্যত্র আছে যে, তাদের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে বলেন—'মা, এখানে তুমি এই বেশে বা ভাবে আছ' ?) [আর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে তুমিই মা শ্রীশ্রীভবতারিণীরূপে আছ—এটি implied ভাব]—শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্ময়-ব্যাপক-দৃষ্টি ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি চৈতন্যময়, অর্থাৎ চৈতন্যপ্রলেপিত দৃষ্টি, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন। সাধারণও তাঁর চক্ষে ছিল অসাধারণ ও দিব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "এই (সর্বাধার ও সর্বাত্মক) ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও"। লীলা মায়ার জগতে বন্ধনহীন খেলা। 'লীলাবত্তু কৈবল্যম্'-সূত্রের-ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর সকল কথারই প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। অবতারপুরুষই লীলা করেন, কেননা তিনি মুক্ত, আর মায়ার জগৎ দ্বৈত ও অজ্ঞানের জগৎ। ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধির পর সাধক থাকেন স্থিতপ্রজ্ঞরূপে। স্থিতপ্রজ্ঞ-জীবন্মুক্ত মায়ার দ্বৈত বা দুই-দুইজ্ঞানের জগতেও বাস করতে পারেন, কেননা তাঁর মধ্যে তখন দুই-দুই দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈত-জ্ঞানের সমতলে এক হয়ে যায়, সুতরাং মায়ার এবং মায়ার দ্বৈতজগতের সঙ্গে ব্যবহার-কালেও তাঁর অদ্বৈতজ্ঞানের কোন হানি হয় না। অবতারগণের জীবনে শুধু নয়, জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীদের (এমনকি অবতারের অন্তরঙ্গলীলাপার্ষদদের) জীবনেও তার চাক্ষুস-পরিচয় পাওয়া

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অন্যস্থানে এ'প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে : ঘোড়ারগাড়ী ক'রে চিৎপুরের রাস্তা ধরে যাচ্ছেন, গাড়ীর ভিতর থেকে একটু উঁকি মেরেই দেখলেন দু'জন বারবণিতা (বেশ্যারমণী) মাথায় খোঁপা বেঁধে ও কপালে টিপ পরে হুকায় তামাক খাচ্ছে।

যায়, কেননা অবতার ও অবতারসঙ্গীরা সংসারে সকল কাজ করেন সাধারণ মানুষের মতোই —হাসেন, কাঁদেন, এমন কি ঠাট্টাতামাসাও করেন, কিন্তু দেহ ও মন তাঁদের আবিষ্ট (saturated) থাকে সর্বদা ব্রহ্মানন্দরসে। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গীতার ৪।৬ শ্লোকের তাঁর গূঢ়ার্থদীপিকায় শ্রীভগবানের (ঈশ্বরের) অবতারজীবনে ব্যবহারসম্বন্ধে বলেছেন : "স্ব-স্বরূপ-মধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিতএব সন্ সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণৈব দেহিবদ্ব্যবহরামি। কথং তর্হি অদ্বৈতে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্বপ্রতীতিরিতি আহ আত্মমায়য়েতি।" ঈশ্বর নিজের ঐশী-মায়ার সাহায্যে দেহধারণ করলেও ভাষ্যকার ধনপতি গীতার তাত্ত্বোৎকর্ষদীপিকায় পরিষ্কারভাষায় উল্লেখ করেছেন : "পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি"। টীকাকার আনন্দগিরি বলেছেন : "তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃতা ভগবদধীনত্বমাহ"। মায়ার স্বাতন্ত্র্য অর্থে নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। মায়াশক্তি সর্বদাই ঈশ্বরের অধীন, সেজন্য ঈশ্বর মায়াকে নিয়ে দিব্যখেলা ও লীলাকর্ম করলেও মায়ার তিনি অধীশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটু ভিন্নভাবে মায়া ও মায়ার সৃষ্টিকার্য যে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন সেকথা স্বীকার ক'রে বলেছেন : 'ঈশ্বর একই গাছে লালফুল ও সাদাফুল দুই-ই করতে পারেন, সবই তাঁর ইচ্ছার অধীনে, হাঁ ও না—দুই-ই তাঁর ইচ্ছার অধীনে।[৩] গীতার (৪।৬) ভাষ্যে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন, ঈশ্বরের দেহধারণ করা—না করা সবই তাঁর ইচ্ছার অধীনে : "যদিচ্ছয়ৈব প্রবর্তমানা বিশুদ্ধসত্ত্বময়েন মম নৃতির্যগাদিশরীরঞ্চ অজস্যস্যব্যয়স্যাপীশ্বরস্যোপপন্নম্", অর্থাৎ ঈশ্বরের দেহধারণ করা—না করা তাঁর বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ইচ্ছার অধীন। সেজন্য ঈশ্বর মায়ার সংসারেও অবিকৃত ও স্বাধীনভাবে বিহার ও লীলা করতে পারেন। জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীদেরও ঐ এককথা ; তাঁরাও দিব্যজ্ঞানের অমৃতময় জীবন নিয়ে মায়ার অর্থাৎ বৈতজ্ঞানের জগতে বা সংসারে নির্বিকার-চিত্তে থাকতে পারেন, তাতে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন হানি (ক্ষতি) হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথার একটি উদাহরণ দ্বারা বলেছেন : যেমন লুকোচুরিখেলায় (চোর-চোর-খেলায়) একবার বুড়ি ছুঁলে আর চোর হতে হয় না। তখন নিশ্চিন্তে বসে সে খেলা দেখে ও আনন্দ করে। তিনি পুনরায় বলেছেন : "এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ (উপলব্ধি) ক'রে তারপর লীলা-আস্বাদন ক'রে বেড়াও" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮৯)। মায়ার সংসারে আমাদেরও সকলের এই চোর-চোরখেলা। কিন্তু খেলায় আমরা মেতে (উন্মত্ত হয়ে) আছি। তাই যে'দিন বা যখন মায়ার ও মায়ার সংসারের সত্যকারের স্বরূপের আমরা রহস্যভেদ করতে পারবো অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারবো—তখন যা সে'দিন

৩। "নরেন্দ্র বলেন : আইন তিনি (ঈশ্বর) ছাড়াতে পারেন ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি ? তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন। যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন"—(শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮৯)।"

এ'প্রসঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, আইন বা law চিরদিনই আইন, সুতরাং চিরাচরিত আইনের যদি ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সেই ব্যতিক্রমকেও বলবো extra-ordinary একটি আইন। মোটামুটি একথাই বলতে হয় যে, আইনসৃষ্টিকারী ভগবান এবং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা বা শক্তি আইনকে ভাঙা ও না-ভাঙা বা ভাঙা, অর্থাৎ ভাঙাগড়া ঈশ্বরের হাত।

আমরা মুক্ত হবো এবং অমৃতস্বরূপ মুক্তি লাভ ক'রে অজ্ঞানের সংসারে বাস করলেও অজ্ঞান আমাদের কোন অনিষ্ট অর্থাৎ সংসারে আর মায়ায় লিপ্ত করতে পারে না।

॥ মনের নাশে চৈতন্য বা জ্ঞান ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব (মাষ্টারাদির প্রতি)—"ব্রহ্মজ্ঞান সহজে হয় না? মনের নাশ না হলে হয় না"। 'মনের নাশ' অর্থে মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হওয়া। স্বামী অভেদানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই বলেছেন: 'You cannot kill the mind, bur you can only transform the mind into Consciousness (pure Consciousness)'। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন: 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তের বা মনের কাজ বা চাঞ্চল্যকে বৃত্তি বলে। ঐ বৃত্তিকে (চাঞ্চল্যকে) নিবৃত্তি বা নিরোধ করার অর্থ সমাধি (শান্ত করা) বা মনকে স্থির-নিশ্চল-বৃত্তিশূন্য করা। মন বৃত্তিশূন্য হলেই মনের সমাধি-অবস্থা হয়, অর্থাৎ মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। মন সমাধিসম্পন্ন হ'লে মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হয় এবং তখনই ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে ঐ মনের রূপান্তরিত চৈতন্যের মিলন হয়। 'মিলন' রূপকল্পমাত্র। মন সমাধিতে অর্থে ব্রহ্মসমাধিতে ব্রহ্মভাবসম্পন্ন হয়। 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ'—ব্রহ্মভাবই মুক্তি এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরে তাই বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা মনের নাশ হলেই হয়। মনের নাশ হলেই 'অহং' নাশ—যেটা 'আমি আমি' করছে। এটি ভক্তিপথেও হয়, আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'এ'সব মায়া, স্বপ্নবৎ'—এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি নেতি'—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি জীব—'আমি' ঘটমধ্যে রয়েছে"।

"মনে করো দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কটা সূর্য দেখা যাচ্ছে?"

"ভক্ত—দশটা প্রতিবিম্ব। আর একটা সত্য সূর্য তো আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে করো—একটা ঘট ভেঙে দিলে, এখন কটা সূর্য দেখা যায়?

"ভক্ত—নয়টা, একটা সত্য-সূর্য তো আছেই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া গেল, কটা সূর্য দেখা যাবে?

"ভক্ত—একটা প্রতিবিম্ব-সূর্য। একটা সত্য-সূর্য তো আছেই।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাঙলে কি থাকে?

"গিরিশ—আজ্ঞে, ঐ সত্য-সূর্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে—তাই আছে। প্রতিবিম্ব-সূর্য না থাকলে সত্য-সূর্য আছে কি ক'রে জানবে? সমাধিস্থ হ'লে 'অহং'-তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে (ব্যুত্থিত হলে) কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না"—(শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৬১—১৭০)।

"আর এক সময়ে নন্দ বসু বলেছেন : "তাঁর (ঈশ্বরের) কৃপাতে যদি সব হয়, তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী" ?

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি নিজেই সব। ঈশ্বর নিজেই জীব-জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণজ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ। তিনি মন, বুদ্ধি, দেহ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন ?" (যেখানে দুই বা নানা, সেখানেই পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন, কিন্তু যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্, একটিমাত্র সত্তা, এক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, সেখানে কে কার উপর পক্ষপাতিত্ব বা কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন—'কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিঘ্রেৎ ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই এ'গানটি গাইতেন—যদিও সকল গানই তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল—

'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করি, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।'[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য যে, মহাশক্তিময়ী মায়ার প্রভাবেই চেতন-অচেতন, জড়-চৈতন্য, বিশ্বচরাচর ঈশ্বরসঙ্গিনী অব্যাকৃত বা মায়া থেকে বিকাশ লাভ করেছে—'সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'। ঈশ্বরই আবার অবতার হয়ে আসেন (পৃথিবীতে লীলার জন্য অবতরণ করেন)। সুতরাং শক্তিরই অবতার। এখানে ধরে নিতে হবে যে, শক্তিসহকৃত ঈশ্বরের বা সগুণ-ব্রহ্মেরই অবতার। সেজন্য অবতার ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি বিশ্বকল্যাণকার্য করার জন্য নিত্যের লীলায় বা লীলাভূমিতে আসা বা অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর (ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্মের) শক্তিতে অবতার। অবতার তবে (লীলার জন্য) কাজ করেন। সমস্তই মা-র শক্তি" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০১)।

৪। গানটির ভাবার্থ হ'ল : মহাশক্তিময়ী-মা মহামায়ার ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতেই বিশ্বের ও মানুষের সকল-কিছু বাসনা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু অজ্ঞানরূপ মোহের বশে মানুষ ভাবে যে, সে নিজেই সকল কাজ করে ও কাজে কর্তা। ইচ্ছাময়ী মহামায়া অঘটনঘটন সকল-কিছুই করতে পারেন, তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। তবে মানুষ যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেই ভোগের জন্য মানুষই অর্থাৎ তার কর্মফলই দায়ী। মানুষ যেমন কর্ম করে, তার ফল সে তেমনই পায়, কিন্তু অজ্ঞানের জন্য মানুষ মনে করে সে এ'সবের জন্য দায়ী নয়, মহামায়ার ইচ্ছা ও প্রভাবই একমাত্র দায়ী। এখানে মহামায়ার দিকে মানুষের দৃষ্টি থাকে না, যা মহামায়ার ইচ্ছাতেই সকল-কিছু হয়—এ'বিষয়ে সে জানে না। মোটকথা মহাশক্তি মহামায়ার দিকে দৃষ্টি ও মহামায়ার প্রতি শরণাগত থাকলে তবেই মানুষ জানতে পারে যে, সে যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী একমাত্র মহামায়া বা ঈশ্বর।

॥ যুগে যুগে অবতার ॥

যুগে যুগে অবতার, অসংখ্য অবতার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৩য় ভাগে (পৃঃ ২৭) 'জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার'-আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন—'তুমি পূর্ণব্রহ্ম'। কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন : 'আমি পূর্ণব্রহ্ম কিনা দেখবে এসো'। এই বলে একটা আমগাছ নিয়ে গিয়ে বল্লেন—'তুমি কি দেখছ ?' অর্জুন বল্লে—'আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি, তাতে থোলো থোলো কালোজামের মতো ফল ফলে রয়েছে'। কৃষ্ণ বল্লেন : 'আরও কাছে এসে দেখ-দেখি, ও থোলো থোলো কালো ফল নয়—থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে আমার মতো। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে—যাচ্ছে।"

আদ্যাশক্তিরই অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গায়ত্রীতে আছে 'ওঁ রামকৃষ্ণায় বিদ্মহে গদাধরায় ধীমহি'—শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণরূপী গদাধরের অবতার (গদাধর—গয়াধামের গদাধর—নারায়ণ)। নারায়ণ, গদাধর প্রভৃতিও মহাশক্তির অবতার। এই আদ্যাশক্তিরূপিণী মহাপ্রকৃতি বা মায়াশক্তিই জগতের মা—বিশ্বজননী বিশ্বপ্রসবিনী। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : 'মায়াবিদ্যে বশীকৃত্য তাং তাং সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ' অনেকটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিলেন। এই মায়াবিদ্যই মহাপ্রকৃতি বিশ্বজননী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন—সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা।···আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম : মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম। যেমন জেলেরা জাল ফেলে তারপর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে"—(শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৬২)। এই বড় বড় মাছই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন অবতার। "যিনি (সীমাযুক্ত) জগৎরূপে আছেন, তিনিই আবার (সীমাহীন) সর্বব্যাপী হয়ে—তিনিই মা"—জগতের মা।

এই মা যা জগতের মা-ই (ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীই) কালী আদ্যাশক্তি, আবার ব্রহ্ম। সাধক রামপ্রসাদও একথা বলেছেন—

প্রসাদ বলে ভক্তিমুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি।
আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ॥

পুনরায় রামপ্রসাদ বলেছেন—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি ডঙ্ক করি ঘারে।
সেটা চাতারে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝনারে মন ঠারেঠোরে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : "রামপ্রসাদ মনকে বলেছে—ঠারে ঠোরে বুঝতে। এই বুঝতে বলেছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তাকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি—কালী বলি।"

॥ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ ॥

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি। অগ্নি বল্লেই দাহিকা-শক্তি বোঝা যায়। একটিকে মান্‌লেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়"—(শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৪, ৫৮)। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে তবে অভেদ, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি"—(শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৫৫)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও উদাহরণ দিয়েছেন: "দুধ আর দুধের ধবলত্ব। জল আর তার হিমশক্তি"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন: "কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান"। জ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান—'অহং ব্রহ্মাস্মি', আর বিজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই বিজ্ঞানেই সর্বাত্মক, সর্বপ্রাণ ও সর্বচৈতন্য-ব্যাপকব্রহ্মের অনুভূতি হয়—যেমন অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন হয়েছিল। জ্ঞানের পর বিশেষজ্ঞান বিজ্ঞানেই ভগবানের বা আদ্যাশক্তি-মায়ের বিশ্বব্যাপক রূপ দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বিজ্ঞান কিনা তাঁকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) বিশেষরূপে জানা। তাতে আছে অগ্নি—এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, সেরে ছইপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ—তাঁর নাম জ্ঞান, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৫৬)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয় বোধে বা জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর সমাধি। নির্বীজ-সমাধি ও ব্রহ্মোপলব্ধি এককথা, তবে একটি যোগের ও অন্যটি অদ্বৈতবেদান্তসাধনার কথা।

মূলসত্তা-সর্ববেত্তাসক ও সর্বাধার-ব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টি—এক ও বহুভাবে কল্পনা করে মানুষ। উপনিষদে দূরে ও নিকটে (তদ্দূরে ও অন্তিকে)—মহৎ ও অণু এভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে: 'তদ্দূরে তদ্বান্তিকে', 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' প্রভৃতি। সমষ্টি ও ব্যষ্টি যেমন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। —গীতা ১৮।৬১

শ্রীধর-স্বামী টীকায় বলেছেন: "হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী) মায়য়া (নিজশক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (যথা দারুময়না আরূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যথা যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানিদেহাভিমানিনঃ জীবান্) ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি"। অন্তর্যামী ঈশ্বর (সগুণ-ঈশ্বর) নিজ মায়াশক্তির সাহায্যে সকল প্রাণীকে যন্ত্রের মতো ভ্রমণ করাচ্ছেন, অথচ তিনি প্রতিটি প্রাণীর অন্তরে বাস করছেন। আবার শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৬।১১) আছে—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ।

সেই দেবতা আত্মা এক হলেও সর্বপ্রাণীতে বিরাজিত, তিনি সর্বব্যাপী, আবার সকলের অন্তরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। তিনি সকল প্রাণীর কর্তা, সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আবার তিনি নির্গুণ। আবার সগুণ ও নির্গুণের অতীত।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৩।৭।৩।১) আছে: "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্, অন্তরো যময়তি, যম্ আত্মা ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃত"। সুতরাং বোঝা যায় যে, আত্মা বা ব্রহ্ম (সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর) আত্মন্, মায়াধীশ, অন্তরাত্মা, বহিরাত্মা, সর্বাত্মা, সাক্ষী, পরমচৈতন্য অর্থে ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্ম, সীমাহীন অসীম ও অনন্ত। কিন্তু এই অসীম অনন্ত সর্বাত্মা-ব্রহ্মই আবার জীব ও জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হন—'সর্বাত্মত্বাদ্ধি ব্রহ্মণো জীবসম্বন্ধীনি মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি'। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (১।১।১২)—ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর একই ব্রহ্মের (সর্বগুণাতীত তুরীয়-ব্রহ্মের) দুটি রূপের কল্পনার কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন একটি উপাসনার জন্য সগুণ-ব্রহ্ম (ঈশ্বর) এবং আর একটি 'জ্ঞেয়ত্বেন' —জ্ঞানের বা সম্যক্-উপলব্ধির জন্য নির্গুণ-ব্রহ্ম (তুরীয়) এবং সেজন্যই উপাধিযুক্ত ও উপাধিহীন ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়। আচার্য শঙ্কর বলেছেন: যত্র তত্র বিভূত্যাদ্যতিশয়ঃ স ঈশ্বর ইত্যুপাসিতব্যা চোদ্যতে·····। যথৈব হি তাবদানন্দময়োঽভ্যাসাদিতি এষমেবমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতো-পাধিসম্বন্ধঃ নিয়ন্তোপাধিসম্বন্ধকোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যত ইতি"। অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাতেই উপাধিসম্বন্ধ, কিন্তু জ্ঞানে (জ্ঞানসাধনাদ্বারা উপলব্ধিতে) উপাধিসম্বন্ধ নাই। তাছাড়া "আত্মনঃ কূটস্থ নিত্যৈকরূপস্যাপ্যুত্তরোত্তরমাবির্ভূতস্তারতম্যেনাশ্চর্য-শক্তিবিশেষাঃ শ্রূয়ন্তে···'যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্' ইতি। 'যত্র যত্র বিভূত্যাদ্যতিশয়ঃ স ঈশ্বর ইত্যুপাসিতব্যা চোদ্যতে'। গীতার (৮।৬) শ্লোকে কথিত বাক্য থেকে জানা যায় যে, যদিও একই আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বভূতে ও স্থাবরজঙ্গমাদিতে গুপ্ত বা সুপ্তভাবে আছেন বটে, কিন্তু চিত্তগত উপাধির তারতম্য-অনুসারে সেই নিত্য, একরূপ, কূটস্থ আত্মা বা ব্রহ্মেরও (নির্গুণ-ব্রহ্মেরও) আশ্চর্য শক্তির কথা উল্লিখিত আছে, এবং সেই শক্তিসম্পন্ন হয়ে ঐ নির্গুণ-ব্রহ্ম সগুণ-ঈশ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের মধ্যে নির্গুণ-ব্রহ্ম বিচারের (তত্ত্বমসি-মহাবাক্য)-দ্বারা জ্ঞানের বিষয় হয় এবং সগুণ-ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় (ভক্তির বিষয়) হয়। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (২।৩, পৃঃ ১৮৯) আছে: "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ"। একই নিরুপাধিক নির্গুণ-ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত ('মায়োপাধি গুণোপাধি-যুক্তং' বা) 'সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সোপাধ্যং ভবতি'। সর্বজ্ঞ ও সর্বেশ্বর-আদি গুণবিশেষ, সুতরাং নিরুপাধিক নির্গুণ-ব্রহ্মই সোপাধিক সগুণ-ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সোপাধিক বা মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্নরূপে পরিচিত। মায়োপধিক ঈশ্বরই অবতাররূপে অবতীর্ণ হন নিজমায়ার সাহায্যে।

॥ সর্বাত্মক শুদ্ধ-ব্যাপকচৈতন্য ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্বাধীন-স্বতন্ত্র-সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক ব্যাপকচৈতন্যই সকল চেতন ও অচেতন—চৈতন্য ও জড়ের আধার ও মূলবস্তু। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *The Synthesis*

of Yoga-গ্রন্থে এই সর্বাত্মক চৈতন্যকে জানার বা সম্যক্-উপলব্ধির কারণকে বলেছেন জ্ঞানযোগ-সাধনা। তিনি বলেছেন: "জ্ঞানযোগের প্রথম সাধনা হ'ল নিজেকে জানা। যে-আমি দেহ-প্রাণ-মনের নানা বিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, সেই আমি সত্তা নয়, আমার আত্মস্বরূপ নয়। আত্মা অপরাপ্রকৃতি হ'তে বিবিক্ত, কূটস্থ শাশ্বত অস্তিত্বের প্রত্যয়ে অবিচল। এই আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের মুখ্য-পুরুষার্থ" (অনির্বাণ: বঙ্গানুবাদ)। শ্রীঅরবিন্দ পুনরায় বলেছেন: "আত্মচৈতন্যকে বিস্তারিত করা ব্রহ্মচৈতন্যে এবং সেই চেতনা পরিব্যাপ্ত করা বিশ্বচৈতন্যে—অদ্বৈতসিদ্ধির এই রীতি। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) অনুভব হ'তে পৌঁছুলাম 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভবে। এ'হতেই সিদ্ধ হয় 'সর্বমাত্মৈব'। আত্মা ব্রহ্ম আর জগৎ—সম্বোধিতে (integral knowledge) তিন এক হয়ে যায়।...আত্মচৈতন্যের সর্বাত্মভাবে পরিণামের তিনটি ধাপের কথা বলেছেন উপনিষদের ঋষিরা।...তিনটি ধাপ হ'ল আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন, সর্বভূতে আত্মার দর্শন এবং সর্বভূতকে আত্মরূপে দর্শন। তিনটি অনুভবই অদ্বৈতানুভব, কিন্তু এদের মধ্যে গাঢ়তার তারতম্য আছে" (অনির্বাণ: বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ২১০)। এরপর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের অনুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: 'প্রথম অনুভব হ'ল আত্মাকে সমস্ত-কিছুর অধিষ্ঠানরূপে দর্শন করা। আত্মচৈতন্য তখন সাক্ষি-চৈতন্য। এই চৈতন্যে জগৎ ভাসছে', দ্বিতীয় অনুভব হ'ল যে-আমি আমাতে, সেই আমিই সবাতে। তৃতীয় অনুভব হ'ল আমার মধ্যে যে পরম-আমির অপরোক্ষ-অনুভব তাকেই দেখছি ঘটে ঘটে অনুপ্রবিষ্ট পরিস্পন্দিত বিভাব্যমান। চৈতন্য ও শক্তি তখন পৃথক নয়, অরূপেরই রূপায়ণ রূপে-রূপে, ভূতে-ভূতে কোনও ব্যবধান নাই'।

॥ যোগসাধনা ও জ্ঞানসাধনা ॥

পরমানুভূতি বা সর্বানুভূতির কথাই বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠোধ্যায় ২৯-৩০ শ্লোকদ্বয়ে। তিনি বলেছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন॥

যোগে সমাহিত-চিত্ত (সমাধিযুক্ত) সাধক সর্বত্রই ব্রহ্মমাত্রদর্শী ও চৈতন্যদর্শী। তিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্বভূতে (সর্বপ্রাণীতে ও পদার্থে) এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে। তিনি সর্বত্রই সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্মদর্শন হয়। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যিনি আমাকে (আত্মাকে বা ব্রহ্মকে) সর্বত্র দর্শন করেন ও সকল ভূতকে আমাতে দেখেন, আমি সেই সর্বত্র-সমদর্শী যোগীর প্রত্যক্ষের বা উপলব্ধির মধ্যেই থাকি ও তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে থাকেন না (অদৃশ্যঃ ন ভবামি, অদৃশ্যঃ ন ভবতি')।

এখানে যোগসাধনার পরমফললব্ধির কথা বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়। ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন। তবে অধিকাংশ অদ্বৈতসাধনমার্গীই মনে করেন যে, বেদান্তের অদ্বৈতসাধনায় যোগসাধনার অনুপ্রবেশ নাই, কেননা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগে যেমন আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব, তেমনি সম্ভব অদ্বৈতবেদান্তসাধনায় বা জ্ঞানের সাধনায়ও, সুতরাং উভয় সাধনা উভয়ের কোন অপেক্ষা রাখে না। এ'জন্য আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে গীতার (৬।২৯) শ্লোকের ভাষ্যের উপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন: "তদেবং নিরোধসমাধিনা ত্বংপদলক্ষ্যে চ তস্মে সাক্ষাৎকৃতে তদৈক্যগোচরা তত্ত্বমসীতি বেদান্ত-বাক্যজন্যা নির্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপা বৃত্তিরুদ্ভবিষ্যতীত্যাহ আহতে। ততশ্চ কৃৎস্নাবিদ্যাতৎ-কার্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মস্বরূপমাত্মস্বরূপভূতে ইত্যুপসাদয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ত্বংপদলক্ষ্যোপ-স্থিতিমাহ সর্বভূতস্থমিতি"।—অর্থাৎ 'অতএব এই প্রকার নিরোধসমাধির দ্বারা 'ত্বং'-পদ ও 'তৎ'-পদের লক্ষ্য অর্থ যে শুদ্ধ চিৎবস্তু—তার সাক্ষাৎকার হলে 'তত্ত্বমসি'-বেদান্তবাক্যের শ্রবণ থেকেই নির্বিকল্পক-সাক্ষাৎকাররূপ একপ্রকার বৃত্তির (চিত্তবৃত্তির) সৃষ্টি হয় এবং ঐ যে নির্বিকল্পক-সাক্ষাৎকার অর্থাৎ নির্বিকল্প-অপরোক্ষ-অনুভব বেদান্তবাক্যের (মহাবাক্যের) তৎ ও ত্বং-পদের যা লক্ষ্য অর্থাৎ লক্ষণশক্তিসিদ্ধ অর্থ তাদের একতার বিষয় হয় অর্থাৎ এক হয়। তাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলে। 'ত্বং'-পদের লক্ষ্য-অর্থ 'চিৎ' (জীব) এবং তৎ-পদের লক্ষ্য-অর্থ শুদ্ধচিৎ (ব্রহ্ম)। এরা অভিন্ন ও এক—এইটিই অপরোক্ষানুভূতিতে প্রকাশ পায়'। কিন্তু পুনরায় আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: "যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সাক্ষিসাক্ষাৎকারহেতুঃ, তথা জড়বিবেকেন সর্বানুস্যূতচৈতন্য পৃথক্করণমপি। নাবশ্যং যোগএবাপিক্ষিতঃ" ।[১] সেজন্য বশিষ্ঠদেবের কথার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন—

'দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥
অসাধ্য কস্যচিৎ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ।
প্রকারৌ দ্বৌ-তয়োক্তো বেদো জ্ঞাদ পরমঃ শিবঃ ॥'

এ'সম্বন্ধে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: "তত্র চ উপায়দ্বয়ম্। (১) একোঽসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ হি আত্মৈকাকারবৃত্তিপ্রবাহানুকূলমন্তঃকরণসত্ত্বং সাক্ষিণমনুভূয়তে। নিরুদ্ধ-সর্ববৃত্তিকত্বং প্রশান্তত্বাদ্যনুভূয়ত ইতি বিশেষঃ। (২) দ্বিতীয়স্তু সাক্ষিণি কল্পিতঃ সাক্ষা-নুভবাদ্যাত্মোব সাক্ষ্যেব তু পরমার্থসত্যঃ কেবলো বিভুশ্চ ইতি বিচারঃ"।[২] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন যে, আচার্য শঙ্কর ও তাঁর অনুবর্তী অদ্বৈতবাদীরা বিচারের বা জ্ঞানের পথকেই

১। চিত্তবৃত্তির নিরোধ-রূপ যোগ যেমন সাক্ষী আত্মার সাক্ষাৎকারের উপায়, তেমনি জড়বস্তু থেকে পৃথকভাবে সর্বানুগত চৈতন্যের যে পৃথক্করণরূপ জ্ঞান বা বিচার—তাও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়। একটিতে অপরের সহায়তার প্রয়োজন নাই।

২। একটিতে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি। পরে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় এবং সম্প্রজ্ঞাতে বিচারদ্বারা পরমার্থসত্যের উপলব্ধি হয় কিন্তু একটু 'আমি'-অভিমান থাকে।

গ্রহণ করেছেন—'দ্বিতীয়মেবোপাদ্যমুপেয়ুঃ।—বিচারেণৈব চিত্তদোষনিরাকরণেন তত্তাস্তথাসিদ্ধত্বা-দিতি কৃতনদিকেন'।

যোগ ও জ্ঞান—দু'টি সাধনা ও তাদের উপলব্ধিদ্বারা দেখানোর উদ্দেশ্য বিশ্বের ও বিশ্বগত প্রাণীর মূলতত্ত্ব এক—সর্বাতিশয় ব্রহ্ম ও তার উপলব্ধি। কিন্তু তাহলেও অনেকের মধ্যে সাধনা নিয়ে দ্বন্দ্বের উন্মাদনা দেখা যায়, লক্ষ্যের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না—এ'জন্য এই প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্যই এই বিচারের বা প্রভেদের আলোচনা। অন্যথা জীব ও জগতের যা আধার এবং সেই আধারস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাই যে পুনরায় জীব ও জগৎকে জারিত (একীকৃত) ও আলোকস্নাত ক'রে সর্বদাই বর্তমান—এই পরমতত্ত্বের অবধারণ বা উপলব্ধি করাই মনুষ্যত্বমাত্রের কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্নভাবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতবাদ ও তাদের সাধনার প্রসঙ্গে ঐ এক কথারই উপদেশ দিয়েছেন—'যত মত, তত পথ, কিন্তু লক্ষ্য এক'। পরমসত্যের উপলব্ধি না হওয়া-পর্যন্ত তর্ক ও বাদানুবাদের অন্ত নাই, কিন্তু উপলব্ধির পর জীব ও ব্রহ্ম, জগৎ ও ব্রহ্ম, মায়া ও ব্রহ্ম—সমস্তই এক ও অভিন্ন প্রতীয়মান হয়, কেননা অজ্ঞানেই ভেদ, কিন্তু জ্ঞানে অভেদ।

॥ ব্রহ্মের সর্বাতিশয়িত্ব ॥

অদ্বৈতবেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সর্বাতিশয়িত্ব (transcendence)-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম বলেছেন: আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম ক'রে আছেন, আবার ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ বা আধার ও আশ্রয়। ব্রহ্মকে অবলম্বন করেই জীব ও জগৎ প্রকাশমান, কেননা ব্রহ্ম-ছাড়া জীব ও জগতের আর কোন অবলম্বন, আধার বা আশ্রয় নাই।

ব্রহ্ম সর্বাতিক্রান্ত, আবার সর্বাধার ও সর্বব্যাপক (অতীত ও অনুস্যূত) কথা যেন একটু বিপরীতধর্মসম্পন্ন, কিন্তু বিপরীত নয়, কেননা বিপরীতধর্মের সমন্বয়ভূমিই সমন্বয়-ব্রহ্ম। সেজন্যই ব্রহ্ম 'পারমার্থিক-সৎ' বলতে চরমসত্তা, আর জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ পারমার্থিকঅর্থে মিথ্যা। মিথ্যা বলতে প্রকাশমান ও গতিশীল জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সাদৃশ্য নাই। তবে স্বরূপত পারমার্থিক-সত্তা ও ব্যবহারিক-সত্তার মধ্যে কোন বিরোধ (contradiction) নাই, সুতরাং পারমার্থিক-সত্তা-ব্রহ্মের ও ব্যবহারিক-সত্তা-জগতের মধ্যে আসলে কোন বিরোধ নাই, ভেদ আপাতপ্রতীয়মান ও প্রাতীতিক, ব্রহ্মই জগতের মূলভিত্তি ও আশ্রয়, এ'জন্য ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সহাবস্থিতি অদ্বৈতবেদান্তীরাও অস্বীকার করেন না। এজন্যই জীবন্মুক্ত-পুরুষ পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করলেও জাগতিক বস্তুর মধ্যে যা সঙ্গে থাকেন ও ব্যবহার করেন।

মোটকথা দ্বৈতজ্ঞান ও বিরোধই দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন জগতের লক্ষণ, কিন্তু সর্ববিলক্ষণ-ব্রহ্মের অর্থাৎ একরস-ব্রহ্মচৈতন্যের ধারণা করতে গেলে প্রথমে সসীম-জগতের দ্বৈতজ্ঞান ও বিরোধকে অতিক্রম করতে হয়। এই অতিক্রম করার জন্য একটি মহাসমন্বয়-ক্ষেত্রে স্থিত

হতে হয়।[৭] অথচ সসীম-জগতের সত্তা ব্রহ্মসত্তাসাপেক্ষ, কেননা জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত এবং জগতের বা বিশ্বপ্রপঞ্চের আধার বা অধিষ্ঠান ব্রহ্মই। ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্মের বক্তব্য এই যে, একথার দ্বারা বোঝায় না যে, সসীম ও অসীম ব্রহ্ম একই শ্রেণীর বস্তু। এ'থেকে কেবল একথাই বোঝায়—ব্রহ্মই সসীমের আশ্রয় বা মূলভিত্তিস্বরূপ (Primal Ground) —ঠিক যেমন রজ্জু, রজ্জু থেকে ভিন্ন সর্পের প্রতীতির আশ্রয় (ground) হয়। সুতরাং একথাই বলা উচিত যে, এই পরিদৃশ্যমান ও দেশকালাশ্রয়ী জগৎ ব্রহ্ম থেকে মোটেই ভিন্ন নয়, কেননা কারণরূপ ব্রহ্ম-ব্যতীত জগতের কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। আর জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বলতে জগৎ কিন্তু ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বা প্রকাশ—এ'কথা ঠিক নয়। "ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের আধার, স্বাতন্ত্র্যই কার্য-কারণ-পারতন্ত্র্যের মূলসত্তা এবং আশ্রয়, আর ব্রহ্মই জগতের আধার ও আশ্রয়—এই সকল কথার অর্থই এক। যেমন কাণ্টের (Kant) মতে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কার্যকারণব্যবস্থিতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াতীত স্বাতন্ত্র্যের কোন অসঙ্গতি নাই, যেমন স্পিনোজার (Spinoza) মতে পরিণামগ্রস্ত বস্তুর নানাত্বের সঙ্গে এক পরমবস্তুর পারমার্থিক-সত্তারূপ একত্বের কোন অসঙ্গতি নাই, সেরূপ বেদান্তমতে এই দৃশ্যমান জগতের সঙ্গেও সর্বসম্বন্ধাতীত ব্রহ্মসত্তার কোনও অসঙ্গতি (contradiction) নাই।" সেজন্য বলি যে, সসীম-জগৎ ব্রহ্মের বহির্ভূত বস্তু নয়, বরং ব্রহ্মের মধ্যেই নিহিত। অজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এ'সকল বিরোধীভাবাপন্ন ও নানাত্বের ধারণা দেখা যায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বরং একটি অবিরোধী সত্তার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায়।

আর একটি কথা যে, বেদান্তসাধনার সঙ্গে যোগসাধনার হুবহু মিল ও সামঞ্জস্য না থাকলেও আছে এক মিলনের ভাব। কিন্তু তাহলেও যোগোক্ত সমাধি থেকে উত্থান বা ব্যুত্থান-রীতি জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়, কারণ জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীর ব্রহ্মানুভূতির কখনও বিপর্যয় বা বিরতি বা বিকৃতি ঘটে না। তাছাড়া জীবন্মুক্ত-জ্ঞানীর অনুভূতি কখনও কোনদিন বাধিত বা ব্যাহত হয় না এবং এর অর্থ জাগতিক বিষয়বস্তুর জ্ঞান কখনও ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক হয় না, কারণ জ্ঞানাংশেও তারা এক ও অভিন্ন।[৮] সেজন্য যারা মনে করেন যে, অদ্বৈতবেদান্তমতে

৭। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর *Self-Knowledge* ও *True Psychology*-গ্রন্থদ্বয়ে spirit এবং matter (জড়বস্তু ও চৈতন্যবস্তু)-দুটির আলোচনায় neutral Brahman (স্বাধীন ও সর্ববিরোধী (ব্রহ্মকে) বলেছেন ঐ দুটির আধার বা প্রতিষ্ঠা (background)। তিনি বলেছেন: 'There are two ends of space and time, known as the positive and the negative, but the middle part or portion, where the positive and the negative meet, are the neutral one'. তেমনি অচেতন (জড়বস্তু ও জগৎ) ও চেতন (চৈতন্য ও ঈশ্বর) এ'দুটি সীমার মিলন ঘটেছে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বস্তুর সঙ্গে এবং সেই স্বাধীন বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

৮। 'অতএব প্রাণঃ' (১।১।২০)—এই প্রাণ 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য। আচার্য শঙ্কর শ্রুতিবাক্যের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন: 'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে ইতি প্রাণসংস্তৌ সর্বেষাং ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়বস্তুত্বাৎ[দে] প্রাণস্য ব্রহ্মত্বং গম্যতে। নমু উক্তং বৃহদারণ্যকপ্রাণগ্রহণেন সংবেদোদ্ভবস্য'বক্তব্যং ঘ্রাণপ্রবোধযোর্দৃশ্যত্বাদিতি'। কৌষিতকী-উপনিষদে প্রাণ ও প্রজ্ঞা সমান সংজ্ঞাযুক্ত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর *Self Knowledge*-গ্রন্থে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। সেখানে প্রাণ হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা এবং প্রজ্ঞা বিজ্ঞান বা জ্ঞানরূপী ব্রহ্ম।

জগতের ব্যবহারিক-সত্তার (empirical reality-র) সঙ্গে ব্রহ্মের পারমার্থিক-সত্তার (permanent reality-র) কোন সম্পর্ক নাই, তাঁদের ধারণা ঠিক নয়। তারপর বেদান্তের বাধ-সমাধি ও যোগের লয়-সমাধি—এই দুয়ের মধ্যে যে ভেদ সত্তাকারভাবে নাই সেটাও বোঝা যায়। তারপর পারমার্থিক-জগতে স্বতন্ত্রা ও ব্যবহারিক-জগতে পারতন্ত্র্যের মধ্যেও সত্তাকারের কোন ভেদ নাই। তাছাড়া পারমার্থিক-সৎ-ব্রহ্ম যে অজ্ঞান ও অজ্ঞানজাত বিষয়বস্তুর বিরোধী না হয়ে বরং তাদের আশ্রয় ও মূলভিত্তিস্বরূপ এবং সম্বন্ধাতীত অর্থাৎ দ্বৈতাতীত ব্রহ্মের যে কারু সঙ্গে বিরুদ্ধভাব বা বিরোধ থাকে না—অদ্বৈতবেদান্ত এ'তত্ত্বই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

॥ ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রভেদ ॥

ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম বলেছেন যে, ধ্যান ও জ্ঞানের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হ'ল : "ধ্যানের অবস্থায় একটি বিষয়বস্তু অপর একটি বিষয়বস্তুকে স্থানচ্যুত করতে (সরিয়ে দিতে) না পারলে সবিদ বা জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় ঠিক এরূপ ঘটে না, তখন সবিদের সকল স্তরেই একসঙ্গে কাজ হতে থাকে। সুরেশ্বরাচার্য তাঁর 'বার্তিক'-গ্রন্থে ধ্যাতা ও ধ্যেয় বা তত্ত্ববিদের এই পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ধ্যান ও জ্ঞান (ধ্যান ও নিদিধ্যাসনও) এজন্য ঠিক একস্তরের নয়। স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের সর্বাতিশায়ত্বের এই একটি লক্ষণ, সেজন্যই অদ্বৈতবেদান্ত সসীম জগৎকে একেবারে বর্জন করে নি, ধ্বংস করে নি এবং অস্বীকারও করে নি। তাছাড়া বেদান্তমতে স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে না এবং অজ্ঞানজাত বাহ্যজগৎও ব্রহ্মকে অণু স্পর্শ বা পরিবর্তিত করতে পারে না, তবে মিথ্যা-অজ্ঞান-প্রসূত অজ্ঞতার জন্য আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবতা বা সত্তাবোধ করি এবং চিন্তা করি যে, অবাস্তব জগৎ চিরসত্য ও চিরনিত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধির পর ঐ বোধের (জ্ঞানের) রূপান্তর ঘটে, তখন অজ্ঞানজাত বস্তুও জগৎ সদ্‌ব্রহ্মের দ্বারাই ব্যাপ্ত ও স্ফুরিত এবং বোধ হয় যে, স্বরূপে ব্রহ্ম ও তাঁর প্রকাশ পৃথক নয় এবং মিথ্যাও নয়। অজ্ঞানে রজ্জুতে সর্পভ্রম স্বাভাবিক, কেননা রজ্জুতে সর্পসত্তা প্রকৃতপক্ষে অধ্যস্ত বা আরোপিত-সত্তা, সেজন্য সর্পের ভ্রম দূর হয়ে সত্য-রজ্জুর জ্ঞান হলে যে সর্পটি রজ্জুতে প্রতীত হয়েছিল, সেটি ঠিকঠিক অস্বীকৃত হয় না, বা বর্জিতও হয় না, কেননা রজ্জু কোনকালেই সর্প নয়। সেজন্যই সর্পের রজ্জুজ্ঞানটি সংশোধিত জ্ঞান বা corrected idea বা knowledge.

॥ ব্রহ্ম ও জগৎ ॥

সেজন্য স্বীকার করি যে, আপাতত জগৎ ও জীব সসীমতার বা অজ্ঞানের ও নাম-রূপের দ্বারা আবদ্ধ হলেও অসীম-ব্রহ্মই সসীম-জীব ও সসীম-অজ্ঞানের সর্বস্ব, এবং ব্রহ্মই তাদের অধিষ্ঠান, উপাদান ও আশ্রয়, সেজন্য সসীম জীব ও জগৎ এক মুহূর্তও ব্রহ্মসত্তা-ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। পূর্বেই বলেছি যে, ইংরাজ দার্শনিক ব্রাডলে (Bradley) জীব ও জগৎকে রূপান্তরিত-ভাবে (transmuted) ব্রহ্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ক'রে ভুল করেছেন। জীব ও জগৎ যখন সমতারূপ

ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তখন তারা ব্রহ্মস্বরূপতাই লাভ করে, পূর্ণ হয়েই সেই পরিপূর্ণ-ব্রহ্মের স্বরূপ হয়। সেজন্য সসীম জীব তখনই অসীম ব্রহ্মকে লাভ বা উপলব্ধি করে—যখনই সে বুঝতে পারে যে, সসীমতা একটি ভ্রম বা অধ্যাসমাত্র, প্রকৃতপক্ষে সত্তা ও নিত্তা ব্রহ্মই তার প্রকৃত সত্তা।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্ম জগদ্‌বিলক্ষণ ও পরমার্থ-সৎ, আর জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থে ব্রহ্মের মতো পারমার্থিক ও নিত্য সত্তা নাই। রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত বা আরোপিত হলেও রজ্জু যেমন কোন প্রকারেই সর্পের সমগুণসম্পন্ন হয় না, সেরূপ বাস্তব প্রকাশমান-জগৎ অনিত্তা ব'লে সেই মিথ্যা জগতের সঙ্গে ব্রহ্মেরও কোন রূপ-সাদৃশ্য থাকতে পারে না, এবং সম্ভবত এই অর্থেই আচার্য শঙ্কর জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেছেন। দেশ ও কালের দিক থেকেই বলা যায় যে, ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম করেন না, সেজন্য এটিকে এক তত্ত্বের অন্য তত্ত্ব থেকে অতিক্রমের ভাব বলে স্বীকার করা যায়। তাছাড়া ব্রহ্ম ও জগৎ একই স্তরের বস্তু নয়, এজন্য জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় ক'রে বর্তমান আছে একথা বলে দ্বৈতবাদও বোঝায় না। সসীমের ভাব দিয়ে অসীমের বা ব্রহ্মের চিন্তা করতে গেলে আমাদের সসীম ও অসীমকে—ব্রহ্ম ও জগৎকে দু'টি পৃথক বস্তু বলে অনুমান করতে হয় এবং তখনই তাথেকে দ্বৈতবাদ এসে পড়ে। সসীমের চেয়ে অসীম এক উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব এবং ব্রহ্মও জগৎ থেকে ভিন্নস্তরের সত্তা—এ'অর্থেই ব্রহ্ম জগতের অতীত। কিন্তু ব্রহ্ম পারমার্থিক-সৎ এবং চরমসত্তা, কিন্তু জগৎ সেই তুলনায় সত্য নয়—মিথ্যা।

তবে একথা সত্য যে, ব্রহ্মের পারমার্থিক-সত্তার সঙ্গে জগতের ব্যবহারিক-সত্তার কোন বিরোধ বা contradiction নাই, বরং ব্রহ্মই জগতের মূল, আশ্রয়, আধার, আর এজন্য উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা বিরুদ্ধসম্বন্ধ নাই। আর একথাও সত্য যে, যে ব্রহ্ম জগতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সেই ব্রহ্ম আসল ব্রহ্ম নন, বরং সেই ব্রহ্মকে নকল বা মিথ্যা ব্রহ্ম বলা যেতে পারে। সেজন্য বলি যে, ব্রহ্মের সঙ্গে কারুরই কোন বিরোধ হতে পারে না। ব্রহ্মকে বরং সকল বস্তুর পরম ও শ্রেষ্ঠ সমন্বয় (synthesis) বলা যায়, কেননা ব্রহ্মের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী (antithesis) বা বিরোধী নাই, এজন্যই সৎ ব্রহ্ম ও অসৎ বা মিথ্যা জগতের সহাবস্থিতি বেদান্তীরা স্বীকার করেন।

পরিশেষে বলি যে, মিথ্যা জগৎ বা মায়াপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম থেকে একেবারে ভিন্ন নয়, বরং পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্মেই তার পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতা—যেমন প্রতীয়মান মিথ্যা-সর্প তার বাস্তবতা বা সত্যতা রজ্জুতে (আধারেই) লাভ করে। রজ্জুই মিথ্যা-সর্পের পূর্ণ ও সমগ্র বাস্তবতা, অর্থাৎ সর্পের যা-কিছু পূর্ণতা ও সত্তা—তারা সমগ্রভাবে থাকে রজ্জুর মধ্যে, সেজন্যই ভ্রান্তিরূপ ভ্রম-জ্ঞানের সংশোধন হলে সত্যদৃষ্টিরূপ সত্যজ্ঞান রজ্জুর প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ হয়। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মকেই নির্দেশ বা ইঙ্গিত করে এবং প্রপঞ্চের অস্তিত্ব তার অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের মধ্যেই পাওয়া যায়; সুতরাং একথা ঠিক যে, ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বপ্রপঞ্চ ও এমনকি অজ্ঞানকে বর্জন বা অস্বীকার করা হয় না এবং সত্যই উপলব্ধির বিষয় হয় যথার্থ জ্ঞানীর কাছে, বিচারীর কাছে নয়, কেননা বিচারীও বিচার করে অজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস ক'রে।

ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তির সর্গাভিমুখিত্বের প্রসঙ্গে E'lan Vital বা প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকারিণী প্রাণশক্তির (মুখ্যপ্রাণশক্তির) কথা বলেছেন—যে সৃষ্টিকারিণী শক্তির পরিচয়

দিয়েছে ছান্দোগ্য-কপনিষৎ। কঠোপনিষদেও প্রাণ থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভবের কথা আছে। কঠোপনিষদে (৬।২) আছে : "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্"। আচার্য শঙ্কর এর ভাষ্যে বলেছেন : "যদ্বিজ্ঞানাদমৃতা ভবন্তীত্যুচ্যতে, জগতো মূলং তদেবনাস্তি ব্রহ্ম অসত্ত এবেদং নিঃসৃতমিতি তত্ত্ব। যদিদং ব্রহ্ম যৎকিঞ্চিদং জগৎসর্বং প্রাণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সত্যেজতি কম্পতে, তৎ এব নিঃসৃতং নির্গতং সৎপ্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে। যদেবং জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তন্মহদ্ভয়ম্"। এই প্রাণ হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা। আবার প্রাণ ব্রহ্ম—যা থেকে ঈশ্বরের মায়াশক্তি কারণরূপে থেকে সূক্ষ্মরূপে (সংস্কারে রূপায়িত হয়ে) বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে ('এজতি')। বিশ্বসৃষ্টিকারিণী শক্তিই ব্রহ্মশক্তি বা সগুণ-ব্রহ্ম-ঈশ্বরের বৈষ্ণবীশক্তি। এই বৈষ্ণবীশক্তির (মহামায়ার) ঘূর্ণনে ও আগমনে মৃত্যুর বা প্রলয়ের অবসাদ বা আলস্য দূরীভূত হয়ে প্রাণের ও সৃষ্টির অরুণিমা সৃষ্টি হয়, সত্ত্বগুণের পর রজোগুণের প্রকাশাধিক্যে বিশ্বচর রূপ ও নাম (আকার) পরিগ্রহ করে. The Silence beyond Silence অথবা Supreme Silence (শান্ত-নীরবতা) তখন অশান্ত অথচ সুসংযত সৃষ্টিতে বিবর্তিত হয়। ব্রহ্মের এই ক্রম-বিবর্তন এবং বিবর্তরূপই জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্য। এই বিশ্ববৈচিত্র্যেই আবার ব্রহ্মের শান্ত ও প্রসন্ন-দৃষ্টির অশান্ত ও সচকল বাস্তবমূর্তি—বিরূপে, আর স্বরূপে শান্ত-অচকল কল্যাণতম রূপ বা মূর্তি।

●

।। শ্রীরামকৃষ্ণগীতি ।।

শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস

কামারপুকুরে চলো ওরে মন,
সেথা হবে তোর দেব-দরশন,
তুই দিবানিশি নিরালায় বসি
রয়েছিস যাঁর ভাবেতে মগন।

সে যে লীলাময় প্রেমের ঠাকুর,
তাঁর লীলাধন্য কামারপুকুর,
ভাবে ভরা হৃদি সদা-ভরপুর
সেথা গেলে পাবি সে-পরমধন।

অভাবে অসার হৃদয় তোমার,
(তাই) তাঁর নাম করো এ'জীবনে সার,
ঘুচিবে তোমার অজ্ঞান-আঁধার
আলোকিত হবে নূতন জীবন।

রামকৃষ্ণ-রূপে এলেন ভগবান,
কামারপুকুরে হবে অধিষ্ঠান,
শীতল হইবে তাপিত পরাণ
রামকৃষ্ণ-পদে লইলে শরণ।

●

॥ বেদান্ত ও সনাতনধর্ম ॥

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,[১] ধর্মের (Religion) ভিত্তি নীতি (morality) তাঁর মতে শাশ্বত নৈতিক বিধি ধর্ম (কর্তব্য), দান ও দয়া এই তিনটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। দানের সঙ্গে যুক্ত স্বার্থত্যাগ। আমার স্বার্থ আমি ত্যাগ না করতে পারলে কাউকে কিছু দান করতে পারিনে। সহানুভূতি থেকে দয়াভাব মনে আসে। সহানুভূতিতে আমরা যাকে সহানুভূতি দেখাই তার সঙ্গে একাত্ম হই। কর্তব্যবুদ্ধি আমাদের মনে বিচার করার প্রবণতা আনে। কর্তব্যাকর্তব্য বিচার না করতে পারলে কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয় না। আবার কর্তব্যাকর্তব্য বিচার নিত্যানিত্য বস্তুবিচারের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, যা নিত্য তার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য, আর যা অনিত্য সেবদাবস্তু তাকে পাওয়ার চেষ্টা কর্তব্য হ'তে পারে না। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, স্বার্থত্যাগ (দানের ক্ষেত্রে), একাত্মতা অর্জন (দয়ার ক্ষেত্রে) এবং নিত্যবস্তু লাভ (কর্তব্যবুদ্ধির ক্ষেত্রে) নীতির মূলকথা। সমস্ত ব্যাপারটিকে স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, স্বার্থত্যাগ করে সকলের সঙ্গে একাত্মতা অর্জনের জন্য নিত্যবস্তু বা আত্মা (কারণ, আত্মাই একমাত্র নিত্য এবং অন্য সমস্তই অনিত্য) প্রাপ্তি বা আত্মসাক্ষাৎকার নীতির মূল নির্দেশ। আত্মসাক্ষাৎকারের নামই ধর্ম। সুতরাং নীতি ধর্মেই সার্থকতালাভ করে। আত্মাকে জানলে একই আত্মা যে সর্বভূতে বর্তমান তা জানা যায় এবং তাতে সর্বানুভূতিলাভ হওয়ায় বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্তধর্ম সর্বানুভূতিলাভের আদর্শ প্রচার করে এবং এরচেয়ে উন্নত আদর্শ আর কিছু হ'তে পারে না। সেজন্য স্বামী অভেদানন্দ বলেন, বেদান্তধর্ম শ্রেষ্ঠধর্ম। তিনি এই ধর্মলাভের জন্য আমাদের সাধারণ বুদ্ধিকে দিব্য বুদ্ধিতে রূপান্তরের কথা বলেন। তাঁর মতে আমরা যদি আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অজ্ঞান এবং কুসংস্কারের ভারে পিষ্ট হতে না দিই তবে সাধারণ বুদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই দিব্য বুদ্ধিতে রূপান্তরিত হ'বে।[২] অর্থাৎ, স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, দিব্যবুদ্ধিলাভ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ বুদ্ধি স্বাভাবিক চেষ্টা ও সাধনায় দিব্যবুদ্ধি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যা দরকার তা হ'ল চেষ্টা বা সাধনা।

বেদান্তকে স্বামী অভেদানন্দ সনাতনধর্ম[৩] (Universal religion) বলে উল্লেখ করেছেন। সনাতনধর্ম বলতে তিনি কি বোঝেন ? তাঁর মতে সনাতনধর্ম কোন ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি 'Universal religion and Vedanta'-গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন, 'In

---

১। *Vedanta Towards Religion*, পঞ্চম অধ্যায় (Ethics of Vedanta)।

২। 'Common sense is the best sense which the Lord has given us. This Common sense will develop into Divine sense if we protect it from being crushed by the weight of ignorance and superstition'. Vedanta towards Religion, সপ্তদশ অধ্যায়।

৩। Universal religion and Vedanta গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

trying to find out the fundamental principles of universal religion, they would have to remember that it must not be based upon the limitation of any personality, but upon the eternal spiritual laws which govern their life'. (সনাতনধর্মের মূলনীতি নির্ধারণকালে মনে রাখতে হবে যে, সনাতন-ধর্ম কোন ব্যক্তির সীমায় সীমিত হতে পারবে না। তার ভিত্তি হ'বে আধ্যাত্মিক জীবনের শাশ্বত নিয়মাবলী।) স্বামীজী আরও বলেছেন, সনাতন ধর্ম হবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত, সর্বজনের অনুসরণযোগ্য এবং শাশ্বত শান্তি, প্রেম ও মুক্তিদাতা। তাঁর মতে বেদান্তধর্মই এই সনাতনধর্ম।[৪] কারণ, বেদান্তধর্ম কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। বেদান্তধর্মের ভিত্তি উপনিষদ ঋষিদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। ঋষিরা সত্যদ্রষ্টা, স্রষ্টা নন। উপনিষদ বা বেদ

৪। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন—বিবেকানন্দ বেদান্তকে সনাতনধর্ম বলে প্রচার করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে অনুসরণ করছেন এবং তাঁর শ্রোতারাও যেন তাঁদের অনুসরণ করেন (He opened the way and I followed his path and you are here to follow our path'—Universal religion and Vedanta)' এই প্রসঙ্গে কোন কোন পণ্ডিতের একটি ভ্রান্ত মতের সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। অনেকে ভগিনী নিবেদিতা রচিত 'Notes on some Wanderings' গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠা অনুসরণ করে বলেন—বিবেকানন্দ রামমোহন থেকে বেদান্ত-গ্রহণ ও প্রচার করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিবেকানন্দ হয়ত বেদান্তের কথা রামমোহনের বই পড়ে জেনেছিলেন, কিন্তু, যে বেদান্ত তিনি প্রচার করেছেন তা কর্মে পরিণত বেদান্ত (Practical Vedanta) এবং তা তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই প্রথম শুনেছেন এবং এবিষয়ে প্রমাণ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'। (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ২৬১-২৬৪ পৃষ্ঠা)। তিনি লিখেছেন—"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীযুত নরেন্দ্রও সেখানে উপস্থিত।...কথাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কথা উঠিল এবং ঐ মতের সারমর্ম সম্বন্ধে সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া তিনি বলিলেন, 'তিনটি বিষয় পালন করিতে বিশেষ যত্নবান থাকিতে, ঐ মতে উপদেশ করে—মাছে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন।...'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া রহিল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাব ভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম।...ঠাকুর আজ ভাবাবেশে, তাহাতে বুঝা গেল—মনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।...যাহাহউক ভগবান যদি কখনও দিন দেন তো আজি যারা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

বিবেকানন্দের খ্যাতি পুঁথিবদ্ধ ও মনে-আঁকড়িত বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য। তিনি মানুষের দেবত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে চেয়েছেন, তেমনি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভয়তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন; আবার মানুষের সেবাই দেবসেবা বলে প্রচার করে মানবসেবায় সবাইকে আহ্বান করেছেন। এসবই শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ফল। রামমোহন

অপৌরুষেয় এবং নিত্য। আমার পূর্বে যে আলোচনা করেছি তাতে একথা স্পষ্ট যে, বেদান্তধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, সমস্ত রুচি-প্রকৃতির মানুষই তাদের অনুসরণযোগ্য পথ বা ভাব বেদান্তধর্মে পেতে পারে। সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি উপাসনা এবং জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, রাজযোগ সাধনা সবই বেদান্তধর্মে স্বীকৃত। এই ধর্ম-অনুসরণকারী সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করে শান্তি, প্রেম ও সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়। বেদান্তধর্মের সঙ্গে কারও বিরোধ নেই, সুতরাং অশান্তির প্রশ্ন উঠতে পারে না; বেদান্তধর্ম সমগ্রবিশ্বে একই আত্মার প্রকাশ লক্ষ্য করে চলে, তার পক্ষেই বিশ্বপ্রেম প্রচার করা সম্ভব। কারণ সর্বত্রই একই আত্মা থাকায় কারও পক্ষেই অন্যকে বিদ্বেষ করা সম্ভব নয়। আমি আমাকে যেমন বিদ্বেষ করতে পারি না। আমি আমাকে ভালোইবাসি তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে আমারই প্রকাশ বলে আমি কাউকেই বিদ্বেষ করতে পারি না। একমাত্র ভালোই-বাসতে পারি। স্বামীজী বলেন—'What do you mean by love? Love means the expression of Oneness. What you call love, is nothing but the expression of that Oneness. It is the feeling of Oneness. So, my friends, if your heart overflows with the ideal of divine love, you will see that divine love is manifested in humanity and all human beings are but parts and parcels of your true self'.[৫] (প্রেম বলতে কি বোঝ? প্রেম একেরই প্রকাশ বোঝায়। তোমরা যাকে প্রেম বল তা একের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়; তা একেরই অনুভূতি। সুতরাং আমার বন্ধুগণ, যদি তোমাদের হৃদয় ভাগবতপ্রেমের আদর্শে পূর্ণ হয় তবে তোমরা দেখবে যে, ভাগবতপ্রেম মানবপ্রেমে প্রকাশিত হয় এবং সমস্ত মানুষ তোমার আত্মারই আত্মীয়রূপে প্রতিভাত)।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'।[৬] আত্মা প্রিয় বলেই অন্যসব কিছু প্রিয় হয়। অর্থাৎ,

---

বেদান্তকে তাত্ত্বিক দিক থেকে যতই সমর্থন করুন না কেন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে বলে তিনি মনে করতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—'Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father, brother, etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better'. সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর সত্তা অস্তিত্ব নেই; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সবই অনিত্য ও অসত্য, তাদের প্রতি ভালবাসা অর্থহীন, যত শীঘ্র তাদের ও জগৎ ছেড়ে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল, এই বেদান্ত-বাণী দেশের যুবকদের সমাজের যোগ্যতর সদস্য করবে না। রামমোহন এখানে ইঙ্গিতে বেদান্তের মায়াবাদ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে মায়ার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে সমাজের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। তিনি বলেছেন, মায়া ঘটবার বিবৃতি মাত্র। তাছাড়া জগতের ব্যবহারিক সত্তা কখনও অস্বীকার করেন নি। তিনিও নিজেই লোক-সংগ্রহার্থে অনেক কাজ করেছেন। আমরা পরে আমার বিবেকানন্দ-অদ্বৈতানন্দ-স্বীকৃত মায়ার ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি।

৫। Universal religion and Vedanta, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৬। বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

আত্মা আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং অন্য যা কিছু আমরা প্রিয় বলে মনে করি তা সবই আত্মারই বিচিত্র প্রকাশ বলেই প্রিয়। যিনি ভাগবতপ্রেমের অধিকারী হয়েছেন, তিনি বিশ্বচরাচরে ভগবানেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করে বিশ্বপ্রেমিক না হয়ে পারেন না। সেজন্যই দেখি, ভাগবত-প্রেমাকুল শ্রীরামকৃষ্ণ দেওঘরে দুঃখদারিদ্র্য লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি ভালবাসায় কাঁদেন, তাঁর সন্তান বিবেকানন্দ ভারতবাসীর দুঃখদৈন্য দেখে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন এবং স্বামী অভেদানন্দ ভারতের বঞ্চনার কথা 'India and her people' বক্তৃতামালায় আমেরিকা-বাসীদের কাছে তুলে ধরেন। ভাগবতপ্রেম ও মানবপ্রেম একই প্রেমের দুইদিক, কারণ, ভগবান ত মানুষের মধ্যেও আছেন, যিনি ভগবানকে ভালবাসেন তিনি তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ মানুষকে ভালো না বেসে পারেন না।

বেদান্তধর্মে একই সত্য বিচিত্ররূপে প্রকাশিত, একথা স্বীকৃত বলে বেদান্তমতে আত্মোপলব্ধি হলে বন্ধনমুক্তি হয়, কারণ বাঁধবার মত অন্যকোন বস্তু বা বিষয় তখন থাকেই না।

স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা একটু স্বাধীনতা নিয়ে বলতে পারি—যীশুর প্রেমধর্ম, মোহম্মদের ঐশ্বরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, বুদ্ধদেবের করুণা প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য ভাব বেদান্তধর্মে স্বীকৃত। আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান বলে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ খুবই স্বাভাবিক, আমাদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীভাবনা এবং করুণাভাবই সহজ ও আন্তরিক।

●

।। ভারতসংস্কৃতি ধারায় কৃষ্ণচেতনা ।।

ডক্টর শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(এক)

কৃষ্ণচেতনা আসমুদ্র ভারতভূমির এক অপ্রমেয় সম্পদ, ভারতসংস্কৃতির এক অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য।

উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমাচল-সন্নিভে প্রখ্যাত বদরিকাক্ষেত্র, দক্ষিণে কেরালার গুরুবায়ুর, পশ্চিমের সাগরভূমিতে দ্বারকা থেকে পূর্বসাগর-বেলার নীলাচল জগন্নাথতীর্থ এই আসমুদ্র প্রসারিত ভারত ভূখণ্ড ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকল। যে ধর্মে কোন ক্ষমতা-কেন্দ্রিক সংগঠন নাই, যে সংস্কৃতির প্রচারে কখনও কোন নির্মমতা বা প্রলোভনের প্রয়োগ হয়নি সেই ভারত সংস্কৃতির নিবেদিত চিত্তপ্রাণপুরুষ কৃষ্ণভগবান কতযুগ থেকেই না অগণিত মানুষের জীবনের দিশারীরূপে এই মহাদেশ ভারতভূমির মানসসত্তাকে প্রোদ্ভাসিত করে এসেছেন। ভারত-আত্মার চেতনায়, চিন্তায়, জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে ভগবান কৃষ্ণকে একান্ত প্রাণপুরুষরূপে আত্মস্থ করে থাকলেও অভারতীয় ভারত-অনুসন্ধিৎসুদের কাছে কৃষ্ণ এক পরম রহস্যসমাকুল এবং সমস্যাপূর্ণ বিস্ময়কর অস্তিত্ব বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। আমরা ভারতবাসীরা এই কৃষ্ণচেতনার এত নিকট যে কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা কোন সমস্যা বা বিস্ময় আমাদের

উদ্বিগ্ন করে না। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদী বিশ্লেষণপন্থী ঐতিহাসিকেরা কিন্তু এক অপরিসীম বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে এই কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণচেতনার প্রসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় সমুদ্যত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। তাদের ধারণা খ্রীষ্টিভিত্তিক চেতনা-গণ্ডীর দ্বারা সীমিত। তাই তারা মনে করে কোন ধর্মপ্রচারকের পক্ষে ছাড়া এই ধরণের স্বীকৃতি, যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্মের পরিবেশে যীশুখ্রীষ্টের বা ইসলামীয় ধর্মের ক্ষেত্রে মহম্মদের সম্ভব হয়েছিল, তা সম্ভব নয়। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তারা লক্ষ্য করেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমন কোন নূতন ধর্মপ্রচার করেন নি, সৃষ্টি করেন নি নূতন কোন সম্প্রদায়ের। তা সত্ত্বেও কি করে এই কৃষ্ণচেতনা ভারত উপমহাদেশে এমন ব্যাপক বিস্তৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তার অনুধাবনে এইসব বৈদেশিক জিজ্ঞাসুদের মনে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার ঘটেছিল লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে, কৃষ্ণ কি সত্যই কোন ঐতিহাসিক মানুষরূপে বর্তমান ছিলেন—তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিহাসের কোন্ যুগে? কবে কিভাবে তিনি উপাস্য দেবতার উন্নীত হয়েছিলেন—কি করে তিনি পুরুষোত্তম পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এমনি কত জিজ্ঞাসা। এইসব নানা গূঢ় জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তাঁরা যেমন কৃষ্ণসত্তার অনুসরণে ব্রতী হয়েছেন তেমনি এই নূতন প্রবণতার প্রভাবে বহু ভারতবাসীর মনেও এই ধরণের নানা জিজ্ঞাসার সঞ্চার ঘটেছে। ফলে এই পরমরহস্য-পুরুষ ভগবান কৃষ্ণকে অবলম্বন করে নানা আলোচনা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা সিদ্ধান্তেরও উদ্ভব ঘটেছে দেখা যায়।

অভারতীয় দৃষ্টিতে কৃষ্ণগীতার অনুবাদ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলে প্রচলিত অপরিসীম জনপ্রিয়তার আধার অলৌকিক জ্ঞানগর্ভ মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতগীতাই সর্বপ্রথম এই পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারণিক, পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত ও ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সভ্যপদে নির্বাচিত Charles Wilkins ইংরাজীতে গীতার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন। গীতার এই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যভাষার অনুবাদের সঙ্গে ভারতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কিছু ইতিহাস জড়িত আছে। এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রসারের সেটা ছিল এক প্রারম্ভিককাল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে এক মুষ্টের প্রহসনের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন ঘটলেও ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ইংরাজ সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করবার চেষ্টায় বক্সারের সন্নিকটে সংঘটিত সংগ্রামে ব্যর্থকাম হলে নিশ্চিতভাবে ভারতে ঔপনিবেশবাদ প্রসারের পথ উন্মোচিত হল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্রমবিবর্ধনশীল ইংরাজশক্তির উপর নির্ভরশীল বাদশাহ শাহ আলমের আনুকূল্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনদ লাভ করে এই বিস্তৃত অঞ্চলের উপর ইংরাজের আধিপত্য প্রসারিত হলে ব্যাপকভাবে শাসকসম্প্রদায় ভারত-সমাজের নিকট-সান্নিধ্যে আসতে থাকে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে Warren Hastings শাসন ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হলে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আদান প্রদান রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং শাসিত সম্প্রদায়ের ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। কোম্পানীর কারণিক Wilkins এই সময়েই কার্য-উপলক্ষে কিছুকাল বারাণসীতে ছিলেন এবং এখানকার পণ্ডিতশ্রেণীর সংস্পর্শে এসে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর এই সংস্কৃতচর্চা এবং ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহই তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার অনুবাদে প্রবৃত্ত করেছিল। এছাড়া তিনি মহাভারত গ্রন্থেরও একখানি অনুবাদ রচনা করেছিলেন যার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এখনও সংরক্ষিত আছে। পরে এই উইলকিন্স-এর উদ্যোগে বাংলা হরফ ও ছাপাখানার প্রবর্তন হলেও গীতার অনুবাদ মুদ্রনের কোন সুযোগ তখন কলকাতায় না থাকায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে প্রেরিত হয়। সেখানে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালীন কোম্পানীর লণ্ডনস্থ অধিকর্তাকে যে পত্রখানি প্রেরণ করেছিলেন মুদ্রিত গীতার সঙ্গে সেই পত্রখানি মুখবন্ধরূপে সংশ্লিষ্ট করা হয়। গীতার এই প্রথম ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় হেষ্টিংস যে মন্তব্য করেছিলেন গীতা তথা কৃষ্ণচর্চার নববিবর্তনের ক্ষেত্রে তার মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়ত একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়।

হেষ্টিংস লিখেছিলেন "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহুশতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহৎ অংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অনুকরণীয়। গীতা পাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানব-জীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে।...যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেষ সহায়ক হইবে।...গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিকতত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ। গীতার উপদেশে খ্রীষ্টানধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়" [উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কর্তৃক গ্রথিত ভূমিকার প্রদত্ত অনুবাদ—পৃঃ ১৫-১৬] ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শের প্রাথমিক অবস্থায় দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য-প্রসারকারী শাসকের লেখনীতে উৎসারিত যে প্রভূত বিস্ময় ও শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় পরে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষিত হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতের প্রচলিত সংস্কৃতি ও সাধনা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভারত-বিজ্ঞানুদের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

কৃষ্ণ সম্পর্কে আগ্রহের পরিচয় এরপরে লক্ষ্য করা যায় Sir William Jones-কৃত প্রখ্যাত গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুবাদে। প্রভূত প্রতিভার অধিকারী বহুভাষাবিদ উইলিয়াম জোন্স তৎকালীন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিরূপে ভারতে আসেন। ১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে জোন্সকে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত করা হয়। সেকালে

ইংরাজ শাসকদের মধ্যে উপলব্ধিসম্পন্ন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যে ভারতসংস্কৃতি সম্বন্ধে বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, এশিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে উইলিয়াম জোন্সের একটি ভাষণে তার পরিচয় বিধৃত আছে। সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জোন্স এই ভাষণে বলেছিলেন—"The Sanskrit Language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure. More perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either, yet bearing to both a close affinity, in the roots of verbs and the forms of grammer, than could possibly have been produced by accident that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which perhaps no longer exists :" শাসক সমাজের অত্যন্ত উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিক বিদগ্ধতায় সমাহিত হয়েও জোন্স শাসিতজাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে উপলব্ধি ও সহানুভূতির পরিচয় রেখেছেন উপরে উদ্ধৃত উক্তিতেই শুধু তার পরিচয় পাওয়া যায় না, জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের অন্তর্নিহিত মর্ম ও রসানুসন্ধানের প্রয়াসেও তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই গীতগোবিন্দ কাব্য কৃষ্ণচেতনাকে অবলম্বন করে একটা যুগসন্ধি অতিক্রমনের যে দিকনির্দেশ করেছিল তার পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয় নি। তবে জোন্স তার স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে জয়দেব উৎসারিত রসকে যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার একান্ত ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ পাঠে সহজেই তা উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই অনুরাগ ও উপলব্ধির প্রয়াস কিন্তু শাসকসমাজে বা পাশ্চাত্যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বস্তুত ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ও মৌলিক অনুধাবন প্রয়াসেও যে সবিশেষ পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করেছিল তার পরিচয় এদেশে নিযুক্ত শাসক-কর্মচারীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুশীলন ও অনুধাবনের যে ব্যাপক ক্রিয়াশীলতা দেখা দিয়েছিল তা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। ভারতে ইংরাজশাসন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভারতের সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিতে থাকে এবং ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে সংস্কৃতের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে এই সাদৃশ্যের কারণ-সম্পর্কিত প্রশ্ন তাদের গভীরভাবে ভাবিত করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে সংস্কৃতচর্চা বিস্তৃত হলে ফরাসী ও জার্মান দেশেও সংস্কৃত সম্পর্কে ব্যাপক ঔৎসুক্য দেখা দেয়। জার্মান পণ্ডিত A. W. Schlegel (১৭৬৭-১৮৪৫ খৃঃ) ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার একটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করলে ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে গীতার বেশ কিছু প্রচার ঘটে। শ্লেগেলের রচিত গীতার অনুবাদ পড়ে সে যুগের একজন বিখ্যাত জার্মান মনীষী Wilhelm Von Hamboldt মন্তব্য করেছিলেন যে গীতার মত সুললিত সত্য ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় নাই।"

ক্রমশঃ

●

॥ ভারত-শিল্প ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-শিল্প আলোচনায় কেবলই শিল্প-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে আবর্তিত হব না। ভারত-শিল্প-ইতিহাসের পথে পথে না ঘুরে একটু দেখতে চেষ্টা করব কি সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ দেশের শিল্প-সৃষ্টির প্রাণপ্রদীপটি। কি অনন্ত জ্যোতিতে সে প্রদীপ আজও দীপ্যমান।

কি সত্যে দীপ্যমান প্রদীপ? সত্যসন্ধানে যে পূজা, যে সৃষ্টি, তাই হয় দীপ্যমান আর তাতেই তার অমলিন প্রজ্জ্বলন।

ভারত-শিল্পের ইতিহাসে কখন অন্ধকার আসেনি এরূপ বলে সত্যই মনে হতে পারে আপন সৃষ্টির কথাতে এমন ভাবেই ভাষা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধকার বলতে মেঘে ঢাকা সূর্যের যে অদৃশ্যতা তা প্রকাশের সত্য কোন দিন চিরদিনের জন্য অন্ধকার হতে পারে না।

আসলে ভারত-শিল্পের সত্যের পথটি নিবেদনের পথ বেয়ে চলেছে। আমরা আজও বলি—আপনি বলেন, আমি বলি আর যাঁরা বলেন তাঁদের কাছ থেকে শুনি—আমি আমরা যা কিছুই করি-না তা সব নিবেদনের ভেতর দিয়ে গ্রহণ করলে, প্রসাদী হয় সৃষ্টি আর ধন্য হয় স্রষ্টা। নিবেদনের মধ্য দিয়েই তো চিরসত্যকে পাওয়া যায়। আমিত্ব চাইনা অমরত্ব চাই। সে অমরত্ব কিন্তু নিবেদনের ভেতর দিয়েই প্রতিষ্ঠিত। নিবেদনের মধ্য দিয়েই সত্যকে পাওয়া। যাকে পেলে সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ। সেই সত্যকে পাওয়ার বাসনাতেই বালক নচিকেতা তাকে দেখানো সব প্রলোভনকে ত্যাগ করে যথার্থ বলতে পেরেছিলেন—আমি অন্য কোন বর চাই না—যা অনিত্য; আমি চাই অমৃত বা অমরত্ব, যে অমৃত বা অমরত্বের নাম আত্মজ্ঞান ও অজ্ঞানের বিলুপ্তি। যমরাজ এই দৃঢ় সত্যের কাছে বাধ্য হলেন যথার্থ সত্যের পথকে খুলে দিতে।

শবরীর কাহিনী আপনারা সবাই জানেন—প্রতিদিন সেই নিবেদনের আত্ম-তিতিক্ষা। যৌবন অতিক্রান্ত জীবনের সায়াহ্নে সেই নবদূর্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রের স্পর্শে শবরী তার সাধনার পূর্ণ ফলটি নিবেদনের মধ্য দিয়েই গ্রহণে সম্পূর্ণা হলেন, জীবন-সায়াহ্নের বার্দ্ধক্যত বৈপরীত্য আর রইল না, তিনি রামদর্শনে যৌবনের চেয়েও যৌবনে পূর্ণা হলেন।—সে যৌবন কাল-বিবর্তনে কলঙ্কিত নয়। ঠিক এই ভাবেই রচিত হয়েছে ভারত-শিল্পের প্রতিটি সৃষ্টি।

ভারত-শিল্পে সৃষ্টির মূলে রয়েছেন সেই আত্মবোধ, সেই চিরদিনের বস্তুটিকে চিরদিনের বলে হৃদয় দিয়ে জানার পরিচর্যাটি।

সুদূর পর্বতের অচীন গুহায়, কন্দরে, স্থাপিত হয়েছে অসীম সুষম শিল্প-সৃষ্টিগুলি। কিসের চাওয়ায়, কিসের পাওয়ায় এমন সব অনিন্দ্য-সুন্দর বিস্ময়-করা শিল্পরাজী তার সৃষ্টিপথ চেয়ে অনন্তকালের জন্য সেই অনন্তমায়ের অসীম সত্যকেই ঘোষণা করছে? ওই নিবেদন। বিনয়ের সাধনায় পরিমার্জিত হয়ে আপন মাধুরীতে মিশ্রিত হয়ে এরা চিরকালের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অনন্তকাল ধরে দিক্‌চিহ্ন হিসেবে বহমান।

আমরা মন্দিরে দেখি, দেখি অসাধারণ মূর্তি-সৃষ্টিগুলি। কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরে অনুপ্রবেশ করি তা হলে কি দেখব ?

দেখব এই অবাক করা সৃষ্টির মধ্যে সেই নিবেদনের সুরেরই অনুরণন।

কেন এই অর্ঘ-নিবেদনের কথা বলছি ? আমাদের দেশে শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে বারবার বিস্ময়ভাবে অবাক হই তন্ময় হই। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করার, সেখানে শিল্পীর নিজের নাম রূপ কতটা উপস্থিত ? অজন্তার গিরিগুহা বা তারও আগে চলে গিয়ে মধ্যপ্রদেশে সুরগুহার পর্বতমালার আঁকা চিত্রাবলী থেকে আবার কোণারকের সূর্যমন্দিরের পাশে দাঁড়ালে স্রষ্টার শব্দময় নাম-ভজনের কোন আভাসই পাব না। এখানে শিল্পী তো ভক্ত, ভক্তের অর্ঘডালিতে তো আমিত্ব থাকতে পারে না। সৃষ্টির অর্ঘডালি জগৎপিতার কাছে সঁপে দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত, আনন্দিতপূর্ণ।

ভারত-শিল্পের আর একটি বিস্ময়তা হল যুগধর্ম অনুযায়ী সে তার সৃষ্টির অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। ধর্ম বলতে এখানে পূজা-পার্বণ বা আচার-অনাচারের কথা বলছি না। কোন বিশেষ রীতি-নীতির আভাসেও যেতে চাই না। ধর্ম বলতে যা সত্য যা চিরন্তনকে প্রতিফলিত করে, যার মধ্য দিয়ে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা-ই। অবশ্যই এর নানান চর্চা আলোচনার অবকাশ আছে। শিল্পসৃষ্টির মধ্যেও সেই ধর্মকে, তার স্পর্শকে অনুভব করি। ভারতবর্ষের জীবনে যুগে যুগে চেতনার একটা ঢেউ এসে সচেতন করে দিয়েছে বারবার। মানুষকে তার সত্যপথকে ধরিয়ে, চিনিয়ে আর সেইমত পথচলার নির্দেশ দিয়ে। এই চেতনার প্লাবনের মধ্য দিয়েই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরও একটা রূপরেখা গাঁথা হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

আমরা সব সময় ভুলে যাই এই যুগ-উপযোগী শিল্প সংস্কৃতির স্পর্শচিহ্নগুলি সেই সচেতনতারই স্পর্শ-ইঙ্গিত ছাপ। এই সচেতনতার তন্ময়ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প তার আঙ্গিক বিশেষত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর সেই বিশেষ আঙ্গিকের পরিচয়ের মধ্য দিয়েই আমরা যুগকে চিহ্নিত করতে পারছি। তবে সেই যুগকে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কেবলই নিঃসঙ্গভাবে পরিচিত হচ্ছে না, সেই সৃষ্টি পরিচিত হচ্ছে একটি অমিত ছত্রছায়ায়। অজন্তার, ইলোরার বিস্ময়কর কাজের মাঝে নিজেকে হারিয়ে যখন দাঁড়াই তখন শিল্পের অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে বুদ্ধিকে মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই ভগবানকে যাঁকে কেন্দ্র করে এ'সবের আয়োজন। এই ভাবেই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি একটি বিশেষ অধ্যায় আর চেতনাকে স্পষ্ট করে তোলে।

আমার এ কথার মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিল্প-সৃষ্টির মাঝে সেই সচেতন প্রাণটি যারযার কাজ করেছে প্রতিটি স্রষ্টার মাঝে।

আমরা সাধনার কথা বলি, আমরা পরিশ্রমের কথা বলি। আর তার সঙ্গে অর্থের যোগের কথা অনেক সময় বলতে ভুলি না। কিন্তু ভুলে যাই কেবলমাত্র অর্থের বিনিময়ে এমন কালজয়ী সৃষ্টি হতে পারে না। আমরা নিশ্চয়ই উপমা স্বরূপ তাজমহলের সৃষ্টির চিহ্নটি তুলে ধরতে চাইব আর স্বাভাবিকভাবেই সেই সব উপমাই আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, তুমি যা বলতে চাইছ তা নয়, দেখ অর্থ দিয়ে সব কেনা যায় সব করা

যায়। কিন্তু তাজমহলের সামনে কি অর্থের নিবেদনের উপমা আমরা পাচ্ছি? এখানে সেই ভালবাসায়। একজন একজনের ভালবাসার প্রদীপকে চিরদিন উজ্জ্বল করে রাখার জন্য শিল্পকে করেছে অবলম্বন আর সেই অবলম্বনের ভেতর দিয়েই পেয়েছি তাজকে। তবে একথা অস্বীকার তো কখনই করা যাবে না—এই শিল্পসৃষ্টির পেছনে যত ভালবাসাই থাকুক ঐশ্বর্যের স্পর্শ-গন্ধের থেকে তা মুক্ত নয়।—

প্রেমের এই নিবেদনটি পরম সত্যকে অবলম্বন করে নয় একজনকে ব্যক্তিজীবনে অমর করে রাখার বাসনা কাজ করেছে, এখানে বিনয় স্বতন্ত্রতা বা আমিত্ব ত্যাগের মহিমায় তা মহিমান্বিত কখনই নয়। কিন্তু যে শিল্প সৃষ্টি জগৎকে ভেবে নয়—মানুষের অনুপ্রেরণায় হলেও এক বিশেষ সত্যের কথা ভেবে যা প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার মধ্যে সময়ের বিশেষ চিহ্ন থাকলেও বিশেষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শচিহ্ন থেকে মুক্ত।

আমাদের জীবনে প্রায়ই একটি ঘটনা আমি বা আপনার মধ্যেই ঘটে। আমাদের শ্রেষ্ঠ বস্তুটিকে সেই পরমের আশ্রয়ে ডালি দিই। আশীর্বাদ চেয়ে নিতে ভুলি না সেই সত্যবস্তুর কাছে। কি সেই সত্যবস্তু? সেই সত্যবস্তু যিনি বিশেষ কারুর জন্য বিশেষ কাউকে বঞ্চিত করেন না। বিশ্বাস করে—সবার অর্ঘ্যই তিনি গ্রহণ করে হৃদয়ের যথার্থ মূল্য দেন।

(ক্রমশঃ)

●

॥ পূর্বরাগ ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

উজ্জ্বলনীলমণির ভাষায় :

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ সঙ্গম বা মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণজনিত যে 'রতি' নায়ক-নায়িকার হৃদয়কে উন্মীলিত করিয়া দেয় তাহাকে পূর্বরাগ বলে।

বৈষ্ণবকাব্যে ও রসশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে দূতী, বন্দী বা সখীর মুখে প্রেমাস্পদের নাম বা গুণকীর্তন শুনিয়া অথবা প্রেমাস্পদের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পূর্বরাগের উদয় হয়। বৈষ্ণবপদাবলীতে এই বিভিন্নরূপ শ্রবণের মাধ্যমে কিরূপে পূর্বরাগের উদয় হয় তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পূর্বরাগে প্রেমের গাঢ়তা হেতু নায়ক-নায়িকার লালসা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা প্রকার অবস্থা হইতে পারে। আলংকারিকগণ ঐরূপ দশটি দশার বর্ণনা করিয়াছেন :

"লালসোদ্বেগ জাগর্যা তানবং জড়িমাত্রতু,
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদ মোহো মৃত্যুর্দশাদশ।"

অতীষ্ট প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে 'লালসা', মনের কম্প বা চাঞ্চল্য হইতে 'উদ্বেগ', নিদ্রাহীনতা হইতে 'জাগর্যা', শরীরে কৃশতা ও দুর্বলতা হইতে 'তানব', ইষ্টানিষ্টের জ্ঞান নাই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না এইরূপ অবস্থা 'জড়িমা' ভাবের গভীরতা হেতু যে চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মে তাহা সহিতে না পারিলে বৈয়গ্র্য, বৈবর্ণ, শীত প্রভৃতি শারীরিক গ্লানি হইতে ব্যাধি, প্রিয়ের একান্ত আবেশ হেতু সর্বত্র অভিব্যাপ্তি হইতে উন্মাদ, বিমনস্কতা অর্থাৎ বিপরীত গতি হইলে মৃত্যুর উদ্যম হয়। সুতরাং আলংকারিকগণের মতে এগুলিই পূর্বরাগের লক্ষণ।

বয়ঃসন্ধিকালেই পূর্বরাগের উদয় হয়। এই বয়ঃসন্ধির সময় যখন নিবিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়া দেখা দেয়—তখনই স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরস্পর-পরস্পরকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করে। তবে নারীর লজ্জা আছে, ধৈর্য আছে, বংশমর্যাদা আছে তাহার উপর আছে 'গুরুতরজন ভয়' যাহার জন্য পূর্বরাগ তত প্রকট হয় না। কিন্তু পুরুষের সে সব ঝামেলাই নাই; তাই তাহার পূর্বরাগ প্রথমেই প্রকাশ পায়। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামী বলেন, "দৃগাদিগণের অনুরাগের চারুতার আধিক্য হেতু নায়িকার পূর্বরাগই প্রথম উল্লেখ করা উচিত"।

নবীনা শ্রীরাধার এখন বয়ঃসন্ধি তিনি এখন কলিকাটি (কুঁড়িটি) মাত্র নন, তাঁহার হৃদয়-মুকুল প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় একদিন যমুনার কূলে তমালের তলে শ্রীকৃষ্ণের ভুবন ভুলানো রূপ দেখিয়া "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল"—প্রথম দর্শনেই প্রেমের আকর্ষণ :

সজনি! কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু মূলে॥

আর চক্ষু ফিরাইতে পারেন না—ভাবেন দুইটি চক্ষে কি হইবে, বিধি যদি আরও চক্ষু দিতেন, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেন :

সবে দুটি আঁখি দিয়াছে বিধি
রূপ নিরখিব কি?

প্রেমাস্পদের প্রথম দর্শনে শ্রীরাধার মন উচাটন, সদাই চঞ্চল—তাঁহাকে আবার দেখিবার জন্য লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, রাত্রে ঘুম নাই, শরীর ভাল নয়, দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছেন—তাহা দেখিয়া,

বিরলে বসিয়া পটেতে আঁকিয়া
বিশাখা দেখাল আনি॥
সে রূপ হেরিয়া—মূরছিত হইয়া
পড়িল কমল-মুখী।

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে বলেন :

এই মোর হরিয়াছে প্রাণ,
ইহ বিনু নহে কেহ আন।

যখন প্রত্যক্ষ দর্শনে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, তখন স্বপ্নের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে দয়িতের শ্যাম রূপ :

রূপে-গুণে রস-সিন্ধু মুখ ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।

নিদ্রাতুর অবস্থায় দয়িতের পরশ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন। নিদ্রাভঙ্গে সখিদের বলেন,

মনের মরম-কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন, শুন, পরাণের সই
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ সে
তাহা বিনু আর কারো নই

এমনি করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শনের মধ্য দিয়া প্রেমাস্পদ যখন শ্রীরাধার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে অমনি শ্যাম নাম শুনিয়া তিনি অধীর :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ

নাম শুনিয়া প্রাণ উচাটন, কৃষ্ণ নাম যে অমৃতের খনি, যতই শ্রবণ করেন ততই কর্ণে অমৃতের পরশ, হৃদয়ে আনন্দের উল্লাস। কৃষ্ণ এই দুইটি শব্দ কর্ণে না জানি কি অমৃতই না সিঞ্চন করিয়া দেয়? তারপর সখীমুখে, বংশীমুখে, দূতীমুখে তাঁহার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া ও কালিয়া বঁধুর নব-পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্রীরাধার চিত্ত বেয়াকুল, আহার নাই, নিদ্রা নাই, সর্বদা তাঁহারই ধেয়ানে মগ্ন—তাহার সঙ্গে কঠিন প্রশ্ন 'যুবতি ধরম কৈছে রয়'। তাইতো শ্রীরাধা তাঁহার নারী ধর্ম, জাতি ধর্ম, কুল ধর্ম, দেহ ধর্ম, সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ :

থির বিজুরী বরণ গোরী
পেখনু ঘাটের কূলে

এমনি করিয়া উভয়ে-উভয়কে দেখিয়া—ভালবাসিয়াছেন—তাই পরস্পরকে লাভের জন্য এত আকুতি, এত লালসা।

নায়িকা ভেদে পূর্বরাগ ত্রিবিধ : মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। বিভিন্ন নায়িকার পূর্বরাগও বিভিন্ন। মুগ্ধা—বয়সে নবীনা, মদনের তাড়না কম। লজ্জাই অঙ্গের ভূষণ। মনের ভাব গোপন করিতেই তৎপর। প্রিয়তম অপরাধী হইলেও মুখে তাহার অপ্রিয় কথাটি নাই। শুধু নয়নে মন্দ। প্রগল্‌ভা একেবারে মুগ্ধার বিপরীত। তাহার যৌবন পূর্ণ, ভোগে উন্মত্ততা, ব্যবহার কর্কশ—প্রিয়তমকে দুকথা শুনাইয়া দিতেই ভালবাসে। আর মধ্যা নায়িকা এই দুইয়ের মাঝামাঝি—লজ্জা আছে—মদনও আছে। কখন কোমল, কখন কঠোর। তাই ইহাদের পূর্বরাগও ভিন্ন।

প্রাক্ চৈতন্য-যুগের বিদ্যাপতির রাধা নবীনা—সেই কিশোরীর নবীন প্রেমের উপরে কল্পনার আলোক-রশ্মিপাত বিচিত্র বর্ণে তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বয়ঃসন্ধির মুগ্ধা রাধা, বিচিত্র অনুভূতি ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া আসিয়া 'ভাবোল্লাসে'র রাধায় রূপান্তরিত হইয়া গেলেন—বিদ্যাপতি তাহা চিত্রের পর চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। নিপুণ শিল্পীর মত তিনি তাহাতে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিয়াছেন, কোন অংশই বাদ দেন নাই। চপলা নায়িকার লালসা, হৃদয়-চাঞ্চল্য ও বিহ্বলতা যেমন তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি যে তীব্র বিরহের অনুভূতিতে :

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাই

সেই অনুক্ষণ বিরহ-পারাবারে তিনি স্বর্ণ-কমল ফুটাইয়াছেন।

আর চণ্ডীদাসের নায়িকা প্রথম হইতেই রুক্ষাভপ্রাণা। পরিণত নায়িকা, তাহার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলের বিহ্বল-কল্পনা-রঙিন্ দিনগুলি হারাইয়া গিয়াছে। কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। আমরা যাহাকে পাইয়াছি সে মুগ্ধা নবানুরাগিণী রাধা নয়, সে প্রেম-প্রৌঢ়া পরিণতা নারী। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেম-অন্বেষণে ভাসিতেছে না—প্রেম-সমুদ্রের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত। তাই চণ্ডীদাস প্রথম দৃষ্টেই রাধাকে যোগিনী করিয়াই অঙ্কিত করিয়াছেন :

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

তাই বিদ্যাপতির পূর্বরাগের কবিতায় বিরহ-মিলন, মান-অভিমানে বিচিত্রসুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আর চণ্ডীদাসের পদে বৈরাগ্যের একতারাটি সরল সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার, চণ্ডীদাসের কবিতা রুদ্রাক্ষের মালা। চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদে প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত। চণ্ডীদাস প্রেমিক হইয়া রাধিকার সহিত তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন আর বোধ হয় বিদ্যাপতি নিজে কৃষ্ণ হইয়া রাধিকার রূপ উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাসকে সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের অনুবর্তী ও গোবিন্দ দাসকে বিদ্যাপতির অনুবর্তী বলা হয়। এই কথাটিতে অনেকখানি সত্যও নিহিত রহিয়াছে। এজন্য পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে জ্ঞানদাসের চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় যেমন :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর

পূর্বরাগের উদ্বেগ ও আকুলতার ভাবটি এখানে অতি সাধারণ ভাষায় অলংকারের বিপুল বর্ণচ্ছটা ব্যতিরেকেই অল্প কয়েকটি অনুভাবের সাহায্যে রসে পরিণত হইয়াছে :

রূপের সাগরে-আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

জ্ঞানদাসের এই সব পদ অতি সহজেই মনের তন্ত্রীতে আঘাত করে।

কিন্তু গোবিন্দ দাসের পদ আস্বাদন করিবার জন্য চাই ছন্দ—অলংকার, ভাষা ও শিল্প কৌশলের জ্ঞান। জ্ঞানদাস পূর্বরাগের ভাব-গভীরতাকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বিভিন্ন নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে তরঙ্গের উত্থান-পতন ঘটে, বিভাবে ও অনুভাবে প্রতি মুহূর্তে, তাহার মধ্যে কি বিচিত্র লীলা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বহিয়া চলে তাহার প্রকাশে চারুত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আবার প্রেমের সূক্ষ্মত্ব গোবিন্দদাস যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তেমন ভাবে আর কোন বৈষ্ণব কবিই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রেমের অতল স্পর্শ গভীরতা যাহা জীবনের অপর সব কিছুই ভুলাইয়া দেয় গোবিন্দ দাসের পদে তাহার সাক্ষাৎ মেলে—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ

কিংবা,

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়,
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা যায়। ইত্যাদি

অপর পক্ষে পূর্বরাগের একটি প্রধান অঙ্গ অভিযোগ। অভিযোগ ছাড়া পূর্বরাগ হয় না। নায়কের রূপ দেখিয়া কিংবা গুণ শুনিয়া যখন নায়িকা ভালবাসিয়াছে তখন পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ-জনিত যে হাবভাব, লীলাসঙ্কেত তাহাকেই বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে নায়কেরাও কম পটু নয়, এই অভিযোগে চিত্তগত ভাবের প্রকাশ পায় বলিয়া একে রস পর্যায়ে অনুভাব বলা হয়। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ইহাদের সমবায়ে 'রতি' রসে পরিণত হয়। মধুর রসের যে স্থায়ীভাব 'রতি' পূর্বরাগে তাহাই ঘনাইয়া উঠে। সভ্যকার কাব্যসৃষ্টি হয় বিপ্রলম্ভে। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগকে পুষ্ট করিয়া তোলে বলিয়া তাহার মূল্য এতখানি। সম্ভোগে প্রাচুর্য আছে কিন্তু বৈচিত্র্য নাই। বিপ্রলম্ভে বৈচিত্র্য আছে, মাধুর্য আছে এবং অভাবজনিত বেদনাবোধ আছে। দুঃখকে রসোত্তীর্ণ করাই কবির কৃতিত্ব। পূর্বরাগ এই বিপ্রলম্ভের প্রথম স্তর। পূর্বরাগের পদগুলি কাব্য-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে।—ইহা আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে—তাইত ইহা সাহিত্য। সাহিত্য শব্দের অর্থই হইল মিলন—যাহা লেখকে-পাঠকে, নায়কে-শ্রোতায়, মানুষে-মানুষে মিলন বা রাখীবন্ধন করিয়া দেয়—যাহা, রূপে, ভাবে, রসে মিলাইয়া একাকার করিয়া দেয়। তাইতো সাহিত্যে দেশ-কালের ব্যবধান তখন দূর হইয়া যায়—অতীত, বর্তমান, দূর, নিকট তখন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে হৃদয়ে-হৃদয়ে আনন্দরসের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া একাকার করিয়া দেওয়া যদি সাহিত্য হয় তাহা হইলে বৈষ্ণব-পদাবলীর (পূর্বরাগের) গীতগুলি সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান পাইবার যোগ্য। এমন প্রাণমাতান গান, এমন রসের উৎস আর কোথায় আছে ?

●

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের আলোচনার কিছু অংশ লেখক অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনের বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা হইতে গৃহীত।

॥ নেপালের জাতীয় কবি—আচার্য ভানুভক্ত ॥

শ্রীজহর সেন*

১৯৫৬ সালের মে মাসে কাঠমাণ্ডুতে রাজা মহেন্দ্রের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসব-মঞ্চে তিনটি ঐতিহাসিক দৃশ্য উপস্থিত করা হয়েছিল। এক, জনকপুরে রাজসভায় শ্রীরামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন; হাতে ভাঙা ধনুক, সামনে সীতা। দুই, রাজা পৃথ্বীনারায়ণকে তাঁর মা চন্দ্রপ্রভা আশীর্বাদ করছেন। তিন, রাজা ত্রিভুবন জাতীয় বিপ্লব সম্পন্ন করে গণতন্ত্রকে স্বাগত জানাচ্ছেন। একই মঞ্চে তিনটি দৃশ্যের অবতারণা বিশেষ অর্থবহ। নেপালী গণমানসে শ্রীরামচন্দ্র মহাকাব্যের চরিত্র নয়, রাজা পৃথ্বীনারায়ণ ও রাজা ত্রিভুবনের মতই ইতিহাসের জীবন্ত নায়ক, মহৎ আদর্শ ও মূল্যবোধের অবিনশ্বর প্রতীক।

সুদূর অতীত থেকেই নেপালীরা রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। নেপালের তরাই অঞ্চলে জনকপুর নামে একটি শহর আছে। নেপালীদের বিশ্বাস এই স্থানটি প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এখানেই সীতার জন্ম। কাঠমাণ্ডুতে তালেজুদেবীর মন্দির বিশেষ পরিচিত। তালেজু হলেন রণদেবী। এই মন্দিরে একটি হীরকখণ্ড রক্ষিত আছে। জনশ্রুতি এই যে রাবণকে যে তীর দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, এই হীরকখণ্ডটি সেই তীরে শোভা পেত। তালেজু মন্দির খুব প্রাচীন। মধ্যযুগের মল্লরাজারা এই মন্দিরের সংস্কারসাধন করেন। নেপালের রাজপ্রাসাদের একটি অংশের নাম হনুমানঢোকা দরবার। এই দরবারের বাঁ দিকে হনুমানজীর একটি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিও আছে। কাঠমাণ্ডুর একটি প্রাচীন মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা অর্চনাও করা হয়। অদ্যাপি লৌকিক বিশ্বাসে শ্রীরামচন্দ্রের অধিষ্ঠান ও রামায়ণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ও অম্লান। জনশ্রুতি ও লৌকিক বিশ্বাসের কথা এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হল এই কারণে যে নেপালী জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে এগুলির প্রভাব ছিল অপরিমেয়। আচার্য ভানুভক্তের রামায়ণ এই চেতনাকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। তাই আচার্য ভানুভক্ত নেপালের জাতীয় কবি।

২

১৮১৪ সালে তনহু গ্রামে ভানুভক্তের জন্ম। তনহু কাঠমাণ্ডুর পশ্চিমে প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি ধনুখল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের কাছে তিনি জ্যোতিষ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেন। বাইশ বছর বয়সে (কেউ বলেন আঠারো) একটি ঘটনা তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। একদিন গাছের ছায়ায় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঘাস বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করে এমনি একটি লোকের সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়। আলাপ আলোচনায় তিনি জানতে পারেন যে এই দরিদ্র লোকটি পুণ্যার্জন মানসে তার স্বল্প আয়ের সঞ্চয় থেকে নিজের গ্রামে একটি কূপ খনন করেছেন। তার আশা বহুদিন ধরে গ্রামের মানুষ তার গুণকীর্তন করবে।

---

*কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।

এই কথা কয়টি শোনার পর ভানুভক্তের মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। আবেগে তিনি কবিতা লিখে ফেললেন। এই কবিতায় আত্মগ্লানি প্রকাশ করে তিনি বললেন বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবন অসার্থক। তিনি কোন পুণ্যকর্ম করেন নি, খ্যাতিলাভও করেন নি।

এরপর থেকেই তিনি কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪১ সালে তিনি রামায়ণের বালকাণ্ড রচনা করেন। তারপর অনেকদিন তাঁর কাব্যসাধনা স্থগিত ছিল। ১৮৪৯ সালে তিনি প্রথম কাঠমাণ্ডু আসেন। বালাজু ও কাঠমাণ্ডুর সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তার জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ। কাঠমাণ্ডু দেখে তাঁর মনে দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের প্রেরণা জাগে। দুটি ছত্রে তা ধ্বনিত।

কহি ভোট র লঙ্কন চীন সরী।
কহি মাল তরি গল্লি ছ ভিল্লী সরী॥
লখনৌ পাটনা মদরাস সরী।
অলকাপুরি কান্তিপুরী নগরী॥

হিস রাগ কপট ছল ছৈন জহাঁ
তব ধর্ম কতী ছ কতী ছ যহাঁ॥
পতকা পতি ছন রঘবারি গরী।
শিবকো পুরি কান্তিপুরী নগরী॥

তিনি কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন নিজস্ব জমিজমা সংক্রান্ত মামলার তদ্বির করতে। এই মামলায় তিনি জয়ী হন। সেখানে রাজদরবারেও তিনি প্রবেশাধিকার পান। প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা কৃষ্ণবাহাদুরের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা জন্মায়। এ কারণে তিনি একটি সরকারী চাকুরীও পেয়ে যান। রাজকার্যের দায়িত্ব নিয়ে তিনি ১৮৫০ সালে তরাই অঞ্চলে চলে আসেন। প্রায় দু'বছর তিনি এখানে ছিলেন। তাঁর হিসাবপত্রে সন্দেহজনক কিছু বিচ্যুতি থাকায় তাঁকে পাঁচ মাসের জন্ত জেলে আটকে রাখা হয়। জেলে বসেই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ড শেষ করেন। প্রায় এগার বছরে তিনি সমগ্র রামায়ণ রচনা শেষ করেন।

রামায়ণ রচনার কিছুদিন পর তিনি 'প্রশ্নোত্তর' ও 'ভক্তমালা' লেখেন। ৪৮টি শ্লোকে ভানুভক্তের 'প্রশ্নোত্তর' সাজানো। এখানে প্রথম শ্লোকটি উল্লেখ করা হল।

অসার সংসার সমুদ্র মাহাঁ
ডুব্য শরণ, তুপ ছ মলাই, যাহা ?
চাড়ো কৃপালে অইলে বনাউ
শ্রীরামকো পাও ছ মুখ্য নাও।

জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মুক্তির শাশ্বত বাণী প্রশ্নোত্তর আকারে তিনি শুনিয়াছেন। ২২টি শ্লোকের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'ভক্তমালা'তে আছে পরলোক প্রাপ্তির কথা, আছে সীতারামের ভজনার জয়গান।

১৮৬২ সালে তিনি "বধূশিক্ষা" লেখেন। কথিত আছে যে একটি রাতে তাঁর বন্ধুগৃহে তিনি শাশুড়ী পুত্রবধূর মধ্যে তিক্ত বচসা শোনেন। সেই রাত্রেই এই কবিতাটি লিখে তিনি তাঁদের উপহার দেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি 'রামগীতা' লেখেন। ১৮৬৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩

ভানুভক্তের রামায়ণ সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার। এই রামায়ণে এক হাজারের বেশী শ্লোক আছে। প্রতিটি শ্লোক চার পংক্তি বিশিষ্ট। ইন্দ্রবজ্র, উপমতি, দ্রুতবিলম্বিত, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, শার্দূল বিক্রীড়িত ও প্রহরণ ছন্দে শ্লোকগুলি রচিত। বাংলা অনুবাদসহ প্রথম ছয়টি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করছি।

একদিন্ নারদ্ সত্যলোক্ পুগিগয়া লোক্কো গর্হ হিত ভনী।
ব্রহ্মা তাহিঁ খিয়া প, চরণমা খুসী গরাথা পনী॥
ক্যা সোচ্ছো তিমি সোধ ভনছু ম ভনী মঙ্গী অন্নেথ্যো অসৈ।
ব্রহ্মাকো করুণা বুঝোয় ঋষিলে বিন্তী গ য়ো ওসৈ॥

(একদিন নারদ লোকহিত মানসে সত্যলোকে গেলেন। সেখানে ব্রহ্মা ছিলেন। নারদ ব্রহ্মার চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা তাঁকে কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়েছেন দেখে তিনি বললেন)

হে ব্রহ্মা! জাতি ছন্ শুভাশুভ সবৈ হুনী রহ্যাছুঁ বহু।
বাকী ছৈন তথাপি মুহ অহিলে ইচ্ছা ম যো গর্দছু॥
আওলা জব য়ো কলী বধতমা প্রাণী দুরাচার ভই।
গর্ন্যা ছন্ সব পাপ অনেক তরহকা নিচ্কো মতীমা গই॥

(হে ব্রহ্মা, শুভাশুভ আমি সবকিছু শুনেছি। আর আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমার শুধুমাত্র একটি বাসনা আছে। কলিযুগ এলে মানুষরা দুরাচারী হবে, নীচু প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক পাপকর্ম লিপ্ত হবে।)

সাচো বাত গরৈন কোহি অরু কৈ গর্ন্ ত নিন্দা পনী।
আর্কাকো ধন খানলাই অভিলাষ্ গর্ন্ অসত্ হো ভনী॥
কোহী জন্ ত পরস্ত্রিমা রত হুনন্ কোহী ত হিংসা মহাঁ।
কেহৈলাই ত আত্ম জানিরহনন্ নাস্তিক্ পন্থ কৈ ভহাঁ॥

(অনেকে সত্যকথা বলবে না। অনেকে অন্যের নিন্দা করে বেড়াবে। অনেকে অন্যের ধন লাভের জন্য আকাঙ্খা করবে এবং ভাববে এটাই ঠিক কাজ। অনেকে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে, অনেকে হবে হিংসাপ্রবণ। আর পাশুব নাস্তিকদের মত তারা দেহকেই আত্মা বলে ভাববে।)

কাম্কা চাকর ভএর বহনন্ স্ত্রীলাই ভোগ্যা সরী।
মান্ন্ পীতৃ র মাতৃলাই বুকি বুকি খুস্ শত্রু সরীপ পরী॥
ব্রাহ্মণ ভৈকন বেদ বেচিরহনন্ কোহি পুটুন তাপনী।
ধন ঘুলো ছ পনী ভক্তা সহজ ধন আর্জন্ গরৈলা ভনী॥

(কামাতুর হয়ে তারা স্ত্রীকে ভাববে দেবতা, তাদের চোখে পিতামাতা হল শত্রু। তারা ব্রাহ্মণ হয়ে বেদ বিক্রয় করবে। এমন কি কেউ যদি বেদ পড়েনও, তাহলে তারা তা করবেন ধনার্জনের জন্য, ধনসম্পদকেই তারা মহৎ উদ্দেশ্য বলে ভাববে।)

জাতি ধর্ম রহন ক্ষত্রিহরূপা জো হুন্ বি নীচাহরু।
শূদ্রাদী ও তপস্বি হোই রহনন্ ব্রাহ্মণ্ সরীকা বরু॥
স্ত্রী বৈর ভ্রষ্ট হুনন্ পতী র সহুরাকো দ্রোহ ধুলো গরী।
যত্তা নষ্ট কসৌরি মুক্ত ও হুনন্ সংসার সাগর তরী॥

(ক্ষত্রিয়রা জাতিধর্ম মানবে না; শূদ্র প্রভৃতি নীচু জাতির লোকেরা ব্রাহ্মণদের মত তপস্বী হবে। অনেক রমণী স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধাচারণ করে ধ্বংস হয়ে যাবে। সংসারসাগর উত্তরণ করে এইসব নষ্ট মানুষরা কিভাবে মুক্তিলাভ করবে ?

যো চিন্তা মনমা ভরো র অহিলে সোধুঁ উপাই তনী।
আয়াকো হু দয়ানিধান। কসরী তর্নন্ সহজ্ রো পনী॥
বতালাই উপায় তর্ণ সজিলো কুন্ হো উ আজ্ঞা গরী।
মেরো চিত্ত বুঝাইবন্নহু হাম্ ক্যালে বি জানহুন্ তরী॥

(আমার মনে এইসব চিন্তা এসেছে এবং তাই আমি আপনার কাছে উপায় জানতে এসেছি। হে দয়ানিধান, এরা কিভাবে সহজে সংসার অতিক্রম করবে। কিভাবে এরা সহজে সংসারসাগর পেরোবে, সে উপায় বলে দিন, আমাকে তুষ্ট করুন।) (ক্রমশঃ)

●

।। কবি-সৈনিক গুরুগোবিন্দ সিং ও তৎকালীন ভারত-রাষ্ট্র ।।

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনী শক্তির উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন গুরুগোবিন্দ সিং। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, শাস্ত্রাদি, ধর্মপ্রবক্তা, সংস্কারক, জাতিসংগঠক, দেশব্রতী ও যোদ্ধা। একটি মানুষের জীবনে এতগুলি মহৎ গুণের সমন্বয় কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। শিখসম্প্রদায়ে গুরু নানক থেকে শুরু ক'রে নবম গুরু তেগবাহাদুর পর্যন্ত যখনই যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাস ও প্রার্থনার সঙ্গে মানবকল্যাণের নানা কর্মের উপর। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে সংহত ক'রে জাতীয় মুক্তির পথে অগ্রযাত্রার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে বৃহৎ আকারে কখনো দেখা যায় নি। দশম গুরুগোবিন্দ সিংয়ের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তিনি এলেন একটা দুর্বল ও ভীরু জাতিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শক্তিমান ক'রে গ'ড়ে

তুলতে। আত্মজীবনীতে তিনি লেখেন: 'ঈশ্বরের আদেশে আমি পৃথিবীর এই অন্ধকার যুগে এসে পৌঁছেচি বিভ্রান্ত মানবসমাজকে পাপের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে। তার কাকে বলে আমি জানি না; আমি কেবল ঈশ্বরকে জানি, এবং তাঁরই নির্দেশে চলি।'

গুরুগোবিন্দের নানা কবিতাতেও পাই একদিকে ঈশ্বরমহিমা ও অন্যদিকে স্বদেশপ্রেম ও জাগ্রত প্রাণচেতনার অনবদ্য সুর। একই সঙ্গে তিনি গণতন্ত্র পদ্ধতিরও প্রবর্তক ছিলেন। গুরু ও শিষ্য বা অনুগামীদের মধ্যে কোনো বৈষম্য রাখেন নি তিনি। গুরু হ'য়ে শিষ্যদের চাইতে কোনো বিশেষ সুবিধে ভোগের তিনি ছিলেন বিরোধী। এইভাবে সকলের মধ্যে তিনি সৃষ্টি ক'রেছিলেন সমতা ও সাম্য। ঐতিহাসিকদের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে তাঁর সম্পর্কে জনৈক মুসলমান তত্ত্ববিদ বলেছেন: 'In him were imbibed the qualities of a religious leader, and warrior. He was a law-giver in the pulpit, a champion in the field, a king on his masnad, and a fakir in the society of the khalsa. He was the rightman for the needs of time...He appeared at a most crucial time of the Indian history when religious persecution was as its highest pitch. He played a part which none else had played before.'

ভারতীয় ইতিহাসে তখন মোঘল সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সাজাহানের মৃত্যুর পর তৃতীয়বার রাজ্যাভিষেক হয় নবাব ঔরঙ্গজেবের। ইসলামধর্মে তাঁর নিষ্ঠা ছিল সন্দেহাতীত, কিন্তু পরধর্মবিদ্বেষ ছিল তাঁরমধ্যে প্রবল। তাঁর এই স্বধর্মনিষ্ঠা তাঁকে উদারতার পথে না গিয়ে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত করে। হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর আঘাত হয়ে ওঠে প্রবল। কেবল হিন্দুদের দেবস্থানসমূহের ধ্বংসসাধন ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বলপূর্বক তিনি হিন্দুদের ইসলামধর্মভুক্ত করেছেন এবং বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। তাছাড়া হিন্দুরাজ্যকে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরিণত করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ফলে ভারতে জাঠ, বুন্দেলা, সন্ন্যাসী, শিখ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি জাতি বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে। কত তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হ'য়ে ধর্ম না দিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, আবার ছত্রপতি শিবাজীর মতো কত দুঃসাহসী রাষ্ট্রনেতা ঔরঙ্গজেবের কূটবুদ্ধিকে হেলায় উপহাসে পরিণত ক'রে আত্মমর্যাদায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, ভারতীয় ইতিহাসে তার সাক্ষ্যের অভাব নেই।

সেই মসীলিপ্ত মোঘলসাম্রাজ্যের নির্মম অত্যাচারের যুগে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে গুরুগোবিন্দের আবির্ভাব। বংশগত পদবী ছিল রাই, পরে তিনি সিং পদবী গ্রহণ করেন। বাল্য ও কৈশোর কাটে তাঁর পাঠ-অধ্যয়ন এবং নানা কাব্য, সাহিত্য ও নাটক রচনায়। তাঁর পাঞ্জাবী ও হিন্দীভাষায় রচিত 'চণ্ডী মাহাত্ম্য', 'চব্বিশ অবতার কাহিনী', 'বিচিত্র নাটক,' 'রাম অবতার' প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে ভারতীয় জনজীবনে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। প্রথম জীবনে তিনি উপযুক্ত শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ এবং তাঁর পূর্বতন ন'জন গুরুর রচনাবলী সম্যকভাবে অধ্যয়ন ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আত্মস্থ ক'রে নেবার

অবকাশ পান। সেইসঙ্গে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিতবৃন্দকে নিজের পরিষদে আমন্ত্রণ ক'রে তিনি উপযুক্ত মর্যাদায় সকলকে পারিতোষিক দিয়ে সম্মানিত করেন। তাছাড়া যে কোনো আশ্রয়প্রার্থীকে সাহায্য করা পিতা তেগবাহাদুরের মতো গুরুগোবিন্দের মধ্যেও প্রবল ছিল। বহু দেবদেবীর পূজা, সাধারণ মানুষের উপর যাজক-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও কুসংস্কারকে রোধ ক'রে তিনি চাইলেন বর্ণপ্রথার ঊর্ধ্বে হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে গ'ড়ে তুলতে। গুরু নানকের মতো তিনিও বললেন: 'ঈশ্বরকে খুঁজতে মন্দিরে বা মসজিদে যাবার প্রয়োজন নেই; নিজের অন্তরের মধ্যে তাঁকে অনুসন্ধান করো, এবং লোকাচারের ঊর্ধ্বে আপন শক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে দাঁড়াও।'

তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে বহু পাঠান এসে সেদিন গুরুগোবিন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নিজে থেকে অপরকে আঘাত করার তিনি ছিলেন বিরোধী, কিন্তু বাইরে থেকে আঘাত হলে তাকে প্রতিহত করতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যদিও মুসলমান সমাজের বহু সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু মোঘলশক্তির সহায়তায় পার্বত্যরাজশক্তি পরাক্রমশালী হ'য়ে গুরুগোবিন্দের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হল; গুরুর সংগঠনী শক্তিও ক্রমেই প্রবল হ'য়ে ওঠে। মোঘলের বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল না, কিন্তু যখন দেখলেন—তারা বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণ করছে, হিন্দু নারীর উপর আসুরিক বলপ্রয়োগ করছে, হিন্দু-সম্পত্তি দখল করছে, এবং তাদের মঠ-মন্দির ধ্বংস করছে, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি গ'ড়ে তুললেন 'খালসা' বাহিনী। খালসা অর্থ পবিত্র। ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয়েও এই খালসা বাহিনী অস্ত্রবিদ্যায় হয়ে উঠলো পারদর্শী। গুরুর আদেশে শিখরা এই প্রথম গ্রহণ করলো 'সিং' পদটী। 'সিং' অর্থে সিংহের মতো শক্তিমান। তাদের উদ্দেশ্যে গুরুগোবিন্দ বললেন: "কোনো জাতি বা বর্ণবাহুল্যে বিশ্বাস করবে না। তোমাদের উপাস্য দেবতা হবেন একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, তাঁর কোনো বিকল্প নেই। মাংস খাবে, কিন্তু সর্বদা মাদকদ্রব্য পরিহার ক'রে চলবে। পরস্ত্রীর প্রতি কখনো কামনার দৃষ্টিতে তাকাবে না। নমস্কার বিনিময় বা কুর্নিশের ক্ষেত্রে সকলে একই বাক্য ব্যবহার ক'রে বলবে: ওরা গুরুজীকা খালসা, ওরা গুরুজীকে ফতে। আবশ্যিকভাবে প্রত্যেকেই দীর্ঘ কেশ, কঙ্ঘ বা চিরুণী, কাচ্ছা বা কটিবাস, কড়া বা লৌহ বলয় এবং কৃপাণ ব্যবহার করবে। তোমাদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হবে 'গ্রন্থসাহিব'। শিখ-সমাজে আমার পর আর কোনো ধর্মগুরুর আবির্ভাব ঘটবে না। গ্রন্থসাহিবকেই তোমরা গুরু হিসেবে জ্ঞান করবে।—ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে এবং গুরু নানককে সাক্ষী রেখে আমি এই উক্তি করছি যে, আজ থেকে খালসা শুধু আমার ভাবমূর্তি নয়, প্রতিটি খালসাই হচ্ছে আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব।"

ঔরঙ্গজেবের কাছে এই খালসাবাহিনী গঠনের সংবাদ গিয়ে পৌঁছালে তিনি পর্বতাঞ্চল সিরিন্দের রাজাকে জানান গুরুগোবিন্দকে প্রতিহত করতে। কারণ গুরু তখন সিরিন্দের

বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকারে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু কোনো অবরোধ বা আক্রমণই গুরু-গোবিন্দকে বিচলিত, বিভ্রান্ত বা পরাজিত করতে পারে নি। মোঘলসৈন্য পর পর তাঁর সন্তানদের হত্যা করেছে, তিনি বলেছেন: 'দুঃখ নেই। খালসাদের মধ্যেই আমার সন্তানরা বেঁচে থাকবে, আমি নিজেও খালসাদের একজন।'

তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রসঙ্গত: স্বামী বিবেকানন্দ বলেন: 'Even in the midst of extreme calamities he said · O Lord ! Thy will is the sweetest thing for me.'

ঔরঙ্গজেব একসময় পারস্পরিক আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানান গুরুগোবিন্দকে। গুরু তাঁর এই কূটকৌশল বুঝতে পেরে পাল্টা আমন্ত্রণ জানান ঔরঙ্গজেবকে। সেই একইকালে শিবাজী-পুত্র শম্ভুজী চান গুরুগোবিন্দ মহারাষ্ট্রে গিয়ে তাঁর মারাঠা সৈন্যদের পরিচালন ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু তার আগেই পুনরায় মোঘলসৈন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয় গুরুগোবিন্দকে। বহু মোঘলসৈন্য তাতে হতাহত হয়।

এ ঘটনার পর ঔরঙ্গজেব খুব বেশীদিন আর আয়ু পাননি। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বাহাদুর শা সিংহাসন লাভ ক'রে শাসনকার্যে কিছুটা উদারতার পরিচয় দেন। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে গুরুগোবিন্দ রাজ-অতিথি হিসেবে বাহাদুর শা'র সঙ্গে রাজপুতানা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ক্রমে তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি অনুভব করেন—তাঁর মৃত্যুর দিন আসন্ন। এর স্বল্পকাল বাদে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে অন্তরে ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি ক'রে তিনি স্বেচ্ছায় চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। মানুষের প্রতি তাঁর শেষ বাণী ছিল: 'শারীরিক শুদ্ধতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে মনকে সর্বদা পবিত্র রাখো, দেশ ও জাতির উদ্ধারে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করো, এবং কুসংস্কার ত্যাগ ক'রে সর্বমানবের জন্যে মনের অর্গল খুলে দাও।'

তাঁর ধর্মপ্রাণতা, বুদ্ধির প্রখরতা, অনন্য সাহস ও দুর্বার প্রাণশক্তি ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে চিরকাল এই বিস্মৃত জাতির জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করবে।

●

॥ প্রাণ ও তাহার নিরাময় শক্তি ॥

স্বামী পরমাত্মানন্দ

মানুষ যে অমিতশক্তির অধিকারী প্রাণশক্তিই তার মূল কারণ। এই প্রাণ চেতনধর্মী এবং ইচ্ছাশক্তি ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। প্রধানতঃ শরীরের মধ্য দিয়ে এর গতি ও ক্রিয়া প্রকাশিত। উপনিষদে প্রাণকে চেতন ও জড়জগতের সমস্ত গতির মূল কারণ বলা হয়েছে যথা, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' (কঠোপনিষদ ২।৩।২)। বেদান্তের মতেও এই প্রাণ সমস্ত জীব-নির্বিশেষে একইভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত শক্তির মধ্যে সমানভাবে আছে। এই শক্তি অনাদি ও অবিনাশী। মানবজীবনে জীবনীশক্তি ও মন এই দু'টি এক প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। মনুষ্য-শরীরে মেরুদণ্ডের বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রে প্রাণশক্তি পুঞ্জীকৃত থাকে। যোগসাধনা ও প্রাণায়াম অভ্যাস ক'রে এই শক্তিকে বাড়ানো যায় ও নিজ আয়ত্তে আনা যায়। এই শক্তিকে আয়ত্তাধীন করেই যোগীরা অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক কাজসকল করে থাকেন। সাধারণ মানুষ সে কৌশল জানে না তাই তারা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে এই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। এই শক্তিই আবার আধ্যাত্মিক শক্তিরও উৎস। মনুষ্যশরীরে পুঞ্জীকৃত এই শক্তিকেই যোগীরা প্রথমে মানসিক ও পরে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করেন।

মানুষ যে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ করে তা-ও এই একই প্রাণশক্তির বিকাশ। এমনকি শরীরগঠনক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, রক্তপিত্ত, ফুসফুস ইত্যাদির ক্রিয়াসকলও একই প্রাণশক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। যোগীরা এই শক্তিকেই নিয়ন্ত্রিত করে তাকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত করেন। তখন তাঁদের ইচ্ছাশক্তি অতি প্রবল হয়। ইচ্ছাশক্তিই আধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র। ইচ্ছাশক্তিই প্রাণশক্তির চরমতম বিকাশ। যোগীরা প্রাণশক্তিকে অপচয় হতে না দিয়ে তাকে সংরক্ষণ করেন। পরে সাধন-অভ্যাসের ফলে সেই শক্তিই তাঁদের বিপুল মানসিকশক্তি ও অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। তখন তাঁদের ইচ্ছামাত্র কাজ হয়ে থাকে—তা শুধু জাগতিক বিষয়ে নয়, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরেও তা প্রসারিত হয়। যোগীদের যে-সব যোগবিভূতি দেখা যায় সেগুলি মানসিক স্তরের শক্তিবিকাশ মাত্র। কিন্তু মুমুক্ষুত্ব বা মুক্তি-ইচ্ছাই আধ্যাত্মিক স্তরের শ্রেষ্ঠ শক্তিবিকাশ। যোগীরা শুধু নিজেদের মুক্তির জন্যই সে-শক্তিকে কাজে লাগান না বরং অপর ব্যক্তি এবং প্রাণীদের মুক্তির জন্যও সে-শক্তির বিকাশ করে থাকেন। যেমন অবতার পুরুষ এবং সিদ্ধযোগীগণ করে থাকেন। তাঁদের ইচ্ছার মাধ্যমে প্রাণশক্তিই কাজ করে। রোগ-নিরাময় তাঁদের ইচ্ছামাত্রই হয়ে থাকে—তা যেমন নিজ শরীরের ক্ষেত্রে হয় তেমন অপর শরীরেও হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও আমরা প্রাণশক্তির বিকাশ দেখে থাকি যথেষ্টভাবে। কিন্তু সেগুলি সচরাচর সবসময়েই দেখে থাকি বলে তা আমাদের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে না। কিন্তু যোগীদের শক্তিবিকাশ সচরাচর দেখা যায় না বলেই সেগুলি আমাদের কাছে বিস্ময়কর বা অলৌকিক বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষ যে বিভিন্ন বিরূপ-অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকে তাতেই প্রমাণিত হয় প্রাণশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা—ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বিরূপ মানসিক অবস্থায়

সাথে সংগ্রাম, বিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সংগ্রাম, বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সংগ্রাম,—এসবই মানুষ করে থাকে প্রাণশক্তির সাহায্যে। প্রাণশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হ'ল জীবনীশক্তির বিকাশ এবং ব্যাধি ইত্যাদি থেকে শরীরকে রক্ষা করা। তাছাড়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির প্রভাব, যেমন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা মহামারী ইত্যাদি এবং বিরূপ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে চলাও প্রাণশক্তিরই কাজ। এ-ক্ষেত্রেও প্রাণশক্তির বিকাশ নিশ্চয়ই কম বিস্ময়কর নয়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রাণ ও নিরাময়-শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'পরিবেশ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতি রক্ষা করে চলাই পার্থিব জীবনের গতি ও প্রকৃতি। সেই বস্তুই জীবন্ত যা তার পরিবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ, আর যখনই এই সঙ্গতি-রক্ষা বা তৎপরতার অভাব দেখা দেয় তখনই আসে মৃত্যু। এই সামঞ্জস্য বা সংহতি-রক্ষা যত সুষ্ঠু হয়, প্রাণের প্রকাশ ও উদ্‌বর্তন হয় ততই পূর্ণ ও স্পষ্ট। উদ্ভিদ্-জীবন, পশু-জীবন, মানব-জীবন প্রভৃতির সকল প্রকাশ বা অভিব্যক্তিই ঐ নিয়মের বশবর্তী। জীবনের পরিবেশসংহতি বলতে বুঝতে হবে পরিবেশের সঙ্গে জীবনগতির মিলন-সাধন ও প্রাকৃতিক নিয়ম-পালন। আর এসব হচ্ছে ঐ জীবনী-শক্তিরই পরিণতি।...রোগ বা ব্যাধি যে বাইরে থেকে এসে আমাদের দেহ ও মনকে অধিকার করে তা নয়, প্রকৃতির নিয়মনীতি-পালনে অসামর্থ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জীবনীশক্তির অসংগতির জন্যই রোগের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে রোগ অপ্রাকৃত অবস্থায় জীবনীশক্তিরই একটি বিকৃত বা অসম্পূর্ণ প্রকাশ মাত্র।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যেখানেই জীবনীশক্তির বিকাশ সেখানেই প্রাণশক্তি বিভিন্নভাবে পরিস্ফুট। প্রাণশক্তিই জীবনগতির সৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মূল উৎস। এবং যখন, যেভাবে, যে-অবস্থায় প্রাণশক্তির স্ফুরণ হয় ব্যাহত তখন, সেখানে এবং সে-অবস্থায় হয় ব্যাধি বা রোগের প্রকোপ। এক কথায় প্রাণশক্তিই জীবনগতির সমস্ত বিরুদ্ধশক্তির সাথে সংগ্রামে জয়ী হয়ে জীবনকে রাখে অব্যাহত এবং স্বাস্থ্যকে রাখে অটুট। জীবনীশক্তির অবিকৃত বিকাশই পূর্ণ স্বাস্থ্য নামে অভিহিত হয়। তাই স্বাস্থ্যকে রোগমুক্ত রাখতে হলে প্রাণশক্তির বিকাশ হওয়া চাই অব্যাহত এবং অবিকৃত। যখন ক্ষয়, অপচয়, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব বা স্বাস্থ্যের নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে শক্তি কমে যায় তখন আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং তার ফল এই হয় যে, যেসব বিরুদ্ধ শক্তি সর্বদা আমাদের ধ্বংস ক'রে দিতে সচেষ্ট হয় তাদের আর প্রতিরোধ করতে পারি না। তখন প্রতিকূল শক্তির কাছে আমাদের হার মানতে হয়, অর্থাৎ নানাপ্রকার রোগের কবলে পড়তে হয়।

অপরপক্ষে জীবনীশক্তি যদি প্রচুর থাকে তাহলে আমাদের দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতি-গুলো নিশ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য, পানীয় ও চর্ম-রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে প্রবিষ্ট জীবাণু সকলকে ধ্বংস ক'রে দেয়। এইসব রোগজীবাণুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে বা হটিয়ে দিতে গেলে চাই জীবনীশক্তির প্রাচুর্য, আর তবেই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বাস্থ্য ফিরে আসে। দেহস্থ জীবকোষগুলি যদি পারিপার্শ্বিক বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় তাহলে শরীরে কোনরকম রোগ জন্মাতে পারে না।

একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন এবিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ: 'মৌচাকের কোন অংশ আহত হলে যেমন হাজার হাজার মৌমাছি শত্রুকে আক্রমণ ক'রে তাড়িয়ে দিতে আসে ও চাকের আহত স্থানটি মেরামত ক'রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনে, তেমনি দেহের কোন অংশ আহত হলে, অথবা কোন বিজাতীয় জীবাণু শরীরে ঢুকে জীবকোষকে আক্রমণ করলে অন্যান্য জীবকোষগুলি বহিঃশত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সেখানে ছুটে আসে, আর যদি তারা শত্রুকে পরাভূত ও বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়, অথবা মেরে ফেলতে পারে তো সুস্থতা বা স্বাস্থ্য ফিরে আসে, আর যদি তা না পারে তো সেখানে ব্যথা, বেদনা বা যেকোন ব্যাধি দেখা দেয়। নিজেকে রক্ষা করার অথবা আঘাত-বেদনাকে উপশম করার ক্ষমতা বা জীবনীশক্তি প্রতিটি জীবকোষেরই আছে।'

প্রাণ-বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক জীবেরই প্রাণশক্তি আছে। এই শক্তির অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন স্নায়ুমণ্ডলী কাজ করে, আবার এইসব স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে যে প্রাণস্রোত প্রবাহিত হয় তাও প্রাণের স্পন্দনের জন্যই হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই এই প্রাণশক্তির ভাণ্ডার। ওখানেই ঐ শক্তি উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়। দরকারের সময় এই প্রাণশক্তি শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় ও আরোগ্যকারী শক্তি বিকীরণ ক'রে দেয়। এই প্রাণশক্তিকে যত বেশী সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারা যাবে, শারীরিক ও মানসিক শক্তি তত বেশী লাভ করা যাবে। যাঁর মধ্যে প্রাণশক্তি বা প্রাণবায়ু প্রচুর আছে, তাঁর স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং বলবীর্যও তেমনি। ইচ্ছা করলে তিনি তা অপর কাউকে দিতেও পারেন।

এই প্রাণশক্তির সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই যোগীরা অধিকতর প্রাণশক্তি সৃষ্টি ও সঞ্চালন করতে সক্ষম হন। ইচ্ছাশক্তি তাঁরা তৈরী করেন জীবনীশক্তি থেকেই। প্রতি শরীরেই জীবনীশক্তি আছে—কম অথবা বেশী। যোগীরা শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন করে এবং সংযম ও প্রাণায়াম অভ্যাস করে প্রথমে নিজ জীবনীশক্তিকে বর্ধিত করেন এবং পরে সেই শক্তিকে পরিণত করেন ইচ্ছাশক্তিতে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছাড়া প্রাণশক্তিকে নিজে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায় না। তাই ইচ্ছাশক্তিকে বর্ধিত করতে হয় প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এ-সম্বন্ধে বলেছেন, 'রোগ সারাতে হ'লে প্রবল ইচ্ছাশক্তি অর্জন করা চাই। এমন যোগী আছেন যাঁরা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই রোগীকে ব্যাধিমুক্ত করে দিতে পারেন অযোঘ অব্যর্থভাবে। এই ইচ্ছাশক্তিকে প্রাণায়ামের সাহায্যে বর্ধিত করা যায়'।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে, তন্ত্রশাস্ত্রে এবং হঠযোগে প্রাণায়ামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ' বক্তৃতার তৃতীয় পর্যায়ে কয়েকটি সহজ প্রাণায়ামের কথা বলেছেন, যেমন বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'যোগশিক্ষা'-গ্রন্থে। তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রাণায়াম অপরিহার্য নয়, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা দূর করার কাজে সহায়ক মাত্র। সাধকের মনের বিক্ষিপ্ততা দূর করার অনেক পদ্ধতি আছে যেমন, প্রার্থনা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে পাই ভক্তিতেও বায়ু

স্থির হয়, কুম্ভক হয় যার ফলে চিত্ত স্থির হয়। সকল সাধনারই আসল উদ্দেশ্য হল মনের প্রশান্তি লাভ করা যার জন্য প্রয়োজন মনের বৃত্তিচাঞ্চল্য দূর করা। যেকোনও পদ্ধতিতে মনের বৃত্তিচাঞ্চল্য দূর করলেই প্রাণায়ামের ফল পাওয়া যায়। এই বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্তব্য দিয়েই প্রসঙ্গটি শেষ করছি : 'প্রাণের অব্যক্ত শক্তিকে বিকশিত করে যোগীপুরুষ নিজের দেহের সমস্ত রোগই সারাতে পারেন। জ্ঞানের এই অব্যক্ত শক্তিসমূহই জীবনগতির মূল-উৎস। কিভাবে এই পরিব্যাপ্ত প্রাণশক্তিকে সমগ্র দেহে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও এমনকি শরীরের প্রত্যেকটি কোষে সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত করতে পারা যায় সেই কৌশল যোগীদের সুবিদিত। প্রাণের দ্রুত স্পন্দনের ফলে সমগ্র শরীরের কোষগুলির সাম্যাবস্থা রক্ষা ক'রে তিনি প্রাণের প্রবাহকে আরও প্রবল করেন। ফলে প্রাণের আরোগ্যশক্তি হয় প্রবলতর। প্রাণশক্তির এই প্রবাহ দেহের রক্ত-সঞ্চালনের গতিকে আরও দ্রুত করে ও দেহের রোগাক্রান্ত অংশে সঞ্চারিত হয়ে তাকে ক্রমে সুস্থ করে। এ'ভাবেই শরীরের প্রতিটি কোষ (cell) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ও ক্রমে দেহে আর কোন ব্যাধি থাকে না'।

এককথায় বলা যায়, শারীরিক ক্রিয়া ও মনের বৃত্তিগুলিকে নিয়মিত করে প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রবাহকে অবাধে প্রবাহিত করিয়েই নিজের ও অপরের দেহের সমস্ত রোগ নিরাময় করতে পারেন যোগীরা প্রাণের অব্যক্ত শক্তিবিকাশের মাধ্যমে।

●

।। সৎসঙ্গ ।।

শ্রীঅটল চন্দ্র দাশ

হরষে পাই পরশ তোমার, বিরহেও পাই,
রোগে-শোকে-সুখে দুখে আছো সর্বদাই।

আমার দেহে-মনে—
বিহার তোমার নিত্য প্রভু, গোপনে গোপনে।
আমার আড়ালেতে তোমার দেখা নাহি পাই।

এই বিরাট সংসারে—
সাজাও কত মজা সাজা যে সারে সারে,
তোমায় ভুলে' দেখ্‌তে যে তাই তা'দের পানে যাই।

প্রান্ত যখন ঘুমে,
তোমার কৃপা অবিশ্রান্ত কপোল আমার চুমে।
স্বপ্নে-জাগরণে তোমার সঙ্গ ঘুঁয়ে যাই।

যবে কাঁদাও আমাতে,
আমার ব্যথায় অশ্রু জোয়ার তোমার চোখের পাতে।
তোমার এমন ভালোবাসার নাই যে তুলনাই।

●

।। কালিদাসসাহিত্যে সামুদ্রিক ও জ্যোতিষপ্রসঙ্গ এবং লোকবিশ্বাস ।।

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যসর্জনা বিষয়গৌরবে রত্নাকর বারিধির উপমা। তাঁহার সাহিত্যনিহিত রত্নরাজির মধ্যে প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ বিষয় অন্যতম। দূর অতীতে কালিদাসের কালে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতকে ভারতে সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ বিষয়ে মানুষের যে সুগভীর বিশ্বাস ছিল তাহার প্রমাণ কালিদাস-বিহিত কাব্যে, নাট্যে সেই সেই বিষয়ের প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনা। এই উভয় শাস্ত্রই মানবজীবনের শুভাশুভ ফল নির্দেশ করে। কালিদাস স্বয়ং 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া স্বীকৃত।

কালিদাস-রচিত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে দেখি, বিদর্ভরাজনন্দিনী মালবিকা যখন পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রে সমর্পিত হইবার জন্য আসিতেছিলেন তখন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও দস্যুদ্বারা অপহৃত হইবার দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া পরিচারিকার কর্মে নিযুক্ত হইলেন সেই অগ্নিমিত্রেরই বিদিশারাজভবনে। এদিকে রাজ্ঞী ধারিণী মালবিকার সকলজন-শোভন অলৌকিক লাবণ্যকে ভয় করিয়া আপন বিদিশানাথ অগ্নিমিত্র হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। ধারিণীর সহিত চিত্রিত মালবিকার লাবণ্যরাশি দেখিয়া অগ্নিমিত্র উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নৃত্যপরীক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া কুশলী নাট্যকার নায়ক-নায়িকার দর্শন ঘটাইয়াছেন। নৃত্যপরীক্ষার অবসরে মালবিকা চতুষ্পদ ছলিকের গান গাহিয়াছে 'দুল্লহো পি খো তস্সিং তব হিঅঅ। নিরাসং'।—প্রিয় দুর্লভ জন, হে হৃদয় তুমি নিরাশ হও। কিন্তু এমন সময় তাহার বামনয়নপ্রান্ত কাঁপিয়া উঠিয়া তাহার আশাহত অন্তরে আশা সঞ্চার করিয়াছে। মালবিকা বলিয়া উঠিয়াছে 'অম্মো অণজ্ঞ খো মে পরিপ্ফুরই কিং পি বাম খো'।—ওমা, আমার বাম অপাঙ্গ যে কি করিয়া পরিস্ফুরিত হইতেছে। ইহা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের কথা।

পঞ্চমাঙ্কে যখন মালবিকা-অগ্নিমিত্রের মিলন অদূরবর্তী তখন এক সময় মালবিকা বলিয়াছে—আমি কৌতুকালঙ্কারের নিমিত্ত জানি। তবু পদ্মপত্রের জলের মতো হৃদয় আমার কাঁপিতেছে। আবার আমার দক্ষিণেতর নয়ন বারবার কাঁপিতেছে। 'জানামি নিমিত্তং কোদুহলংকারস্সাত্তহ বি হিঅঅং বিদিনীপত্তগদং বিঅ সলিলং বেবদি দক্খিণেদরং পম্হলং অ বহুসো ফুরই।' কৌতুক অর্থাৎ উৎসব। মালবিকার বামনেত্রকম্পন তাহারই বিবাহোৎসবকে নিশ্চিত করিয়া দিয়াছে—মালবিকা অচিরে লাভ করিয়াছে অগ্নিমিত্রকে।

বিক্রমোর্বশীয় ত্রোটক নাট্যে দেখি সৌরলোক হইতে সূর্য্যপূজান্তে প্রতিষ্ঠানপতি পুরূরবা যখন রাজ্যে ফিরিতেছিলেন তখন কেশী নামক দানবের হস্ত হইতে বর্ষীয়সী অপ্সরা চিত্রলেখা সহ উর্বশীকে রক্ষা করেন। এতক্ষণ উর্বশীসঙ্গিনী রম্ভামেনকার দল বিপদ গণিতে ছিল। সখীর সঙ্গে মিলনের পূর্বক্ষণে তাহাদের বামাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। প্রথমাঙ্কে সেই বামাঙ্গ-কম্পনসূচনার নাটকীয় অভিনয়গত নির্দেশ আছে—'নিমিত্তং সূচয়িত্বাবলোকয়ন্ত্যঃ স্থিতাঃ'।

এমন সময় ব্রহ্মা নেপথ্যকে বলিতেছেন—ওগো, চিত্রলেখাদ্বিতীয়া প্রিয়সখী উর্বশীকে সঙ্গে করিয়া বিশাখা সহিত ভগবান চন্দ্রের মতো সমুপস্থিত রাজর্ষি পুরূরবা। নিমিত্তসূচনার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। বিক্রমোর্বশীয় ত্রোটকের তৃতীয়াঙ্কে একসময় বিদূষক যখন রাজা পুরূরবাকে আশার বাণী শুনাইতেছিলেন সেই সময় রাজার দক্ষিণহস্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে :

বচোভিরশ্লোজননৈর্ভবানিব শুরুব্যথম্।
অয়মাস্পন্দিতৈ বাহুরাশ্বাসয়তি দক্ষিণঃ॥

—সখা বিদূষক। তুমি এইসব আশার কথা কহিয়া যেমন হৃদয়ের ব্যথা কতকটা লঘু করিলে ঠিক সেইরূপ হঠাৎ এই দক্ষিণ বাহু কাঁপিয়া ব্যথিত আমাকে আশ্বাস দিতেছে।

পুরূরবা প্রিয়াউর্বশীর সহিত মিলনে আশ্বস্ত হইয়াছেন।

কালিদাসকবি অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখি হস্তিনাপুরাধিপতি দুষ্মন্ত মৃগয়ায় আসিয়া হিমগিরি উপত্যকার মালিনীতটশায়ী কণ্বাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রবেশমুখে তাঁহার বরকামিনী-লাভসূচক দক্ষিণবাহুস্পন্দন ঘটিয়াছে, যদিও আশ্রমপদে তাহা একান্ত অসম্ভব। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্তের স্বগতোক্তি :

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র॥

সত্য সত্যই ভবিতব্যের ঘটনা সর্বত্রই সম্ভব। আশ্রমপদেই দুষ্মন্তের শকুন্তলাসম্মিলন ঘটিয়াছে।

অভিজ্ঞানের ষষ্ঠাঙ্কে। রাজসভা প্রবেশের মুখে শকুন্তলার বামেতর নয়নের স্ফুরণ দেখি। অন্তত আশঙ্কায় শকুন্তলাকণ্ঠে সতীতি উক্তি—অয়ি কিমেতদ্ বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি।—ওমা। আমার দক্ষিণ নয়ন কেন কাঁপিতেছে?

শকুন্তলার দক্ষিণচক্ষুষ্পন্দনের ফল দুষ্মন্তকর্তৃক প্রত্যাখ্যান এই ষষ্ঠাঙ্কেই ঘটিয়াছে।

কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যের ষষ্ঠসর্গ। ইন্দুমতী-স্বয়ম্বর। বৈদর্ভী ইন্দুমতী সঞ্চারিণী দীপশিখার মতো বহু বহু রাজাকে বিবাদে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিয়া উপস্থিত হইলেন রঘু-নন্দন অজ-সন্নিধানে। ইন্দুমতী তাঁহাকে বরণ করিবেন কিনা ভাবিয়া অজ আকুল হইয়াছেন। এমন সময় কেয়ূর-বন্ধনকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তাঁহার দক্ষিণবাহু কাঁপিল—সংশয় ঘুচে গেল। কবির ভাষায় :

তস্যাং রঘোঃ সূনুরুদন্বিতায়াং বৃণীত মাংবেতি সমাকুলোঽভূৎ।
বামেতরঃ সংশয়মস্য বাহুঃ কেয়ূরবন্ধোচ্ছ্বসিতৈ র্ননোদ॥ ৬।৬৮॥

এই রঘুবংশের চতুর্দশসর্গ। সুচিরবিরহান্তে সুকঠিন বিপদের শেষে রামসীতা অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। রামচন্দ্র রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় রামচন্দ্রের চর ভদ্র আসিয়া জানাইল প্রজাগণ রাক্ষসরাবণগৃহোষিতা সীতাকে রামচন্দ্রকর্তৃকগ্রহণ সুদৃষ্টিতে গ্রহণ করিতেছে না। এই শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাবিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু কি উপায়ে? আসন্নপ্রসবা সীতা একবার বনদর্শনবাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই বাসনাপূরণের ছলে

লক্ষ্মণকে দিয়া রামচন্দ্র সীতা বিসর্জন দিলেন। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ হইতে রথ চলিয়াছে বনোদ্দেশে। রথে তিনজন সারথি সুমন্ত্র, দেবর লক্ষ্মণ, রামপ্রিয়া সীতা। লক্ষ্মণ রামকর্তৃক সীতা পরিত্যাগ গোপন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি গোপন করিলে কি হইবে? সীতার সব্যেতর নেত্র অর্থাৎ দক্ষিণচক্ষু ভবিষ্যতের গুরুদুঃখ—প্রিয়তমরামবিচ্ছেদ সূচনা করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কালিদাস লিখিলেন :

জুগুহে তস্যাঃ পথি লক্ষ্মণোঽং সব্যেতরেণ স্ফুরতা তদক্ষ্ণা।
আখ্যাতমস্যৈ গুরুতাবিদুঃখমত্যন্ত-লুপ্তপ্রিয়দর্শনেন ॥ ১৪।৪৯ ॥

নর-নারীর দক্ষিণ-বামঅঙ্গের স্ফুরণ বিষয়ে অদ্ভুতসাগরে আছে পুরুষের বামেতর অর্থাৎ দক্ষিণভুজস্পন্দন বরস্ত্রীলাভসূচক—'বামেতরভুজস্পন্দঃ বরস্ত্রীলাভসূচকঃ'। নিমিত্ত নিদানে পাই—

বামভাগস্থনারীণাং শ্রেষ্ঠঃ পুংসাং তু দক্ষিণঃ।
দানে দেবাদিপূজায়াং স্পন্দে সূত্থায়ণেঽপি চ ॥

দান, দেবাদিপূজা, রতিক্রিয়ায় নারীগণের বামাঙ্গ ও পুরুষগণের দক্ষিণাঙ্গস্পন্দন শুভ। এ বিষয়ে পার্শ্ববচনও স্মরণীয়, পুরুষের 'দক্ষিণচক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুদর্শনমর্থলাভংবা' এবং 'বামচক্ষুঃস্পন্দনং বন্ধুবিচ্ছেদং ধনহানিংবা।' পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর পার্থক্য এইযে 'স্ত্রীণামেতৎ ফলমবিকলং দক্ষিণে বৈপরীত্যম্।' পুরুষের যাহা ফল স্ত্রীরও তাহাই। তবে স্ত্রীগণের দক্ষিণাঙ্গস্ফুরণে বিপরীত ফলই চিন্তনীয়।

রঘুবংশ মহাকাব্যের চতুর্থসর্গে মহাকবি রঘুর চরণে ধ্বজবজ্রছত্রাদিরাজচিহ্নের বর্ণনা করিয়াছেন। এই রঘুনামেই তাঁহার মহাকাব্যের নাম রঘুবংশ :

তে রেখাধ্বজবজ্রকুলিশচ্ছত্রচিহ্নং সম্রাজশ্চরণদ্বয়ং প্রসাদলভ্যম্।
প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রুর্মৌলিস্রক্চ্যুতমকরন্দরেণু গৌরম্ ॥ ৪।৮৮ ॥

—প্রস্থানকালে ভূপতিবৃন্দ আসিয়া রঘুর অনুগ্রহলভ্য ধ্বজবজ্রছত্ররেখাঙ্কিতচরণে প্রণত হইলেন। তাঁহাদের মৌলিমণ্ডিতমালার মকরন্দ ও পরাগে সম্রাটের পাদাঙ্গুলিসকল গৌরবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল।

অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকের সপ্তমাঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার অনাবিষ্কৃত পরিচয় পুত্রের হস্তে রাজচক্রবর্তি চিহ্ন দেখিয়াছেন। মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে: এই বুঝি শকুন্তলার গর্ভজাত সন্তান। কথং চক্রবর্তি লক্ষণমস্যানেন ধার্যতে? তথাহি অস্য

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্য-পত্রান্তরমিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নমিবৈকপঙ্কজম্ ॥

—লোভনীয় বস্তুলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাবশে হাতখানি যেমন বাড়াইয়াছে, আর অমনি তাহাতে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন দেখা যাইতেছে। অঙ্গুলিগুলি এমন পরস্পরসংশ্লিষ্ট থাকিয়া শোভা পাইতেছে যে দেখিলে মনে হয় অভিপ্রত্যূষে যেন একটি পদ্ম বিকচ হইয়াছে, উহার অরুণিমায় কমলকলিকা লাল হইয়াছে, পাপড়ি মেলে নাই তবু শোভায় ভরিয়া গিয়াছে।

করচরণের ঘনসন্নিবিষ্ট অঙ্গুলি, ধ্বজাঙ্কুশাদিচিহ্ন ও রক্তিমাভা বিষয়ে প্রাচীনভারতীয় শাস্ত্র অনেক কথা বলে। গর্গ পুরাণে দেখি :

ঘনাঙ্গুলিশ্চ সঘনাস্তিস্রঃ রেখাশ্চ যস্য বৈ।
নৃপতেঃ করতলগা মণিবন্ধে সমুত্থিতা।

সামুদ্রিক বচনে আছে : অঙ্কুশং কুন্তলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ।
চক্রবর্তী ভবেদ্রাজ্যং সামুদ্রকো বচো যথা।

আরো আছে— যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ তস্য রাজ্যং বিনির্দিশেৎ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথমাঙ্কে দেখি শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত তরুলতায় জলসেচন করিতেছিলেন তখন এক ভ্রমর শকুন্তলাবদনে বারংবার উড়িয়া উড়িয়া পড়িয়াছে— 'বদনং মে মধুকরো অধিবট্টই।' পদ্মোপম বদনের পদ্মগন্ধে সমাকৃষ্ট পদ্মপ্রিয় মধুব্রত। শকুন্তলা পদ্মিনী নায়িকা।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের নায়িকা গৌরীও পদ্মিনী নারী। গৌরীরূপবর্ণনে কালিদাস লিখিলেন :

সুরভি নিশ্বাস বিবৃদ্ধতৃষ্ণম্ বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৩।৭৬ ॥

আপন সুরভি নিশ্বাসে বিবর্দ্ধিততৃষ্ণা বিম্বাধরসমীপে বিচরণশীল ভ্রমরকে উমা ক্ষণে ক্ষণে সম্ভ্রমচঞ্চল দৃষ্টিপাতের সঙ্গে লীলাকমলের সাহায্যে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

এখানেও নিঃশ্বাসের পদ্মগন্ধে সমাকৃষ্ট পদ্মপ্রিয় মধুব্রত। তদুপরি পদ্মগন্ধ পদ্মিনী-নারীর অন্যতম লক্ষণ। রতিমঞ্জরীমতে পদ্মিনী নারীর লক্ষণ :

ভবতি কমলানেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনহসীলা নৃত্যগীতানুরক্তা সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥

পদ্মিনী-লক্ষণ নিরূপণে অন্যত্রও অনুরূপ শ্লোক পাই :

কমলমুকুলদন্তী কুন্দরাজীবগন্ধা সুরতপরমি বন্যা: সৌরতং দিবারন্ধে।
চকিতহরিণনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফলশ্রীবিড়ম্বি ॥

নক্ষত্র-তারা-গ্রহ ইত্যাদিতে নির্ভরশীল জ্যোতিষ শাস্ত্র। রঘুবংশ মহাকাব্যে ইন্দুমতী স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে মগধনরেশ পরন্তপবিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়া কাকবাকী সুনন্দার মুখে এক শ্লোকে নক্ষত্র তারা গ্রহ ইত্যাদির উল্লেখ করিলেন কবি। রাজা সহস্র থাকুন। পরন্তপের দ্বারাই পৃথিবী রাজবতী হইয়াছেন। রাত্রি নক্ষত্র-গ্রহ-তারাসঙ্কুলা হইলেও চন্দ্রসম্পর্কেই জ্যোতিষ্মতী :

কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে রাজবতীমাহুরনেন ভূমিম্।
নক্ষত্র-তারা-গ্রহসঙ্কুলাপি জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥৬/২২॥

এই মহাকাব্যে রঘুর রাশিচক্রে গ্রহসংস্থান বলিতেছেন কালিদাস ॥

গ্রহৈরতঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈঃ সুহৃদ্বিগঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অমুষ্য পুত্রং সময়ে সতীসমা সুষাব সাধ্বী সবিতেব সুপ্রভম্ ॥৩/১৩॥

শচীসখা দুহিতৃকা তত্তদলগ্নে তত্তৎক্ষণে ত্রিসাধনসম্পন্ন রাজশক্তির অক্ষয় অর্থোৎপাদনের ন্যায় একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। তখন পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গভবনস্থ ও অনস্তমিত।

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে অস্তমিত অর্থাৎ রবিসমাচ্ছন্ন গ্রহ উত্তমফলবিধানে অক্ষম। পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ তাঁহার জাতকবল্লভে পাঁচটি গ্রহের তুঙ্গস্থ ফলবিষয়ে সরলপ্রাঞ্জল সংস্কৃতে লিখিতেছেন : 'সম্রাট পঞ্চসু তুঙ্গেষু হি ভবেৎ জ্যোতির্বিদাং সম্মতে।'

কুমার সম্ভব মহাকাব্যে দেখি হরপার্বতীর বিবাহ স্থির হইয়াছে। হরবন্ধু হিমালয় উপস্থিত মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন বিবাহের তিথি কবে হইবে। সেই দিন হইতে তিনদিনপরে বিবাহতিথি নির্দেশ করিয়া চীরবাস মুনিবৃন্দ চলিয়া গেলেন। হিন্দুগণ আজিকার মতো তখনও বিবাহের প্রশস্ত তিথি খুঁজিতেন, মহাকবি বচন হইতে প্রতীত হয় :

বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা।
যে ত্র্যহাদূর্ধ্বমাখ্যায় চেরুস্তীর্থং পরিগ্রহাঃ ॥৫/৬৩॥

ওষধিগণের অধিপতি অর্থাৎ চন্দ্রমা কলায় কলায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ও সপ্তমস্থান দোষরহিত হইলে হিমালয়-কন্যার বিবাহ হইল :

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথৌচ জামিত্রগুণান্বিতায়াম্।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়া বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ ॥৬/১॥

বিবাহকর্মে কলানিধি চন্দ্রের বলাবল লক্ষণীয়। বিশেষ স্ত্রীগণের পক্ষে। লক্ষণীয় সপ্তমস্থানের বিচার। লগ্ন হইতে সপ্তমরাশিকে জ্যোতিষ পরিভাষায় 'জামিত্র' আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। সপ্তমস্থানে বিবাহ, দাম্পত্যসুখ, রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিচার্য। হিমালয় এইগুলি বিচার করিয়া কন্যার বিবাহদীক্ষাবিধি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন।

বিবাহ-মুহূর্তের বর্ণনা করিলেন কালিদাস :

মৈত্রে মুহূর্তে শশলাঞ্ছনেন
যোগং গতাসূত্তর ফাল্গুনীষু
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম চক্রু
বন্ধুস্ত্রিয়ো যা পতিপুত্রবত্যঃ ॥৬/৬॥

উদয় মুহূর্ত হইতে তৃতীয় মুহূর্তাবধি তত্তলগ্নে শশলাঞ্ছন যখন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিত হইলেন তখন পতিপুত্রবতী বন্ধু-রমণীর দল উমাশরীরে বিবাহোচিত মাঙ্গল্য রচনা করিলেন।

পতি-পত্নীর মিত্রতাই বিবাহ কার্যের বিশেষ লক্ষ্য। তাই জ্যোতিষ বিধানে হিন্দুগণ মৈত্রমুহূর্তকে পরম মঙ্গলদ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই মঙ্গলকর্মে পতিপুত্রবতী রমণীর অংশগ্রহণ নবোঢ়ার সীমন্ত-সিন্দূরকে অক্ষয়ত্ব দান ও পুত্রলাভের দ্যোতকবিশেষ। হিন্দুগণ কালিদাসের কালেও বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ-রীতি পালন করিতেন।

বিক্রমোর্বশী নাটোর তৃতীয়াঙ্কে পুরূরবাকে প্রধানা রাজ্ঞী জানাইয়াছেন মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে থাকিয়া সোমচন্দ্রের রোহিণীনক্ষত্রসমাশ্রয় পর্যন্ত পুরূরবার সহিত তিনি অপেক্ষা করিবেন। 'দেবী

বিজ্ঞাপয়তি মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে সুদর্শনশ্চন্দ্র : তত্র সন্নিহিতেন দেবেন প্রতিপাদয়িতুমিচ্ছামি যাবদ্রোহিনী-সংযোগ ইতি।' চন্দ্রের রোহিণীনক্ষত্রসংযোগ অতি শুভ। পুরাণে রোহিণী চন্দ্রকান্তা বলিয়া সংকথিত।

প্রাচীনভারতের বাক্‌সিদ্ধ ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা সাধুর সমুল্লেখ পাই মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পঞ্চমাঙ্কে পরিব্রাজিকার উক্তিতে। পরিব্রাজিকা বলিতেছেন মালবিকার পিতা বাঁচিয়া থাকিতে কোন এক দেবতার যাত্রা উপলক্ষে এক বচনসিদ্ধ সাধু তাঁহারই সমক্ষে বলিয়াছিলেন এক বৎসর মাত্র দাসীভাবে থাকিয়া মালবিকা আপনযোগ্য স্বামী লাভ করিবে। "ইয়ং পিতরি জীবতি কেনাপি দেবযাত্রাগতেন সিদ্ধাদেশকেন সাধুনা মৎসমক্ষং ব্যাদিষ্টা 'বৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্যভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতি।"

সিদ্ধাদেশকের এই উক্তি বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—মালবিকা বৎসরমাত্র দাসীরূপে থাকিয়া অগ্নিমিত্রে সমর্পিতা হইয়াছিলেন।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখি মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলার প্রতিকূল দৈব প্রশমনের জন্য তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই প্রতিকূলদৈব কি কোনো বিরুদ্ধ গ্রহ? হইতে পারে। কোষগ্রন্থ দৈবজ্ঞ বলিতে গ্রহাচার্যকে বোঝাইতে চাহিয়াছে।

সাহিত্যে সমাজের ছবি ফুটিয়া উঠে। সাহিত্যের নাট্যশালায় বাস্তব অবস্থার আকৃতি তথা আরোপ ঘটে। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মতে 'অবস্থানুকৃতির্নাট্যম্', দশরূপক প্রণেতা ধনঞ্জয়ের মতে 'রূপারোপাত্তু রূপকম্'। নারীপুরুষভেদে বিভিন্ন অঙ্গের কম্পনে যে বিচিত্র ফললাভ হয় এ লোকবিশ্বাস সুদূরকালবাহিত। নারীপুরুষভেদে অঙ্গচিহ্নদর্শনে শুভাশুভ নির্ণয়-বিধিও অতীতাগত। জন্মরাশিচক্রে গ্রহাবস্থানভেদে শুভাশুভ ফলনির্দেশনা লগ্ন-তিথি ইত্যাদির শুভাশুভত্বজ্ঞাপনও ফলিতজ্যোতিষের বিষয়। ত্রিকালবক্তা সিদ্ধাদেশকের কথা আমাদের মহাকাব্য-পুরাণ-প্রভৃতিতে প্রখ্যাত। আপনজীবনের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসু নন এমন মানুষ নাই বলিলেই চলে। সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র মানবজীবনের মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ের ফলনির্দেশন বলিয়া এই দুই শাস্ত্রে লোকবিশ্বাসের ধারা প্রাচীন যুগ হইতে আমাদের সংস্কৃতিতে প্রবাহিত। কালিদাসের সাময়িক কালে এই দুই শাস্ত্রে লোকবিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহার নাট্যের পাত্র-পাত্রীমুখে এবং কাব্যে প্রসঙ্গত উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশ্বাসের ধারায় কালিদাসসাহিত্যের হস্তিনাপতি দুষ্মন্ত, প্রতিষ্ঠানাধীশ পুরূরবা, সংসার বিরাগী মুনিজন, নগরাজ হিমালয়, বিদর্ভ-নৃপনন্দিনী মালবিকা, বনবালা শকুন্তলা, যতিবেশধারিণী পরিব্রাজিকা রামকান্তা সীতা, হিম-নগনগরীর নরনারীকুল সকলেই মিলিয়াছেন।

●

॥ হিমালয়ের পথে পথে – যমুনোত্রী ॥

শ্রীবিশ্বজিত দাস

উত্তরকাশী থেকে গঙ্গোত্রী ঘুরে আবার উত্তরকাশী এসে পৌঁচেছি। চিরঞ্জীবদা বিদায় নিয়েছেন। দেরাদুন থেকে ওঁদের ট্রেনের রিজার্ভেশনের দিন এগিয়ে এসেছে। দেরাদুনের বাস চলতে শুরু করেছে। আমাদের সকলের চোখেই জল। হিমালয় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে এমন নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দেয় তা কে জানত।

ধীরে ধীরে ফিরে আসি টিকিট কাউন্টারের সামনে। এখান থেকে সরাসরি স্নানাচটি যাবার বাস মেলে। স্নানাচটি যমুনোত্রী যাবার পথে শেষ বাসরাস্তা। কিন্তু আজ আর স্নানাচটি যাবার বাসে জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। তার বদলে মিললো বারকোট যাবার বাসের আসন। স্নানাচটি থেকে দূরত্ব প্রায় ২৭ কিলোমিটারের মত। পরবর্তী বারকোটে পৌঁচেছি তখন দুপুর বারোটা। পরবর্তী বাসের জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে প্রায় চার ঘণ্টা। আরও বহু লোক এখানে অপেক্ষা করছেন ঐ বাসের জন্য। তার মধ্যে আলাপ হয়ে গেল নবদ্বীপের একদল যাত্রীর সঙ্গে। একই স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী তাঁরা। এসেছেন তীর্থদর্শনের পুণ্য অর্জনে। আলাপ হোলো আরও একজনের সঙ্গে। তিনি স্নানা ও রাণা চটি গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট আত্তার সিঙ্ পরমার।

স্নানাচটি পৌঁছে আত্তার সিঙ্ কিন্তু আমাদের কিছুতেই ছাড়লেন না। তাঁর ওখানেই আমাদের রাত্রিবাস করতে হ'ল। আমাদের রাতের খাওয়াদাওয়ার ভারও তিনিই নিলেন।

* * *

স্নানা চটির দু' কিলোমিটার পরেই রাণা চটি। তারও দু কিলোমিটার পরে হনুমান চটি। এগিয়ে চলেছি। অনেক পেছনে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকার দল। বয়েস হয়েছে ওদের। উঠতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে।

রাস্তা বেশ চড়াই। আকাশে সাদা মেঘের ঘনঘটা। তবে রাস্তা অত্যন্ত চওড়া। একপাশে পাহাড়। অন্যপাশে ঘন গুল্মলতা। তাদের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক্ দিয়ে উঠছে যমুনার রূপোলী জলরেখা।

হনুমান চটি থেকে ফুল চটি চার কিলোমিটার। বৃষ্টি নামলো ফুল চটিতে পৌঁছনোর আগেই। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আশ্রয়ের জন্য ছুটেছে সবাই। দুপুরের পর কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই উচ্চ হিমালয়ের আকাশকে। ভিজতে ভিজতে আমার সহযাত্রীরাও একে একে হাজির হলেন। সে দিনটা আর এগোনো গেল না। যদিও বৃষ্টি থেমেছিল তবু পথশ্রমে সবাই বড় ক্লান্ত।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছি। পথ একটু কাদা হয়েছে; কিন্তু পথের দু'পাশের দৃশ্য সে কথাকে মনেই আসতে দিচ্ছে না। কত রকমের যে ফুল ফুটেছে তার তুলনা নেই। সাদা, লাল, নীল, সোনালী। তাদের অপূর্ব গন্ধে সারা রাস্তাটি ভরে

রয়েছে। শিলিরে সদ্যোস্নাত এইসব ফুলের সম্ভার যেন আমাদের যমুনামাইর মন্দিরে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

পেরিয়ে এলাম জানকী চটি।

জানকী চটির পরই অত্যন্ত চড়াই রাস্তা বার বার পাক খেতে খেতে ওপরে উঠেছে। কত লোক চলেছে। ওপর থেকে দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। একপাশে রুক্ষ পাহাড় আর অন্যদিকে প্রবল গর্জন জলপ্রপাতের মত যমুনা এসে পড়ছে অন্ধকার পাহাড়ের গর্ভে। আবার পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে তরতরিয়ে বয়ে চলেছে ঝিকমিক করতে করতে। এপথে এসেছে সদ্যোজাত শিশু; এসেছে কাঠের পা নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ। কিন্তু কেন এই:কৃচ্ছসাধন? বাইরের কষ্ট দিয়ে অন্তরের বেদনাকে বুঝি ভোলার প্রচেষ্টা। আমরা যারা এগিয়ে চলেছি যমুনোত্রীর দিকে তাদের মুখে কোন কিছুকে পাবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। যারা নেমে আসছে দর্শন শেষ করে তাদের চোখে মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কণ্ঠে তাদের জয়ধ্বনি 'যমুনা মায়ীকী জয়'। 'যমুনা মহারাণী কি জয়'। আমরাও গলা মেলাই তাদের সাথে। শক্তি পাই এগিয়ে চলার।

দুরন্ত চড়াই। এ ওঠার বুঝি আর শেষ নেই। তবু সব কিছুরই যেমন শেষ থাকে পথেরও তেমনি সমাপ্তি ঘটল। ১০৮০০ ফুট উঁচুতে এসে পৌঁছলাম যমুনোত্রী মন্দিরে।

সামনে মন্দির। তার পেছনে বন্দেরপুঁছ পর্বত। যার চল্লিশের হিমবাহ থেকে নেমে এসেছে যমুনার অমৃতময় ধারা। মন্দিরের বাইরে বসে অপেক্ষা করছি। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে আমার সহযাত্রীরা এসে পৌঁছলেন। ওদের নিয়ে স্নান করার জন্য উষ্ণকুণ্ডে এলাম। স্নান করার জন্য একটি ছোট্ট চৌবাচ্চা মত আছে কিন্তু সেখানে এত ভীড় যে আমাদের সেখানে নামতে ইচ্ছে করলো না। আমরা একটু নীচে নেমে এলাম—যমুনার কোলে। যেখানে উষ্ণ জলের প্রস্রবনের ধারাটি এসে মিশেছে সেখান থেকেই জল তুলে স্নান করলাম।

তারপরই এক পাণ্ডা এসে আমাদের পাকড়াও করলো। সহযাত্রীদের অনুরোধেই চললাম তার সঙ্গে। নইলে আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না পাণ্ডার সাহচর্য নেবার।

একটি ছোট্ট উষ্ণজলের ফোয়ারা আছে এখানে। তাকে বলা হয় 'যমুনার মুখারবিন্দ'। সেখানে পূজো সমাপন করে এলাম যমুনার মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির। কিন্তু পরিবেশটি বড় সুন্দর। ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় দর্শন করলাম গঙ্গা আর যমুনার প্রস্তর মূর্তিকে।

যমুনামাইর প্রসাদ বলতে গামছায় চাল আর আলু বেঁধে একটা উষ্ণকুণ্ডে সেদ্ধ করার জন্য ডুবিয়ে দেওয়ারও রীতি আছে। কুণ্ডের জল এত উষ্ণ যে আধঘন্টার মধ্যেই চাল সেদ্ধ হয়ে যায়। তারপর নুন ছাড়া সেই আলুসেদ্ধ আর ভাত দিয়েই শেষ হোলো আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ। অনেকে অবশ্য নারকোল, মিঠাই ইত্যাদি দিয়েও মন্দিরে পূজো দেন।

যমুনোত্রীর সামগ্রিক পরিবেশটি খুব একটা পরিষ্কার নয়। তার ওপরে বৃষ্টির ফলে পথও কর্দমাক্ত। তাই যমুনোত্রী ত্যাগ করে সে দিনই জানকী চটি ফিরে যাবার ঠিক হোলো।

ফিরে চলেছি পিছল পথে ; সাবধানে পা ফেলে। মন পড়ে রয়েছে যমুনার নীল জলে। গুরু, পিতামহ, ভ্রাতৃহত্যার ভূমি কুরুক্ষেত্রের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে এই যমুনা ; শাজাহানের প্রেমের সাক্ষ্য নিয়ে ছুটে চলেছে যমুনা ; অগণিত পুণ্যার্থীর পুণ্যস্নানের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের যমুনা, এই যমুনার জলে আঁচল ভিজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন শ্রীরাধা।

আজ আমরা ফিরে চলেছি সেই যমুনার উৎসস্থল থেকে। আমরা ভগীরথের বংশধর। কিন্তু গিরিপ্রাচীরের বাধা ঠেলে পৌঁছতে পারিনি সেই চম্পাসর হিমবাহের কাছে। তাই ফিরে তাকাই ঐ বিশাল দেহী বাঙ্ময়পুঞ্জের দিকে, যার ছুটি চূড়ার মাঝখান দিয়ে নেমে এসেছে চম্পাসর হিমবাহ ; যে ধবল চম্পাসরই জন্ম দিয়েছে এই নীল যমুনার।

●

॥ মিউয়্যারল্-চিত্র ভাবনায় সিরামিক প্রসঙ্গ ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

'যুগ হাঁটে—সাথে সাথে পথ হেঁটে শতাব্দীর ছায়ার ছায়ায়
মানুষেরা চিহ্ন রেখে যায়……
আলতামিরা ও সিংহনপুরের গুহায়
যে-খোঁজার সুরু—তার ধারা বয়ে বয়ে অজন্তায়
পৌঁছতে অযুত যুগ কেটে গেলো, আরো কতো কাটে তারপরে'……

উদ্ধৃতিতে উক্ত আলতামিরা ও সিংহনপুরে পর্বতগুহার দেয়ালে চিত্রকলার যে-নমুনা আদিম শিল্পীরা রেখে গেছেন—তা সভ্যতার অরুণোদয়লগ্নে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধের উন্মেষের পরিচয় বহন করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে অবশ্য নিছক সৌন্দর্যবোধের বিশুদ্ধ প্রেরণা ওই গুহাচিত্রগুলোর সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়। আদিম মানবের জীবিকা—অর্থাৎ পশুশিকারের প্রয়োজনে যাদুর (magic) প্রতি বিশ্বাসই নাকি এসব চিত্রসৃষ্টির পেছনে মূল তাগিদ হিসেবে কাজ করেছিলো। শিকারের ওপর নির্ভরতার জন্য স্বভাবতই ছিলো সেযুগের শিল্পীদের প্রধান বিষয়বস্তু। তাই পর্বতগুহার দেয়ালে চিত্ররচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিত্রকরদের ধ্যানে ধরা দিয়েছে শিকারের বন্য পশু। বাঁচবার মূল প্রেরণার সঙ্গে সংপৃক্ত বলেই আদিম শিল্পীদের আঁকা শিকারচিত্রগুলো এতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে আদিম শিকারচিত্রগুলো মিউয়্যারল্-চিত্রের লক্ষণযুক্ত। আদিম শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হুন্ আফ্রিকার বুশম্যানদের আঁকা প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র

সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'The primary thing is the unity, not the multiplicity. The design is conceived as an integral whole, not as a function of its individual parts...Thus it is the composition, the structure of the thing as a whole, deriving from the unity of a pictorial scene, which stands pre-eminent in this art.' মধ্যযুগের য়ুরোপীয় চিত্রকলা তথা খ্রীষ্টীয় গীর্জার দেয়ালে আঁকা মিউয়্যারল্-চিত্রের সঙ্গে তুলনা করে আদিম বুশম্যান্-গুহাচিত্র সম্পর্কে ভক্টর কুন্ বলছেন,....'not only they have an aesthetic value ; but like the pictures of the middle ages in Europe, a significance in religious, or if one is unwilling to regard magic as a form of religious expression, in magical experience.' বুশম্যান্ আদিম গুহাচিত্রকলার যে-বিশেষত্বের কথা ভক্টর কুন্ উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের (বিষয়বস্তুর) সমন্বয়ে সম্পূর্ণ একক (the structure of the thing as a whole)—সেটি মিউয়্যারল্-চিত্রেরই একটি বিশেষত্ব। ইংরেজী মিউয়্যারল্-পেন্টিং (mural painting)-এর বাংলা প্রতিশব্দ দেয়াল-চিত্র। ল্যাটিন্ শব্দ মিউয়্যারলিস্ (muralis) থেকে উদ্ভূত মিউয়্যারল্-এর আভিধানিক বাংলা অর্থ 'দেয়াল' অথবা 'দেয়াল সম্বন্ধীয়'। ইদানীং দেয়ালে আঁকা চিত্র বোঝাতে মিউয়্যারল্ পেন্টিং অথবা মিউয়্যারল্-চিত্র কথাটিও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

আদিম যাযাবর শিকারী মানব থেকে কৃষি সভ্যতায় পদক্ষেপ, কৃষি সভ্যতার পরবর্তী যুগে গ্রাম ও নগরের পত্তন, ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শের অভ্যুদয়, বিজ্ঞান ও টেকনোলজির নব নব উদ্ভাবন ইত্যাদি কারণে হাজার হাজার বছরে পৃথিবীর শিল্পকলার বিভিন্ন বিভাগে বিচিত্রমুখী বিবর্তন ঘটেছে। মিউয়্যারল্-চিত্রের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটেনি। আদিম গুহাচিত্র থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে আঁকা মধ্য এশিয়া এবং ভারতে অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্র, খ্রীষ্টীয় তেরো-চোদ্দো শতকে বাইজেন্টাইনীয় মোজেইক্ চিত্রকলা, পনরশ-ষোড়শ খ্রীষ্টীয় শতকের য়ুরোপে ভাটিকান্ প্রাসাদ ও সিস্টিন্ গীর্জার ফ্রেস্কো ও মিউয়্যারল্-চিত্র, বর্তমান শতকে আঁকা মেক্সিকো ও অন্যান্য দেশের দেয়ালচিত্রে মিউয়্যারল্ চিত্রকলার বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে।

চিত্রাঙ্কনের মাধ্যম হিসেবে দেয়ালের ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই শুরু হয়েছে। পর্বতগুহার অমসৃণ পাথুরে দেয়াল থেকে মসৃণ পাথরের দেয়াল কিংবা চুন বালির প্লাস্টারএর আবরণযুক্ত সাদা দেয়ালের বিবর্তন ঘটতেও বেশ কয়েক হাজার বছর কেটে গেছে। তাছাড়া মিউয়্যারল্-চিত্রের উপকরণ এবং কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও ঘটেছে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এসবের পেছনেই রয়েছে গত কয়েক শতাব্দীর বিজ্ঞানী, টেকনোলজিষ্ট ও চিত্রকরদের নিরলস প্রচেষ্টা।

মিউয়্যারল্-চিত্রে সিরামিক অথবা যথার্থভাবে বলতে গেলে দেয়ালে সংস্থাপনের উপযোগী চিত্রিত সিরামিক টালির অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে

(১৫৪০--১৩৫০ খ্রীঃ পূঃ) চিত্রিত বলে অনুমিত একটি টালির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই টালিটিতে দুই অশ্বচালিত একটি রথ এবং রথচালকের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার আশুরএ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিষ্কৃত সম্রাট টিগ্লাথ্ পাইন্সার্এর নামাঙ্কিত একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষে রঙীন চিত্রশলেপমণ্ডিত নকশাযুক্ত যে-পোড়ামাটির ইট পাওয়া গেছে—সেটির নির্মাণকাল ১১২০ থেকে ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রায় সমসাময়িককালে নির্মিত বলে অনুমিত আরও একটি চিত্রিত টালি আশুরএ পাওয়া গেছে। চিত্রশলেপমণ্ডিত এই বড়ো আকারের (২২"×১০½") টালিটি কোনো প্রাচীরে সংস্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রাচীন ব্যাবিলনএর সম্রাট নেবুচাড্নেজারএর রাজত্বকালে নির্মিত সিংহের উচ্চাবচ মূর্তি (relief) সম্বলিত ও চিত্রশলেপমণ্ডিত ইটের মিউয়্যারল্ এবং অন্যান্য আরও এজাতীয় নিদর্শনের কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভবতঃ সঙ্গত হবে না। কারণ, এধরনের নিদর্শনগুলোকে সিরামিক মিউয়্যারল্ চিত্রের পর্যায়ে না ফেলে সিরামিক মিউয়্যারল্-ভাস্কর্যের পর্যায়ে ফেলাই যুক্তিসঙ্গত।

য়ুরোপে মিউয়্যারল্-চিত্রণে মোজেইক্ রীতির প্রসার ঘটেছিলো বাইজেন্টাইন্ সম্রাটদের রাজত্বকালে। প্রধানতঃ গীর্জা এবং প্রাসাদের দেয়ালে মোজেইক্ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করা হতো। গোড়ার দিকে মোজেইক্ অলংকরণে ব্যবহার করা হতো রঙীন পাথরের ছোটো ছোটো টুকরো। বিভিন্ন রঙএর পাথরের টুকরো ঘষে পালিশ করে নকশা অনুযায়ী দেয়ালে বসানো হতো। য়ুরোপে মোজেইক্ পদ্ধতিতে মিউয়্যারল্-চিত্রণরীতির অনুপ্রবেশ মুরদের মাধ্যমে ঘটে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মুরদের স্পেন বিজয়ের ফলে সেমেটিক্ তথা ঐস্লামিক সংস্কৃতির প্রভাব স্পেনএর স্থাপত্য ও শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করে। মোজেইক্ রীতির অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার যে-প্রাধান্য রয়েছে—সেটিও ঐস্লামিক সংস্কৃতিরই অবদান। ঐস্লামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে গণিত তথা জ্যামিতি চর্চার বিশেষ প্রসার ঘটেছিলো। তাছাড়া ইস্লাম ধর্মে মনুষ্যপ্রতিকৃতি অঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় প্রাচীন ঐস্লামিক চিত্রকলায় জ্যামিতিক নকশার প্রাধান্য দেখা যায়। চিত্রকলায় জ্যামিতিক অলংকরণ পদ্ধতির মতো শিল্পকলার আরও একটি বিভাগে স্পেনীয়রা মুরদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে। শিল্পকলার এই বিভাগটি হলো সিরামিকচিত্রণ। সিরামিকচিত্রণে রঙীন লাস্চারএর ব্যবহারপদ্ধতি মুরদের মাধ্যমেই স্পেনে প্রচলিত হয়। লাস্চারমণ্ডিত সিরামিক সাজসজ্জা থেকে একহাজার খ্রীষ্টাব্দের সেভিয়েত উত্তালে চুল্লীতে পোড়ানো পালিশ করা মূল্যবান ধাতুর মতো উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে ওঠে। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থাপত্যে লাস্চারমণ্ডিত সিরামিক টালির অলংকরণ এখনও স্পেনে মুর সংস্কৃতির প্রভাবের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

স্পেনীয়দের মাধ্যমে ইতালীতে সিরামিকপাত্র ও টালিতে লাস্চারচিত্রণের পদ্ধতি প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। ক্রমে ইতালীর পার্শ্ববর্তী ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে লাস্চারএর সিরামিক টালিচিত্রণের কাজ শুরু হয়। য়ুরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে হল্যাণ্ড সিরামিক টালিচিত্রণে ষোড়শ-সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতকে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং হল্যাণ্ডের চিত্রিত সিরামিক টালি

য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতে থাকে। এই সময় থেকেই য়ুরোপের দেশগুলোতে মিউয়্যারল্‌চিত্রণে সিরামিক টালির ব্যবহার সুরু হয়।

খাইজেন্‌তানীয় মোজেইকএর আদিম গুহাচিত্রের রেখাপ্রধান ত্রিমাত্রিক রীতিই অনুসৃত হতো। রেনেশাঁস্‌এর যুগে চিত্রকলার ত্রিমাত্রিক গঠনরীতি ও পরিপ্রেক্ষিত—অর্থাৎ কাছের জিনিষ বড়ো করে এবং দূরের জিনিষকে ছোটো করে দেখাবার চেষ্টা সুরু হলো। রেনেশাঁস যুগের ইজেলচিত্রে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইজেলচিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন পড়লো সিরামিকচিত্রণেও। সিরামিকপাত্র ও টালিতে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তেলচিত্রের বিষয়বস্তু ও অঙ্কনরীতির অনুসরণে চিত্রাঙ্কন করা হতো।

ভারতবর্ষে মধ্যপ্রদেশের সিংহনপুর এবং উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে আদিম গুহাচিত্রের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিউয়্যারল্‌চিত্রণের আদিম ধারাটি ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে এখনও প্রবহমান রয়েছে। আদিবাসীদের মাটির ঘরের দেয়ালে এখনও চিত্রাঙ্কন ও অলংকরণ করা হয়। আমাদের দেশে মিউয়্যারলচিত্রের ধারাটি যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিলো—তার পরিচয় বহন করছে অজন্তাগুহার কালজয়ী চিত্রাবলী। সিরামিক মিউয়্যারল্‌এর কাজ অবশ্য ভারতবর্ষে অতি সাম্প্রতিককালে সুরু হয়েছে। স্থাপত্যের দেয়ালে রঙীন পাথরের টুকরো বসিয়ে অলংকরণের কাজ এদেশে মুঘল আমলে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। তাজমহল ও মুঘল রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি স্মৃতিসৌধে এধরণের কাজের কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদ্‌এ অলংকৃত সিরামিক-টালির কাজ দেখা যায়।

বিভিন্ন দেশে গত কয়েক শতাব্দীতে স্থাপত্যের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিউয়্যারল্‌চিত্রণের কলাকৌশল ও অঙ্কনরীতিরও বিবর্তন ঘটেছে। স্থাপত্যের আকার ও আয়তন—বিশেষ করে স্থাপত্যের যে-দেয়ালে মিউয়্যারল্‌চিত্র আঁকা হবে—সেই দেয়ালের আকার ও আয়তনের সঙ্গে চিত্রের বিষয়বস্তুর সংস্থাপন ও অঙ্কনকৌশলের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। নকশা অনুযায়ী কোনো স্থাপত্যের দেয়াল সমতলিক অথবা অর্ধসোপাকৃতি হতে পারে। তাছাড়া ওই দেয়ালের উল্লম্ব ও আনুভূমিক অবস্থানের আয়তন অনুযায়ী মিউয়্যারল্‌চিত্রণের নকশা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে মিউয়্যারল্‌চিত্রণের ক্ষেত্রে দেয়ালের উল্লম্ব অবস্থান অথবা উচ্চতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রধানতঃ দেয়ালের উচ্চতার সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টি জড়িত। তাছাড়া দর্শকদের দৃষ্টি থেকে মিউয়্যারল্‌চিত্রের দূরত্ব ও অবস্থানের বিষয়ও বিশেষভাবেই জরুরী। ট্রেণ লাইনের দুটো রেল এবং একটি দীর্ঘ রাস্তার দূরে একটি বিন্দুতে মিশে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিয়ে মিউয়্যারল্‌এর বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

স্থাপত্যের একটি দেয়ালকে তলা থেকে ওপরের দিকে মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই ভাগ কয়টির ইংরেজী নাম যথাক্রমে প্লিন্থ্‌ (plinth), ডাডো (dado), ওয়াল ভেল্‌ (wall vail), ফ্রিজ্‌ (frieze) এবং কর্ণিশ্‌ (cornish)।

দেয়ালের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা অনুযায়ী অবশ্য এই ভাগগুলোর আয়তনের তারতম্য হতে পারে।

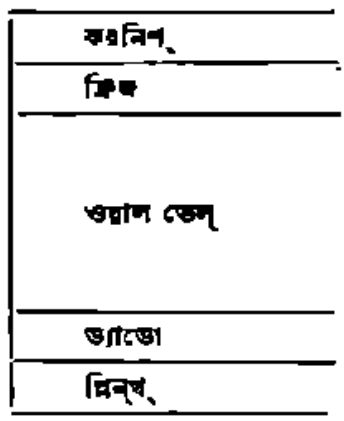

সাধারণতঃ ওয়াল মেল্ অংশেই মিউর‍্যাল্এর মূল বিষয়বস্তু আঁকা হয়ে থাকে। দেয়ালে সিরামিক টালির মিউর‍্যাল্চিত্রণ করতে হলে দেয়ালের পরিমিত মাপ অনুযায়ী সমগ্র নকশাটি প্রথমে কাগজে ছোটো আকারে এঁকে নেওয়া দরকার। তারপর মেঝেতে অথবা টেবিলের ওপর টালিগুলো সাজিয়ে নকশাটি সিরামিক রঙএর টালির ওপর এঁকে যথোপযুক্ত উত্তাপে চুল্লীতে পুড়িয়ে নিতে হবে। শেষ পর্যায়ে দেয়ালের ওপর সিমেন্ট মিশ্রণের সাহায্যে টালিগুলো বসাতে হবে।

সাদা মেজন্ত্ সিরামিক টালি, সিরামিক রঙ এবং চিত্রিত টালি পোড়াবার জন্ত ছোটো আকারের ইলেকট্রিক চুল্লী আজকাল এদেশে পাওয়া যায়। মোজেইক্ নক্শার জন্তে প্রয়োজন হয় ছোটো আকারের (এক বর্গ ইঞ্চি থেকে দুই বর্গ ইঞ্চি মাপের) রঙীন সিরামিক টালির। এই ছোটো আকারের সিরামিক টালিকে ইংরেজীতে বলা হয় টেসেরি (tessrae)। টেসেরি এদেশে সহজলভ্য না হলেও সিরামিকনির্মাতাদের কাছে অর্ডার দিয়ে প্রয়োজনীয় রঙের টেসেরি তৈরী করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কোলকাতায় রবীন্দ্রসদনের বহির্দেয়ালের দুপাশে রঙীন সিরামিক টালিতে করা যে-দুটো মোজেইক্ সিরামিক মিউর‍্যাল্চিত্র রয়েছে—সে দুটো মিউর‍্যাল্চিত্রের সমস্ত টালিই তৈরী করা হয়েছিলো কোলকাতারই একটি সিরামিকনির্মাণ প্রতিষ্ঠানে; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটির তৎকালীন নাম ছিলো বেঙ্গল সিরামিক ইন্স্টিটিউট্।

তিন ভাগ মিহি বালির সঙ্গে এক ভাগ পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট জলের সঙ্গে মিলিয়ে লেইএর মতো করে নিলে ওই মিশ্রণের সাহায্যে ইটের তৈরী দেয়ালে সিরামিক টালি বসানো যেতে পারে। মিশ্রণের সঙ্গে শতকরা দশ ভাগ মাপে চুণ মেশানো চলে। সিমেন্ট মিশ্রণের সঙ্গে শতকরা দুই ভাগ মাপে প্লাষ্টার অব্ প্যারিস্ মেশালে এই মিশ্রণ অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে জমাট বাঁধবে। সিমেন্টের মিশ্রণ দেয়ালের ওপর লাগিয়ে সেই মিশ্রণের ওপর একটি একটি করে চিত্রিত টালি বসানো যেতে পারে। আর একটি পদ্ধতিতে চিত্রিত টালির সবগুলো মেঝেতে অথবা টেবিলে সাজিয়ে ওই টালিগুলোর ওপর দিকে—অর্থাৎ চিত্রিত দিকে শক্ত অথচ পাতলা কাগজ (Brown packing paper) গঁদ কিংবা ময়দার আঠা দিয়ে টালির সবটা ঢেকে এঁটে দিতে হবে। এবারে যে-দেয়ালে চিত্রিত টালিগুলো বসানো হবে—সেই দেয়ালে সমগ্র নকশাটির মাপে সিমেন্ট-মিশ্রণ লাগিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখতে হবে সিমেন্ট-মিশ্রণের জলীয় অংশ কিছুটা টেনে গিয়েছে কিনা। টালিতে আঁটা কাগজটি এবারে দু'দিকে ধরে দেয়ালে সিমেন্ট-মিশ্রণের ওপর বসিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। মিউর‍্যাল্চিত্রের নকশাটি যদি আকারে বেশ বড়ো হয় এবং অনেকগুলো টালির ওপর ওই নকশাটি আঁকা হয়ে থাকে, তবে সবগুলো টালি একসঙ্গে দেয়ালে বসানো

সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে কয়েকটি টালি এক এক বারে কাগজে আঁঠা দিয়ে এঁটে ভাগ ভাগ করে সমগ্র চিত্রিত টালিগুলো দেয়ালে বসাতে হবে। মোজেইক্ পদ্ধতিতে সিরামিক মিউর‍্যাল্-চিত্রের নকশা করবার জন্ত ছোটো আকারের রঙীন সিরামিক টালি অথবা টেসেরি একই পদ্ধতিতে দেয়ালে বসানো যেতে পারে।

গত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ, চীন ও জাপানে বহুসংখ্যক স্থাপত্যে সিরামিক মিউর‍্যাল্‌চিত্রের কাজ হয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লিখিত দেশগুলোর শিল্পীরাও প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন। আমাদের দেশে সিরামিক মাধ্যমে মিউর‍্যাল্‌চিত্রের কাজ সে তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক স্থাপত্যেই গত দুই তিন দশকে করা হয়েছে। ভারতবর্ষে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বহু সংখ্যক বাড়ি তৈরী করা হচ্ছে। এদেশে অনেক দক্ষ চিত্রকর আছেন; সিরামিক মাধ্যমে চিত্ররচনা করতে পারেন—এমন শিল্পীরাও রয়েছেন। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি সিরামিক টালি নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিরামিক রঙ এবং চিত্রিত টালি পোড়াবার ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীও এদেশে তৈরী হচ্ছে। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্যোগী হলে এদেশে চিত্রকলার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হতে পারে বলে মনে হয়।

এদেশের জনসাধারণের শিল্পরুচি তৈরীতে ও সিরামিক মিউর‍্যাল্‌চিত্র এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শহরের বাহ্য আকৃতির বহুতল বিশিষ্ট বাড়িগুলোর বাইরের দিকের অন্ততঃ একটি দেয়ালেও মিউর‍্যাল্‌চিত্রের একটি নিদর্শন থাকে—তবে ওই জ্যামিতিক বাহ্য আকৃতির অমানবিক স্থাপত্যগুলোতে মানবিকতার ছাপ পড়বে। তাছাড়া চলমান জনসাধারণের দৃষ্টিতে সর্বক্ষণের জন্ত ওই মিউর‍্যাল্‌চিত্রগুলো উন্মুক্ত থাকায় ওগুলোকে বলা চলবে স্থায়ী উন্মুক্ত প্রদর্শনী। এদেশে সাধারণের চিত্রকলা সম্বন্ধে অনীহা অথবা ঔদাসীন্ত দূর করতে এবং সুস্থ শিল্পরুচি তৈরী করতে সিরামিক মিউর‍্যাল্‌চিত্র বোধহয় বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে।

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

একে ত ভারতীয়, তার মানেই ফুরেতে সর্বনিম্ন নাগরিক, তার উপর কোম্পানীর চাকুরী বজায় রাখার চিন্তাতেই মাথায় টাক পড়ার সামিল। আর তেমনি পড়েছে গরমটা, একুশ, চব্বিশ, পঁচিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট। ঘাম ফুটছে, হাওয়া ছুটছে, শরীর জ্বলছে। মনটা একটু স্বস্তির আশায় যখন চাতক পাখী হোয়ে উঠেছে তখন দৈবাৎ কোম্পানীর দয়ায় দিন-বিশেকের বিশেষ ছুটী পাওয়া গেল। এবার একটু মুক্তির স্বাদ পেতেই হবে।

এক আরবী বুদ্ধি দিল, 'গ্রীসে চলে যাও, আমার বিশ্বাস তোমার ভালই লাগবে।' গ্রীস্। ও দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ভাষা বলতে জানি 'প্যারাকেলো' অর্থাৎ দয়া করে,

আর নাম বলতে জানি অতীতের আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট। যাই হোক বেড়িয়েই পড়া গেল। ষাড়া সাড়ে তিন ঘন্টার একনাগাড়ে উড়ান দিয়ে "ওলিম্পিক এয়ার ওয়েজ" এথেন্সের মাটী ছুঁল। নামে মাত্র কাষ্টমস্ সেরে বিমান বন্দরের বাইরে আসতেই চক্ষু স্থির। কোথায় সেই স্বপ্নের সুসজ্জিত নগরী, ছায়া-সুশীতল প্রশস্ত রাজপথ। তার বদলে ঝিক্‌ঝিক্ কোরছে মোটরগাড়ী। গিজগিজ কোরছে লোকজন। আর গরমও তেমনি। টুরিষ্ট পুলিশের সহায়তায় হোটেলে পৌছানো গেল। হোটেল ডিরেক্টরির ম্যানেজার মিঃ পিরাম্যালো সময় ও সুযোগ পেয়ে একনাগাড়ে বক্তৃতা দিয়ে চললেন—"ভাগ্যিস হোটেল বুক কোরে এসেছিলেন, নইলে হোটেল পেতেই আপনার অবস্থা কাহিল হোয়ে যেত। এথেন্সে এত ভীড়ের কারণ কি জানেন এথেন্সের সাথে পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের সরাসরি স্থলপথে যোগাযোগ রয়েছে। গাড়ী নিয়ে বাস নিয়ে যে যার টুপটাপ বেরিয়ে পড়ছে। লেবাননের গৃহযুদ্ধের ফলে কায়রোর সাথে সম্পর্ক ছেদ হওয়ার দরুন, বারবার গিয়ে লণ্ডনও পুরনো হোয়ে যাওয়ার ফলে বহু আরবও এখন গ্রীসে বিশেষ কোরে এথেন্সে এসে ভীড় করছে। জার্মান আমষ্টারডামের মত না হোলেও রোম, প্যারিসের মত এখানেও সব খোলামেলা ব্যাপার। পকেটে রেস্ত থাকলে প্রাণে যা খুসী করে যান কেউ টু শব্দটী পর্যন্ত করবে না।

ভদ্রলোককে মাঝপথে বললাম—"দেখুন কয়েকটা দিন একটু নিরিবিলিতে কাটাতে চাই, মানে……

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, পেন্সিলের পিছন দিক দিয়ে টাকটা বার দুয়েক চুলকে গম্ভীর হোয়ে বোললেন হুঁ……আপনার মত একলা যারা, তারা ত দাপাদাপি করতেই আসে এখানে, তবে আপনি যদি তা-না-চান তবে দিন কয়েকের জন্য দ্বীপে চলে যান, ভাল লাগবে।

টিকিট কাটা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপত্র সব হোটেলে বসেই হোয়ে গেল। জাহাজ ছাড়বে বেলা বারোটায়। হোটেল থেকে সকাল দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে পৌছুতে হবে এগারোটার মধ্যে। হাতে অনেক সময় তবুও উত্তেজনায় ঘুম আসে না। ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া আছে। হোটেলের রিসেপসনিষ্টকে বলা আছে সকাল আটটায় তুলে দেওয়ার জন্য। ঘড়ির এলার্মে ঘুম ভেঙেছে ঠিকই কিন্তু চারিদিকে এত অন্ধকার কেন? এলার্ম ঘড়ি, হাত ঘড়ি মিলিয়ে দেখি সকাল আটটা। রিসেপসনিষ্টএর টেলিফোনও বেজে উঠল—"কালিমেরা সুপ্রভাত, উঠে পড়ুন আটটা বাজে"।

মুখ হাত পা ধুয়ে বাথ্ প্যাটরা নিয়ে রেস্তোরার উদ্দেশ্যে নীচে নেমে আসি। অন্ধকার ফ্যাকাশে হোয়ে এসেছে কিন্তু আলো তখনও ফোটেনি। রিসেপসনিষ্ট টেবিলে মাথা দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। রেস্তোরার বেয়ারা আড়মোড়া ভাঙ্গার ব্যস্ত।

অলিগলির দোকানপাট সব বন্ধ। দোকানের বারান্দায় আলোগুলো জ্বলছে, প্রধান রাস্তার আলো সবে নেভানো শুরু হোয়েছে। পাহাড়ের ওপর আক্রোপলিসের ভগ্নস্তূপের পিছন থেকে সূর্য্যের আভা ছড়িয়ে পড়েছে নগরীর বুকে। কর্মচঞ্চল নগরীর চেখে এখনও ঘুমের

রেশ। হুহু করে বাতাস কাটিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে বন্দরের উদ্দেশ্যে। অতি সকালে রাজপথে হোড়বীরদের অনুশীলনের মত কতকগুলো সরকারী বাস ট্রাম ছুটে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই বন্দর। বন্দরের চেহারা দেখে চক্ষু স্থির। বিরাট চওড়া কনক্রীটের চত্বর চলে গেছে মাইলব্যাপী। নাকে দড়িবাঁধা অতিকায় জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা সার বেঁধে। এর মধ্যে আমাদের জাহাজ M.T.S. ওসেনস্ কোন্‌টা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। জিজ্ঞেস করি এক বন্দর-কর্মীকে, সুবিধের বিষয় এখানে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা। ব্যবসার সাথে যাদের সম্পর্ক তারা সবাই ইংরেজী বোঝে এবং বলতে পারে। বন্দরের কর্মীটি রসিক মানুষ—বলে ট্যাক্সিওয়ালা আপনাকে বন্দরের এপ্রান্তে নামিয়ে দিয়েছে। এপ্রান্তে মাল বোঝাই জাহাজের ভীড়, আপনাকে যেতে হবে একেবারে শেষে অপর প্রান্তে। সকালের ব্যায়ামটা আপনার ভালই হোল। সকালের মধুর আমেজ কাটতে না কাটতে একি অশান্তিরে বাবা। এখন এই বাইশ কেজি ওজনের সুটকেশ আর কেজি পাঁচেকের ঝোলা ব্যাগ বয়ে নিয়ে যেতে হবে প্রায় আধ মাইল পথ। সুটকেশটা ঘসটানোও যাবে না। ওটা শাঙরাবাবুর, যার করে আনা। হাওড়া স্টেশনের কুলিদের কথা মনে পড়ে। প্রথমে ট্রাঙ্ক, তার উপর সুটকেশ তার উপর বেডিং বাঁ হাতের কনুইয়ে কাঁধ-ব্যাগ, হাতের মুঠোয় ছাতা, ডানহাতে একটা জিনের সুটকেশ তুলে নিয়ে দিব্বি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ফুলবাবু হয়ে নজর রাখতে রাখতে কুলির পিছন পিছন যাওয়া "ব্যাটা যেন পালিয়ে না যায়"।

এখানে ওটি চলবে না, নিজের মাল নিজে বও। উটকো কাজের লোকের যেমনি অভাব তেমনি দাম। কুলির পিছনে যা খরচ হবে তাতে একটা নতুন কামিজ হোয়ে যাবে।

কাটমসের বাবুরা এখনও আসেন নি। হাতে সময় আছে এই অবসরে বন্দরটার একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যতদূর চোখ যায় ততদূর কেবল জাহাজ আর জাহাজ। জাহাজের আধিক্যে সমুদ্র ঢাকা পড়ে গেছে। সুপার ট্যাঙ্কার থেকে শুরু করে মাঝারি জাহাজ। কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কারো মেরামতি চলছে, কেউ বা বন্দরে ঢুকছে, ভেঁপু বাজাতে বাজাতে কেউ চলে যাচ্ছে বন্দর ছেড়ে। বড় বড় জাহাজের ফিসমত্ খাটতে ছোট ছোট নৌকগুলো কুচো মাছের মত অনবরত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। বস্তুতঃ জাহাজই এদেশের প্রধান ব্যবসা। গ্রীসের সর্বসাকুল্যে প্রায় একহাজার পাঁচশ'টা দ্বীপের মধ্যে চল্লিশটা দ্বীপে মানুষের বসবাস আছে। সেইসব দ্বীপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে জাহাজগুলো। এখানে জাহাজ চলে দূরপাল্লার বাসের মত, ঘন্টায় ঘন্টায় বিভিন্ন লাইনে। বন্দরে এসে টিকিট কাটো উঠে পড়ো, প্রয়োজনে ছাগল ভেড়া ত দূরের কথা সাথে গাড়ী এমন কি লরী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

(ক্রমশঃ)

●

॥ ঠাকুর পূজা ॥

(গান)

সুর-রামপ্রসাদী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ পরিপা

ফুলের সাজি নিয়ে এলাম
পূজার বেদী সাজিয়ে দিতে,
ঠাকুর তোমার চরণ দুটি
নয়ন জলে ধুইয়ে দিতে।

দুঃখ আমার, আমার জ্বালা
তাইতে গেঁথে গানের মালা,
বুকের বোঝা তোমার পায়
উজাড় করে ঢেলে দিতে॥

ঠাকুর তুমি দেখিয়ে দিলে
কোথায় তোমার আসন পাতা,
যেখানে যার অশ্রু ঝরে
যেখানে যার বাজে ব্যথা।

চোখের জলটি মুছিয়ে দিলে
প্রেমের ফুলটি আপনি দিলে,
সেই ফুলেতে গেঁথে মালা
সেই মালাটি তোমায় দিতে॥

●

॥ সংঘবার্তা ॥

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে ত্বরান্বিত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

Statement about ownership and other particulars about

'VISVAVANI'

1. Place of publication	...	Shri Ramakrishna Vedanta Math 19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2. Periodicity of Publication	...	Monthly
3&4. Printer's & Publisher's name	...	Swami Paramatmananda
Nationality	...	Indian
Address	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
5. Editors name	...	Swami Sadatmananda & Swami Prajnanananda
Nationality	...	Indian
Address	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of total capital :—

The monthly magazine is the property of the Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta-6, a philanthropic and charitable institution, which is managed by a Board of Trustees consisting of the following members :—

1.	Swami Sadatmananda	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2.	" Prajnanananda	...	do
3.	" Sadrupananda	...	do
4.	" Adyananda	...	do
5.	" Swarupananda	...	do
6.	" Parameshananda	...	do
7.	" Tapasananda	...	do
8.	" Buddhatmananda	...	do
9.	" Paramatmananda	...	do
10.	" Pranabeshananda	...	do
11.	Sri Birendra Nath Roy	...	do

I. Swami Paramatmananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Swami Paramatmananda

Dated 15th March 1981 *Publisher*

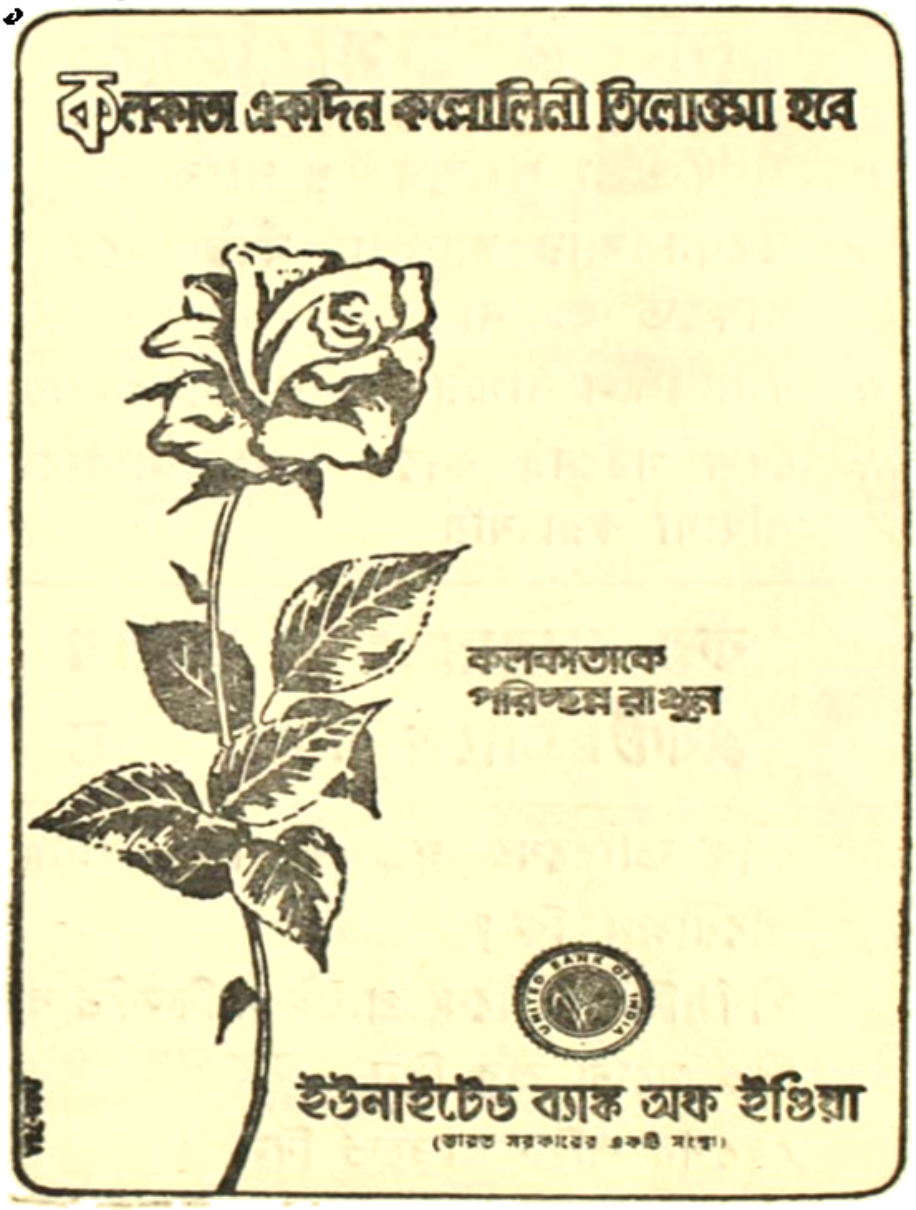
কলকাতা একদিন কলোলিনী তিলোত্তমা হবে
কলকাতাকে
পরিচ্ছন্ন রাখুন
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

প্রদেয় কর
চটপট জমা দিলে

★ অর্থদণ্ড বা শাস্তির ভয় থাকে না
★ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকতে হয় না
★ দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দেওয়া হয়
★ দেশ গঠনের কাজে সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করা যায়

কর দেবার শেষ তারিখ একটা আছে সত্যি, কিন্তু

শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি ?
দীর্ঘসূত্রিতা থেকে প্রায়ই গাফিলতি ঘটে।
ঠিক মতো কর দিন
দেশের শক্তি বাড়তে দিন

ডিরেকটর অফ ইন্সপেকশন
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশন)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

davp 80/404

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

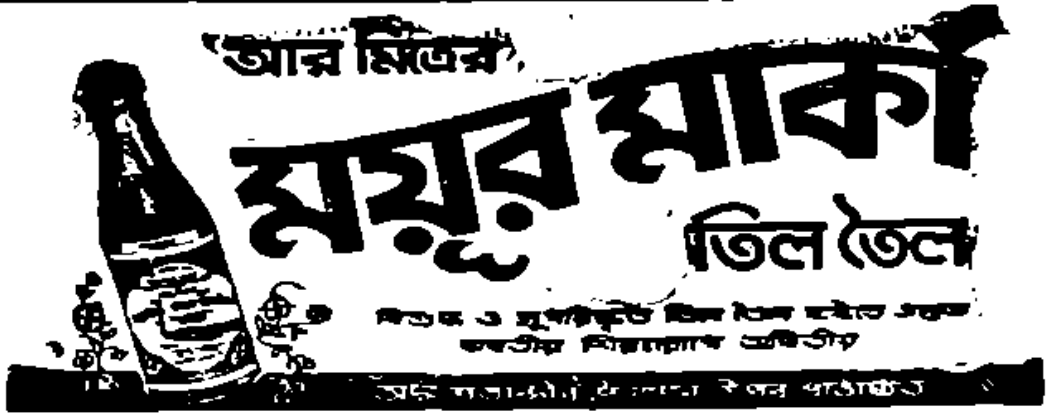

ফোন নং ৪৬-৮৪২৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JECT" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.B. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে,

কেশুত

কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা

With Best Compliments From :

J. K. Steel (A Division of J.K. Synthetics Ltd.)

7, COUNCIL HOUSE STREET,
CALCUTTA 700 001.

TELEGRAM : 'BALINGHOOP'
TELEPHONE : 23-6181 (7 Lines)

- JUTE BALING HOOPS
- BOX STRAPPINGS
- COLD ROLLED STRIPS
- CABLE TAPES
- STEEL WIRE ROPES
- HIGH CARBON WIRES & STRANDS
- MILD STEEL WIRES
- WIRE ROPE SLINGS

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	১৬·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ		হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

আয়ুর্বেদীয় শোষ্টের শীতাম্ব

ডাঃ সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

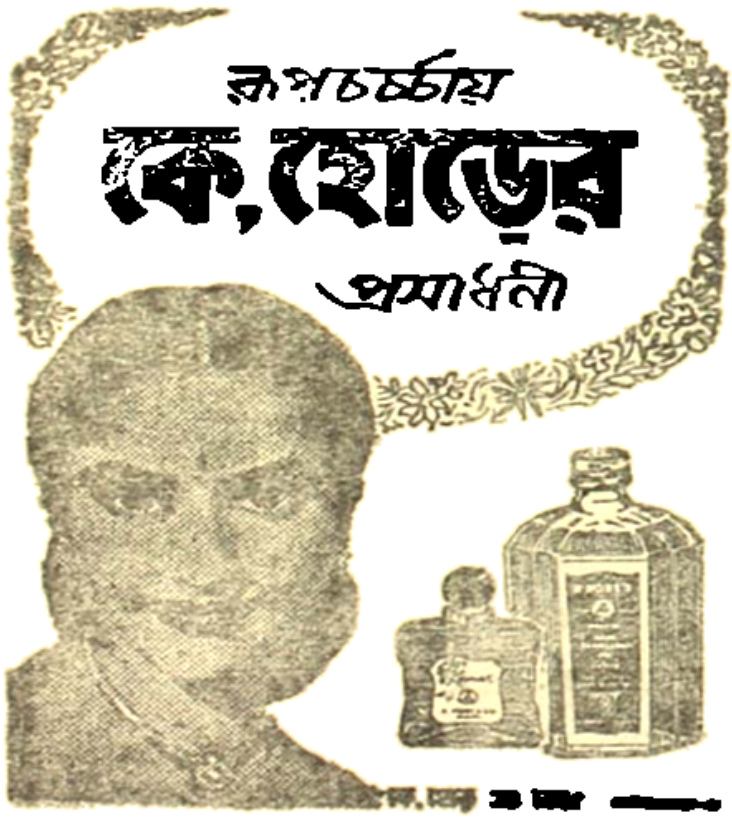

Phone : 36-1207

THE ARTISAN

107/A, B. B. GANGULI STREET,
CALCUTTA-700017

★

DESIGNERS
BLOCK-MAKERS
&
COLOUR PRINTERS

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের
পরিবার মঙ্গল পরিকল্পনাসমূহ

কোন পরিশ্রম বা চিন্তাভাবনা ছাড়াই প্রতিমাসে বাড়তি রোজগার

মান্থলী ইন্টারেস্ট ডিপোজিট স্কীম

১২ মাস বা তার বেশী সময়ের জন্য ১০০০/-বা তার বেশী টাকা জমা দিয়ে প্রতিমাসে নগদ সুদ পেতে থাকুন—প্রতিমাসের বাড়তি খরচা সামাল দেবার জন্য এক বাড়তি রোজগার। ১২ থেকে ১২০ মাসের জন্য সুদের হার বার্ষিক ৭½% থেকে ১০%।

বাড়ি থেকে না বেরিয়ে ঘরে বসেই সঞ্চয় করুন

সেণ্ট্রালের মিনি ডিপোজিট স্কীম

আপনি এমনকি মাত্র ১/-টাকা দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে ৩৬ মাস বা ৬০ মাসের জন্য ৫০ পয়সা বা তার গুণিতক যেকোনো সংখ্যা জমা করতে পারেন। আমাদের অনুমোদিত সংগ্রহকারী প্রতিনিধি আপনার সুবিধেমত আপনারই দরজা থেকে আপনার জমা সংগ্রহ করবেন। সুদের হার বার্ষিক ৬% ও ৭%।

আপনার ছোট্ট প্রিয়জনদের এক সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিন

মানি মাল্টিপ্লায়ার ডিপোজিট স্কীম

১০০/-বা তার গুণিতক টাকা ১২ থেকে ১২০ মাসের জন্য জমা করুন। আপনার জমা টাকা ৮৭ মাসে ২ গুণেরও বেশী এবং ১২০ মাসে ২½ গুণেরও বেশী হয়ে যাবে। যার দ্বারা আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের নানান প্রয়োজন মেটাতে পারেন। এর সঙ্গে প্রতি ৩ মাস অন্তর বার্ষিক ৭½% থেকে ১০% হারে সুদ যোগ হতে থাকবে।

বিন্দু বিন্দু জমেই সিন্ধু

রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

চাকুরীজীবীদের জন্য এ এক আদর্শ স্কীম। ১২ থেকে ১২০ মাসের যেকোনো সময়ের জন্য এমনকি মাত্র ৫/-বা তার গুণিতক টাকা প্রতিমাসে জমা করতে থাকুন। দেখুন, আপনার টাকা সুদসমেত ফুলে ফেঁপে, কত মোটা রকম টাকায় পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে বার্ষিক ৭½% থেকে ১০% সুদ প্রতি ৩মাস অন্তর যোগ হতে থাকবে।

আর এই শেষ নয়, আরও কত কি

আপনার 'বাড়তি' খরচা সামাল দেবার জন্যে আপনি সেণ্ট্রালের কোয়ার্টালি ইন্টারেস্ট ডিপোজিট স্কীমের সুযোগ পাচ্ছেন।

আর এছাড়া সুবিধেমত যখন পারবেন তখন সঞ্চয় এবং প্রয়োজনে টাকা বার করার জন্য হোম সেক্সিস সেফ অ্যাকাউন্টের সুবিধাও পাচ্ছেন।

আসুন, আপনার নিকটতম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাখায় অবিলম্বে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন।

আপনার নানান পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করুন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

যে ব্যাঙ্ক নানা দেশে

নানা লোকের সেবায় আগ্রহী

ফোন : ২২-৬৩৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

With Best Compliments of :

BRITISH ELECTRICAL AND PUMPS PRIVATE LTD.

4, B. B. D. BAG EAST,

CALCUTTA-700001

Grams :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	021-2426	22-7126, 27, 28 & 23-8714

WE ARE BUSY BUILDING A BRIDGE BETWEEN
RAJASTHAN AND WEST BENGAL
WHY NOT HELP US STRENGTHEN THE FOUNDATIONS ?
WE HAVE MORE THAN 490 BRANCHES
IN INDIA SPREAD OVER 14 STATES
AND UNION TERRITORIES

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

(The largest Bank of Rajasthan)
AT YOUR SERVICE

WITH THE FOLLOWING FIVE BRANCHES IN CALCUTTA :-

★ **14, Netaji Subhas Road.**

★ **204, Rash Behari Avenue, Ballygunge.**

★ **4, Synagogue Street, Brabourne Road.**

★ **66 & 66/1, Sri Arabindo Road, Salkia, Howrah.**

★ **Plot No. 227A/227B, Acharya Prafulla Chandra Road, Shyambazar.**

Also opening shortly at :-
94, Vivekananda Road, Cornwallis Street.

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
ANNUAL SPECIAL NUMBER
43rd Year, March 1981 VOL. I

Regn. No. WB/NC-14
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৫০১২৫, ৩২৬৬৩, ৩৩১৩২
Cable:'Cookmepure','Queenspice'
Telex:0212591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 8885 Calcutta-70
iaa 1293

30 MAR 1981

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-700006
CE Rs. 2.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ২.৫০টাকা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

বিশ্ববাণী

সম্পাদক : স্বামী অভেদানন্দ
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রকাশানন্দ
সহসম্পাদক : শ্রীআশুতোষ লোক
প্রতিষ্ঠিত

চতুশ্চত্বারিংশ বর্ষ · তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৮৮

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি জানুয়ারি মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে প্রত্রিন 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারা পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani. Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

শিশুর হাসি প্রস্ফুটিত হোক রাশি রাশি

স্বাস্থ্যবান শিশুই জাতির গর্ব। আজকের শিশুই আগামী দিনে জাতি গঠনের দায়িত্ব নেবে। তাই তাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে মূল প্রয়োজনের প্রথমেই আসে খাদ্য। দেশের প্রতিটি শিশুকে সুস্থ সবল করে তুলে তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড
বিপণন বিভাগ

ফোন : ৫৫-৬১৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল এহরত বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন।

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত-১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

'পিয়ারলেস ভবন'

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

মোট সম্পদ—১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট পীড়াহর

ভাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯) ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
"NECY" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

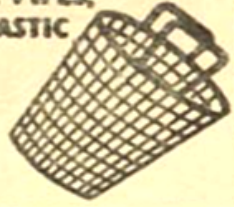

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিত্যস প্যারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-২

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

বৈশাখ, ১৩৮৮

সম্পাদক : স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।
স্বামী বৃদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।
শ্রীরাধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধ দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্. বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৪-১৬১৩

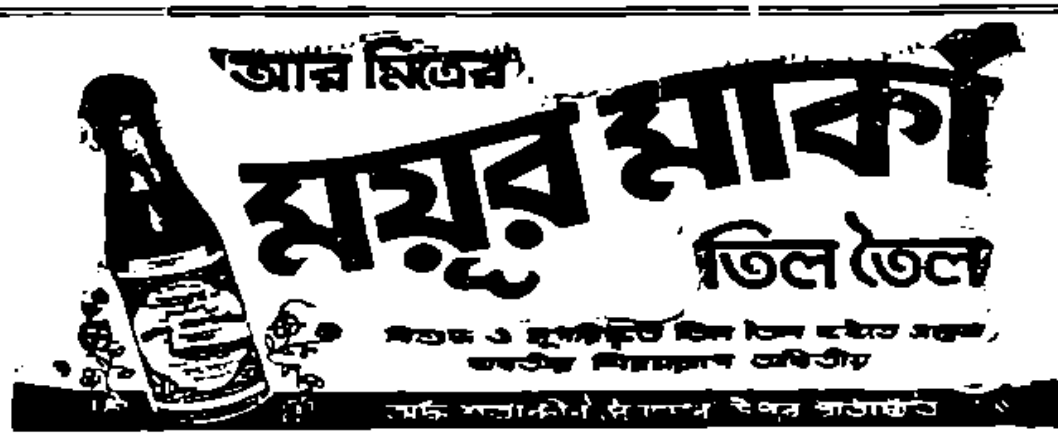

ফোন নং ৪৬-৮৯২৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • লালবাগ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

বৈশাখ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	১০৭	
২।	বেদান্ত ও সনাতন ধর্ম	১১৩	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৩।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	১১৭	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৪।	ভারত-শিল্প	১২০	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ অভেদানন্দ	১২৩	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৬।	জাপানের কাবুকি নাটক	১২৪	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৭।	নববর্ষ	১২৭	শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস
৮।	শৈব মতবাদ ও শৈব সাহিত্য	১২৮	শ্রীরণজিৎকুমার সেন
৯।	গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	১৩৫	শ্রীতপন কবিরাজ
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	১৩৭	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১১।	সংঘবার্তা	১৪০	

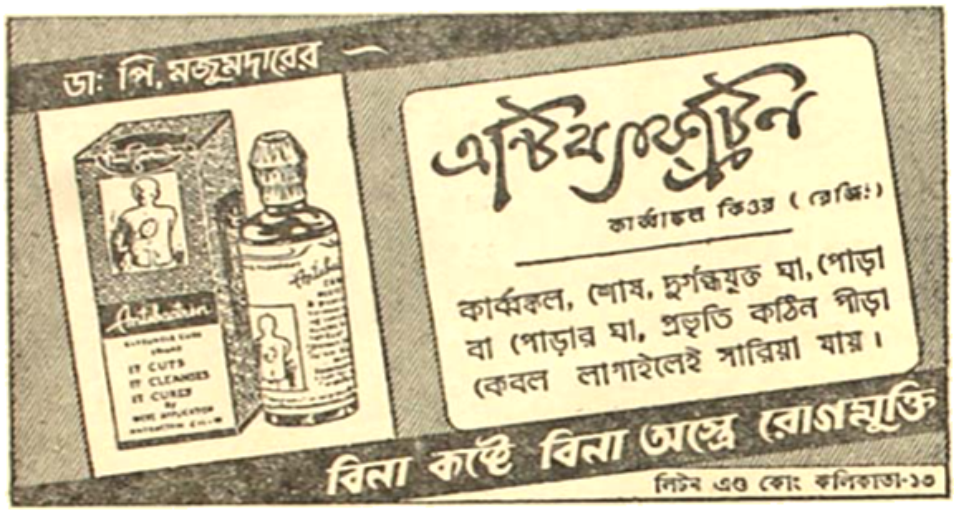

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

BUST PARK, MALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

49, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

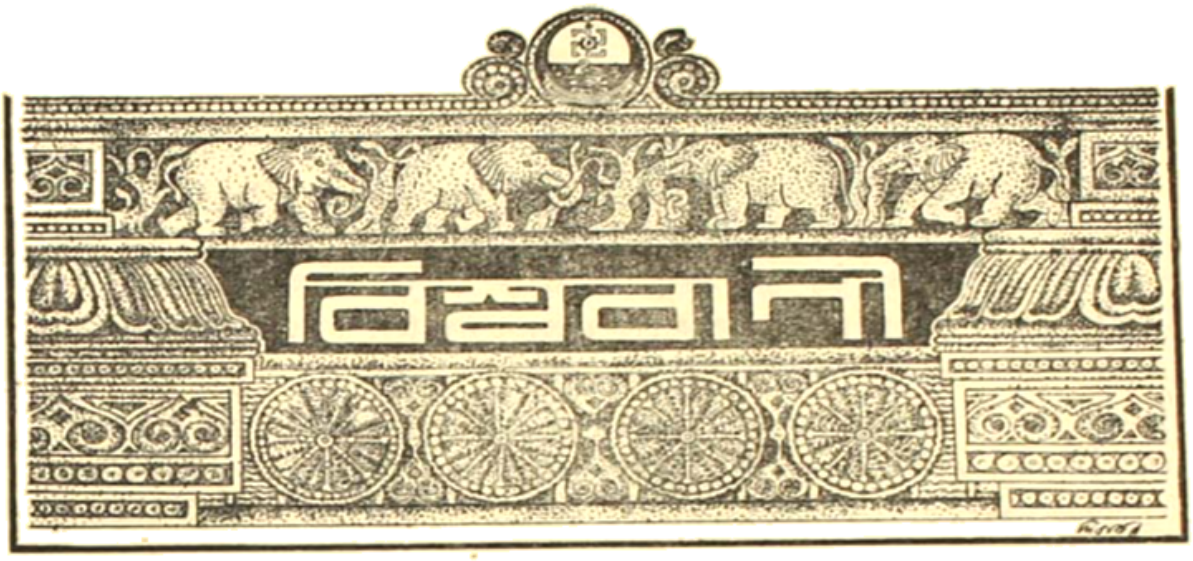

তেতাল্লিশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | বৈশাখ ১৩৮৮

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(দ্বাদশাংশ)

॥ তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত ॥

শক্তি ও শক্তিমান অভেদ এই বিষয়বস্তুর বিচার ও বিশ্লেষণ এতদিন নানা শাস্ত্রবাক্য ও মতবাদের সাহায্যে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করা হ'ল একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জীবনে সকল ধর্মের ও মতের সাধনা ক'রে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটি তত্ত্বে ও সিদ্ধান্তে উপনীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিচারের বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবাদী – না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, দ্বৈতবাদী, শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী—না ভেদাভেদবাদী ছিলেন, কিংবা তিনি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম এই চারটি মতের ও পথের মধ্যে কোন্‌টির যথার্থভাবে পথচারী ছিলেন এই সকল-সম্বন্ধে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত স্থির করা। অবশ্য বাদানুবাদ সংশয় ও নিশ্চয়তাকে নিয়ে সকল মতে, সকল পথে ও সকল বিষয়ে চিরদিনই মতদ্বৈধ থাকে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু তাহলেও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কর্তব্য। তাছাড়া শক্তি ও শক্তিমান পরস্পরে ভিন্ন—কি অভিন্ন এ'ধরনের বিচার ও জিজ্ঞাসা নূতন নয়, অতীতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও আবার হবে, কিন্তু তাহলেও কোন-একটি নিঃসন্দিগ্ধ ও অবিরোধী মীমাংসা সকল সময়েই হয় এবং তাথেকে মীমাংসার ও সিদ্ধান্তের আলোকও খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা কালযাহী জিজ্ঞাসা, মীমাংসা ও সিদ্ধান্তের প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ ক'রেই এতক্ষণ বিচিত্র মতের ও পথের শাস্ত্রপ্রমাণ ও বিচারপদ্ধতির অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হয়েছি

বিভিন্ন জীবনসিদ্ধ ও লক্ষ্যপূর্ণ মানুষের ও আচার্যদের চিন্তাধারাকে অনুসরণ ক'রে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, দর্শন ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতির প্রমাণ এবং নিদর্শনও উপস্থাপন করেছি, কেননা বর্তমান বিষয়বস্তু বা বিষয়সমস্যাটি বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র রচনা ক'রে। সেজন্য বলে রাখা ভাল যে, যখনই এ'প্রবন্ধের আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনানুভূতির কথা, প্রসঙ্গ, নিদর্শন প্রভৃতির আশ্রয় আমরা নিয়েছি তখনই বিশেষভাবে সাহায্য নিয়েছি বিশেষভাবে ভক্তপ্রবর ও জ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থখানির। তাছাড়া সাহায্য নিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অনুভূতিসম্পন্ন লীলাপার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ও সমজাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের। তবে একথাও সত্য যে, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থই শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ঘটনাবলী, সাধনপরিক্রমা, বাণী ও উপদেশ প্রভৃতি-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার একমাত্র গ্রন্থ নয়, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনের ও সাধনার বহু কথা তাঁর অন্যান্য অনুরাগী ভক্তদের ও বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের কাছে বলেছেন। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে, দক্ষিণেশ্বরের আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্ত-মানুষদের তিনি সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তাঁদের স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন, সুতরাং তাঁদের কাছেও যে তাঁর জীবনস্মৃতির উপাদান কিছু ছিল না—তা নয়। তাছাড়া বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য কথা যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গপার্ষদদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ও আলোচনা ক'রে বহু প্রামাণিক তথ্য ও তত্ত্বের উপকরণসমৃদ্ধি রেখে গেছেন—যাদের মূল্য শ্রীরামকৃষ্ণজীবন, শ্রীরামকৃষ্ণধর্ম ও দর্শন এবং সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনানুভূতির বহু কথা-কাহিনীরূপ উপাদানসামগ্রীও সর্বদাই গ্রহণীয় ও সর্বমান্য।

তথাপি বর্তমান 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-আলোচ্য বিষয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থটির সহায়তাই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছি, কেননা জানি যে, সিন্ধুর বিন্দুই সিন্ধুর স্বরূপের পরিচয় দেওয়ার পথে একেবারে সামান্য নয়। তাছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গেই 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-বিষয়বস্তুটির অবতারণা।

বর্তমান বিষয়টির আলোচনাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন দর্শনাচার্যদের মতবাদ উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের শক্তির কথা বলেছি এবং সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে তাঁর শক্তির স্বরূপসত্তা যে অপৃথক বা অভিন্ন সে'সকল কথারও প্রমাণ উপস্থাপন করেছি যুক্তি ও বিচারের সাহায্য নিয়ে। সেজন্য এবার শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থে উল্লিখিত ও আলোচিত কথার উদ্ধৃতি ও প্রমাণ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করবো ব্রহ্ম তথা সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বৈভবীশক্তি অভিন্ন কি-না ?

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ব্রহ্ম' বলতে সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্ম দু'রকম পরমসত্তার কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, একটি উত্তীর্ণসত্তা—মায়ার অতীত (নির্গুণ) ও অপরটি

মায়াসহকৃত, কিন্তু মায়ার অধীশ্বর (সগুণ)। তবে সগুণ-ব্রহ্মের আলোচনাক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবারই বহুপ্রসঙ্গে বলেছেন: "··· কিন্তু একই বস্তু। নাম-রূপ ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। তিনিই ভগবান"। এই উদাহরণের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এজন্য যে, অনেকেরই ধারণা যে, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম প্রভৃতি সাধনপদ্ধতি নামে, সাধনে ও ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং তাদের চরমলক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এবং ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন ও লক্ষ্যকামী সাধকও ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং ভিন্নতার আবরণ এবং পথরূপ উপায় সকল সাধনাকে ও লক্ষ্যকে ভিন্ন বা পৃথক করাই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'সকল ভিন্নতার ধারণা ও দৃষ্টি সত্য নয়—একথাই বলেছেন নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়ে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ব্রাহ্মণের, জলের, অগ্নি প্রভৃতির। বলেছেন: (১) একই ব্রাহ্মণ—যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রান্না করে, তখন রাঁধুনি'। কথা এই যে, ব্যক্তিরূপে ব্রাহ্মণ এক ও অভিন্ন, কিন্তু কর্মের অনুযায়ী ব্রাহ্মণের নাম ভিন্ন ভিন্ন। সুপরিচিত এই উদাহরণ ও কথা, কিন্তু তত্ত্বমাধুর্যের তুলনা নাই এর মধ্যে। অজ্ঞানে দুই-দুই বা ভেদবুদ্ধি, আর জ্ঞানে এক ও অভেদ। পূর্বেও প্রসঙ্গক্রমে এই উদাহরণ আমরা দিয়েছি এবং দেওয়াও স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন পরিশেষে সিদ্ধান্তের কথা: "যে জ্ঞানী, জ্ঞানকেই ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ' নয়, ও' নয়; জীব নয়, জগৎ নয়—এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ)। মন নিয়েই কথা সকল ধর্মে ও সাধনায়। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে (মনোলয়প্রকরণে) আছে—

মনো হি জগতাং কর্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্।

মন বা মনের বিলাসই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, তাই মন শান্ত ও সমাধিসম্পন্ন হ'লে মনের লয় বা নাশ হয়। কিন্তু মন কি? যোগবাশিষ্ঠকার বলেছেন: 'যদবস্তুনি বস্তুত্বং তন্মনো বিদ্ধি রাঘব',—অবস্তুতে যা বস্তু বলে ভ্রম করায়, মিথ্যাকে যা সত্য ব'লে মনে করায়, তার নাম মন। তাই যতক্ষণ মন মন-রূপে বলতে সংকল্প ও বিকল্পরূপ দুটি বৃত্তি (চাঞ্চল্য) নিয়ে থাকে, ততক্ষণ মন, আর বৃত্তি বা চাঞ্চল্য দূর হয়ে শান্ত (সমাধি) হলেই মন আর মন নয়, মন তখন চৈতন্য।[১] তাই বিচার ক'রে মনের চঞ্চলতাকে দূর অর্থে শান্ত করতে হয় এবং স্থির বা শান্ত করার নামই সাধনা, অভ্যাস বা চেষ্টা। আর তখনই জ্ঞানীর ঠিক ধারণা হয় যে, ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ (সংসার) মিথ্যা বা অনিত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞানীর (তখন)

১। বাসনা বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী॥

বাসনা মনেরই পরিণতি বা কার্য। মনকে মলিন ও শুদ্ধ দু'রকম বলতে পারি। মলিন-মনে বিচিত্র সংকল্প-বিকল্পরূপ বাসনা থাকে, আর শুদ্ধ-মন চৈতন্য।

ঠিক ধারণা হয় যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নাম-রূপ এ'সব স্বপ্নবৎ"। সমাধিতে (যোগে) বা নিদিধ্যাসনে (বেদান্তে) মানুষের স্বরূপের অর্থাৎ নিজের যথার্থ রূপের উপলব্ধি হয়। তাই স্বরূপোপলব্ধির নাম জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানে প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় যে, নানা বা বৈচিত্র্য এক ও অদ্বিতীয় বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাস। প্রতিভাস মিথ্যা ও যাঁর প্রতিভাস—তিনি সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যতক্ষণ না জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততক্ষণ-পর্যন্ত ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভেদ এই জ্ঞান (যথার্থজ্ঞান) হয় না, ততক্ষণ-পর্যন্ত জীব-জগৎ ও মায়ার যথার্থ-স্বরূপ এক ও অভিন্ন—এই প্রকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'কথাই আবার ভিন্নভাবে বলেছেন : "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এ'সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এ'সব স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ—অবস্তু"। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন : "কিন্তু হাজার বিচার করো—সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ'সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে"।

কথা এই যে, যেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রূপ কার্য, সেখানেই শক্তি। শক্তি বলতে মায়ার বা অবিদ্যার এলাকা। বেদান্তদর্শনে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২)-সূত্রে এই শক্তির কথা বলা হয়েছে। শক্তির স্থিতি ও এলাকা সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর-পর্যন্ত। শক্তি বা মায়া স্বীকার না করলে বিশ্বসৃষ্টির কোন প্রশ্নই ওঠে না, আর প্রশ্ন আসে না জন্ম ও মৃত্যুর—বন্ধন এবং মুক্তিরও। তাই সৃষ্টিপক্ষে যাঁ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তও শক্তি, মায়া, লীলা, বৈচিত্র্য প্রভৃতি স্বীকার করে, আর সৃষ্টি যেখানে নাই, জীব-জগৎ-চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব যেখানে নাই, সেখানে শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, লীলা ও নিত্য, সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার এ'সব কোন-কিছুরই প্রশ্ন নাই। কিন্তু মুক্তি ও শান্তিকামী মানুষও সৃষ্টির প্রজা, সুতরাং মানুষমাত্রেই মায়ার অধীন, সেজন্য শক্তি তাকে স্বীকার করতেই হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্তির অধীশ্বর হলেও প্রথমে শক্তিমান যে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর তাঁর ও পরে শক্তিরহিত ও সকল গুণবর্জিত নির্গুণ-ব্রহ্মেরও ধারণা করতে হয়। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের চরমসিদ্ধান্তের তত্ত্ব ও সত্য এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু আমরা তাঁকে নানা বা ভিন্ন ভিন্ন বলি মায়ার স্পর্শ দিয়ে লীলাবিলাসের জগতে, মায়ার অতীত নিত্যের রাজ্যে নানা, বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য নাই, সেখানে এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব ও সত্যেরই কেবল বিকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অভেদ ও অনন্তদৃষ্টি নিয়েই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বারবার বলেছেন : "তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।···যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মানলেই তার দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, আবার সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪১)। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'এক, রূপ-অপরূপ, নাম-বরণ' বাণীযুক্ত গানের শেষে লিখেছেন : 'যেই সূর্য, সেই কিরণ'—অদ্বৈত, আবার 'যারই সূর্য তারই কিরণ'—বিশিষ্টাদ্বৈত। কেননা সূর্যের সঙ্গে রশ্মির গুণেরই সম্বন্ধ, কিন্তু 'যেই সূর্য, সেই কিরণ' বলতে সূর্যের কিরণের বা

আলোকের সঙ্গে সূর্যের কোন ভেদ নাই—অভেদসম্বন্ধ। কিরণ বা রশ্মিমালা আছে বলেই সূর্যের সত্তা ও সার্থকতা। কিরণ বা রশ্মির সত্তা ও সূর্যের সত্তা সেখানে এক ও অভিন্ন। প্রথমে সূর্য কিরণ-বিশিষ্ট, কিন্তু পরে সূর্যও যা, কিরণও তাই। শক্তি বা মায়াকে নিয়ে তেমনি ব্রহ্মের সগুণ-ঈশ্বরত্বের সত্তা—যা শক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, কিন্তু শক্তিকে বাদ দিলে ব্রহ্ম স্বরূপে যা—তাই, অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণের অতীত সর্বোপরমসত্তা।

এ'সকল কথা বা বিচার কিন্তু সৃষ্টিরূপ দ্বৈতক্ষেত্র থেকে এবং সৃষ্টিপক্ষে, আর যেখানে সৃষ্টি নাই, সেখানে বিকাশ বা কার্য নাই—লীলাও নাই, সেখানে গুণ ও বিকাশ-বিবর্জিত নিত্য-সত্তা। একমাত্র স্বাধীন ও নিরপেক্ষ (উদাসীন) সত্তাই নিত্য বা নির্গুণ-ব্রহ্ম। অথবা বলা যায়, যথার্থব্রহ্মসত্তা উপলব্ধির বিষয়, সেখানে-অস্তি স্বাধীন-স্বতন্ত্র-নিরপেক্ষ-সত্তামাত্র। সেখানে সগুণ-নির্গুণ এই গুণবিচারেরও কোন সার্থকতা নাই। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের প্রকাশ থাকলে তবেই সগুণের কল্পনা ও বিচার, তারপর সগুণকে লক্ষ্য ক'রে বা সগুণের সূত্র ধ'রে নির্গুণের কল্পনা ও বিচার। সেজন্য আচার্য শঙ্কর সর্বোপরম, সর্বাতীত, অথচ সর্বানুস্যূত ব্রহ্মের সত্যকারের রূপকে অর্থাৎ সত্তাকে নির্ণয় করতে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন—'দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিতম্', অর্থাৎ দ্বৈত নয়, অদ্বৈতও নয়, সগুণ নয়, নির্গুণও নয়, ব্রহ্ম একমাত্র দু'য়ের বা দ্বৈতসত্তার অতীত অদ্বিতীয় ও এক সত্তা। সেজন্য ব্রহ্মবস্তুর বা ব্রহ্মচৈতন্যের যথার্থস্বরূপকে বাক্য, মন, বুদ্ধি কোনটা দিয়েই বর্ণনা করা যায় না। বৈখরী-শব্দ স্থূল ও সেটাই বাক্যের আকারে প্রকাশ পায়, সুতরাং স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের অতীত বস্তুকে বাক্য দিয়ে বোঝানো যায় না, মন দিয়ে কল্পনা করা যায় না ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না, সেজন্য ব্রহ্মসত্তা একমাত্র 'অস্তি'—এই উপলব্ধির বস্তু—'অস্তিত্বোর উপলব্ধব্যম্'। এই উপলব্ধিরূপ বোধি দিয়ে বোধিকে (ব্রহ্মজ্ঞানকে) উপলব্ধি করা যায়। এখানে দুই নাই, পার্থক্য নাই, একমাত্র সর্ববিরহী অদ্বৈত বা এক সত্তা। তবে অদ্বৈত বা এক বললে দ্বৈত বা দু'য়েরও অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এ'সব কথা হ'ল মায়াময় জগত-সম্পর্কের কথা, কিন্তু যেখানে মায়ারূপ দ্বৈতজ্ঞান নাই, সেখানে দ্বৈতের বালাই নাই, আস্বাদক-আস্বাদ্য-আস্বাদন-রূপ সম্পর্কের বালাই নাই। একে আমরা বলি রহস্যের ক্ষেত্র। কিন্তু ব্রহ্মরূপ সর্বগত বা সর্বানুস্যূত-সত্তা আসলে না-জানা-রূপ রহস্যময় ক্ষেত্র নয়, তা জানার ও জ্ঞানেরই ক্ষেত্র, আর এই জানার ও জ্ঞানের অবস্থাকেই বলে শুধু উপলব্ধি নয়—প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির ক্ষেত্র। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার জন্য অদ্বৈতবেদান্ত বলেছে 'নেতি নেতি'-বিচার। প্রথমে 'নেতি নেতি',—ইহা নয়, ইহা নয়, কিন্তু পরিশেষে 'ইতি' বা 'অস্তি'—উপলব্ধির বস্তু ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বা অদ্বয় বলা হয় দ্বিতত্ত্ব, দ্বিতেদ বা দ্বৈত-সত্তাকে দূর করার জন্য। বন্ধন থেকে যেমন মুক্তির কথা ও কল্পনা, তেমনি আবরণের অতীত-সত্তাকে বোঝানোর জন্য বলা হয় নিরাবরণ, নচেৎ যথার্থ-ব্রহ্মানুভূতির অবস্থায় বন্ধন, মুক্তি, আবরণ, নিরাবরণ এ'সব অভিধান ও উপাধির কোনই যোগ্যতা বা সার্থকতা নাই, বরং এ'গুলি অপ্রাসঙ্গিক।

কৌষিতকী-উপনিষদে (৩।১৫) বলা হয়েছে 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্' ব্রহ্মসত্তাকে বোঝানোর জন্য। সর্বত্রই ও সকল সময়ে উপনিষদে ব্যবহার করা হয়েছে

'অ' বা 'ন'-শব্দ অস্তিবাচক ব্রহ্মসত্তাকে সম্যক্‌ভাবে নির্দেশের জন্ত। আবার বলা হয়েছে 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্', অর্থাৎ বাক্য নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়—কোনটাই ব্রহ্মকে জানার উপায় নয়, অথচ ব্রহ্মবস্তু স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানের গোচর এজন্ত যে, 'তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—সেই চৈতন্ত আছে বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল-কিছু প্রকাশ পায়। আবার সেই ব্রহ্মচৈতন্ত এক এবং অদ্বিতীয় হলেও রূপে রূপে নাম ও আকার নিয়ে বহুভাবে প্রকাশিত—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। এটি বৃহদারণ্যক-উপনিষদের কথা। উপনিষৎ এমন বস্তুর ও সত্তার আভাস দেয় না—যাকে কোনদিন ধরাছোঁয়া যায় না, বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন যে, প্রতিবিম্ব অনেক বা বহু হতে পারে, কিন্তু সেই অনেক বা বহু প্রতিবিম্ব একটিমাত্র বিম্বেরই প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছবি। মূল একটাই, কিন্তু বহু আর্শীতে তার প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন ও অনেক হতে পারে। একই পুকুরের জল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা হয় ব'লে জলকে ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়—গ্লাসের জল, বাটির জল, বাল্‌তির জল প্রভৃতি, কিন্তু আসলে একই পুকুরের জল। তেমনি ব্রহ্মসত্তা একটিমাত্র, অথচ ব্যাপক, সর্বগত ও সর্বাত্মস্যূত; কেবল দেহ ও আধারভেদে ঐ একই চৈতন্ত নানান আত্মা, নানান জীব, নানান ব্যক্তি বলে মনে হয়—যে মনে হওয়াটা ঠিক নয়, কিন্তু ভুল। সাধারণত আমরা যাকে ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মচৈতন্ত বলি, তা একটি সত্তামাত্র—যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধী নাই, কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অবিরোধী ও নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষ স্বাধীন ও ব্যাপক-সত্তাই ব্রহ্ম, আর এই ব্যাপক ও অসীম ভূমাসত্তাই দুর্গা, কালী, শিব, শক্তি, মনসা, চণ্ডী নানান নাম ও আকার নিয়ে বিশ্বমানুষের কাছে প্রকাশিত। রূপ ও অরূপ, সাকার ও নিরাকার, ঔপাধিক ও নিরুপাধিক ঐ একেরই নাম ও রূপ, কিন্তু বিচারে ও যথার্থ-উপলব্ধিতে সকল-কিছু ভেদই দূর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'সকল কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন: 'যতদিন না জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হয়, ততদিনই ভেদবুদ্ধি। জ্ঞান হ'লে এক ও অভেদ'।[১]

●

১। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এক ও অভেদরূপ অদ্বৈতমত একরকম নয়। 'ভারতীয় সাধনার ধারা'-গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৬-১৩৮) মহামহোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন যে, অদ্বৈতবাদ এক রকমের নয়: মাধ্যমিকদের 'শূন্যাদ্বৈতবাদ', যোগাচারীদের 'বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদ' বৈয়াকরণদের ও মণ্ডনমিশ্রের 'শব্দাদ্বৈতবাদ'। তাছাড়া আছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শাক্ত্যাদ্বৈতবাদ, রসাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি। আচার্য শঙ্করের পূর্বেও অদ্বৈতবাদ ছিল। শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদ। আবার গৌড়পাদ ও শঙ্করের মধ্যে যে সকল অদ্বৈতবাদী আচার্যেরা ছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া, শঙ্করাচার্য, সত্যনিধি, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। সুতরাং গৌড়পাদ থেকে সপ্তমপুরুষ হলেন আচার্য শঙ্কর। 'শ্রীবিদ্যার্ণব'-গ্রন্থে এ'সকল বিষয়ের আলোচনা আছে।

॥ বেদান্ত ও সনাতনধর্ম ॥

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, যে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম) বিশ্বচরাচরে প্রকাশিত, তিনিই মা। অর্থাৎ বেদান্তের ব্রহ্ম এবং শক্তি বা তন্ত্রসাধনার শক্তি বা জননী এক ও অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপলব্ধি বেদান্তধর্মে একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঈশ্বরের মাতৃত্ব বা আদ্যাশক্তির আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর গুরুর উপলব্ধিগম্য এই সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বেদান্তধর্মে শক্তিসাধনা ও তন্ত্রসাধনাও সমন্বিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে আর একজন শক্তিসাধক এই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি রামপ্রসাদ, যিনি গানে বলেছেন—'প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি, আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ধর্ম অধর্ম সব ছেড়েছি।' রামপ্রসাদ আরও বলেছেন—'তারা আমার নিরাকারা'। বেদান্তের ব্রহ্ম যেমন সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ সব হ'তে পারেন, শক্তি বা কালীও তা-ই হ'তে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্টই বলেছেন—'কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী।'[১]

এখানে প্রশ্ন উঠবে—রামপ্রসাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধিতে ও ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ বলে জানলেন, কিন্তু, এবিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন? মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট তন্ত্রশাস্ত্রকে শ্রুতি বা বেদ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব বিবিধা কীর্তিতা শ্রুতিঃ'। অর্থাৎ শ্রুতি দুই প্রকার—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। এই মত অনুসরণ করে বলা যায় শ্রুতির দুই ধারা—বেদান্ত ও তন্ত্র। বেদান্ত-কথার সার গীতায়, তন্ত্রশাস্ত্রের সার চণ্ডীতে। গীতা ও চণ্ডী হিন্দুর নিত্যপাঠ্য। গীতার উপাস্য ব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডীর উপজীব্য দেবী-মাহাত্ম্য। ব্রহ্ম ও দেবী একই তত্ত্ব। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে জানা যায়, শক্তিবাদ বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত আখ্যান থেকে ব্রহ্ম ও তৎশক্তির অভিন্নতা জানা যায়। দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবতাদের জয় হ'ল। স্ব-শক্তিতে জয়লাভ হয়েছে মনে করে দেবগণ গর্ব করতে লাগলেন। তাঁদের মিথ্যাভিমান দূর করার জন্য স্ব-শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেব-গণের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। দেবগণ আবির্ভূত শক্তির তাৎপর্য না বুঝতে পেরে অগ্নিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। আবির্ভূত ব্রহ্ম অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন—'তোমার নাম ও শক্তি কি?' অগ্নি বললেন—'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সবই আমি দগ্ধ করতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন—'দগ্ধ কর।' অগ্নি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তৃণখণ্ড দগ্ধ করতে পারলেন না। এবার বায়ু গেলেন ব্রহ্মের কাছে। ব্রহ্ম তাঁকে তাঁর নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করলেন। বায়ু বললেন—'আমার নাম বায়ু, আমি পৃথিবীর সবকিছু উড়িয়ে দিতে সক্ষম'। ব্রহ্ম একখণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে স্থাপন করে

১। কথামৃত ৭।৩।৪

তাঁকে তা উড়িয়ে দিতে বললেন। বায়ু সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তৃণখণ্ড উড়াতে পারলেন না। তারপর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের কাছে এলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হয়ে তাঁকে জানালেন যে, ব্রহ্মশক্তির দ্বারা দেবতারা শক্তিশালী এবং এই শক্তির সাহায্যেই তাঁরা অসুরের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণ উপনিষদে আছে—

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥২॥

—আমি সেই বৈরোচিনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয়তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণি। হে সংসার-ত্রাণকারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত বানিকা উপনিষদে নিম্নলিখিত দুর্গা-গায়ত্রী পাওয়া যায়—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্যানুসারে দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন। এই সমস্ত উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, উপনিষদেও শক্তি বা দুর্গার স্থান আছে।

তাছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডী ত বেদমূলা। এঁর প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদ-স্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদ-স্বরূপা ও উত্তর চরিত্র সামবেদ-স্বরূপা। চরিত্রত্রয়ে ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও অনুষ্টুপ। ঋগ্বেদের মতে উক্ত ছন্দ-ত্রয় দ্বারা ব্রহ্মতেজলাভ, আত্মতুষ্টি ও পরমানন্দ লাভ হয়। চণ্ডী-জপের প্রারম্ভেই গায়ত্রী ছন্দরূপে আবির্ভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ বেদবিহিত। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদধারিণী বৃদ্ধা। কুমারীর ন্যায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী, যুবতীর ন্যায় মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার ন্যায় মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়েই প্রণবরূপা। শাস্ত্রে আছে—'ঋগ্ভিঃ স্তবন্তি, যজুর্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি।' অর্থাৎ, ঋগ্বেদের দ্বারা পরমাত্মার স্তব, যজুর্বেদের দ্বারা তাঁর পূজা এবং সামবেদের সাহায্যে তাঁর ভজনা করা হয়। চণ্ডী পরমাত্মময়ী। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। সুতরাং ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, একথা শাস্ত্রসম্মত ও প্রামাণ্য।

তন্ত্র শুধু হিন্দুদেরই নেই, বৌদ্ধদেরও আছে।[৪] তবে হিন্দুতন্ত্রে যেমন শক্তির প্রাধান্য, শিব-শক্তিতত্ত্ব স্বীকৃত, বৌদ্ধতন্ত্রে তা নয়। সেখানে প্রাধান্য প্রজ্ঞার ও করুণার।[৩] হিন্দুদের

২। মহামায়াতন্ত্রই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় 'মহামায়া' নামক ইংরেজী গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ 'Mother'-গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

৩। লামা গোবিন্দ 'Foundations of Tibetan Mysticism'-গ্রন্থে বলেছেন, 'The Concept of Sakti, of divine power, of the creative female aspect of the highest God (Siva) or his emanations, does not play any role in Buddhism (Bddhist Tantricism). While in the Hindu Tantras, the concept of Power (Sakti) forms the focus of interest, the

নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডী একসময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের প্রিয় হয়েছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একটি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গেছে। অনেকে হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন এবং অনেকের মতে বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি।[৪] তবে তন্ত্র জন্ম উদ্ভবক, গ্রন্থের স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দজী ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বৌদ্ধতন্ত্র থেকে হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টি, একথা স্বীকার করেন না। ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী: 'Doctrine of Sakti in Indian Literature'-গ্রন্থে বৈদিক স্তোত্রেই শক্তিবাদ প্রচারিত বলে উল্লেখ করেছেন। আমরাও পূর্বগামী আলোচনায় একথার সত্যতার সাক্ষীই পেয়েছি। 'বিবেকানন্দের সাধনায় যন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত'-গ্রন্থে এই মতই সমর্থন করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ(গ্রন্থ-ভূমিকার ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জৈনধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করেছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত সুবৃহৎ জৈনমন্দির বিরাজিত, তার চূড়াতে ষোলটি জৈনদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। কাথিয়াবাড়ের গিরনার পর্বতে পাষাণ নির্মিত সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়। জৈনদের কাছে সরস্বতী বিদ্যাদেবী। 'রত্নসাগর' নামক জৈনগ্রন্থে সরস্বতীর ধ্যানে তাঁকে বিশ্বরূপিণী বলা হয়েছে। আর একটি জৈনগ্রন্থে সরস্বতীর নিম্নোক্ত ধ্যান পাওয়া যায়—

কুন্দেন্দু-গোক্ষীর-তুষারবর্ণা
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্ণহস্তা
মুদায় সা নঃ প্রশস্তা॥

শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের 'দশম বাদশাহ্ কি গ্রন্থে'র ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ অংশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা আছে। এর ৪র্থ অংশ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত।

কোন কোন উপনিষদে ব্রহ্মকে যেমন সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতির কারণ বলা হয়, চণ্ডীতে মহামায়াকেও তাই বলা হয়েছে। 'বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে। তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥' (চণ্ডী ১।৭৬)। ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী চণ্ডী-চিন্তা গ্রন্থের 'মহামায়া কে ?' প্রবন্ধে (৪১ পৃষ্ঠায়) বলেছেন—'উপনিষদ প্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্বও তিনি, কার্য-

---

central idea of Tantric Buddhism is prajna : knowledge, wisdom'. (৯৯ পৃষ্ঠা)। হিন্দুতন্ত্রের দৃষ্টিতে শক্তি নিত্য মহামায়া, শিবের নিত্য সঙ্গিনী। বৌদ্ধমতে প্রজ্ঞা চরম জ্ঞান এবং এর অপর নাম শূন্যতা। বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনায় প্রজ্ঞা বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই লক্ষ্য। হিন্দুতন্ত্র-সাধনায় শিব-শক্তির সমরস-জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ। তবে ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'Tantric Buddhism'-গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় অন্য মত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, হিন্দুতন্ত্রের শিব ও শক্তির মতো বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায়। তবে আমাদের প্রশ্ন : শক্তির সঙ্গে শিবের যে সম্বন্ধ, উপায়ের সঙ্গে প্রজ্ঞার সে সম্বন্ধ সম্ভব কি ?

৪। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : 'Introduction to Buddhist Esotericism', ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী—'Studies in the Tantras', ডক্টর এম. আর. সমরে : 'Lingadharana Chandrika' (লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা), অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী : Tantras—Studies on their Religion and Literature, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : Indian Historical Quarterly Vol. I, Sept. 1925 : Northern Buddhism প্রবন্ধ।

ব্রহ্মরূপে জগন্ময়ও তিনি, আবার তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ভূত মহাবিদ্যাও তিনি। এইরূপ সর্বরূপা, গুণময়ী হইয়াও গুণাতীতা নারায়ণী শক্তিস্বরূপিণী মহামায়া-দেবীর কৃপালাভার্থ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করি।

'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥' (চণ্ডী ১১।১১)

আমাদের মনে হয়, চণ্ডীতে মহামায়ার রুদ্রমূর্তিই যেন বেশী প্রকট, অসুর-সংহারই যেন তাঁর মুখ্য কাজ। তাঁর যে স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, মাতৃরূপ তা যেন প্রচ্ছন্ন। তবে চণ্ডী যে মাতা একথা চণ্ডীতেই বলা আছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' অতি স্নেহময়ী ও অতি ভয়ঙ্করী (অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ) চণ্ডীতেই আছে। বঙ্গের শক্তি সাধনায়, বিশেষ করে রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে মায়ের বরাভয় মূর্তিই যেন বেশী প্রকট। এক হাতে তাঁর খড়্গ জ্বললেও অন্য হাতে তাঁর শঙ্খাহরণ। শক্তি এখানে যেন স্নেহময়ী, করুণাময়ী, প্রেমময়ী জননী রূপেই প্রকটিতা। শক্তিসাধক গেয়েছেন—

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তাঁর মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা॥

তিনি আরও গেয়েছেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা যেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবতারিণী মা-কে নিয়েই মত্ত, যে মা সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে ভবযাতনা দূর করেন তিনি বসে-বসে সন্তানভাবে মা-সুধা-রসের রসিক। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই ধারাকেই অনুসরণ করে আদ্যাশক্তিকে জগজ্জননী (Divine Mother) বলে উল্লেখ করেছেন। 'For Terror is thy name, Death is in thy breath'-এর লেখক বিশ্ববিজয়ী বীর বিবেকানন্দও এই করুণাময়ী জননীর শরণ নিয়ে বলেছেন[৩]—

I go adrift and know not whither. Save me form this fire!
Rescue me, merciful Mother, from floating with desire!
Turn not me thy aidful face, 't is more than I can bear,
Be merciful and kind to me, to chide my faults forbear.
Take me, O'Mother, to those shores where strifes forever cease;
Beyond all sorrows, beyond tears, beyond e'en earthly bliss;
Whose glory neither sun, nor moon, nor stars that twinkle bright,
Nor flash of lightning can express. They but reflect its light.

৩। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী হাইকে রচিত।

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(১১)

ভারত সংস্কৃতিতে ধর্মের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, "আর দেখবে যে এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা কেটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হওতো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার"। এবং এ ধর্ম মানে আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব বিশেষ কোনো গিচুয়ালের অক্ষম অন্ধ অনুবর্তন বা অনুস্থতি নয়,—একথা আগেই বলা হয়েছে। ধর্মের মূল কথা মানবধর্মের উদ্বোধন। হৃদয়ের মধ্যে মানুষের জন্য শুধু নয়, সর্বভূতের জন্য পরিব্যাপ্ত প্রেম ও ভালোবাসার কর্ষণা। এই কারণেই স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম জাতীয়তাবোধ একই সঙ্গে জীবন ও মহাজীবনের অভিমুখী। আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতা ও বিশ্বসৌভ্রাত্রের সঙ্গে তার কোনো সংঘাত নেই। এই প্রেমের প্রসন্নতা বুকে করেই অতীতে সম্পন্ন হয়েছিল ভারতের বিশ্ব-দিগ্বিজয়। বরং বলা চলে বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তা, সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি, সকলের জন্য সম-অধিকারের প্রতিশ্রুতি, সমস্ত রকম বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির বিলোপ, স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা—এ সবই স্বামীজীর সাধনার অঙ্গ। তাই এর একটির অর্জনের সঙ্গে অন্যটি অর্জনের কোনো বিরোধ নেই কোথাও। আছে সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড সংহতি এবং অন্বয় ঐক্যের আনন্দময় পরিসমাপ্তি। ভারত সংস্কৃতির এই মৌল স্বরূপে আস্থা রেখেই স্বামীজী বললেন, "ভারত আবার উঠিবে। কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া"।···"ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে···"। এবং একবারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার সারাৎসার ঘোষণা করলেন, "Each soul is potentially divine the goal is to manifest this Divinity within, by controlling nature, external and internal." তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "স্বামীজীর মতবাদের মধ্যমণি মানুষ। তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর সকল মতই পর্যবসিত হয়েছে মানবধর্মে। এই মানবধর্মের মধ্য দিয়েই তিনি মানুষের উত্তরণ চেয়েছেন। রাষ্ট্রনীতি তাঁর চোখে মানবসমাজের একটি অঙ্গ মাত্র। প্রধান অঙ্গ অবশ্যই নয়। মানুষের জীবনের আংশিক চাহিদা মেটানো ছাড়া রাষ্ট্র যে বেশী কিছু করতে পারে না, এ বিষয়ে কি তিনি নিঃসন্দেহ। তাই রাষ্ট্রের সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তাঁর সকল চিন্তার পিছনে ব্যক্তিত্বের বিকাশই মুখ্য"। তাই স্বামীজী যথার্থ মানুষ গড়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে—Education is the manifestation of the perfection already in man." এবং তাঁর মতে "Religion is the manifestation of the devinity already in man." শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সংস্কার, ধর্মান্দোলন, রাজনৈতিক মুক্তি ও অর্থনৈতিক

সচ্ছলতার পরিকল্পনা—সবকিছুরই একটিমাত্র উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। এবং একই সঙ্গে ঐ পূর্ণতা ও দেবত্ব-জাগ্রত মানব-সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠবে যে সমাজ, তাই হবে আদর্শ-সমাজ। এবং আদর্শ সমাজই প্রয়োজন হলে গড়ে তুলবে নিজেদের মতো করে দেশের ঐশ্বর্য ও ইতিহাস পরম্পরা-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংহতি রেখে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এবং ঐরকম আদর্শ রাষ্ট্রপুঞ্জই গড়বে সাম্যে ও শান্তিতে স্থিত এক বিশ্ব-রাষ্ট্র ও মানব সমাজ ও সভ্যতা। তাঁর ধর্ম, তাঁর পরিকল্পনা সকল মানুষের জন্য বলেই—স্বামীজী এমন করে বলতে পারেন, "One watchward, then, will be acceptance and not exclusion. What I want to propagate is a religion that will be equally acceptable to all minds; it must be equally philosophic, equally emotional, equally mystic and equally conductive to action." বস্তুতঃ ভারতধর্মেরও ঐ একই অনুশাসন। সেখানে রয়েছে সকলের জন্য সার্বজনীন সুধার সন্ধান। "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরেই" ভারতাত্মার পূজাবেদীর মঙ্গলকলস পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ মানুষই সেখানে প্রথম এবং শেষ কথা। নর-কে হতে হবে নরোত্তম এবং নরোত্তমকে নারায়ণ। তাই কবি সমালোচক মোহিতলাল বললেন, "বুদ্ধ যাহাকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে নির্বাণমুক্তির অভয় দান করিতে বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট তাহাকেই সঞ্জীবিত করিয়া ক্ষমা ও তিতিক্ষার অনুশীলনে পাপমুক্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। চৈতন্য অহৈতুকী শ্রদ্ধা-প্রীতির সাধনা করিতে বলিয়াছিলেন—কামকেই ইন্দ্রিয়লোক হইতে অতীন্দ্রিয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। কেহই মানুষকে বড় করেন নাই, মানুষের মনুষ্যত্বের দাবিকে সাক্ষাৎভাবে তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছিলেন।···কিন্তু এবার প্রেমের নতুন ধর্ম হইল—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জীবের মধ্যেই শিবের সাক্ষাৎকার।···আমার মনে হয়, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দ)-প্রচারিত নব ধর্মের সার সত্য।"

অবশ্য এই শুদ্ধ মনুষ্যত্বের কথা—ও নিদিধ্যাসনা শাশ্বত ভারতধর্মেরও চিরন্তন ঐতিহ্য-লালিত জীবনধর্ম। তাই স্বামীজী স্পষ্ট করেই বললেন, "দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আচরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেইসব কিছুরই পুণ্যভূমি।"—আরো বললেন "বিদেশী বা স্বদেশী, যে-কেহ এই পবিত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে—যদি তাঁহার মন পশুস্তরে অবঃপতিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে-সন্তানেরা পশুসত্তাকে দিব্যসত্তায় উন্নীত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেদের পরিবৃত অনুভব করিবেন। সমগ্র বায়ুমণ্ডল আধ্যাত্মিকতায় স্পন্দিত হইতেছে।"

পরাধীনতার বন্ধন : যদিচ মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই ভারতধর্মের ও দর্শনের একক অন্বিষ্ট, তা সত্ত্বেও একথাও নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায় যে ঐ সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিতত্ত্বের

কর্মে রূপায়ণের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রাথমিক কৃত্যগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। ক্ষুধার বন্ধন, অশিক্ষার বন্ধন, কুসংস্কারের বন্ধন, সামাজিক বন্ধন, রাষ্ট্রিক বন্ধন, শিল্পের বন্ধন, সাহিত্যের বন্ধন, অস্পৃশ্যতার বন্ধন, জাতিভেদের বন্ধন এবং শেষপর্যন্ত নিরানন্দের বন্ধন-জাতিকে এই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করার কর্ম-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আমাদের এই প্রাচীন অন্ধকারে অবচ্ছিন্ন জাতির অচলায়তনে প্রথম নবজাগরণের লক্ষণ সূচিত হয়। নিত্যমুক্ত শুদ্ধ সত্ত্ব ব্যক্তি জীবনের বন্ধনমুক্তির প্রশ্নেই একে একে নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বন্ধনের প্রশ্ন এসে পড়ে। ব্যক্তি তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আলাদা সত্তা নয়। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রই ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সেইহেতু ব্যক্তির আত্মমুক্তির প্রশ্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। এবং যেহেতু "খালি পেটে ধর্ম হয় না,"—এবং যেহেতু 'নিত্য' ও 'লীলা' এই দুই নিয়েই সামগ্রিক পূর্ণতা, সেইহেতু জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতার নির্দেশেই জাতির সমস্তরকম বন্ধনমুক্তির দায়দায়িত্ব স্বামীজীকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কারণ যত বড় তোমার হৃদয়—তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়," কারণ "অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাঁহারে দেন—তাঁর বক্ষে বেদনা অপার।" বাসনার বন্ধন—মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তির আগে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে ক্ষুধার বন্ধন থেকে, পরাধীনতার বন্ধন থেকে। কারণ 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। ক্ষুধার সঙ্গে পরাধীনতার রয়েছে নিবিড় যোগ। তাই প্রথমেই স্বামীজী জাতির হৃদয়ে উদ্বোধন করতে চাইলেন স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার চেতনার। বললেন "স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার-পোষাক-বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন—তবে এই স্বাধীনতা যেন অপর কাহারও অনিষ্ট না করে"। তিনি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তাঁর তো কেউ শত্রু নেই। সকল মানুষের কল্যাণই তাঁর কামা। ভারতাত্মারও তাই ঘোষণা। কিন্তু দেহে মনে আত্মায় সকল মানুষেরই হয়ে উঠবার, প্রস্ফুটিত হবার অধিকার আছে। এই অধিকার যে খর্ব করে সে দেবতার শত্রু, ঈশ্বরের শত্রু, মানুষের শত্রু, সমাজের শত্রু। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার মানুষের জন্মগত। ভারতদর্শনে তাই ধর্মযুদ্ধ, সত্য-রক্ষার সংগ্রাম চিরকাল সমর্থিত। রামায়ণমহাভারত সেই মহত্তম সত্যেরই প্রদীপ্ত টেস্টামেন্ট। যেহেতু ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতি হিসাবে হয়ে ওঠার পথের অন্তরায়, সেইহেতু তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনিবার্য সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সবচেয়ে আগে রাজনৈতিক মুক্তির সনদ আমাদের হাতে চাই। কিন্তু তাই বলে ইংরেজ জাতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই—তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। "It is just a painful necessity" "একটি মহান বেদনাদায়ক প্রয়োজন।" পরাধীন ভারতে তাই তিনি আমাদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রথম সেনাপতিরূপে চিহ্নিত। দেশের যুবকদের কাছে তিনি ছিলেন মূর্তিমান প্রেরণাস্বরূপ। বলতেন "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের সরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন : তোমার স্বজাতি—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত।" কারণ

বৃহৎ জীবন বা মহাজীবনের মুক্তদ্বারে পৌঁছাতে হলে আগে চাই প্রাত্যহিক জীবনের বন্ধনমুক্তি। জীবনের স্থির ভিত্তির উপরই যে মহাজীবনের সৌধ নির্মাণ সম্ভব। আরো বললেন, "একমাত্র জাগ্রত দেবতা হইলেন আমার নিজের জাতি; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, তাঁহার পদ, তাঁহার কর্ণ প্রসারিত রহিয়াছে; তিনি সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন, অন্যান্য সকল দেবতারা ঘুমাইতেছেন। যে বিরাট যেমন আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতাদের পিছনে ছুটিব?···আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন—সেই বিরাটের পূজাই আমাদের পূজা হইবে।" শুধু তাই নয়, পরন্তু এই দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ দুঃখী দরিদ্র নিরন্ন জনসাধারণই যে দেশজননীর যথার্থ দেহ, তাদের সেবাই যে দেশসেবা স্বামীজীর কণ্ঠে তাও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে, হৃদয়ের অপার অনুভবে এবং তপশ্চর্যার উদাত্ত শক্তিতে সে-সব উক্তির প্রতিটি অক্ষর পরিশুদ্ধ বহ্নিশিখার মত দীপ্তিমান।

●

॥ ভারত-শিল্প ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

(তিন)

আপনারা সকলেই জানেন প্রত্যেক সাধনার একটি সাধন-শাস্ত্রের দিক আছে। আমাদের দেশের শিল্প ইতিহাসের একটি বিশেষ অঙ্গ হ'ল এই শাস্ত্র। শিল্প সৃজনের নানান বাজনার মাঝ দিয়েই সে তার আপন রূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা যেমন বলে থাকি যথার্থ বস্তুর লক্ষণে প্রমাণ হয় সে যথার্থ কিনা। এই লক্ষণের একটি রূপরেখা বেঁধে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে তাও বহু সাধনার আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেমন অনেক সহজেই বলে থাকি—"যোগী চিনো আঁখসে"—কিংবা

"মনের মানুষ থাকলে মনে
সাধন ভজন লাগবে না।
বুঝবি জগৎ চিনবি আপন
আপন কিছুই থাকবে না।"

এই ভাবেই শিল্পশাস্ত্রে বলা হ'ল—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্,
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।[১]

১। আচার্য অবনীন্দ্রনাথের "ভারত-শিল্পে ষড়ঙ্গ"।

যথার্থ শিল্প সৃষ্টিকে এই ছয় আঙ্গিকে হাঁদে বেঁধে দিয়ে বলা হ'ল—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাবলাবণ্য, সাদৃশ্য আর বর্ণিকা ভঙ্গের চমৎকারিত্বের যৌথ ও যথার্থ পরিবেশনাতেই সত্যিকারের ছবির, মূর্তির প্রাণ। কিন্তু আরও বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে—যে পরম শাস্ত্রকার শিল্প সৃষ্টির পথটি বাতলে দিলেন তিনিই বলছেন ব্যতিক্রমের কথা—বিচিত্রতার কথা—আমরা ইংরিজীতে একসেপশন বলে একটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি শিল্পের একসেপশনের কথায় বলি—সৌন্দর্যের দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সেদিন শাস্ত্রোক্ত মান-পরিমাণ দিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। সেদিন হয়তো সৌন্দর্যলক্ষ্মী কোন এক অজ্ঞাত শিল্পির রচিত শাস্ত্রছাড়া-সৃষ্টিছাড়া মূর্তিতে ধরা দিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিয়াছিলেন, আমার দিকে চাহিয়া দেখো, আচার্য দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন ও বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন—

সেয়া সেবক ভাবেষু প্রতিমা লক্ষণং স্মৃতম্।

তুমি বিচিত্র লক্ষণা, তোমার শাস্ত্র দিয়া ধরা যায় না, তোমায় মূল্য দিয়া কেনা যায় না, তুমি বিচিত্র লক্ষণা।

এই বিচিত্র গতিই শিল্পী ও শিল্পের প্রাণ—এই হ'ল ভক্ত হৃদয়ের সত্য উদ্ঘাটন। যেখানে নিয়ম দিয়ে বাঁধা গেলো না—আর এই নিয়মের বাইরের মনটি কাজ করেছে বলেই আমরা পেয়েছি নটরাজ, বুদ্ধ এবং অজন্তার মত এমন সব কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি। তাই ভারতবর্ষে চিত্র মূর্তি কেবলই শাস্ত্রের অনুশাসনে বাঁধা থাকেনি। বাঁধন ছেঁড়াই তার উদ্দেশ্য ছিল বলেই ছবি মূর্তি কেবলই Illustration হয়ে ওঠেনি। আর শিল্পীর এই সৃষ্টির আনন্দে শাস্ত্রকে ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়াতেই ভারত-শিল্পের চমৎকারিত্ব। ঈশ্বর যোগের প্রথম পর্বে—আচার আচরণের একটি নিয়মের দিক থাকলেও সিদ্ধিতে সে সবই তুচ্ছ—যে যাকে ফুল নিবেদন করতে গেলেও শাস্ত্রীয় আচরণের বিধিতে শুদ্ধ হবার পদ্ধতি অনুসৃত সেখানেই প্রেমে পাগল সাধক অনায়াসেই নিজের মুখের অন্ন দেবীর মুখে তুলে দিতে দ্বিধা করছেন না।

আগে ভারত-শিল্পের স্বচ্ছ গুণের কথা বলেছি, বলেছি ভারত-শিল্পে উদারতা গ্রহণের দিকের কথা। তেমনই আর একটি অসাধারণ গুণ এই শিল্পের, যা চিরদিনের। এপ্রসঙ্গে স্বভাবতই ইউরোপীয় চিত্র শিল্পের চর্চার একটা দিক মনে পড়ছে। আমরা দেখেছি ইউরোপীয় শিল্প যথাযথ প্রতিফলনের অধ্যায় থেকে আজ কি অধ্যায়ে এসে পথ করেছে? এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হ'ল—ক্যামেরার আবিষ্কার। কিন্তু ভারত-শিল্পে লক্ষ্য করুন—এখানে কেবলমাত্র ছবিই আঁকা হয়েছে বলেই তাকে ক্যামেরার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত বিভ্রান্ত হতে হয়নি যা এইটাই প্রমাণিত ভারত-শিল্পে সৃষ্টির দিকটি অভ্রান্ত।

এই অভ্রান্তের দিকটি মনে হলে সবচেয়ে অবাক লাগে এই প্রকৃতির মধ্য দিয়েই শিল্পী মানুষ গাছপালা প্রকৃতির সমস্ত কিছু পরিচয় গ্রহণ করেছে কিন্তু যখন প্রকাশ করছেন আপন সৃষ্টিতে তখন তা যথাযথের কোন প্রতিলিপি বা অনুলিপি নয়—তা প্রকৃতি অনুসারী, কিন্তু হুবহু নয়—। শিল্পীর আপন পরিচয়টি সৃষ্টিতে বিধৃত। একই মানব-মানবী দেখেছেন অথচ

একবার আসমুদ্র হিমাচলের চিত্র মূর্তি শিল্পের প্রতিটি অঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন তা সবই যথাযথ অথচ কোথায় একটা ভাবময় অনুভূতিতে মাখা অন্য কিছুর আভাস দেয়—। অজন্তার দেওয়ালে আপনার আমার মতই নর-নারীরা ভীড় করে কাহিনী সৃষ্টি করেছে অথচ আমার আপনার মত হয়েও তা নয় আরও কিছু। যেখানে মনে হয় সব মিল পেয়েও কোথায় একটা বিশেষ তফাৎ। তবে কি স্বর্গীয়? তবে কি অতিরিক্ত কিছু—সত্যই অতিরিক্ত কিছু—যা চলমান জীবন থেকে গ্রহণ করেও তাকে অতিক্রম করে আরও কিছু—। আর এই দেখা আর প্রকাশের মাঝের মধ্যে ভারত-শিল্পের যথার্থ বেঁচে থাকার প্রাণটি স্পন্দিত।

কোন তুলনামূলক আলোচনার অবতারণা এখানে করছি না। তবে একটা জিনিষ আমার বারবার মনে হয়—শিল্পকে প্রতিক্ষেত্রে আমার জীবনের প্রতি অধ্যায়ে পদক্ষেপে একটা অঙ্গেও অঙ্গ।

এই সঙ্গে ভগবানকেও কত সহজে নিজের মত করেছি। একটু ভাবলে অবাক হতে হয় ভগবানরূপে যাকে বিশেষ আসনে বসিয়ে পূজা করছি, তাকে বেদীতে রেখেও জায়া-জননী-কন্যা-পুত্র ও পিতৃরূপে কিংবা বন্ধুরূপে অনায়াসেই আপনজন করে নিয়েছি—অন্যান্য দেশে পূজ্য ঈশ্বরকে তার বেদীমূল থেকে নাবিয়ে এনে নিজের ঘরের করতে পারছে না। অথচ আমরা ঘরের দেবতা বলে তার ওপর সব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, বন্ধু বলে আলিঙ্গন করছি—ঈশ্বরকে আমাদেরই একজন এ বোধে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত নই—। তাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গী করতে এতটুকু সঙ্কোচের বাধায় আটকে পড়ছি না। এই আলোচনার একটি দিক নির্ণয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ করি—ভারত-শিল্পে ভগবানের রূপকে যখন রূপায়িত করেছি তখন তা সাধারণের মত হয়েও অসাধারণ—শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে আমাদের মতই সবকিছু থেকেও তা স্বর্গীয়—। শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক সীতা আমাদের মত ঘর করে ঘরণী হয়েও তা আরও কিছু যা আমাদের এবং আমার আপনার পরমজন হয়ে আছে—। ভারত-শিল্প আর আর শিল্পীদের এই দৃষ্টিকোণটিই হচ্ছে একটি বিশেষ দিক এবং এই বিশেষ দিকটির জন্যই ভারত-শিল্প অনন্য প্রাণ। অক্ষয়।

০

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অপ্রাকৃত শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা উপলব্ধি করা সকলের সহজসাধ্য নয়। তাঁহার মহিমা ও মাধুর্য যথার্থভাবে অনুভব করিতে হইলে তাঁহার চিন্তায় মগ্ন হইতে হয় এবং তবেই যথাযথভাবে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ কালীপ্রসাদ তথা স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভাবনায় ভাবিত হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে জাহাজে করিয়া বোম্বাই-সহরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মহাবালেশ্বরে আসিয়া কালীপ্রসাদ শুনিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নরোত্তম মুরারজী গোকুল দাসের বাড়ীতে আছেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা জানাইলেন যে, যেই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ বর্ষিত সেইখানেই তাঁহার সন্তানদের স্থান। গোকুল-দাসজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সেইখানে স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দ) পাইয়া কালীপ্রসাদ আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলেন। গোকুলদাস মহাশয় যখন জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ও কালীপ্রসাদ পরস্পরে গুরুভ্রাতা তখন তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া সাদরে কালীপ্রসাদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আরও বিস্মিত ও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুইজন সন্তানকে একত্রে পাইয়া। কালীপ্রসাদ তিন দিন গোকুলদাস মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। চতুর্থদিনে কালীপ্রসাদ পুণা যাইবেন স্থির করিয়া স্বামীজী ও গোকুলদাসজীকে জানাইয়া বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন। সেই কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়ে যখন আমরা বার হয়েছি, তখন তিনি আমাদের দু'জনেরই মঙ্গল-বিধান করবেন"। কালীপ্রসাদ সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা লইয়া ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বামীজীকে প্রণাম জানাইয়া পুণা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কালীপ্রসাদ পুণায় গিয়া দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া পরে বরোদা, নাসিক পরিভ্রমণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। এ' সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ "আমার জীবনকথা"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "অরণ্যসমাকুল দণ্ডকারণ্য দর্শন করিয়া ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব লীলার কথা মনে হইতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল সেই অতীত দিনের কথা—যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন : 'যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একাধারে যে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই কথাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদিগের সকলের নিকট এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অপূর্ব রহস্যময় লীলা। যুগে যুগে ভগবান অবতাররূপে পৃথিবীতে আসেন জ্ঞানহীন লক্ষ্যহীন মনুষ্যসমাজকে জ্ঞান দিয়া যথার্থ পথ নির্দেশ করার জন্য। এই যুগে—এই উনবিংশ-বিংশ শতকে আবার ভগবান মনুষ্যরূপেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেই

রহস্যপূর্ণ কথাই স্বামী বিবেকানন্দকে ও পরে তাঁহার লীলাপার্ষদের প্রায় সকলকেই বলিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনুষ্যরূপে মর্ত্যলীলা একমাত্র ভাগ্যবানেরাই প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব মানবলীলা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" কালীপ্রসাদ তথা স্বামী অভেদানন্দের এই কথা স্মরণীয় ও বরণীয়।

অতঃপর কালীপ্রসাদ অন্যান্য তীর্থস্থানে দর্শন করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণ-ভারতে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রত্যেকটি দেবদেবীর মন্দিরের ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখিতে দেখিতে কালীপ্রসাদ মুগ্ধ হইলেন। প্রতিটি মন্দিরে বিস্তৃত চত্বর ও গোপুরমগুলি সৌন্দর্যমণ্ডিত ও অপরূপ। ঐসকল মন্দির ও তাহাদের সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে কালীপ্রসাদের মনে হইতে লাগিল এই মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তিগুলি মুসলমান শাসকদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সেইজন্যই তাহারা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া সাধারণের নিকট তাঁহাদের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। অতীতে করিয়াছে, বর্তমানেও করিবে এবং অদূর ভবিষ্যতের বুকেও তাহাদের মহিমা-প্রচারের সাক্ষ্য থাকিবে।

কালীপ্রসাদ পরে তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীতে স্নান সম্পন্ন করিয়া প্রতিদিনই পূর্বের মতো মাধুকরী করিতেন। এইভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে তিনি সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বরে তিনটি সমুদ্র একত্রে মিলিত হইয়াছে। কালীপ্রসাদ সমুদ্রে স্নান শেষ করিয়া রামেশ্বর-শিব দর্শন করিলেন। রামেশ্বরের নাট-মন্দিরটি হাজার-স্তম্ভদ্বারা বেষ্টিত ও অতিসুন্দর একটি কারুকার্যময় গোপুরমের দ্বারা সমলঙ্কৃত। এই গোপুরমগুলি বিশ্ববিখ্যাত। একমাত্র দক্ষিণ-ভারতেই গোপুরমগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কালীপ্রসাদ তিনদিন তিনরাত্রি রামেশ্বরে থাকিয়া পরে মাদুরায় উপস্থিত হইয়া মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দর্শন করিলেন। এই মন্দির বৃহৎ ও অতিশয় কারুকার্যমণ্ডিত। মন্দির চত্বর ও গোপুরম সুশোভিত।

তাহারপর কালীপ্রসাদ আনন্দে সেইস্থান হইতে পদব্রজে ত্রিচিনাপল্লী দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন ও শ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন। দক্ষিণ-ভারতে কালীপ্রসাদ প্রত্যক্ষ করিলেন যে, ঐ দেশের লোকেরা সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সম্পন্ন। যাহা হউক, তিনি পরে তাঞ্জোরে উপস্থিত হইলেন। তাঞ্জোরে বহু মন্দির দর্শন করিয়া, কুম্ভকোণম, কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিলেন। কাঞ্চীতে বিরাট দুটি মন্দির। মন্দিরের চূড়া স্বর্ণনির্মিত। তিনি অসংখ্য কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত স্তম্ভবিশিষ্ট বিরাট নাটমন্দির দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, দ্রাবিড়ী পণ্ডিতগণ সুমধুর স্বরে সামগান করিতেছেন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরের ঝঙ্কারে অপূর্ব এক অমৃতময় ধারা বর্ষণ করিতেছে ঐ অপূর্ব ছন্দযুক্ত সামগান। তাহা শুনিয়া কালীপ্রসাদের স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল বৈদিকযুগের মধুময় স্মৃতি। তাঁহার মন ও হৃদয় শান্তিতে ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া গেল।

●

॥ জাপানের কাবুকি নাটক ॥

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(পাঁচ)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের জাতীয় সংস্কৃতি চরম-উৎকর্ষ লাভ করল। এক সামরিক গোষ্ঠী তখন রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী, দেশের বণিকদের হাতে ধনসম্পদ। সাধারণ লোক তখন উৎপীড়িত এবং স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রশক্তির হাতের পুতুল মাত্র। কাবুকির মধ্য দিয়ে অনেক সময় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হতো। পরে তার ফল বিষময় হয়ে দাঁড়ালো, তাকে সামরিক শক্তির রোষের সম্মুখীন হতে হলো। রাষ্ট্রপতির আদেশে সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কাবুকির মঞ্চগুলো সহরের উপকণ্ঠে একস্থানে কিংবা সহরের বাইরে গিয়ে তাদের অনুষ্ঠান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার যেমন একদিন নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল প্রবর্তন করে নাটকের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর ইংরেজের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করবার পথ বন্ধ করেছিলেন, জাপানী রাষ্ট্রশক্তিও সেদিন সেই উদ্দেশ্যে কাবুকির মঞ্চগুলোই সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলেন, তারপর সহরের বাইরে গিয়েও তারা কেবলমাত্র নীতিমূলক নাটক ছাড়া অন্যপ্রকার নাটকের অভিনয় করতে পারবে না বলে নির্দেশ জারি করলেন। তখন থেকে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর নীতিমূলক কাহিনীই কাবুকির অবলম্বন হলো, তাতে ধর্ম বা সততার জয় এবং অধর্ম বা অসতের পরাজয় তাই দেখানো হতে লাগ্‌লো। একদিন আমাদের দেশে পৌরাণিক নাটকগুলো এই আদর্শেই গড়ে উঠেছিল।

ক্রমে জাপানে সামরিক শক্তির শাসনের অবসান হলো এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মেইজি সরকারের প্রতিষ্ঠা হলো। জাপানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কারণ, তখন থেকেই জাপানের সামনে পশ্চিম জগতের দ্বার খুলে গেল, সে দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল। আধুনিক জাপানের তখন থেকেই জন্ম হলো।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে জাপান আমাদের দেশের মতো যে একেবারে তার সাংস্কৃতিক সম্পদ বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করল তা নয়। বরং নিজেদের ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই তারা কাবুকিকে সংস্কার করে তার পুনঃপ্রবর্তন করল। আমরা যেমন সেদিন পুরোপুরি পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চটি অনুকরণ করে নিয়ে তার মধ্যে আমাদের নাটকগুলোর অভিনয় করতে লাগলাম, জাপানে তা কেউ করল না। জাপানে প্রয়োজনার বিষয়ে নূতনত্ব যতদূর সম্ভব গ্রহণ করা হলো, কিন্তু বিষয়বস্তু এবং অভিনয়ের আঙ্গিকে কোনো ব্যতিক্রম করা হলো না। আমাদের দেশে যেমন 'যাত্রা' ছেড়ে 'থিয়েটার' করলাম, জাপানে কাবুকি কাবুকিই রয়ে গেল, তা পশ্চিমের 'থিয়েটার' হলো না। তবে তার মধ্য দিয়ে কাবুকির প্রচলিত বিষয় ছাড়াও জাপানী কথাসাহিত্যিকদের রচনা কাবুকি নাটকের আকারে রূপান্তরিত করে কাবুকির মঞ্চে অভিনীত হতে লাগ্‌লো। ক্রমে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার দিক থেকে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের প্রভাব যে কিছু কিছু তার উপর না পড়লো, তা অস্বীকার করা যায় না,

ভগ্নাংশ থাকা সত্ত্বেও, তাতে তার মৌলিক চরিত্র পুরাপুরি বদলে দিতে পারে নি। বর্তমান যুগের কাবুকি আর পুরোপুরি কাবুকি না থাকলেও তা কাবুকিই, তাকে 'সিন কাবুকি' বলে। 'সিন' শব্দের অর্থ নূতন। আমাদের দেশের নূতন যাত্রার মত, নূতন কাবুকি। কিন্তু আমাদের দেশের নূতন যাত্রা ক্রমে চৌদ্দ আনা 'থিয়েটারে' পরে গেল, কিন্তু কাবুকি, নূতন কাবুকি হয়েই বেঁচে রইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান-সরকার কাবুকিকে যুদ্ধের প্রচার কার্যের জন্য নিয়োগ করেছিলেন তাতে কাবুকির বৈশিষ্ট্য অনেকখানি লুপ্ত হয়েছিল, তারপর যুদ্ধে যখন জাপানের পরাজয় হলো তখন মনে হলো কাবুকি সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। জাপান অমর, তার মৃত্যু নাই, তার কাবুকিও এক অমর শিল্প, যতদিন জাপান আছে, ততদিন তার কাবুকি থাকবে, কারণ জাপান তার জীবনের সূত্রে কাবুকিকে একসঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। তাই যতদিন জাপান ততদিনই কাবুকি। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জাপানে আবার কাবুকি নূতন শক্তি নিয়ে আবার জেগে উঠেছে। যুদ্ধের পরাজয়ের মধ্যে জাপানের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়েছে, কারণ, জাপানকে তার এই ঐতিহ্যই বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করবার শক্তি দিয়েছে, তার এই ঐতিহ্য প্রীতি না থাকলে সে পরাজয়ের চরম গ্লানির মধ্যে বাঁচবার শক্তি পেত না। তাই শুধু কাবুকিই নয়, যুদ্ধের পর জাপানের সকল প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাগুলো আবার যেন সতেজ হয়ে উঠেছে, তাই তার নিজস্ব জাতীয় শিল্প, রঙ্গমঞ্চ, সাহিত্য নূতন প্রাণশক্তি লাভ করেছে। কাবুকির ধারাও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, কারণ জাপানের জাতীয় রস সংস্কারের মূলধারা তার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। কাবুকি যেন জাপানী জাতির একটি মহাদৃশ্যকাব্য, তার মধ্যে ভারতের মহাভারতের মত জাতির বহু যুগের চিন্তা, সৃষ্টি, জীবন, সৌন্দর্য ও সমাজ যেন এসে মিশেছে, তার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাই মনে হয় একটি বিশাল জাতির কর্মচঞ্চল-জীবনের দিনগুলোর হাসি-অশ্রু আঁকা হয়ে আছে। অপরূপ শিল্প মহিমা নিয়ে জাপানের কাবুকি আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

●

॥ নববর্ষ ॥

শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস

পুঞ্জীকৃত বেদনার গ্লানি বয়ে বয়ে
চৈত্রের শেষ দিন ও'ল অবসান
ভাবাক্রান্ত হৃদি লয়ে
শুনিলাম স্তব্ধ হয়ে

সকরুণ নববর্ষ-আগমনী-গান।
ক্লান্ত আঁখি খুঁজে ফিরে
শ্যামলীম প্রকৃতিরে

স্নিগ্ধছায় ডুবে যেতে চায় এ-জীবন
কিন্তু মেটে না আশা
ক্ষুধাতায় যাচে তৃষা

ক্ষুব্ধ হয়ে আছে মোর শুষ্ক প্রাণ মন।
অমৃতের পুত্র মোরা
তবু হায় বিষে ভরা

বিশ্ব-চরাচর আর মোদের হৃদয়।
ভোগের এ' চক্রব্যূহে
প্রবেশ করিয়া মোহে

অজ্ঞানে জীবনমাঝে আনি অবক্ষয়।
মৃত্যুহরা মধু-হাসি
প্রাণে হিংসা রাশি রাশি

প্রকৃত স্বরূপ তার বুকে ওঠা ভার—
খোলা চোখে অন্ধ সব
নাই নিত্যে অনুভব

পাই না সন্ধান তাই অথায় আত্মার।
অন্তরে বিদ্বেষে ভরি
স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি

চারিদিকে সেই পুরাতন পরিচয়,
কেবা শুধু শোনে আর
নববর্ষ-হাহাকার

অনুভব করিবারে নাই সে' হৃদয়।
তাই আমি নিরজনে
ভাবিতেছি একমনে

কি দিয়ে বরিব আজ নূতন বছরে,
কোথায় যে দিব ঠাঁই
নতুন তো কিছু নাই

পুরাতন প্রাণে তাই বসানু সাদরে।

●

॥ শৈব মতবাদ ও শৈব সাহিত্য ॥

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

শৈব মতবাদের মূল কথা 'শিবোহং', অর্থাৎ 'আমিই শিব'; জীবমাত্রেই পাশমুক্তাবস্থায় 'শিব' অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে, এবং শিব নির্গুণ, আনন্দস্বরূপ। সকল কামনার ঊর্ধ্বে আসন তাঁর। এ হ'লো উন্নত শৈবমতবাদীদের মতে শৈবমতবাদের মূল কথা। অবশ্য এটাই লৌকিক আচার ও লৌকিক পূজার্চনার বিধির মধ্য দিয়ে কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। উন্নত ধরনের শৈবমতবাদীরা বৈষ্ণবমতবাদীদের ন্যায় শিবের 'সগুণ' ভাব স্বীকার করেন না। তাঁদের বিবেচনায় শিব নির্গুণ, গুণাতীত, এবং এ ধরনের শিবোপাসকেরা শিবের পাশাপাশি আর কোনো দেবের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি নন। এক শিবই তাঁদের উপাস্য।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরই প্রাধান্য ছিল। এখানে হিন্দুধর্ম তথা আর্যসংস্কৃতি বহুদিনই অজ্ঞাত এবং দূরে সরানো ছিল। সাম্যপন্থী বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় ক'রে বাঙালী যে সেদিন পশ্চিমাগত হিন্দুধর্মী রাজা-রাজড়াদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে, এর নজীর বাংলার ইতিহাসে অনেক মিলবে। শশাঙ্কের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোনো হিন্দুধর্মী বড় রাজার দৃষ্টান্ত আমাদের ইতিহাসে বিরল। তখনও পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়, পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচিত হতো। বিক্রমশিলা তখন বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। শশাঙ্কের পরেও পালরাজাদের সময়ে 'রাঢ় বঙ্গে'ও বৌদ্ধধর্মের পুনরায় জোয়ার আসে। তাই প্রথম যেদিন হিন্দুধর্ম তথা আর্যসংস্কৃতি বাংলার মাটিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়, সেদিন তাকে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল, আশ্রয় করতে হয়েছিল অনেক কূট-কৌশল। বৌদ্ধমতবাদী বাঙালীর কাছ থেকে তাঁরা নিদারুণ প্রত্যাঘাতও পান। সে সময়ে এখানে প্রথম পত্তন হয় শৈব মতবাদের। শৈব মতাবলম্বীরাই প্রথম হিন্দুসংস্কৃতির ধ্বজা ওড়ান বাংলার মাটিতে।

স্পষ্টতঃ বলতে গেলে শৈব মতবাদ কতকাংশে আর্যেতর সম্প্রদায় ঘেঁষা। শিবচতুর্দশী ব্রতের ব্যাধের কাহিনী তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব কাহিনীর মূল বক্তব্য—শিব জনগণের দেবতা। জনগণের সঙ্গেই তিনি চলেন ফেরেন। পশুতোষণাই তাঁর প্রধান কাজ। সাম্যধর্মী বৌদ্ধবাংলার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিন্দু আর্যরা সেদিন দাঁড় করালেন শিবকে। শিবকে সামনে রেখেই সেদিন তাঁদের জয়যাত্রার সূত্রপাত। তাই প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠা পান শৈব-মতবাদীরা। শিবের এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। প্রায় গ্রন্থের মুখবন্ধেই শিব প্রসঙ্গ, শিবের প্রশস্তি। এর কারণ হিসেবে অবশ্য একথাও অনুমান করা যায় যে, শিব হিন্দুদের মতে দেবাদিদেব, সকল দেবতার ঊর্ধ্বে তিনি। তাই প্রথমেই তাঁর স্থান বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু শিবস্তুতি অধিকাংশ ধর্মকাব্যগুলির মুখবন্ধ হিসেবে স্থান পেলেও শৈবমতবাদীরা কিন্তু অধিককাল প্রতিষ্ঠা পেলেন না। এই না পাবার একটা বড় কারণ তাঁদের ধর্মের কাঠিন্য। বাঙালী ভাবপ্রবণ, সারা ভারতে বাঙালীই প্রথম ভাববিপ্লবকে গ্রহণ করে। বাংলার আর্দ্র জলবায়ু সরস মাটিই তাকে ভাবপ্রবণ ক'রে তুলেছে; তার মনে কাঠিন্য কম, নীরস কাঠিন্যকে বাঙালী হৃদয় দিয়ে গ্রহণ ক'রে উঠতে পারে না।

বোধকরি প্রধানতঃ এই কারণেই বাঙালী দীর্ঘকাল নিজের ক'রে গ্রহণ করতে পারেনি শৈবমতবাদকে। বাঙালী চায় তার দেবদেবীকে নিজের আত্মীয় হিসেবে গ'ড়ে তুলতে, চায় তাঁকে মানুষরূপেই বাংলার মুটিয়ে দেখতে ; তাঁর সকল রূপই বাঙালীর কাছে অধিক পূজনীয়, নির্গুণ রূপ নয়। ফলে কিছুকাল শিব নানারূপে বাঙালীর নিত্য-সঙ্গী থেকে বাংলার তন্ত্র-সাধনার মধ্য দিয়ে মাতৃভাবে শক্তিরূপে পরিণতি পেলেন।

কিন্তু শৈবমতবাদ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শৈবসাহিত্য আকার ও ব্যাপ্তিতে কম নয়। তন্মধ্যে রতিদেব ও রঘুরাম রায় কৃত 'মৃগলুব্ধ' কাব্যখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। এ কাব্যখানি রচিত হয় আনুমানিক ৩৭৪ খৃষ্টাব্দে। প্রায় দু'শো বছর পূর্বেকার হস্তলিখিত পুঁথিতে রতিদেব সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা মোটামুটি এইরূপ—

'পিতা গোপীনাথ নন্দন মাতা বসুমতী।
জন্মস্থান সুখদন্তী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বন্দন রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটায়ে বন্দন যত গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ি যে শ্বশুর শংকর।
মন্ত্রদাতা মহাশীল মোক্ষদা ঠাকুর॥
গোপীনাথ দেব সুত রতিদেব গায়।
মৃগলুব্ধ পুঁথি এহি হরগৌরীর পায়॥'

এই গ্রন্থ থেকে আমরা শিবচতুর্দশী ব্রতের শিবমাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে রচিত ব্যাধের কাহিনী পাই। এছাড়া আর যে-ক'খানি কাব্য শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে দ্বিজ হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামীয় কবিকৃত 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল', ভগীরথের 'শিবগুণ মাহাত্ম্য' এবং রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের 'শিবায়ণ' ও তৎপরবর্তীকালে লিখিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে রামেশ্বরের 'শিবায়ন' সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এই গ্রন্থে আমরা কবির যে কেবলমাত্র কবিদৃষ্টির পরিচয় পাই, তাই-ই নয়, এই গ্রন্থে রামেশ্বর তাঁর হাস্যরস-বোধেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। নারদের চরিত্রটি এই গ্রন্থে এমনভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে যে, তা যথার্থই উপভোগ্য। নারদ কর্তৃক নিরূপিত জামাতাকে দর্শন ক'রে মা মেনকা শিরে করাঘাত ক'রে বলছেন—

'নারদ করেছে বটে ভালো ঘটকালি,
আগেতে জানিলে মত্ত কিত কোন্ শালী!'…

ঢেঁকি-বাহন নারদ মামীকে গিয়ে জানালেন—শঙ্কর বাগ্দিনীর প্রেমে মজেছেন, ক্ষেতে চাষ করতে গিয়ে বাগ্দিনীর সঙ্গে প্রেমরঙ্গে আমোদেপ্রমোদে কাল যাপন করছেন শঙ্কর। পার্বতীকে তিনি বলছেন—

'না গো, স্বামী ভালো ক'রে দেখিয়াছি দুনয়নে
প্রেমজ্বরে জ্বরেছে মহেশ,
এ প্রেম সে-প্রেম নয়, আদিরস মিশ্র হয়,
তাই ভয় করি বড় মনে।'…

নারদের কথায় পার্বতীর দাসীরা তাঁকে যেভাবে ভৎর্সনা করে, তার ভিতর দিয়েই রামেশ্বর নারদের খাঁটি রূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন—

'নারদের এ কথায় দাসীরা কহিল তায়
দূর বুড়ো মিন্‌সে হতচ্ছাড়া।
বকিস না মাথামুণ্ড ওরে কুন্দোলের কুণ্ড
চ'লে যা ঢেকিটে ক'রে খাড়া।'…

'শিবায়নে' যে দেবচরিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে, তাতে দেবত্ব তো দূরের কথা, অনেকস্থলে মানবত্বও আরোপিত হয়নি। ভীম এসে নবাগতা যাগ্দিনীর যে বর্ণনা মহেশের কাছে দিচ্ছেন, তা কি ভাষায়, কি ভাবে সব দিক দিয়েই অতি সাধারণ স্তরে নেমে এসেছে।

'এত কহি ঋষিবর গমন করিলে পর
ভীম আসি কহিল মহেশে,
এ যে বড় কর্মভোগ বাধাইল গোলযোগ
এক মাগী যাগ্দিনী এসে॥
ভাঙ্গিয়া শক্তের গাছ জল ছেঁচে ধরে মাছ
শস্যক্ষেত্রে বারণ না শুনে,
আমি যদি বলি কিছু মাগীটা আমার পিছু
শুনাইয়া দেয় চতুর্গুণে॥
ধরিতে যাইলে ছুটে আমায় মারিতে উঠে
মাগী যেন জলন্ত আগুন।
কি ক'ব নারীর গায় হাত তোলা হলো দায়
তা না হ'লে করিতাম খুন॥'…

নারীর প্রতি যে সম্মানের ভাষা ভীম প্রয়োগ করেছেন, তার চাইতে নারীকে খুন করলেও বোধহয় নারীর প্রতি যথেষ্ট সম্মানই প্রদর্শন করা হতো।

অপরদিকে গৌরী শিবের নিকট যেভাবে তাঁর অনাধারণিষ্ট দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের অভাব জ্ঞাপন করছেন, তা আমাদের বিংশ শতাব্দীর অর্ধশিক্ষিত বস্ত্রহীন ময়লোন্মুখ বাঙালীর ধৈর্যকেও ছাড়িয়ে গেছে। শিব ভিক্ষা থেকে ফিরেছে; তাঁর ঝুলি থেকে যাকিছু খাদ্যসামগ্রী বেরিয়েছে, তা নিয়ে দুই ভাইয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে।—

"লাড়ুগুলি সব খেয়ে ফেলে ষড়ানন।
তাহা দেখি শুণ্ডে চাপি রাখে গজানন॥
দুয় মুখে দু'টা লাড়ু দিয়াছে পুরিয়া।
গণেশ ধরিল তার গলাটি টিপিয়া॥

পার্বতী কোনোরকমে পুত্র দু'টিকে শান্ত করলেন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই তাঁকে আবার স্বামী-পরিচর্যায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়তে হলো।—

'মরিলে গায়ের মাস কহিলেন হর
সিদ্ধি কিছু অদ্ধি (পার্বতী) তুমি বাটহ সত্বর।
নন্দী বেটা ঘোটনাটা ফেলেছে ভাঙিয়া।
নন্দী বাটাহে দাও সিদ্ধিটা বাটিয়া।

এরপর শিবের মুখ দিয়ে কবি তাঁর সংসারের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তৎকালীন দরিদ্র চাষী-সমাজের একটি মর্মন্তুদ চিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য। যেমন—

'গৌরীকে কহেন হর, 'শুন প্রাণাধিকে,
ক্ষুধায় উদর জ্বলে : নাহি থাকে টিকে।
ঘরায় যা পারো কিছু করহ রন্ধন।
ভিক্ষায় তণ্ডুলে অন্ন ফলেতে ব্যঞ্জন।
ছেলে দু'টি ছটোপুটি করিছে ক্ষুধায়।
বিলম্ব কোরো না যাহ রন্ধন শালায়।'

স্বামী-পুত্র সকলের আহারান্তে সাধারণ গৃহস্থ বধূর মতো গৌরী আপন আহার সমাপ্ত করলেন।—

'এইরূপে সকলেরে অন্ন দান করি
আপনি আহার তরে বসিলেন গৌরী।
পদ্মা আদি তিন সখী বসে তিন ধারে।
গল্প শুজবেতে সবে প্রবৃত্ত আহারে।'

উদার ওপন্যাসিক অধ্যায়ে কবি শিবের প্রতি উমার অগাধ প্রেম ও আত্মনির্ভরতার যে চিত্রটি এঁকেছেন, তা আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছদ্মবেশী শিবকে উমা বলছেন—

'নাহি বুঝি হিত কি করি বিহিত
আমি যে অবলা বালা।
নিরখিয়া হরে সেই মনোহরে
ঘটিয়াছে এই জ্বালা।
• • •
তাঁহারই যে রূপ নেহারি স্বরূপ
সঁপিনু জীবন মন।'…

'শিবায়ন' মূলতঃ ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ হলেও সর্বক্ষেত্রে যে একটি সুউচ্চ ধারা বজায় রেখে চলেছে, এমন নয়। অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা বারবনিতাদের যুবকদেরকে প্রলোভিত করবার যে চিত্রগুলি দেখতে পাই, তাও উচ্চাঙ্গের নয়। শস্যক্ষেত্রে হরগৌরী বাগ্দী ও বাগ্দিনীর বেশে যে রসলীলা করেছেন, তা সাধারণ বাগ্দীদের রুচিকেও হার মানায়। যেমন—

'বলি যান পঞ্চানন বাহু করি প্রসারণ
গৌরীকে করিতে আলিঙ্গন।'…

এরপরও পার্বতীর মুখ দিয়ে কবি হরের প্রতি যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন, তা শ্লীলতার গণ্ডিকেও অতিক্রম করেছে বলা যায়। যেমন—

'ছি ছি ছি ছি ছুঁওনা কো সরে যাও দূরে থাকো
পর নারী হরিতে মনন,
হ'তে যদি রূপবান পীড়িতে পড়িত টান
মদনের জ্বলিত অনল।
বয়েস না দেখিতাম আয়েস না ভাবিতাম
মজিতাম হইয়া চঞ্চল॥'—ইত্যাদি

এখানে কবি কেবল দেবতাকে মর্ত্যের ধূলোকাদায় নামিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁকে সাধারণের স্তর থেকে নিচে নামিয়ে আনতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অনেকে একে দেবলীলা ব'লে আধ্যাত্মিকতা আরোপ ক'রে থাকেন। তা নিয়ে এখানে তর্কের প্রয়োজন নেই।

এই গ্রন্থে কবি বহু ছোটখাটো উপাখ্যানেরও অবতারণা করেছেন। বাণরাজার উপাখ্যানে কবি শিবকীর্তন করতে গিয়ে অধিক পরিমাণে কৃষ্ণমাহাত্ম্যই বর্ণনা করেছেন। শিব স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে বিপদগ্রস্ত ভক্তের উদ্ধার সাধনে কৃষ্ণকে স্তুতি করতে গিয়ে বলছেন—

'তুমি ওহে যদুপতি সকল জীবের গতি
দেহ মুক্তি পাপী নীচ জনে।
তুমি ব্রহ্ম সনাতন তুমি কলুষনাশন
সবে রত তোমার অর্চনে॥'…

অরন্তী উপাখ্যানে রাম নাম মহিমা কীর্তিত হয়েছে। অরন্তী বারাঙ্গনা হ'য়েও রাম নামের প্রভাবে বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক বৈকুণ্ঠে গমন করে, আর পরাজিত যমদূতগণ উদ্যত ধ্যান প্রহার খেয়েও নিষ্কৃতি পায় না, প্রভুর নিকটে গিয়ে তিরস্কৃত হয়; স্বয়ং যমরাজ উপদেশ দিলেন—

'জান না যেজন করে শ্রীরামের নাম।
সে সাধু-পরশে যম নাহিক বিধান॥'

শিবের উপাখ্যানেও হরিভক্তির গুণগান করা হয়েছে—

'স্বর্গবাসে অধিকারী হইল চণ্ডাল।
হরিভক্তি যেই সেই পূজ্য সর্বকাল॥'

এতদ্ব্যতীত দিলীপ রাজার উপাখ্যানে 'কপিলী হরণ' পালাতেও কৃষ্ণমহিমাই ঘোষিত হয়েছে; তবে বৃকাসুরোপাখ্যানে, দূষণাসুরোপাখ্যানে ও অন্ধকোপাখ্যানে শিববন্দনাই গীত হয়েছে। একাদশী ব্রত উপাখ্যানের শেষে কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকলকেই ভক্তিযুক্ত হ'য়ে এই ব্রত আচরণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।—

'বৈষ্ণব অথবা শৈব শাক্ত কিবা আর।
একাদশী ব্রতকথা কর্তব্য সবার॥

হরিচরণের উক্তি মুক্তি যদি চাও।
একাদশী ব্রত করি বাসনা পুরাও।'

এছাড়া শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন পাওয়া যায় বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, এমন কি বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মমঙ্গলেও শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। গোরক্ষ বিজয়ের যে পুরনো পালাকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার প্রথমেও এইজাতীয় শিবমাহাত্ম্য-কীর্তিত মুখবন্ধ রয়েছে। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শিবকে নিয়ে আরও বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে; তবে সেগুলিতে শিবকে আমরা যতটা দেবাদিদেব রূপে না পাই, তার চাইতে অধিক পাই মনুষ্যসমাজে হাস্যাস্পদরূপে। সেগুলোতে খোলাখুলি বুড়ো শিবকে নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। শিব ভাঙড়োর, শিব মাতাল, তাই যুবতী গৌরীর কাছে শিব দূষিত পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যগুলিতে 'শিবের বিয়ে', 'হর-গৌরী কোন্দল' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি এর নিদর্শন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে যুবতী অন্নপূর্ণার স্বামীরূপী ভাঙড়োর বৃদ্ধ মাতাল শিবকে চূড়ান্তভাবে ঠাট্টা করা হয়েছে। এগুলি আমাদের মনে ভক্তির খোরাক জোগায় না, জোগায় হাসির খোরাক।

অপরাপর কতকগুলিতে সোজাসুজি শিবকে অগ্রাহ্যই করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে শৈবমতবাদের হীনতা ও নীচতা; আর তারই পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থগুলির লেখকেরা বড় ক'রে তুলেছেন তাঁদের উপাস্য 'শক্তি'কে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল—প্রায় সর্বত্রই এই সুর। তাঁদের এসব কাব্যের মধ্যে শিবের সঙ্গে প্রায়শঃই শক্তির কলহ লক্ষ্য করা যায়। লেখকের নায়ক-নায়িকা এখানে পূজো করছেন লেখকের উপাস্যদেবী মনসা, চণ্ডী ও শীতলাকে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী'তে 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' অধ্যায়েও শক্তির সঙ্গে শিবের লড়াই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। খুল্লনা শক্তির উপাসনা করে, ধনপতির কাছে তা অসহ্য। সে পদাঘাতে চণ্ডীর পূজার ঘটসরা ভেঙে ফেলে। তার মতে চণ্ডী ডাকিনী দেবতা। উক্ত কাব্যগ্রন্থে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ে চণ্ডীর জয় দেখানো হয়েছে। খুল্লনার উপাস্য দেবীরই হয়েছে জয়। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'ও তাই। চাঁদবেনে শিবভক্ত, আর মনসার সঙ্গে তার লড়াই। শেষপর্যন্ত তাকে বিষহরির তেজের কাছে হার মানতে হলো। চাঁদবেনের সপ্তডিঙা যখন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন চাঁদসদাগর 'শিব' 'শিব' ব'লে চিৎকার করছে, কিন্তু তেজশালিনী শক্তিময়ী বিষহরির ভয়ে শিব তটস্থ। শক্তি তাঁর মত প্রচার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, শিবভক্তদের জব্দ করছেন, কিন্তু শিব তথাপি নির্বিকার। রচয়িতা তাঁকে একেবারে পরাজিত ও পলায়নপর একটি চরিত্র হিসেবে এঁকে তবে আরম্ভ হয়েছেন। শিব এসব স্থানে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট। আর এই নিশ্চলতা ও নিশ্চেষ্টতাই শৈবমতবাদীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

বাঙালীর মন সহ্য করতে পারে না নির্গুণ শিবকে। তাই বাংলার লৌকিক কাব্যে, বাংলার লোকসঙ্গীতে, কাহিনী ও উপকথায় শিব উপেক্ষিত, উপহাসিত। কবির লেখনীতে শক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, নানা কাহিনী ও নানা উপকথায় কবিরা শ্রেষ্ঠ ক'রে তুলেছেন শক্তিকে।

সে যোধকরি বাংলার মহিমময়ী নারীশক্তিকে প্রাধান্য দেবার জন্য। বাঙালী নারীকেই চিরকাল বড় ক'রে দেখেছে। এরকম নানা প্রতিকূলতার জন্য বাংলাদেশে একদা 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে সৃষ্ট হলেও আসলে শৈব মতবাদ প্রায় উপেক্ষিত। যে শিব বাঙালীর প্রাণকোষে জাগ্রত, তিনি মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের শিব নন্, তিনি পুরাকালের বৈদিক বা ঔপনিষদিক শিব। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বর, শাশ্বত, সুন্দরতম, অদ্বৈততম; তিনি সর্বযুগের সকল মতের ঊর্ধ্বে, তিনি নিরাকার হ'য়েও সগুণাধার। শক্তির প্রভাবে যাঁরা শৈবমতবিরোধী, তাঁদের কাছেও তিনি পূজ্য।

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

(দুই)

জাহাজে ওঠার ব্যবস্থা একটা নড়বড়ে অ্যালুমিনিয়ামের মস্ত সিঁড়ি দিয়ে। যাত্রীরা টলতে টলতে উঠছেন, ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে। চল্লিশখানা সিঁড়ি ভাঙার পর জাহাজে ঢোকার দরজা। দরজার সামনেই রিসেপশন কাউন্টার। সেখানে দাঁড়াবার আগেই একজন ঘপ করে এসে হাত ধরছে, তার হাতধরা হয়ে চলো নিজের কুঠুরির দিকে। হাত ছাড়লেই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। কথাটা খুবই সত্যি জাহাজের খোলের মধ্যে একটা মিনি প্যালেস। দামী কার্পেটে মোড়া দেড়হাত চওড়া গলির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝেই রঙীন কাপড়ে মোড়া কাঠের দেওয়ালে ধাক্কা লাগছে। হাত বাড়ালেই বাহারি শিলিং ছোঁয়া যায়। একনজরে বোঝা যায় যে কোথা থেকে এতো আলো ছিটকে আসছে। দশখানা সিঁড়ি নামলেই এক একখানা তলা শেষ। এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে নিজের কেবিনে আসা গেল। কেবিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বেয়ারা হিতোপদেশ দিয়ে গেল—এই মাইকের দিকে কান খাড়া করে রাখুন, ঘোষণা হলেই চলে আসবেন। খুব বেশী হলে আটফুট-বাই-আটফুটের একটা কেবিন। কিন্তু নেই এহেন জিনিষ নেই। দু'খানা ডানলোপিলোর বিছানা, একখানা আলমারী, একখানা ওয়ারড্রোব, লেখার টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, রেডিও, প্রভৃতি দেখাল ঘুলঘুলি, বাথরুম, শাওয়ার, সবই এই ঘরের ভেতরে। প্রতিটি জিনিষ নিখুঁত ভাবে সাজানো। মিনিট বিশেক পরেই ঘোষণা হলো, আপনারা যে যার ঘর বন্ধ করে রিসেপ্‌শন হল-এ চলে আসুন। ঘর থেকে বেরিয়েই অবস্থা কাহিল, সব দিকেই রাস্তা গেছে, কোন পথে যাওয়া যায়?

শুভ্ মর্ণিং···আমি শ্রীমতী ভিকেল, রিসেপ্‌শন হল-এ যেতে বলছে কিভাবে যাই বলত। ইতিমধ্যে জাহাজ চলতে শুরু ক'রেছে, রাজপুরী দুলছে। সামনের মহিলা পঞ্চাশোর্ধ্ব

ঝুলকারা, সমুদ্রের মাছের মতো গায়ের চামড়ার রং, সাদা কেডস্, সাদা টাইট ফ্রক পরে, সারা মুখে-চোখে চুনকালি মেখে মাথার দামী সাদা টুপী সামলাতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝেই টাল সামলাতে দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছেন ; তবুও মুখের হাসিটি অমলিন।

হাত বাড়িয়ে টাল সামলাতে সাহায্য করে বলি, "হাসীমা এগোনোতো যাক, তারপর দেখা যাবে।"

দশ পা এগিয়েই চৌমাথা। গলি গেছে ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে, নীচে, সামনে, পিছনে। এপাশের ওপাশের গলি থেকে একজন দু'জন করে বেরিয়ে আসছে, সবারই এক অবস্থা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেহারার আবির্ভাব। সবজান্তার ভঙ্গিতে বলে উঠল—"আমি জানতাম আপনারা রাস্তা খুঁজে পাবেন না। আসুন, আমার পিছনে পিছনে চলে আসুন।"

হলঘরের যা চেহারা তাতে রিসেপ্‌শন না বলে রাজদরবার বললে গাম্ভীর্য আরও বাড়ে। হলঘরের একেবারে শেষে একটি মাঝারি আকারের মঞ্চ। একাঙ্ক নাটক অনায়াসে হতে পারে। হলঘরের মধ্যে শতখানেক ইয়া মোটা-মোটা নরম গদীওয়ালা মাথা উঁচু সোফা। সাথে সেন্টার টেবিল, তার ওপর ফুলের তোড়া, অ্যাসট্রে। ঢোকার দরজার বাঁপাশে মিনি বার এবং ডানপাশের কোণা থেকে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা। ঝাড়বাতি কারুকার্যময় সিলিং থেকে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে সারি সারি। হলঘরের দু'সারি দোনালী রঙের থামের পাশে পাশে গ্রীসের আধুনিক ভাস্কর্যের কিছু কিছু মূর্তি। দেওয়ালে ঝুলছে টেরাকোটার কাজ। মঞ্চে আসীন এক ডিরেকটরের কথা মাইকে গম্ভীরভাবে ভেসে এলো। "ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, M.T.S., ওদানেস-এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকের এই মুহূর্ত থেকে আপনারা প্রত্যেকে আমাদের প্রত্যেকের অতিথি। কাজের সুবিধের জন্য আপনাদের প্রত্যেকের নামের সাথে সাথে একটি নম্বর ও চাকতি দেওয়া হলো। ভবিষ্যতে যোগাযোগের জন্য এখন থেকে কেবল ওই নম্বরগুলিই ব্যবহার করা হবে। জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপে যাওয়ার সময় নিজের নিজের চাকতি সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং জাহাজে ফেরা মাত্রই চাকতি আবার নিজের নম্বরের পাশে বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখবেন। বোর্ডের চাকতি দেখেই আমরা বুঝতে পারবো কোন কোন যাত্রী জাহাজে আছেন বা নেই। মনে রাখবেন একমাত্র আপনার সামান্য ভুলের জন্য আপনারা তিনশ পঁচাশি জন সহযাত্রী উৎকণ্ঠায় থাকবেন, অযথা কষ্ট পাবেন। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই দলছুট যাত্রীর জন্য জাহাজ নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র পনেরো মিনিট বেশী দাঁড়াবে, তারপর অন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। দলছুটদের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন দায়িত্ব নেবেন না। বোর্ডে ঝোলানো যে যার নম্বর দেখে পাশেই খাবার ঘরে চলে যান এবং নিজের পছন্দমত টেবিল বুক করুন।"

বোর্ডের সামনে টুক করে লাইন পড়ে গেল। সুন্দর ব্যবস্থা—পাসপোর্টের নম্বর, নাম, কোন্‌দেশী ইত্যাদির পরে একটা নম্বর। এখন থেকে আমি তাহার নম্বর হয়ে গেলাম। সমস্ত লিস্টটা চোখ বুলিয়ে দেখলাম বাঙ্গালীতো দূরের কথা আর একজনও ভারতীয় এই দলে নেই। আঃ বাঁচা গেল। এই তিনদিন অন্ততঃ শান্তি। এখন খাবার ঘরে যাওয়া যাক্।

"স্যুটস্"—ঘাড়ে চিমটা। ঘাড় ফিরিয়েই দেখি এখেন্সে সামান্য পরিচিত সৌদি-আরবীয়ার স্বামী-স্ত্রী সাথে তিন ছেলেমেয়ে। শেষেরটা একেবারে বাচ্চা। ভদ্রলোক হাতঘড়ি টেনে নিরালায় নিয়ে এলেন, সাথে মহিলা দু'জনের মুখে বিরল অমায়িক হাসি।

"বাবার টেবিল বুক করেছো ?"

"আজ্ঞে না।"

"যাও করে এসো,আমরা তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।"

কট্টরপন্থী মুসলমান দম্পতিদের হাড়ে হাড়ে চিনি। ওদের কাছে অবিবাহিত যুবক শুধু অবাঞ্ছিতই নয় সাক্ষাৎ যমদূত, ঘৃণার এবং আপদ্ধার পাত্র। হঠাৎ আমার ওপর এত দরদ কেন? নিশ্চই কোন মতলব আছে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই হলঘরে ঢুকেছি। খাওয়া দাওয়ার অধিকর্তা হাতে একটা কাগজ নিয়ে বসে আছেন। একটু যোগ-বিয়োগ করে বললেন—আপনার সতেরো নম্বর টেবিল। তারপর কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বাঁহাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন জায়গাটা। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম তার একটা চিহ্ন মনে রেখে বেরিয়ে আসতেই সৌদিয়া দম্পতি এগিয়ে এলেন।

"চল তারা ওপরে ডেকে যাই।"

"আজ্ঞে কি বলতে চাইছিলেন যেন।"

"আরে আগে চলই না ওপরে, তারপর সব বলছি।"

সব বড় বড় নদনদী চলতে চলতে এঁকেবেঁকে যেমন শেষবেশ সমুদ্রে এসে মিশেছে, এখানেও তেমনি যেকোন সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠলে ঘুরে ফিরে একেবারে ওপরের খোলা ডেকে পৌঁছাবে। কিন্তু ভদ্রলোক এত সাসপেন্স রাখছেন কেন? এ-ত হিন্দী সিনেমা। ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের চূড়োয় উঠিয়ে তারপর পরিণতি।

●

●

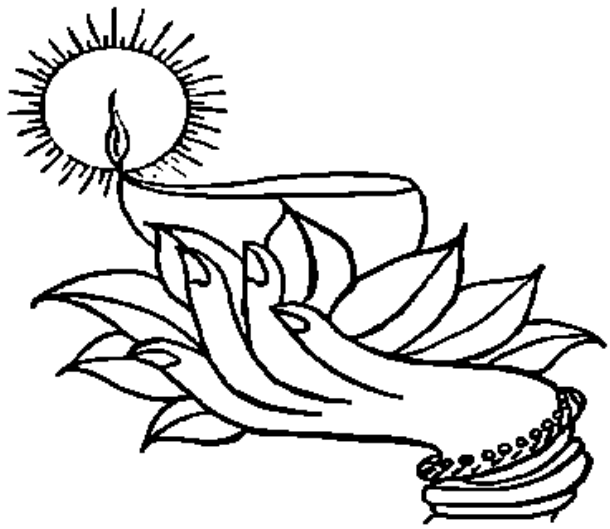

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(আট)

'The useful and the beautiful are never seperated'—অর্থাৎ 'কার্যকর এবং সুন্দর কখনো অবিচ্ছেদ্য নয়'—পেরিক্লাওরিএর এই উক্তি শিল্পীত সিরামিক্‌স্‌এর ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত হতে পারে। সিরামিক্‌স্‌এর নকশা অঙ্কন সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যাপক এক্‌. এইচ, নরটন যে-তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যমূলক গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—সেগুলো হলো : গড়নে ঐক্য-সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্যের সমন্বয়, স্বচ্ছন্দ ব্যবহারযোগ্যতা এবং শিল্পময়তা। অবশ্য এই সঙ্গে বিচার্য হবে উপাদান এবং উৎপাদনপ্রণালীর বিষয় দুটি। নকশা রচনার মূল সূত্রগুলোকে সিরামিক্‌স্ নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সহজসাধ্য—একথা মনে করা ভুল হবে। আগেও বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র নকশা রচনা সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞানের আক্ষরিক প্রয়োগে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পীত সিরামিক তৈরী করা সম্ভব নয়। হাতে-কলমে দীর্ঘদিনের অনুশীলন এবং বেশ কিছুসংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাব্য অসাফল্যের পর এ-বিষয়ে সাফল্যের পুরস্কার মিললেও মিলতে পারে।

কোনো পণ্যের উৎপাদনকালে উপাদান এবং কারিগরী ছাড়া সম্ভাব্য ক্রেতার কথাও পণ্যনির্মাতাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। শিল্পীত সিরামিক্‌স্‌এর উৎপাদনকারী অথবা শিল্পীকেও সম্ভাব্য বাজার অথবা ক্রেতার কথা চিন্তা করতেই হবে, কারণ একজন সিরামিকশিল্পী তার জীবিকার প্রয়োজনে ক্রেতাদের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং ক্রেতাদের রুচি অথবা পছন্দ-অপছন্দ যে পরোক্ষভাবে সিরামিকএর গড়ন ও অলংকরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে—একথা অস্বীকার করা চলেনা। প্রশ্ন উঠতে পারে—ক্রেতাদের পছন্দ-অপছন্দ সিরামিকএর গড়ন ও অলংকরণকে যদি আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হয়, তবে সিরামিকশিল্পীদের মৌলিক সৃষ্টির স্বাধীনতার অবকাশ কতটুকু? এর উত্তরে বলা যায়—প্রতিভাবান শিল্পী ক্রেতাদের

রুচির সঙ্গে সমঝোতা করেও কিন্তু সিরামিক্স্‌এর গড়ন ও অলংকরণে উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন্। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পীত সিরামিক্স্‌এর উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলোর কথা এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-সব ঐতিহ্যবাহী শিল্পীত সিরামিক্স্ কয়েক শতাব্দী ধরে বিপুল সংখ্যক ক্রেতার ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের বহুমুখী রুচিবোধকে কি করে তৃপ্ত করে চলেছে—সে সম্বন্ধে একালের সিরামিকশিল্পীদের বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার বলে মনে হয়। এসব ঐতিহ্যবাহী সিরামিক্‌এর এমন কতকগুলো ব্যবহারিক এবং নান্দনিক গুণ নিশ্চয়ই রয়েছে, যার ফলে এগুলোর চাহিদা ক্রেতাদের কাছে দীর্ঘকালের ব্যবধানেও হ্রাস পায়নি।

প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে শিল্পীত সিরামিক্স্‌নির্মাণে যে-কয়টি গঠনাকৃতি প্রধানতঃ অনুসৃত হয়ে আসছে—সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ঘোতলাকৃতি সিরামিকপাত্রগুলোকে ফেলা চলে প্রথম শ্রেণীতে। এই ধরনের পাত্র পানীয় কিংবা তরল পদার্থ রাখবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বয়াম অথবা কৌটো আকৃতির সিরামিকপাত্রগুলো। এই পাত্রগুলোতে রাখা হয় গুড়ো অথবা দানা জাতীয় জিনিষ। যে-ধরনের সিরামিকপাত্রে তরল পদার্থ রেখে আবার অন্যপাত্রে ঢালা হয়—সে-পাত্রগুলো হয় গাড়ু আকৃতির। গাড়ু আকৃতির পাত্রে যুক্ত থাকে হাতল এবং নল, ঢাকা দেবার জন্যে থাকে ঢাকনা। এই ধরনের পাত্রগুলোকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। চতুর্থ শ্রেণীর সিরামিকপাত্রের মধ্যে রয়েছে বাটি এবং কাপ্ (হাতলযুক্ত ও হাতলশূন্য) আকৃতির পাত্র। থালা ও প্লেট্ আকৃতির সিরামিকপাত্রগুলোকে পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফেলা যায় মিশ্র আকৃতির অন্যান্য সিরামিকপাত্রগুলোকে। এসব পাত্রের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ফুলদানী, বাতিদান, ছাইদানী প্রভৃতি। শিল্পিত সিরামিক্স্‌এর অপর একটি শ্রেণী হলো বিভিন্ন সাইজের টালি।

চিত্রিত সিরামিক টালি এবং সিরামিক ভাস্কর্যের মাধ্যম সিরামিক হলেও এই দুই শ্রেণীর সিরামিক্স্‌কে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য—ললিতকলার শ্রেণীভুক্তই করতে হয়। এ-ধরনের সিরামিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য একান্তভাবেই নান্দনিক বলা চলে, ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে এ-ধরনের সিরামিক্স্‌এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেসব সিরামিক্স্ যুগ্ম উদ্দেশ্য সাধন করে—অর্থাৎ ব্যবহারিক এবং নান্দনিক চাহিদা তৃপ্ত করে, সেধরনের সিরামিক্স্ তৈরীর পরিকল্পনায় কার্যোপযোগীতাই কিন্তু মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং কার্যোপযোগী সিরামিক্স্ তৈরীর পরিকল্পনায় যে-বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা দরকার—তা হলো এই যে, নির্মিত হবার পর এই সিরামিকগুলো যথাযথভাবে কার্যোপযোগী হয়ে উঠবে কি না? এ-প্রসঙ্গে একটি গাড়ু আকৃতির সিরামিকপাত্রের কথা ধরা যেতে পারে। এ-ধরনের একটি সিরামিকপাত্র তৈরীর নকশা রচনা করতে হলে যেসব দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার, সেগুলোর উল্লেখ করা যাচ্ছে: (ক) পাত্রটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তরল পদার্থ রাখা যাবে কিনা এবং ওই পাত্রটি থেকে ওই তরল পদার্থ অন্য কোন পাত্রে সুবিধেজনকভাবে ঢালা যাবে কি না?

(খ) পাত্রের হাতলটি দৃঢ় ও স্বচ্ছন্দভাবে ধরবার উপযোগী কি না ? (গ) পাত্রের সঙ্গে যুক্ত যে-নলটি দিয়ে তরল পদার্থ ঢালা হবে—সেই নলটির গড়ন এবং অবস্থান সুবিবেচনাভাবে তরল পদার্থ ঢালবার উপযুক্ত কি না ? (ঘ) পাত্রটির হাতল ধরে কাত করে তরল পদার্থ ঢালবার সময়ে মুখের ঢাকনাটি স্থানচ্যুত না হয়ে স্বস্থানে বসানো থাকবে কি না ? (ঙ) টেবিলে পাত্রটি বসানো থাকলে নাড়াচাড়াতেও অটল অর্থাৎ সুস্থিত থাকবে কি না ? (চ) ব্যবহারকালে পাত্রটিতে সামান্য আঘাত লাগলে ওই আঘাত সহ্য করে অটুট থাকবে কি না ? (ছ) অনায়াসে পাত্রটি ভালো করে পরিষ্কার করা কিংবা জলে ধোয়া সম্ভব হবে কি না ? প্রশ্নগুলির কোনো একটিরও উত্তর যদি নেতিবাচক হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পাত্রটির গড়ন এবং অলংকরণ যতোই নয়নলোভন হোকনা কেন, কার্যোপকারীতার দিক থেকে আংশিকভাবেও ন্যূনতা ঘটায় ব্যবহারকারী ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়না।

সিরামিকএর নকশা রচনার সঙ্গে পারিপার্শ্বের বিষয়টিও বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। ঘরের ভেতরে যেসব সিরামিক রাখা হয়—সেসব সিরামিকএর গড়ন ও অলংকরণ এবং ঘরের বাইরে—বারান্দা কিংবা বাগানে যেসব সিরামিক রাখা হয়—সেসব সিরামিকএর গড়ন ও অলংকরণ একরকম না হবারই সম্ভাবনা। একটি ফুলদানীর কথাই ধরা যাক্। ঘরের ভেতরে টেবিলে অথবা তাকএ যে ফুলদানী থাকবে—সেটি আকারে হবে মাঝারি কিংবা ছোটো, গড়নে থাকবে লালিত্য, ওজনে হবে হাল্কা, অলংকরণে থাকবে সূক্ষ্মতা ও আভিজাত্য—ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের রঙ ও অলংকরণের সঙ্গে থাকবে সামঞ্জস্য। ঘরের বাইরে বারান্দা অথবা বাগানে রাখবার জন্যে ফুলদানীর আকার হবে বড়ো, গড়নে থাকবে স্থাপত্যসুলভ দৃঢ়তা, ওজনে হবে ভারি, অলংকরণে থাকবে চড়া ও উজ্জ্বল রঙ।

গোড়ার দিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণের কথা এবং সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে—শিল্পমন্যতা। একটি সিরামিক তৈরীর ক্ষেত্রে নিয়মের সব সূত্রগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলেও শিল্পমন্যতার অভাব থাকলে ওই সিরামিকটিকে কিন্তু শিল্পীত সিরামিক বলা চলবে না। শিল্পকলার নিদর্শন না হয়ে ওইটি হয়ে উঠবে নিতান্ত সাধারণ এক আটপৌরে ব্যবহারিক সামগ্রী।

—শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

॥ সংঘবার্তা ॥

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২৮তম শুভ জন্মোৎসব।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২৮তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে গত ২৮শে ডিসেম্বর বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় মঠ-প্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভার উদ্বোধন ক'রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, মায়ের সম্পর্কে কিছু বলা ধৃষ্টতা। তিনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। তাঁর প্রতি আমরা কেবল শ্রদ্ধার্পণই করতে পারি। তিনি যেন আমাদের সব অপরাধ ও অজ্ঞানতা ক্ষমা করেন।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর পাঁচ হাজার বছরের সাধনা সম্পূর্ণ করেছেন মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনে। আর শ্রীশ্রীমা এই পূর্ণতা আহরণে নিঃস্বার্থভাবে করেছেন সহায়তা। শ্রীরামকৃষ্ণ ধারার দুই দিক—শ্রীশ্রীঠাকুর আর শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের জীবন বৈরাগ্য-প্রধান আর মায়ের জীবন গার্হস্থ্যপ্রধান। মায়ের কাছ থেকে আমরা সরলাগতি শিক্ষালাভ করতে পারি। ঠাকুরকে বুঝতে হলে মাকে বোঝা দরকার আগে। ঠাকুর আর শ্রীশ্রীমা অভেদ। শ্রীশ্রীমা শেষ পর্যন্ত ঠাকুরকে সর্বত্র দর্শন করতেন।

ডঃ রমা চৌধুরী সভানেত্রীর ভাষণে বলেন, চণ্ডীতে দেবীশক্তিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে আমরা তাই পাই। শক্তি ও শান্তির একত্র মিলন আমরা দেখতে পাই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে। সাম্য, মৈত্রী; ভীতি, ত্যাগ, সেবা—সব পথকেই আমরা খুঁজে পাবো শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে। সব পথকেই আমরা শান্তিপূর্ণ করতে পারি। তবে, সৃষ্টি করতে হবে ভালবাসার। স্বামীজী বলেছেন মা হচ্ছেন ঠাকুরের সহস্রগুণ। মা ভারতবর্ষের আদর্শ। একাধারে আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে গার্হস্থ্যধর্মের মূর্তপ্রতীক। তিনি সকলকে আপন সন্তানরূপে অভয় দিয়েছেন। সুখে-দুঃখে, শান্তি-অশান্তি প্রতিটি অবস্থায়ই তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আনন্দে রেখো মা। তোমার স্মরণে থাকবো।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং ধন্যবাদ জানান স্বামী পরমাত্মানন্দ। শক্তিপাঠ করেন ব্রহ্মচারী কেশবচৈতন্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দম্ সঙ্গীত-গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম শুভ জন্মতিথি উৎসব।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ২৭শে জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, রামকৃষ্ণ-আদর্শের সূত্র হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আর তা সেই সূত্রের ভাষ্য হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সাধনা ও বাণীকে পাথেয় ক'রে আমরা আমাদের জীবনকে গঠিত করবো। তাঁরই মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর আদর্শ ও বাণী রূপায়িত হলে জীবন ও সমাজ উপকৃত হবে।

অধ্যাপক প্রেমব্রত সেন বলেন, ঐতিহাসিক বিচারে প্রত্যেকটি মহাপুরুষের জীবন থেকে স্বামীজীর জীবনের তাৎপর্য আছে। সশস্ত্র বিপ্লবের ধারক শ্রীঅরবিন্দ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষ প্রত্যেকেই স্বামীজীকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। আবার গান্ধীজীও তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতা আসবে একথা তিনিই বলেছিলেন।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ বলেন, আত্মদান, বলিদান ছাড়া সত্যলাভ হয় না। স্বামীজী বলেছেন, "জন্মেছিস তো একটা দাগ রেখে যা"। বিবেকানন্দের সামনে সব মানুষ স্বয়ং ব্রহ্ম—একদেশদর্শী নয়। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী যা বলেছেন তা আমাদের ধরে নিতে হবে অভ্রান্ত। এই বিশ্বাস রেখে চলতে হবে। বিপ্লবীদের প্রত্যেকের কাছেই থাকতো স্বামীজীর ছবি। জেলে বিপ্লবীদের বলা হতো—Are you a disciple of Swami Vivekananda ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৪৬তম শুভ জন্মতিথি উৎসব।

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৬তম পুণ্যজন্মতিথি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে দু'দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১০ই মার্চ এক সাধারণ সভায় উদ্বোধন ক'রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন শ্রেষ্ঠ অবতার। একথা শুধু মুখের কথা নয়। তাঁর কাজেও তা প্রমাণিত হয়েছে। শাস্ত্রের অনুশাসনে নয়—নিজ জীবনে সেই আদর্শকে আমরা গ্রহণ করব।

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শেই শান্তি আসবে বর্তমান বিশ্বে। বিজ্ঞানের যুগে তিনি এসেছিলেন—বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় করতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের আত্মিক উন্নয়নে প্রকৃত সাহায্য করে। বহির্বিশ্বে আমাদের পরিচয় বেদান্তের মাধ্যমে।—এই বেদান্ত প্রচার করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী হলে সব জানা হয়। তাই প্রায় নিরক্ষর হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ মহৎজ্ঞানী। তিনি হচ্ছেন একটি অত্যাশ্চর্য আবির্ভাব। আড়াই হাজার বছরের ৩০ কোটি মানুষের চিন্তাধারার ঘনীভূত সমষ্টি। সকলের যতদিন মুক্তি না হচ্ছে—ততদিন আমার মুক্তির কোন মূল্যই নাই। এই মুক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখালেন। তাই—তাঁর প্রদর্শিত পথ সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান বিচারপতি শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষ বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর একদিকে সমাজের অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবি এবং অন্যদিকে অতি নীচু স্তরের সাধারণ মানবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। বর্তমান ভারতের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অনেকটিরই তিনি মূলসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন, রামকৃষ্ণই বিশ্বে একমাত্র অবতার যিনি অন্যকোন ধর্মকে আঘাত করতে চান নি। তিনি বলেছেন, সব পথেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তিনি Practiceকে Theory-র উপরে নিয়ে এসেছেন। নিজে অনুভব করেছেন। অন্যকে অনুভব করতে বলেছেন। তিনি কেবলই সর্বদেবস্বরূপ-ই নয়—সর্বধর্মস্বরূপ, বিশ্বমানবধর্মস্বরূপ। সমবেত অতিথিবৃন্দ ও ভক্তমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান স্বামী পরমাত্মানন্দ। শান্তিপাঠ করেন ব্রহ্মচারী কেশবচৈতন্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দম্ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

●

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'য়ে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রভাবতাকে অক্ষুণ্ণ করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ABIM IN. **Cable : CASTINGS**

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অমরত্ব অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

ফোন : ৫৫-৭০০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৬১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২৮·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহ সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙালী	৮·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙালী	৬·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	৮·০০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	৬·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	২০·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত

একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের মূল্যবান ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পো: নবদ্বীপ, নদীয়া

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization	10.00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South-Asian Peoples. Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its Form, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
43rd Year, May 1981
VOL. III

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1600

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
9-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Dulf Street, Calcutta-70000
RICE Re. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১.৫০টাকা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রকাশানন্দ
সহকারী সম্পাদক : শ্রীঅমিতাভ ভৌমিক

সাতচল্লিশ বর্ষ - সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৮৮

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

শুক্রবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৮-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

WE ARE IN THE GOOD BOOKS OF WHOM WE DELIVER THE GOODS
YOUR LARGER OPERATIONS REQUIRE OUR LARGER TRANSPORTATION NET-WORK

INDIAN ROADWAYS CORPORATION

1, SUNYAT SEN STREET,
CALCUTTA-700 012

Telephones : 26-5110 (5 Lines)
26-7551
27-6345

Telex : 021-7010
Gram : INDROADCOR
CALCUTTA

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৫৫-৬০৫৩

এ. এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও তদুর্ধ্বপ্রেম	
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৬·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	২৫·০০	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	৫·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৬০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ		হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৪-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন · ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুতকারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও "JECY" ব্রাণ্ড
পলিথিন পাইপস ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা - ৭০০০০৯

ডি. রতন এণ্ড কোঃ

ষ্টেশনার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-২

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পীড়াহর

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৪

ফোন : ৪৫-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৪-১৮০০

ভাদ্র, ১৩৮৮

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বৃত্তাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৮ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধ দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্. বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Phone : 55-2526
64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004

(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timostar, Shreeshyla, Sandoz Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hos, Anglo-Swiss & Favre-Louba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

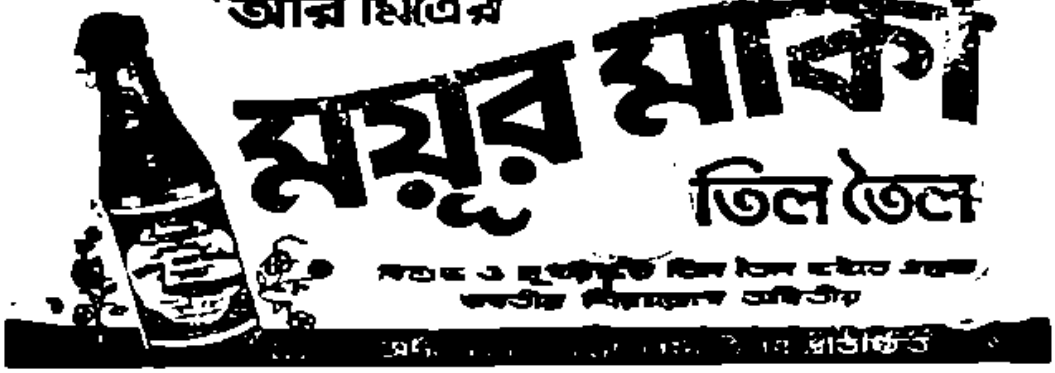

ফোন নং ৪৬-৮৪২৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, জাতেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৮৮

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	২৫১	
২।	বলরামভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ	২৬০	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীমা ও কামারপুকুর	২৬৩	শ্রীমতী চামেলী বসু
৪।	গুরুরূপে হৃদয় দেবতা	২৬৫	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
৫।	অভেদানন্দ-স্তুতি	২৬৬	শ্রীশচীন্দ্রনাথ হরিপা
৬।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	২৬৭	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৭।	ভারত-সংস্কৃতি ধারায় কৃষ্ণচেতনা	২৭১	ডক্টর শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৮।	বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে বর্ষা	২৭৫	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
৯।	সিনিওলচুর পাদদেশে কয়েকটি দিন	২৭৯	শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
১০।	গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	২৮২	শ্রীতপন কবিরাজ
১১।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৮৫	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১২।	গ্রন্থসমালোচনা	২৮৭	
১৩।	শোক-সংবাদ	২৮৯	

বেনারসী সিল্ক সাড়ী পোষাক

শৈললাল মণিলাল স্টোর্স

১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি ১২

(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)

বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫ ২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানো হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্বত্র প্রাপ্তব্য

৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

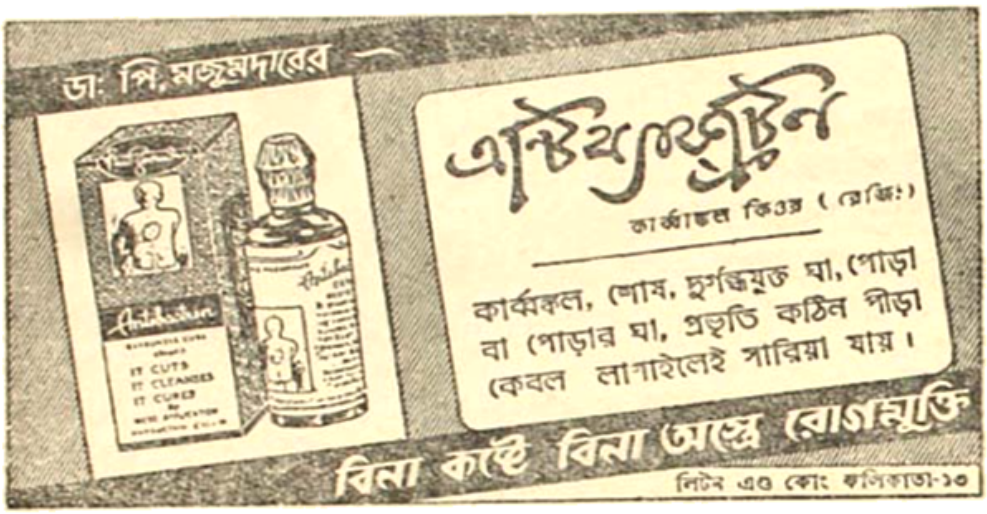

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

ATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMA

BUDGE BUDGE, BALLY, 24 PARGANA

Regd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

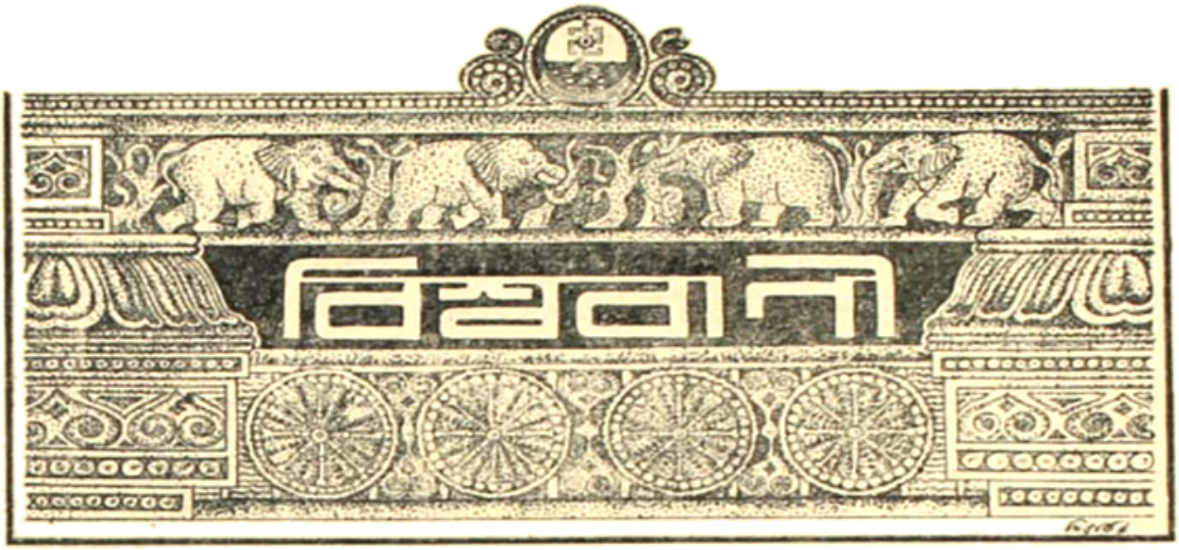

চেতাল্লিশ বর্ষ	সপ্তম সংখ্যা	ভাদ্র ১৩৮৮

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(পঞ্চদশাংশ)

॥ তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "সচ্চিদানন্দময় ও সচ্চিদানন্দময়ী"। একথা বলার উদ্দেশ্য যে, যিনি আদি-মহান্‌পুরুষ, তিনিই আদ্যাশক্তি-মহাকালী। সাংখ্যমতেও শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'। বৈয়াকরণিকমতবাদও অনেকটা তাই। জগৎকারণ কে বা কোন্ বস্তু—সেই সম্পর্কে 'উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি'—এই ২।১।২৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম। ন তস্যাস্তেন কেনচিৎপূর্ণতা সংপাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ ভবতি—'ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্র-শক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।" জগৎকারণ ঈশ্বর হলেও তিনি কারুর বা কোন বস্তুর সাহায্য না নিয়ে নিজেই সৃষ্টি করেন কি-না—এই প্রশ্ন হ'তে পারে। এ'প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কঠিন নয়, কেননা কুম্ভকার যেমন ঘট-সরাবাদি মাটির পাত্র তৈরী করে চুলাদিচক্রের সাহায্য নিয়ে তেমনি ঈশ্বর বা পরমেশ্বর অবিদ্যাত্মিকা-শক্তির সাহায্য নিয়ে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। সেজন্য শক্তি, মহাশক্তি, মায়া, অবিদ্যা, অব্যাকৃতি, বা প্রকৃতি সৃষ্টির জন্য স্বীকার করা হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রের 'তদধীনত্বাদর্থবৎ' ১।৪।৩ সূত্রে এ'রহস্যই প্রতিপন্ন করেছেন বাদরায়ণ-ব্যাস এবং এ'সূত্রের বিশ্লেষণে আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "পরমেশ্বরাধীনা বিশ্বস্যাপ্তিঃ প্রাগবস্থা জগতো-ঽনুপগমাতে, ন স্বতন্ত্রা। সা চাবস্তাকৃপগন্তব্যা। অর্থবতী হি সা। **ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি। শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্তানুপপত্তেঃ।** অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তি-ব্যাকৃতনামনির্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ, তস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ"।

বৈয়াকরণিক-দার্শনিক ভর্তৃহরিও 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থে শক্তি স্বীকার করেছেন এ'ভাবে—'শক্তিমাত্রাসমূহস্য বিশ্বস্যানেকধর্মণঃ' (বাক্যপদীয় ৩।২)। তিনি অবশ্য দেশ ও কালকে শক্তি ব'লে বর্ণনা করেছেন : "কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ" (১।৩) কিংবা 'শক্তির্দিগিতিকথ্যতে' (৩।৩)। তাছাড়া আচার্য হেলারাজ ভর্তৃহরিকে অনুসরণ ক'রে দ্রব্যমাত্রের যে ক্রিয়া—তাকেও শক্তি বলেছেন : 'ক্রিয়াপি দ্রব্যপরতন্ত্র-শক্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে'। মোটকথা যেকোন দ্রব্যের বা বস্তুর যে কম্পনরূপ ক্রিয়া থাকে তাকেই শক্তি বলে স্বীকার করতে হয়, কেননা শক্তিছাড়া দ্রব্যের বা যেকোন বস্তুর ক্রিয়া (কম্পন ইত্যাদি) হতে পারে না। তাছাড়া অচেতন বস্তুর যে দৃঢ়তা ও সমবেত রূপ বা solidity—তাও শক্তির সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন একখণ্ড কাঠ বা একটি কাঠের টেবিল—তাতে জোরে আঘাত করলে তা regist বা প্রতিরোধ করে, এবং এই প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার সামর্থ্য শক্তি থাকে বলেই হয়। সুতরাং জড়বস্তু প্রভৃতির মধ্যে যে শক্তি থাকে তা স্বীকৃত। অনেকে এই শক্তিকে প্রাণ বা প্রাণশক্তি বলেন। ডক্টর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী এ'প্রসঙ্গে তাঁর *Doctrine of Sahti in Indian Literature*-গ্রন্থে লিখেছেন : "All that happens shows only the unfolding of *sakti*. Expressions like *prá́na-sakti* (power of speech), *buddhi-sakti* (power of intelligence), *vá́k-sakti* (power of speech), *iccha'-sakti* (power of will), *jn'á́na-sakti* (power of knowledge) etc. will serve as best examples to bring home the fact that each and every form of activity is capable of being interpreted in terms of *sakti*" (p. 15)। শব্দব্রহ্মবৈভববাদী আচার্য ভর্তৃহরি এজন্য পরিষ্কার করে বলেছেন : "তস্য প্রাণে চ বা শক্তির্যা চ বুদ্ধৌ ব্যবস্থিতা" (বাক্যপদীয় ১।১১৮)। এই শক্তিই মহামায়া মহাশক্তি—যা তন্ত্রে, উপনিষদে ও এমন কি বেদান্তভাষ্যে প্রায়ই উল্লিখিত হয়েছে। আচার্য শঙ্করের কথাই বলি এ'প্রসঙ্গে। বেদান্তসূত্রের 'সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ' (২।২।৩৭) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পরিষ্কারভাবে বলেছেন : "চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চেত্যস্মিন্নবধারিতে বেদার্থে পরৈরপক্ষিপ্তানি বিলক্ষণ-স্বাদীন্দোষান্।...সর্বে কারণধর্মা উপপদ্যন্তে **'সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি মহামায়াং চ স্রষ্টৃ'** ইতি তস্যাদনভিশঙ্কনীয়বিদমৌপনিষদং দর্শনমিতি"। "অতস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ"—এই ২।১।২০ বেদান্তসূত্রে আচার্য শঙ্কর 'মায়ার সাহায্য নিয়ে মায়াধীন হয়ে যাদুকরের মতো বিশ্বরচনা করেন শক্তিমান ঈশ্বর'—একথা বলেছেন স্থষ্টিপক্ষে ব্যাখ্যা করার জন্য। তিনি বলেছেন : "তাৎপরমেশ্বর-

স্বাপীচ্ছাবশাদ্গৃহীতমায়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—ভক্ত-সাধককে অনুগ্রহ করার জন্য পরমেশ্বর মায়াময় শরীর ধারণ ক'রে মায়াবীর নাম ধরেন। এবং এইসঙ্গে আচার্য শঙ্কর স্মৃতি থেকে উদাহরণের উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥

কিন্তু মায়া বিকারধর্মী অসৎ, সুতরাং সৎস্বরূপ পরমেশ্বর-ব্রহ্মের সঙ্গে মায়ার স্পর্শ থাকে কেমন ক'রে? এর উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, স্বরূপত ব্রহ্ম 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্', কিন্তু উপাসনার জন্য অধিকারী ও সর্বরূপবর্জিত ব্রহ্ম রূপ ধারণ ক'রে মায়ার স্পর্শ নেন, তবে মায়া তাঁকে লিপ্ত বা মলিন করতে পারে না, তিনি চিরদিনই শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ থাকেন—'অপিচ যত্র তু নিরস্তসর্ববিশেষং পরমেশ্বরং রূপমুপদিশ্যতে, ভবতি তত্র শাস্ত্রম্—'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদি। সর্বকারণত্বাত্তু বিকারধর্মৈরপি কৈশ্চিদ্বিশিষ্টঃ পরমেশ্বর উপাস্যত্বেন নির্দিশ্যতে—'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ' ইত্যাদিনা।...স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাপি আধারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ভবিষ্যতি, সর্বগতত্বাৎ ব্রহ্মণো ব্যোমবৎ সর্বান্তরত্বোপপত্তেঃ"। উপাসনাও কর্ম, তবে আন্তরকর্ম। উপাসনা সাধককে ভগবানের সমীপে বা নিকটবর্তী করে (উপ + আসন) এবং অতি-নিকটের দেবতারূপে ভগবানকে সাধক তখন উপাসনা করেন। কর্মমাত্রেই মায়ার বা অজ্ঞানের কার্যবিশেষ, সেজন্য অদ্বৈতবেদান্তে উপাসনারূপ আন্তরকর্ম দিয়েও ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করা যায় না। তারপর শ্রুতিতে নিরাধার নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'আকাশ' বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ও সংশয় হয় এজন্য যে, সর্বদেশবিস্তারী ব্যাপক হলেও আকাশ ভূতাকাশ, সুতরাং তা মায়ার বা অজ্ঞানের কার্য, সুতরাং আকাশ কীভাবে নিঃসঙ্গ ও নিরবয়ব ব্রহ্মের নির্দেশক বা উপমা হ'তে পারে? তার উত্তরে আচার্য শঙ্কর 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'-এই (১।১।২২) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন: "...তস্মাদাকাশশব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'। আকাশশব্দেন ব্রহ্মণো গ্রহণং যুক্তম্। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। পরস্য হি ব্রহ্মণ ইদং লিঙ্গম্ (চিহ্নম্)—'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে' ইতি। পরমাত্মনি ব্রহ্মণো ভূতানামুৎপত্তিরিতি বেদান্তেষু মর্যাদা"। পুনরায় শঙ্কর বলেছেন: "দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দঃ —'আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা' ইত্যাদৌ। তথাকাশশব্দাবরুদ্ধনামরূপাভিধেয়বাচিনামপি ব্রহ্মণি প্রয়োগো দৃশ্যতে।...তস্মাদাকাশ শব্দং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্"। এখানে আকাশ যেমন ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের (সর্বব্যাপীত্বের) লক্ষণ—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যম্', তেমনি সৃষ্টির সার্থকতার জন্য মায়ার উপাধি বা মায়ার স্পর্শ স্বীকার করা হয় নির্গুণ ও নির্লিপ্ত সর্বাতীত ব্রহ্মে। সেজন্য তাঁকে (ব্রহ্মকে) বলা হয়েছে ঈশ্বর বা পরমেশ্বরচৈতন্য। ঈশ্বরেই (সগুণ-ব্রহ্মেই) উপাধি তথা মায়োপাধির প্রশ্ন আসে, নির্গুণে ও পরিশুদ্ধ বা তুরীয়-ব্রহ্মে নয়। আকাশ তথা ব্যাপকতা-বিশেষণও ব্রহ্মের লিঙ্গ বা চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় উপলক্ষণরূপে, সত্য সত্য নয়, কেননা অদ্বৈত-বেদান্তের নির্গুণ কিংবা নির্গুণ-সগুণাতীত-ব্রহ্মচৈতন্য একম্ অদ্বিতীয়ম্ শান্তম্ চতুর্থম্ অথে সর্বোপরম্ তুরীয়ম্।

সুতরাং একথা ঠিক যে, সৃষ্টির অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির সার্থকতায় মায়ার উপাধি স্বীকার করা হয় ব্রহ্মে এবং তাই বলা হয়েছে : "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর উ: ৪।১০)। পুরাণ প্রভৃতিতে ও তন্ত্রে বলা হয়েছে : "যঃ বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা" (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ)। ঋগ্বেদের (৬।৪৭।১৮) মন্ত্রেও শক্তির উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে : "ইন্দ্রো[১] মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"। সেজন্য আচার্য শঙ্করও সৃষ্টিপক্ষে উপাসনা ও অনুগ্রহ প্রভৃতি ব্যাখ্যায় উল্লেখ করে বলেছেন : "সর্বশক্তিযুক্তা পরদেবতেত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্"। পরদেবতা বা পরম-দেবতা ঈশ্বর এক হলেও বহু রূপ ধারণ করেন—'স একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎবর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" (শ্বেতাশ্বতর উ:), কিংবা বলা হয়েছে : "একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি-যোগাদ্ধটনাবশতঃ বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তম্"। এ'প্রসঙ্গে ওঁর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী সাবলীল ভাষায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন : "Māyā, as we shall see later on, is a power of Brahman, which is inexplicable. Inspite of his apperently uncom-promising character, māyā, we should remember, is subservient to Him. The scriptures enjoin that 'He is the Lord who has māyā under His control' (স ঈশো মন্তব্যে মায়া). But *in the higher plane of spiritual experience* all contradictions and inconsistencies cease to exist. In the Upanisads, māyā has been indentified with *prakriti*—the primordial matter, and one that owns it has been styled *mahesvara* (the Great Lord). Māyā is generally held to be the supreme cosmic principle : to the Vaisnavas it is *Vashnavi śakti*, to the Śāktas it is *Mahāmāyā* or supreme power, to the Saivas it is *śakti* inseparable from the Lord, to Naiyāyikas it is *Sahakāri śakti* or the power that helps God in His infinite varieties of actions, In the *Śākta-tantra*, माया has been accorded a unique position. It need not be said that *māyā* has exactly the same connotation as *śakti*. Brahman, in its *nirguna* aspect, is said to be devoid of all qualities, that is to say, it is capable of doing nothing unless and until it comes in contact with *māyā* (vide *Doctrine of Sakti in Indian Literature*, pp 17-18).

এই উদ্ধৃতিতে যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, পূর্ব-আলোচনায় তারই পুনরুক্তি ক'রে এখানে বলা হ'ল মায়া শক্তি এবং শক্তি যে মূলতঃপুরুষে থাকে উপাধিরূপে, তাঁকে মায়াবী ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম বলে এবং এই সগুণ ও ঔপাধিক ঈশ্বর বা পরমেশ্বর থেকেই বিচিত্র বিকার বা বিশ্বসৃষ্টি—সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ সম্ভব হয়। যোগদর্শনে, সাংখ্যদর্শনে, পূর্বমীমাংসাদর্শনে এবং

১। আচার্য শঙ্কর 'ইন্দ্র'-শব্দে ব্রহ্ম বলেছেন। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'—ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। 'ইন্দ্র'-শব্দে ব্রহ্ম।

বেদান্তের সকল ভাষ্যে ও সম্প্রদায়ে কোন-না-কোন ভাবে 'শক্তি' স্বীকার করা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি বেদান্তদর্শন-সম্প্রদায়ের আচার্যদের অভিমতে শক্তি-সম্পর্কে। আচার্য রামানুজ বলেছেন : 'সর্বশক্তিযুক্তং সন্মাত্রদ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম' (২।১।১৫)। নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস বলেছেন : (ক) 'অংশোহি শক্তিরূপো গ্রাহ্য' এব পরস্য শক্তি, জীবোঽয়ং-শক্তির স্বতন্ত্র ইতি শ্রুতে' (বেদান্তকৌস্তুভ), (খ) 'সর্বজ্ঞত্বাদেতৎ জগদভিন্ননিমিত্তে পাদান-কারণং ব্রহ্ম'। (নিম্বার্কভাষ্য ১।১।৪)। মাধবাচার্য ও বিষ্ণুস্বামী বলেছেন —

'সাকারং সর্বশক্ত্যেকং সর্বজ্ঞং সর্বকর্তৃকম্।
সচ্চিদানন্দরূপং হি ব্রহ্ম তস্মাদিদং জগৎ'।

কিংবা "পরিণামাৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি-ব্রহ্ম সর্বশক্তিবিক্ষেপেণ জগদাকারং স্বাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমত্তা পরিণতমেব ভবতি"।

এ'ভাবে বিবর্তবাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতির অনুযায়ী ব্রহ্ম ও শক্তি-সম্পর্কে আমরা পূর্বেপূর্বে আলোচনা করেছি যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-তত্ত্বের ও বাণীর একটি সদুত্তর দিয়ে মীমাংসায় উপস্থিত হওয়ার জন্য।[২] শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিচিত্র তত্ত্বের সাধনার সত্যোপলব্ধির পরও বিভিন্ন ধর্মমতে বা ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত সাধনার অনুষ্ঠান করেছিলেন সত্য, কিন্তু সকল-কিছু প্রত্যক্ষভাবে সাধনার পর একই লক্ষ্যে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'যত মত, তত পথ' অর্থে সকল ধর্মমত ও সকল

২। বিভিন্ন মতবাদে শক্তি ও শক্তিমানের লক্ষণ ও পরিচয়-সম্পর্কে এখানে আরও কিছু উল্লেখ করি :

(ক) 'সর্বেশ্বরবিদৈব জগদ্বীজনিমিত্তকর্তৃত্বেশ্বরেণেত্যস্য আহ-পরমেশ্বরাশ্চর্যেতি। স হ্যেতেনৈব চেতনান-বিষ্ঠীতং কার্যাং পর্যালুমিতি'—বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্যভাষ্য।

(খ) 'যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিবিচিত্র্যা তদা শব্দৈকসমধিগম্যস্য ব্রহ্মণঃ কিমু বক্তব্যম্ ?'—ব্রহ্মপ্রভাষ্য।

(গ) 'বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ'।—শাঙ্করভাষ্য।

(ঘ) ব্রহ্মপ্রভাষ্যকার যেভাবে বলেছেন তদনুরূপই অন্যভাবে বলেছেন ২।১।২৭ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর : 'লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যাদ্শক্তয়ো বিরুদ্ধানেক-কার্যবিষয়া দৃশ্যন্তে'।

(ঙ) কার্য-কারণনিয়মকে অনুসরণ করলে শক্তি মানতেই হয়। আচার্য শঙ্কর ২।১।১৮ বেদান্ত-সূত্রভাষ্যে বলেছেন : 'শক্তিশ্চ কারণস্য কার্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা যুক্তা (কার্যকারণত্বায়)'।

(চ) 'তস্মাৎ কারণস্যানুমেয়া শক্তিঃ, শক্তেশ্চানুমেয়ং কার্যম্'।

(ছ) (i) 'সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম'—১।১।১।

(ii) 'সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাদ্ ভবতি'—১।১।২।

(iii) 'তস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ সর্বশক্তিত্বং ইতি'—১।১।৩।

(iv) 'পরিপূর্ণশক্তিকস্য ব্রহ্ম'—২।১।২৪

(জ) 'সর্বশক্তি' ইতি সর্বস্য জগত-উপাদানকারণং নিমিত্তকারণং চেত্যুপপাদিতম্'—ভামতী।

(ঝ) পরমেশ্বরে শক্তি স্বীকার করার উদ্দেশ্য তাঁর লীলাকে স্বীকার করা'—'লীলৈব কেবলয়-পরিমিতশক্তিত্বাৎ'—২।১।৩

ধর্মস্বরূপ ধর্মসাধনার চরম ও পরম-লক্ষ্য এক ও অদ্বৈত-সত্তার ও তত্ত্বের অনুভূতি—যে অনুভূতির মধ্যে মতদ্বৈত নাই, বাদানুবাদ নাই, নিম্ন-উচ্চ-স্তরের পার্থক্য বা ভেদ নাই, আছে একমাত্র এক সর্বসমন্বয়ী অখণ্ডতত্ত্বের ভাব ও রূপ। সেজন্য তিনি বলেছেন: হিন্দুরা যাঁকে ঈশ্বর বলে, খ্রীষ্টানরা যাঁকে গড বলে, মুসলমানেরা যাঁকে আল্লা বলে—তিনিই চরমতত্ত্ব ও পরমসিদ্ধান্ত। এখানে জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও দৃষ্টির কোন তর-তম-ভেদ নাই, আছে সমান্তরাল সমন্বয়ের রূপ এবং অনুরক্ত মিলন, শান্তি ও আনন্দের ভাব।

সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মের সাধনা ক'রে একই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সেই চরম ও পরম-তত্ত্ব অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈত—কি অন্য আরও কিছু—সেই সম্বন্ধে কিছু নির্ধারণ করাই বর্তমান 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-আলোচনার উদ্দেশ্য। প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসঙ্ঘ যেমন নিজের নিজের প্রতিষ্ঠাতার এবং তাঁর উপলব্ধ নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রেই নিজ-নিজ সত্তাকে ও মহিমাকে রক্ষা করে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ধর্ম ও জীবনানুভূতিকে কেন্দ্র ক'রেই অসাম্প্রদায়িক-সম্প্রদায়বিশিষ্ট উদার 'রামকৃষ্ণসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কি সেই নির্দিষ্ট ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনানুভূতিপূর্ণ সত্য তা আমরা জানি এবং 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-তত্ত্বই প্রধানভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সেই নির্দিষ্ট ধর্মের, তত্ত্বের ও সত্যের। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এ'সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এ'সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮৩, পৃঃ ৪১)। এই উদ্ধৃতি পূর্বেও দিয়েছি, কিন্তু এখনও বলি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মদৃষ্টি ও অনুভূত-দর্শনদৃষ্টিসম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে পুরোপুরি অদ্বৈতদৃষ্টির কথাই বলেছেন, কেননা আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী অনেকে এরকথাই বলেন যে, মায়ার স্পর্শ (উপাধি) নিয়ে নির্গুণ-ব্রহ্ম যখন সগুণ বা গুণযুক্তরূপে এবং মায়াযুক্ত হয়ে পরিচিত হন, তখনই আসে বিশ্বসৃষ্টির, বিশ্বপালনের ও বিশ্ববিনাশের কথা, আর মায়া প্রকৃতিরূপেই হোক, অবিদ্যারূপেই হোক, অব্যাকৃতিরূপেই হোক, কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বরচৈতন্যের সহায়তা নিয়েই বিশ্ব-সৃষ্টি সম্ভব হয়। মায়ার বা প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির বীজ প্রসুপ্ত থাকে, সুতরাং মায়ার উপাধিকে নিয়ে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেন—যদিও মায়া বা প্রকৃতির কৃতিত্বই সেখানে প্রধান। ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) মায়ার উপাধি (স্পর্শ) নিয়ে হিরণ্যগর্ভচৈতন্য বা প্রজাপতি ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হন এবং পরে হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম বিরাটচৈতন্যরূপে বিশ্বচরাচরে রূপায়িত হন। অর্থাৎ তখন কারণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বিরাটরূপে বিবর্তিত হন। এই রূপান্তরের নাম বিবর্তন, পরিণতি নয়। সুতরাং বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিবীজ মহাপ্রকৃতি-মায়াতে নিহিত বলতে কারণাকারে সুপ্ত থাকে। এই কারণাকারে সুপ্তাবস্থাই অব্যক্ত-প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ব্যক্ত হ'লে হয় সৃষ্টি। এই অব্যক্ত-প্রকৃতি প্রথমে কারণাকারে বা সুষুপ্তির আকারে থাকে, পরে সূক্ষ্মাকারে বা স্বপ্নাকারে বিবর্তিত হয়, এবং পরিশেষে জাগ্রতাকারে স্থূলরূপে বিশ্বচরাচরে বিবর্তিত হয়। এখানে বিবর্তিত হয় অর্থে এক হ'য়েও ব্রহ্ম মায়ার জন্য ভিন্নরূপে রূপায়িত হয়,

কিন্তু স্বরূপে শুদ্ধচৈতন্যরূপকেই অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন: "সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এ'সব শক্তির খেলা"—একথা ও এই তত্ত্ব ঠিক। শক্তিই প্রকৃতি, মহাপ্রকৃতি, বা অব্যক্ত-মায়া। "বিচার করতে গেলে, এ'সব স্বপ্নবৎ"। তারপর শুদ্ধব্রহ্ম থেকে বিবর্তিত হয়ে কীভাবে মায়াময় অথচ মায়াধীশ ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম হয়, কারণ ও সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে কীভাবে মায়ার অধীনচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ বা কার্যব্রহ্ম ব্রহ্মা হয়, এবং পরিশেষে স্থূল-জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাকারে বিবর্তিত হয়—এই বিবর্তনধারারূপ সৃষ্টিক্রমের বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সকলের মধ্যে এক অনুস্যূতচৈতন্যই সত্য, আর সব বিবর্তন ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা অর্থে অসত্য। শক্তির অর্থাৎ মায়ারই লীলা ও খেলা—সগুণ-ব্রহ্ম থেকে জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব এবং সেজন্যই এ'সকল যথার্থসত্তাহীন অবস্তু। অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকে 'বস্তু' বলা হয়েছে ব্রহ্মের ত্রৈকালিক শাশ্বত-সত্তা থাকে ব'লে, আর শাশ্বত-সত্তাহীন যা—তাই স্বপ্নবৎ অসৎ ও অবস্তু।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কিন্তু হাজার বিচার করো, সমাধিস্থ (ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত) না হ'লে শক্তির (মায়ার) এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ'সব শক্তি (মায়ার)-এলাকার (সীমার) মধ্যে, (সুতরাং মায়া বা অসৎ ও অবস্তু). শক্তির (মায়ার) ঐশ্বর্যের (লীলার ও বিলাসের) মধ্যে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৩৬, পৃঃ ৪১)।

এখানে বিচারের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। বিচার বিনা—ব্রহ্ম (নির্গুণ-ব্রহ্ম) সত্য—না মায়া এবং জীব-জগৎ ও চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব সত্য—এই বিচার। বিচার অর্থে বিবেকের নির্ণয়কর্ম ও যুক্তিসহকৃত মনের খেলা। বিচার ক'রে মানুষ বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে মনে ও সেজন্য শাস্ত্র-যুক্তিরূপ প্রমাণের ও তর্করূপ বাদানুবাদেরও (বাক্যের বা কথারও) সাহায্য নেয়। বাক্য, মন ও বুদ্ধি—এ'সকলই মায়ার বা অজ্ঞানের রাজ্যের উপাদান, সুতরাং অজ্ঞানের উপাদান দিয়ে স্বয়ংজ্যোতিঃ জ্ঞানের বা বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মের (নির্গুণ ও মায়াতীত ব্রহ্মের) নির্ণয় ও নির্বাচন করা যায় না। সেজন্য উপনিষৎ বা বেদান্ত বলেছে: 'যতো বাচা নিবর্তন্তে', 'মনসা ন মনুতে', 'ন মনসা, ন বহুনা শ্রুতেন', বা 'অবাঙ্মনসগোচরম্',—অজ্ঞান রাজ্যের মন, বুদ্ধি, বাক্য দিয়ে জ্ঞানরাজ্যের নির্গুণ-ব্রহ্মের স্বরূপকে বোঝা যায় না, সেজন্য এ'সবের পারে সত্য একমাত্র শুদ্ধজ্ঞানরূপ অনুভূতিমাত্রগোচর ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "(ব্রহ্ম) শুদ্ধমনের গোচর", বা "শুদ্ধবুদ্ধির গোচর"। 'গোচর' অর্থে জানা যায়, সম্যক্-উপলব্ধি করা যায়, আর শুদ্ধমন বা শুদ্ধবুদ্ধি অজ্ঞানরাজ্যের মন বা বুদ্ধি নয়—বিশুদ্ধচৈতন্য। সুতরাং তখন (ব্রহ্মজ্ঞানোপলব্ধির সময়ে) চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন হয়।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—

(ক) "তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একটিকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না।

সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮১, পৃঃ ১১)।

(খ) "দুধ কেমন ?—না—খোবো খোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না"।

(গ) "তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে ও শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮১, পৃঃ ৪১)।

এ'সকল উদাহরণ পূর্বেও দিয়েছি প্রসঙ্গক্রমে, কিন্তু পুনরায় এখানে উল্লেখ করলাম সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলার ও শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, ও সক্রিয় বা ক্রিয়াচাঞ্চল্যকে ছেড়ে যখন নিষ্ক্রিয় কূটস্থসত্তার কথা বলেছেন, তখন লীলাকে ছেড়ে নিত্যের এবং সক্রিয়-শক্তিকে ছেড়ে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ-ব্রহ্মের কথাই উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "আদ্যাশক্তি (সৃষ্টির বীজস্বরূপিণী মহাপ্রকৃতি অব্যক্ত বা অব্যাকৃতি) লীলাময়ী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী"। কলনাৎ (কল+ণ্যুট্) গ্রহণাৎ, ধারণাৎ, দর্শনাৎ—কালী। মোটকথা যে'শক্তি ক্রিয়াশীল বা ক্রিয়াচঞ্চল, তাই কালী। শিব অর্থে স্থির ও নিষ্কল, সেজন্য তিনি অকূল এবং যখন তাঁতে স্পন্দন বা সৃষ্টি হয়, তখন তিনি কূল বা কালী। 'কল' অর্থে ধ্বনি, নাদ, শব্দ প্রভৃতি, আবার 'কল' অর্থে কলা বা অঙ্কুর বোঝায়। সুতরাং ক্রিয়াশীলতাই 'কল' এবং ক্রিয়াচঞ্চলা সৃষ্টি অর্থে কালী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু,—যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ-ভেদ" (শ্রীশ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ, ১৩৮১, পৃঃ ৪২)। এখানে ব্রহ্ম বলতে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর বা পরমেশ্বর, আর তত্ত্বদৃষ্টিতে শিব। শিব বলতে শব বা নিষ্ক্রিয়। মোটকথা কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী'—একথা যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, তখন কালী শক্তি বা মহাশক্তি, আর ব্রহ্ম মায়ার উপাধিকে নিয়ে মায়াধীশ ঈশ্বর। কিন্তু একই চৈতন্য, একই সর্ববিস্তারী, সর্বগত ও সর্বানুস্যূত মহাচৈতন্য—নির্গুণ-ব্রহ্ম। কিংবা যথার্থভাবে বলতে গেলে বলা যায় নির্গুণ-সগুণ দুই উপাধি বা বিশেষণের অতীত তুরীয় ও সর্বোপরম ব্যাপকচৈতন্য—যিনি সমানভাবে ঈশ্বরে, হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মায় ও বিরাটে বা স্থূল-বিশ্বচরাচরে অনুস্যূত—'সূত্রে মণিগণা ইব'। তাই সর্বসমন্বয়ী বস্তু বা তত্ত্ব সগুণ-নির্গুণেরও অতীত, ব্যাপক ও বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম। এই বিশুদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যহীন ব্রহ্মই সমন্বয়ী-তত্ত্ব। বেদান্তদর্শনের 'তত্তু-সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) সূত্র যেমন সমগ্র বেদান্তবাক্যের তাৎপর্যের সমন্বয় সাধন করে, তেমনি সর্বাতীত অথচ সর্বগত ও সর্বানুস্যূত তুরীয়-ব্রহ্ম সকল-কিছু অব্যক্ত-ব্যক্তের, নিরাকার-সাকারের, কারণ-কার্যের, ঈশ্বর-হিরণ্যগর্ভ-বিরাট-চৈতন্যের সমন্বয় সাধন করে। আচার্য শঙ্কর "তত্তু সমন্বয়াৎ"-সূত্রের ভাষ্যে এ'তত্ত্বেরই আভাস বা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি ভাষ্যে বলেছেন : "তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রৈকসমন্ব-

গম্যতে। কথম্ সমন্বয়াৎ। সর্বেষু হি বেদান্তেষু ব্যাকরণানি তাৎপর্যৈকস্যার্থস্য প্রতিপাদক-ত্বেন সমন্বীতানি। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 'তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরম্'। 'পরমাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ'। 'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ' ইত্যাদীনি"। মোটকথা সমন্বয়ী বা সমন্বয়কারী তুরীয়-ব্রহ্মকে আচার্য শঙ্কর তাই "নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বলেছেন। ব্রহ্ম গুণ, ঐশ্বর্য ও উপাধি থেকে নির্মুক্ত বা অতীত, সেজন্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাব বা ঐ ধরনের প্রকৃতিসম্পন্ন বা গুণবিশেষিত ব্রহ্ম নন, তিনি স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ প্রভৃতি—একথাই বলেছেন আচার্য শঙ্কর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পক্ষেও তাই। তিনি বস্তু—যখন তিনি নিষ্ক্রিয় (অর্থে সৃষ্টি, প্রকৃতি ও কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না, কিন্তু স্থির-ধীর ও উদাসীন),···তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, আর যখন তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যের সঙ্গে যুক্ত বা সম্পর্কিত থাকেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। **একই ব্যক্তি—নাম-রূপ-ভেদ"**। এটিও সমন্বয়ের কথা, কেননা নির্গুণে যে পরমসত্তা, সগুণেও সেই একই অনুস্যূত পরমসত্তা ব্রহ্ম, কেবল উপাধিভেদ বা নাম-রূপ-ভেদ। এই সর্বানুস্যূত সমন্বয়ী ও ব্যাপক ব্রহ্ম যে উভয়েই অনুস্যূত-সত্তারূপে এক ও অদ্বিতীয়—এ' কথাই বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ; কেননা এরপরই তিনি বলেছেন—

"যেমন 'জল', 'ওয়াটার', 'পানি'। এক পুকুরে তিন-চার-ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায়, তারা বলে 'ওয়াটার'। তিনই এক, কেবল নামে তফাৎ (বা উপাধিতে ভেদ)। তাঁকে (সেই এক ও অদ্বিতীয়কে) কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'গড্', কেউ বলছে 'ব্রহ্ম', কেউ 'কালী', কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮৬, পৃঃ ৪২)।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গেই এ'সকল কথার বা তত্ত্বের আলোচনা হচ্ছিল। কেশবচন্দ্র সেন বলেন : "(সমাধিতে) কালী কতভাবে লীলা করছেন, সেই কথাগুলি একবার বলুন"। কেশবচন্দ্র এখানে সগুণ-ব্রহ্ম কালী অর্থাৎ শক্তির কথাই বলেছিলেন।

●

॥ বলরামভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

ব্যাধির সুচিকিৎসার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের পরামর্শে কলিকাতায় এসে বাস করছিলেন। ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে সাময়িকভাবে বাস করছিলেন। এই বাড়ীতে তিনি এইকালে কতদিন বাস করেছিলেন সে-সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত। রামচন্দ্র দত্ত ও অক্ষয় কুমার সেনের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করেছিলেন এক পক্ষকাল। অপরদিকে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাস কাল এক সপ্তাহ। জীবনীকার শশিভূষণ ঘোষ লিখেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামভবনে এসেছিলেন 'আশ্বিন মাসের প্রথমে' এবং শ্যামপুকুর-বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন আশ্বিন মাসেই।

কিন্তু সকল জীবনীকারের মতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামভবনে আসতে না আসতেই তাঁর দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। পুঁথিকার লিখেছেন,

শ্রীপ্রভুর আগমন বসুর ভবনে।
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে॥
লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে।
অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে॥
মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র।
বসুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র॥
প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে।
দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে॥[১]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম ভবনের দোতলা ঘরে আছেন। সকালবেলাতেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন মাষ্টার। তিনি শ্যামপুকুরে তেলিপাড়ার থাকেন, মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চে[২] প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন।

আজ রবিবার ১২ই আশ্বিন, কৃষ্ণা তৃতীয়া। ইংরেজী ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি তেলের জন্য ব্যস্ত হন। তিনি ঘরের মেঝেতে বসেছিলেন। আগে নিজের মাথায় তেল দেন। সেবক হরিশের হাত মাথা থেকে ঠেলে ফেলে দেন।

স্নানের পর বলরামের নিত্যসেবিত জগন্নাথদেবকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বলেন: জগন্নাথের পট—জগন্নাথ দেখবো ইচ্ছা।

১। শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, নবম সং, পৃঃ ৪৮৪। এ বিষয়ে রামচন্দ্র দত্তও লিখেছেন, "পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল ....বলরামবাবুর বাটী যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল।"

২। শ্যামবাজারে পাঁচমাথার মোড়ের অনতিদূরে ঐ স্কুল ছিল। বর্তমানে ঐ স্কুলের ঠিকানা: ৬৮, সুরেন বোস এভিনিউ।

বাড়ীর অন্দরমহলে দোতলায় উত্তরপূর্বকোণে ঠাকুর-ঘর। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যান, শীঘ্রই ফিরে আসেন নিজের ঘরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ে সেবক রাখালের ওপর। নিকটেই ছিল একটি আরাম-কেদারা। তিনি রাখালকে ইঙ্গিতে বলেন চেয়ারে বসতে। রাখাল চেয়ারে বসলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

* * * *

স্কুলকেরত মাষ্টার আবার বলরামভবনে এসেছেন। তখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা। মাষ্টারকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন—**ছোট নরেন কি চায় গো ?**

মাষ্টার তাঁর কিশোর ছাত্র বঙ্কিমের ভক্তি সম্বন্ধে বলেন।[৩] শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে হাসেন। এমন সময়ে নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি মাষ্টারকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন : 'কাল (রাত্তে) দেখি ছুটো মশারির মধ্যখানে (শুয়ে আছেন)—(নিরীহ) ভাল মানুষ কিনা' :

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে তাকান, ব্যাপার কি জানতে চান।

মুর্শিদাবাদ থেকে এক বৈষ্ণব-ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে এসেছেন ভক্ত নবগোপাল ঘোষ। পুঁথিকার লিখেছেন—

একদিন শুন এক শ্রীপ্রভুর খেলা।
গগনে কেবল বাকী প্রহরেক বেলা।
গৌরাঙ্গ-ভকত এক ব্রাহ্মণ-নন্দন।
নামাবলী ছিঁটাফোটা অঙ্গে সুশোভন।
প্রভুর মহিমা-কথা লোকমুখে শুনে।
আসিতেন পথে পথে কভু দরশনে।
... ...
সরল বিশ্বাসে দেঁহ পাইল দেখিতে।
গৌরাঙ্গ-চরিতখানি প্রভুর চরিতে।
বিস্ময় সহিত নানাবিধ চিন্তা মনে।
অবশেষে উপনীত বন্ধুর ভবনে।[৪]

ভক্ত-সমাবৃত শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে মাথা রেখে বৈষ্ণব-বাবাজী প্রণাম করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব-বাবাজীকে বসতে ইঙ্গিত করেন। তাঁর পরিচয় দিতেই বৈষ্ণব-বাবাজী উঠে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দুবার প্রণাম করেন। ভক্ত নবগোপাল ঘোষ বৈষ্ণব-বাবাজী সম্বন্ধে বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন : 'খুব আধার'।

৩। কয়েকদিন পরে ২৭।১০।১৮৮৩ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলেছিলেন : বঙ্কিম ছেলেটি কেমন ? এখানে যদি আসতে না পারে, তুমি যা হয় তাকে সব বলবে।—'চৈতন্য হবে' (ক ৪।২৯।১)।

৪। পুঁথি, নবম সং, পৃঃ ৫৮০

পুঁথিকার এখানে আরেক টুকরো খবর দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজহাতে একটি পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। বৈষ্ণব-ভক্তের আকাঙ্ক্ষা হয় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে হাওয়া করবেন। "হৃদয়-নিবাস প্রভু বুঝিয়া অন্তরে। সমর্পণ কৈলা পাখা ব্রাহ্মণের করে॥" তিনি মনের সাধ মিটিয়ে পরম আহ্লাদে শ্রীরামকৃষ্ণকে বীজন করতে থাকেন;

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **'আজ আমার বড় ভাগ্য'।**

উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন।

বৈষ্ণবভক্ত: একভাবে সৌভাগ্য বলতে পারেন—যেমন, নিতাই জগাই-মাধাই পাপী দুটিকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে। তিনি শয্যা থেকে উঠে এগিয়ে যান বৈষ্ণব-বাবাজীর সম্মুখে। শ্রীরামকৃষ্ণ "কমলার সেবা সেই অমূল্য চরণ। ভাবাবেশে বক্ষে তাঁর করিলা অর্পণ। পুলকে পূর্ণিত হিয়া দ্বিজ ভাগ্যবান"।

বৈষ্ণব ভক্ত সযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণ তাঁর বক্ষে ধারণ করে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **'কৃষ্ণচৈতন্য বল'।**

বৈষ্ণব-ভক্ত ভাবের ঘোরে চীৎকার করে বলেন: গৌর, কৃষ্ণচৈতন্য, প্রেমদয়াল নিতাই

ভাবে বিহ্বল শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। তিনি হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখেন, কিন্তু অশ্রু ঝরতে থাকে। ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদ বৈষ্ণবের বক্ষে স্থাপিত, বৈষ্ণবভক্ত সযত্নে চরণখানি ধরে রাখেন। প্রেমবিতরণের এই মনোহর দৃশ্য দেখে ভক্তগণ বিমোহিত। "যাঁহার যে মনের ভাব, তিনি সেইভাবে একদৃষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে পরম ভক্ত, কেহ সাধু, কেহ বা সাক্ষাৎ দেহধারী ঈশ্বরাবতার দেখিতেছেন, যাহার যেমন ভাব।"[৫]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর বৈষ্ণবভক্তকে লক্ষ্য করে বলেন: **'তোমার তো ভাল, আমার এইটাকে ভাল করে দাও দেখি'।**

কিসে ভাল হয়, ঔষধ (-পত্র দাও দেখি)।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের ঘোরে অপরের বুকে পা দিয়েছেন, সে' সম্বন্ধে এখন তাঁর ভাবনা হয়েছে। তিনি তাঁর আচরণের সমর্থনের জন্যই যেন বলেন: **'এটা বুঝছি (পা বুকে দেবার সময়) মহাবায়ু উঠছে—বুক দুড় দুড় করে—অজ্ঞান যখন চলে যায়—অথচ অপরাধ হবে কি, অপরাধ হবে কি'?**[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেন: **'এই ভিতরে কি (একটা) আছে'।**[৭]

৫। ২৪।১০।১৮৮৫ তারিখে শ্যামপুকুর বাটীতে সংঘটিত অনুরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীম'র মন্তব্য

৬। ২৩।১০।১৮৮৫ তারিখে অনুরূপ কৃপাবর্ষণের ঘটনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন, "কি একটা হয় আবেশে, এখন লজ্জা হচ্ছে। যেন ছুতে পার, আমি আর আমি থাকি না" (ক ১।১৬।৩)।

৭। তুলনীয়: শ্রীরামকৃষ্ণ ১।১।১৮৮৩ তারিখে বলছেন, "এর ভিতরে কে একটা আছে। সেই আমাকে দিয়ে এইরূপ করছে" (ক ৪।১।২)।

এই বিষয়টির অনুরূপ আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৭২ ও ৭৭৩

॥ শ্রীমা ও কামারপুকুর ॥

শ্রীমতী চামেলী বসু

(পূর্বানুবৃত্তি)

অমৃত-সাগরে অবগাহন করে বধূ সারদা ফিরে গেলেন জয়রামবাটীতে, আর ঠাকুর এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পিত্রালয়ে চার বৎসর অতিবাহিত ক'রে অষ্টাদশবর্ষীয়া সারদেশ্বরী দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে "আনন্দের হাট-বাজার" বসিয়ে দিয়ে চোদ্দ বৎসর লীলা করলেন। এই সময়ে পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি কামারপুকুরে গিয়েছেন এবং কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে গিয়েছেন চাতুর্মাস্য করতে।

১২৯৩ সালে ঠাকুর এই আনন্দের মেলা ভেঙ্গে দিয়ে নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে এক বৎসর ভীর্থে বাস করে জননী সারদেশ্বরী ১২৯৪ সালের ভাদ্র মাসে এসে উঠলেন কামারপুকুরের ভগ্ন কুটীরে। রামলালদাদা শ্রীমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন ঠাকুরের শয়নকক্ষ ও রন্ধনশালার একটু অংশ, জমি জায়গা সামান্য যেটুকু দিয়েছিলেন তার কোন বিলি-বন্দোবস্ত করে দেন নি ফলে সর্বহারা শ্রীমা নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় পড়লেন কিন্তু তিনি নির্দ্বিধায় এই পরিস্থিতি মেনে নিলেন। ঠাকুর যে বলেছিলেন, "আমি চলে গেলে তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাক ভাত খাবে আর হরিনাম করবে। কারও কাছে চিৎ হাত করো না তাহ'লে মাথাটাও বিকিয়ে যাবে"। ঠাকুরের এই প্রত্যাদেশ-পালনের জন্য তিনি এলেন। নিজ হাতে মাটি কুপিয়ে শাক বুনেছেন শ্রীমা, সামান্য যা ধান হ'ত তাতে চারটি ভাতের সংস্থান হ'ল, সব দিন নুনটুকুও জুটত না তার সঙ্গে। ঠাকুর যেমন যেপেছেন সেইমত রঘুবীরকে ভোগ নিবেদন ক'রে প্রসাদ পেয়েছেন। তিনি প্রসাদ লাভ করলেন ঠাকুরের, ঠাকুর তাঁকে বারবার দর্শন দিয়ে রামকৃষ্ণজ্যোতিতে তাঁর হৃদয় ভরে দিলেন, বাইরে যাকে হারিয়েছিলেন তাঁকে পেলেন অন্তরে, তিনি হয়ে উঠলেন রামকৃষ্ণময়। যখন তাঁর গঙ্গাস্নানের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, ঠাকুর সপার্ষদ এসে দর্শন দিলেন, দেখ'লেন গঙ্গা তাঁর চরণতলে, যেখানে ঠাকুর সেইখানেই গঙ্গা। শ্রীমা সেই দর্শন লাভ করে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন, আঁচলা আঁচলা ফুল নিয়ে সেখানে অঞ্জলি দিলেন। পরে যখন যোগীনমা কামার-পুকুরে এসেছিলেন, শ্রীমা তাঁকে ঐ দর্শনের কথা ব'লে বললেন, "ঐ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়েছিলেন,…ওখানকার ধুলো খাও, প্রণাম কর"। কামারপুকুরের প্রকৃত স্বরূপ মায়ের নিকট প্রতিভাত হ'ল, লোক নিন্দার ভয় দূর হ'ল তিনি থালা ও সরু লালপাড় ধুতি ব্যবহারে আর বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করলেন না। দীর্ঘ নয়মাস কাল তপস্বিনীর জীবন-যাপন করার পর এল আহ্বান, ভক্তদের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরই তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিশ্বজননীর আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পর বৎসর আষাঢ় কামারপুকুরে গিয়ে শ্রীমা আট-নয় মাস ছিলেন, এই দু'বারের মত দীর্ঘকাল আর কখনও তিনি কামারপুকুরে অতিবাহিত করেন নি।

ভক্তবৎসলা শ্রীমা কামারপুকুরে থাকা কালে সাধুসেবা ও ভক্ত সেবার যে সুযোগ পেয়েছিলেন দুঃখ দারিদ্রের মধ্যেও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। কামারপুকুরের লাহাবাড়ীর কন্যা ধর্মপরায়ণা প্রসন্নময়ী সে সময় এক উড়িষ্যাদেশীয় সাধুকে গোসাইমহলের বাইরে একটা চালায় আশ্রয় দেন। পল্লীর উদ্ধত যুবকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে তিনি ঐ চালা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, এবং অনুরাগী গ্রামবাসীদের আনুকূল্যে হালদার পুকুরের পাড়ে একটি ঘর বাঁধতে মনস্থ করেন। যেদিন কাজ শুরু করলেন, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হ'ল প্রবল বর্ষণ আসন্ন। শ্রীমা ঘরে বসে সেই মেঘ দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে কাতর ভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন: "ঠাকুর রাখ, রাখ, ওর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক, তারপরে যত পার ঢেলো"। মায়ের প্রার্থনা বিফলে যায় নি। অভাব অনটনের মধ্যেও শ্রীমা ঐ সাধুকে নিয়মিত ভোজ্যদ্রব্য যোগাতেন, সকাল বিকাল পুকুরে গেলেই তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন।

আর একবার কামারপুকুরে শ্রীমাদের কাছে গৌরীমা রয়েছেন। গৌরীমা একদিন দেখলেন এক বৃদ্ধ সাধু হালদার পুকুরের ধারে বৃক্ষতলে পড়ে আছেন, অনাহারে অত্যন্ত কাতর; গৌরীমাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন: "মায়ী, জগন্নাথধাম আর কতদূর? রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখলাম, পদ্মপলাশলোচন, দীর্ঘাকার এক পুরুষ বলছেন, কেন উপবাসে কষ্ট পাচ্ছ, আমি জগন্নাথ এখানে আছি"। গৌরীমা শুনেই মার কাছে এসে বললেন: "মা, দেখ তোমার কর্তার কাণ্ড," বলেই ঐ সাধুর বিবরণ দিলেন। শুনে শ্রীমা সেই সাধুকে ডেকে আনতে বললেন ও তিনি এলে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন রঘুবীর ও জগন্নাথ অভেদ অতএব রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করলেই জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাওয়া হবে। সাধু নিঃসন্দেহে সম্মত হলেন ও "গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তমহং ভজামি" বলে সেই প্রসাদ গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত হলেন এবং পরে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কামারপুকুরে সে সময়ে পূজার নবমীর দিন শ্রীমা নিজ হাতে রান্না করে মা শীতলায় ভোগ দিয়েছিলেন ও ভিক্ষাপুত্র শিবরামকে সঙ্গে নিয়ে ঐ প্রসাদ গ্রামবাসীদের পাতা পেড়ে খাইয়েছিলেন। দৈনিক অতিথিসেবা তিনি করতেন, অতিথিকে কখন ফিরিয়ে দিতেন না। এই সকল বিবরণ থেকে বোঝা যায় তীক্ষ্ণধী সারদামা তাঁর জমি জায়গার সুবন্দোবস্ত ক'রে আয় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কামারপুকুরে এইভাবে লীলা করে শ্রীমা কলকাতায় এসে সর্বজননী ও জ্ঞানদায়িনী গুরুরূপে ঠাকুরের কাজে অবতীর্ণ হলেন। পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে অর্থাৎ লীলা সংবরণের পূর্বে তিনি কামারপুকুরে বেশীদিন বাস করেন নি কিন্তু ঠাকুরের শয়নগৃহের সংস্কার ও গৃহদেবতার পূজার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

কামারপুকুরের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমায়ের শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল মন্দির নির্মাণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা এবং সেবার ভার ত্যাগী সন্তানদের ওপর ন্যস্ত করা। এই কাজে প্রতিবন্ধক ছিল, অর্থের অভাব এবং আত্মীয় ও গ্রামবাসীদের অসহযোগিতা। শ্রীমায়ের অনুগত ভক্তদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন গ্রামের মাতব্বর লাহাবাবুরা হয়ত ঠাকুরের

মন্দির নির্মাণে বাধা দেবেন তাই একদিন একজন শ্রীমাকে বললেন, "ঠাকুর মঠ মন্দিরের জন্য বসে নেই অন্যান্য জায়গায় বহু মঠ মন্দির হয়েছে।" শুনে শ্রীমা ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন : "ওকি কথা গো? ঠাকুরের জন্মস্থান পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান, তীর্থভূমি, ও কথা কি বলতে আছে"? শ্রীমায়ের লীলাবসানের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ১৩২৫ সালের ১১ই শ্রাবণ শ্রীমা স্বয়ং দলিলে স্বাক্ষর ক'রে বেলুড় মঠের হাতে মন্দির সংক্রান্ত কার্যভার দেন। কথা পাকাপাকি হচ্ছে শুনে লক্ষ্মীদিদি শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব করেছিলেন যেন তাঁর দুই ভাই রামলাল ও শিবরাম বংশানুক্রমে ঠাকুরের সেবাইত হতে পারেন। শ্রীমা বীরভাবে যে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন তার ওপর আর কথা চলল না। মা বললেন, "তা কি করে হবে? আমাদের ত সব ভক্ত নিয়েই কারবার, আমার সন্তানরা সব সাধু ভক্ত, তাদের কি জাতের বিচার আছে? কত দেশের লোক সাহেব সুবো ওখানে আসবে, থাকবে, প্রসাদ পাবে। তোরা সংসারী, তোদের সমাজ আছে, তোদের কি ওদের সঙ্গে থাকা চলবে"? ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের ঘর ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি কিনে মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মে ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়।

শ্রীমা বলতেন : "ঠাকুরের বাসস্থানে গিয়ে বসে তাঁর কথা চিন্তা করবে, সেখানকার ধুলো নিয়ে যাবে, মাথায় দেবে।"

●

। 'গুরুরূপে হৃদয়দেবতা' ।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

তুমি জান, সেদিনের লীলার মাধুরী,
হেরি তব সৌম্য দীপ্ত সহাস বদন ;
অকস্মাৎ যবে আমি উঠিনু শিহরি'
ছিন্ন করি' তমিস্রার গাঢ় আবরণ।

দেখিনু নয়ন মেলি' জীবন প্রভাতে
অবতীর্ণ গুরুরূপে হৃদয়-দেবতা
নাশিতে অজ্ঞান-তম জ্ঞানদীপ হাতে
শুনাতে অভয় বাণী ব্রহ্মতত্ত্ব কথা।

সংশয়-চঞ্চল চিত্তে তোমারি সে' বাণী
অবিদ্যার ঘন-ঘোর অন্ধকার হতে,
মুক্ত করি' জীবনের সর্ব মোহ গ্লানি
তুলিয়া ধরিল মোরে কী দিব্য আলোতে।

অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্ত হলো শান্তি ভরা,
তোমারি চেতন-স্পর্শে বুঝিনু নিমেষে ;
মানবের মাঝে সুপ্ত দেবত্বের ধারা
ব্রহ্মজ্ঞানে অনুকৃত হয় সর্বশেষে।

●

অভেদানন্দ-স্তুতি

শ্রীশচীনাথ দরিপা

নম্র হুই পায় তীক্ষ্ণ তুষারে
কে যায় তীর্থে ধবল-তুঙ্গে
অটল উন্নত, চির-বেদান্তী
অভেদানন্দ, অলৌকিকী প্রজ্ঞা।

বইছে ছলছল্ গঙ্গা গৈরিক
কে গায় কূলে তার মাতৃ-সঙ্গীত
রচি স্তব গান ললিত ছন্দে
অভেদানন্দ, অলৌকিকী প্রজ্ঞা।

'একটু ছিল বাকী পূর্ব-সাধনার
পূর্ণ করতে তা শেষ এ জন্ম'
আশিস করি গুরু দিলেন মন্ত্র—
অভেদানন্দ, অলৌকিকী প্রজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণে শিষ্য
জ্যেষ্ঠ গুরুভাই বিবেকানন্দ,
সত্য শাশ্বত, নব প্রবক্তা
অভেদানন্দ, অলৌকিকী প্রজ্ঞা।

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(১৪)

আধুনিক শিক্ষা নারীকে স্বাবলম্বী হ'তে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বাইরের পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াতে। প্রতিষ্ঠা দিয়েছে নানা অর্থকরী বৃত্তিতে। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব, কোথাও বা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার বিকৃত অনুকরণ দেখে মনে হয়—আধুনিক শিক্ষা এখনো নারীসমাজকে আত্মস্থ হতে শেখায়নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ যে আমরা জাগতিক উন্নতি, বিজ্ঞান-প্রদত্ত ভোগবিলাস, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করছি—সে-সম্পর্কে কিন্তু আমেরিকা ইউরোপের ইতোমধ্যেই মোহভঙ্গ ঘটেছে। আমেরিকার মানুষের জীবনে প্রাচুর্যের বর্ণনা দিয়ে মেরী লুই বার্ক বলছেন : "ঐহিক উন্নতির সঙ্গে আপনা থেকেই আধ্যাত্মিক সুখ ও সামাজিক শান্তির যে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল—তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। জীবনে সম্ভোগ অবশ্যই আছে কিন্তু নেই আসাদ এবং যা আছে তা হল ভয়ঙ্কর নৈরাশ্য।" ইহ-সর্বস্ব পাশ্চাত্যের এই পরিণামের কথা স্বামীজী জানতেন। তাই আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আধুনিক শিক্ষার ফলে নারীসমাজ কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক বন্ধনমুক্তিস্বাদ লাভ করলেও—সমগ্র নারীসমাজকে সেজন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে তা কিন্তু ভয়াবহ। মেফিস্টোফিলিসের কাছে আত্মা বন্ধক রেখে এ যেন ফাউস্টের ভোগসুখের সন্ধানী হওয়ার মত। শুধু দেহমনে তো মানুষ পূর্ণ নয়। আত্মাই যদি বাঁধা পড়ল শয়তানের কাছে, তাহলে আর কী থাকল! তাই একালের এইসব অত্যাধুনিক নারী যথার্থ সুখ সুন্দর জীবন রচনার দায়দায়িত্ব আজও নিতে পারল না। বেশভূষায় চলায় বলায় আচার-আচরণে এই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-এর ফল ফলতে শুরু করেছে। অতি সাম্প্রতিককালে এই কলকাতা সহরেই অত্যাধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েরা যে পোষাক পরিচ্ছদে বেশভূষায় এবং আদবকায়দার নমুনা সঙ্গে নিয়ে পথে ঘাটে ঘরে বাইরে বের হন—সেটা আর যাই হোক, কোনো সুরুচির পরিচয় বহন করে না। মনুষ্যত্ব এবং অন্যান্য মানবিক গুণরাশির কথা তো ছেড়েই দিলাম।—অথচ উপযোগ, নান্দনিক উৎকর্ষ ও সামাজিক মূল্যবোধ সবদিক থেকেই ভারতীয় শাড়ী দেশ-বিদেশে সর্বত্রই সুধী-সজ্জনের অভিনন্দন লাভে ধন্য। বিদেশিনীরা যখন শালীন ও রুচিরম্য শাড়ীর আবরণে ক্রমেই নিজেদের বেশী করে সজ্জিত করছেন আমরা তখন বীভৎস পুরুষালী পোষাকে নিজেদের বিকৃত কিম্ভূতকার করে সাজিয়ে হাস্যকর গোলামীর পরিচয় দিচ্ছি। নদীকে তার উৎসে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—এবং তা কাম্যও নয়। সম্ভবও নয়। প্রাচীনকে আর আবাহন করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় না। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। তাছাড়া অন্ধ অনুকরণের মধ্যে যে বিলুপ্তির বীজ লুকিয়ে আছে। তাই সেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পাশ্চাত্যের ভয়াল গ্রাস থেকে দেশকে ও জাতিকে রক্ষা করতে সতর্ক সাবধানবাণী রেখে গেছেন। "আমরা নির্বোধের মত অন্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি।.....বাহ্য সভ্যতার উৎকর্ষ আবশ্যক, প্রয়োজন

বেঁচে থাকার নানা উপকরণ সংগ্রহের। এমন কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।".....সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন: "যদিও ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত যত্নরাজি ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়; অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাতে আ-সাধারণ সকলে তাহাদের নিজধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়া বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান-বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

কিন্তু স্বামীজীর এই মহৎ বিশ্বাসের মর্যাদা আমরা রাখিনি। তাঁর আশঙ্কাটাই যে এমন করে সত্য হয়ে উঠবে জাতির জীবনে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। শিক্ষার যাদুকরী শক্তিতে স্বামীজী বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন সব সমস্যার সমাধান একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু বলাবাহুল্য, সে এই বর্তমানের বিদেশী শিক্ষাধারা নয়। "যে শিক্ষায় চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন। সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তিই তাঁর আদর্শ। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা এক বন্ধন থেকে মুক্ত করে অন্য হাজারো বন্ধনে যে আমাদের আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।" আধ্যাত্মিক জাগরণের মাধ্যমেই জগতের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব। এবং তারই নাম স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা। যে সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনীতি আত্মা ও মনের উপর শরীরের বন্ধন দৃঢ় করে, স্বামীজী তাকে সহ্য করতে পারতেন না। অথচ আজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাই ঘটছে।—

তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়। ভারতীয় নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—তার স্বার্থশূন্যতা, সর্বংসহা নিত্য ক্ষমাশীলতা, স্নেহ-কোমলতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীর কর্মশক্তি, স্বাবলম্বিতা ও নির্ভীকতার মিলন ঘটুক তাহলেই আদর্শ নারীসমাজের সৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমানের এই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা, উন্নাসিক বাচালতা এবং পাশ্চাত্যের উন্মাদ অন্ধ অনুকরণ আমাদের সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে।" স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের সাহসী, স্বাবলম্বী ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হোক; ব্রহ্মচর্যের আদর্শে তারা ছেলেদের মতই বেড়ে উঠুক। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তারা হয় ত্যাগী হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে বাঁপিয়ে পড়ুক, অথবা স্বয়ংবরা প্রথায় মনোমত পতি নির্বাচন করে সংসারে প্রবেশ করুক। এরপরে নিজেকে আদর্শ জননী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুক তারা; একদিকে বীর-প্রসবিনী, অন্যদিকে সমাজকল্যাণে নিবেদিতা। ভারতে আশ্চর্য লাগে সন্ন্যাসী হয়েও তিনি স্বয়ংবরা প্রথাকে সবচেয়ে সমর্থন করতেন। অসবর্ণ, আন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিবাহের তিনি

সমর্থক ছিলেন। মোটকথা মানুষ হয়ে ওঠা এবং মানবকল্যাণ এই দু'টি আদর্শের অনুসৃতি ঘটলে জীবন অনায়াসে পূর্ণের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতে পারে এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস।

আশাবাদী স্বামীজী বিশ্বাস করতেন আগামীকালের নারীর মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব প্রাচীনযুগের শ্রেষ্ঠতমা মহীয়সী নারীদের কীর্তিকেও ছাড়িয়ে যাবে। আগামীকালের নারীর মধ্যে থাকবে বীরত্ব, কর্মৈষণা-কর্মতৎপরতা, সাহস ও মহৎ সংকল্প, এবং সঙ্গে থাকবে জননীর স্নেহ কোমলতা, পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার স্পৃহা। স্বামীজী তাই বলেছেন: "শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারীজাগরণের উদ্বোধন ঘটবে। শ্রীশ্রীমা একদিকে সীতা-অরুন্ধতীর মতো পতিপ্রাণা, অন্যদিকে দৌপদী-সাবিত্রীর মত তেজস্বিনী, আবার গার্গী-মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবাদিনী। .....প্রচণ্ড জ্যোতি, যে জ্যোতিতে দাহের জ্বালা নেই, আছে অসীম শক্তি ও তেজের বিকাশ—সেই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হওয়াতেই নারীজাগরণের যথার্থ বিকাশ। শ্রীশ্রীমা এই আদর্শটি স্বীয় জীবনে দেখিয়ে গেলেন।" নারীজাগরণের এই মহৎ আদর্শ সম্মুখে রেখেই স্বামীজী বলেছেন, "জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই।"

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বন্ধন: প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতা আমাদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয় চেতনা স্ফুরণের অন্তরায়। ফলতঃ যে পথে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমস্ত মানুষের হৃদয়ে পূর্ণতার উদ্বোধন সম্ভব—সেই সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির পথেরও বাধাস্বরূপ। গুরুশিষ্য দুজনেই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সফলতা অর্জন করে "একজাতি একপ্রাণ একতার" অন্বয়কে ত্বরান্বিত করে দিয়ে গেছেন। গুরুর জীবনেও যেমন—শিষ্যের জীবনেও তাই। এইসব প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ঠাকুর তো সেই শৈশব থেকেই সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের বন্ধু। খ্রীষ্টের মত তিনিও কামার-কুমোর, গ্রামের জেলে-জোলা-তাঁতি-বাগদী প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষদের প্রিয়-সখা জীবন-সহচর করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অব্রাহ্মণ অন্ত্যজের সংখ্যাই বেশী। অথচ সবাই ছিলেন তাঁর সন্তানের মত। সবার হাতে সবার সঙ্গে তিনি খেতেন। তিনি দত্তের ছেলে নরেনের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত খেয়েছেন। গুরু তোতাপুরী একবর্ণ বাংলা জানতেন না। ঠাকুরও হিন্দী জানেন না। অথচ গুরু-শিষ্যের আজীবন সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা-ভালোবাসার গভীরতম এবং মধুরতম সম্পর্ক। একালের সর্বনাশা প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধেই যেন এটা একটা ব্যবহারিক শিক্ষাদান। গুরু তোতাপুরীর নামেই সঙ্ঘের নাম পুরী-সম্প্রদায়। খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের তপস্যাকালে তাঁর আচার-আচরণের কথা আজ সর্বজনবিদিত। এই গুরুই শিষ্য বিবেকানন্দ স্বামী। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান-যবন-চণ্ডাল জাতী অন্ত্যজ—দেশী-বিদেশী কোনো ভেদাভেদ নেই তাঁর কাছে। বিদেশিনী, ম্লেচ্ছের কন্যা মার্গারেট নোবেল এক মুহূর্তে প্রেমের অভিষেকে খুকী হয়ে গেলেন সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর কাছে। কোলে বসিয়ে নরেনের মেয়েকে মুড়ি খাইতে দিতেন। খাবার পর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে দিতেন। অসুস্থ মার্গারেটকে স্বীয় কন্যার মতই শুশ্রূষা করতেন। তুর্কে মুসলমান—তাকেও আমজাদ পুত্রস্নেহে আদর করে কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন

জগজ্জননী সারদা দেবী। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে তাঁর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে দিতেন। "শরৎ ও আষাঢ় যেমন ছেলে—আমজাদ ও আমার তেমনি ছেলে"—এই উক্তিও শ্রীশ্রীমায়ের। মাতৃস্নেহের মাধুর্যে হিন্দু-মুসলমান, সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখার এই আদর্শ রেখে গেছেন মা। আর ঠাকুর তো ম্লেচ্ছধর্মের প্রবর্তক ঈশামসীহকে অবতাররূপে দেখে প্রণতি জানালেন। অবশ্য একটি একান্ত অনুভবে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন ধ্যানের গভীরে।

জীব-শিবতত্ত্বে বিশ্বাসী স্বামীজী এই গুরুরই চেলা। শুধুমাত্র হিন্দুদের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রতিই নয়, মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও সমান শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন স্বামীজী। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই শুধু ইসলামধর্ম সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাই নয়, সমগ্র জাতিগঠনের কর্মযোজনায় স্বামীজী মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এবং অন্য ভাষাভাষীদেরও সমভাবে ডাক দিয়েছিলেন এবং জাতীয় কর্মযজ্ঞে সমানভাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজীর ভারত হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলের মিলিত দেশ। তাঁর নববেদান্তধর্ম সর্বমানবের কল্যাণে ব্রতী। মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত স্বামীজীর পত্রটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। "আমার দৃঢ় ধারণা যে বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম-পরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত কর্ম-পরিণত বেদান্তধর্ম মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।.....আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া .....মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" আর যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তো স্বামীজীর শ্রদ্ধার শেষ নেই। 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট'-সহ ৬টি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করেছেন স্বামীজী যীশুকে নিয়ে। বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায় ৩৯৪ বার খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ সহ খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁর ধর্ম প্রসঙ্গ নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন স্বামীজী। বার বার স্বামীজী তাঁর রচনাবলীর মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য নিবেদন করেছেন। আজও রামকৃষ্ণ মিশনে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। মুসলমানদেরও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে সন্ন্যাসে দীক্ষার অনুমোদন করে গেছেন। বর্তমানে মিশনে বেশ কয়েকজন মুসলমান সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী রয়েছেন। খ্রীষ্টান ছিলেন একদা—এরকম সাধু-সন্ন্যাসী তো মিশনে রয়েছেন অনেকজনই। সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে সর্বধর্মের লোক নিয়েই যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে তাই নয়, সমস্ত ধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিতরই ভবিষ্যত মহাভারতের উন্নতি ও মুক্তি—স্বামীজী একথা বিশ্বাস করতেন।

●

।। ভারতসংস্কৃতি ধারায় কৃষ্ণচেতনা ।।

ডক্টর শ্রীকল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ভারতীয় পণ্ডিতদের ওপর ওয়েবারের প্রভাব ॥

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে। ভারতীয় ভক্তিমার্গের কেন্দ্রপুরুষ ও অবলম্বন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে যীশুখ্রীস্টের জীবনভিত্তিক প্রভাবের দ্বারাই বিবর্তিত হয়েছিলেন এবং তিনি যে সেই ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র এই তত্ত্ব যেমন ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে ইলিয়ট (Hinduism and Budhism, Vol. II), গোল্ড (Visnu, Utrecht) ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত হ'ল তেমনি ভারতীয় লেখকদের মধ্যে গোবিন্দাচার্য স্বামী (Journal of the Royal Asiatic Society (London) 1911) এবং পরশুরাম চতুর্বেদীও (বৈষ্ণব ধর্ম হিন্দী—) এই মতবাদের দৃঢ় সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এদের সকলকে অতিক্রম করে গেলেন প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার। তিনি তাঁর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর Strassburg থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems-গ্রন্থে এই মতবাদকে এক চূড়ান্ত রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে শিশুভগবান কৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনী আভীর বা আহির নামে পরিচিত একশ্রেণীর গোচারণবৃত্তিধারী উপজাতীয়দের দ্বারা প্রসারলাভ করেছিল। এই আভীরেরা ছিল একশ্রেণীর যাযাবর মানুষ : এরা খ্রীষ্টীয় সমাজে প্রচলিত খ্রীষ্ট সম্পর্কিত নানা কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। এরা সেই সব কাহিনীর সঙ্গে খ্রীষ্ট নামটিও নাকি বয়ে এনেছিল। এবং ধ্বনি সাদৃশ্যে এই খ্রীষ্টই শিশুভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে এক বলে পরিগণিত হয়েছিল। [It is possible that they brought with them the name of Christ also and this name probably led to the identification of the boy-god with Vasudeva Krisna.] তিনি আরও অনুমান করলেন যে কৃষ্ণ-কাহিনীর গোপিনী-বৃত্তান্ত সুন্দর ও সুগঠন আকৃতিবিশিষ্ট আভীর কুলকন্যাদের উপর ভিত্তি করেই বিবর্তিত হয়েছিল। গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যেও পণ্ডিত ভাণ্ডারকার তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে নীতিবোধ সম্পর্কে শিথিল আভীর রমণীদের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছিলেন। [The dalliance of Krisńa with cowherdesses which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion was also an aftergrowth, consequent upon the freer intercourse between the wondering Abhiras and their more Civilised Aryan neighbours. Morality cannot be expected to be high or strict among races in the condition of the Abhiras at the time ; and their gay neighbours took advantage of its looseness.] অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, বিস্ময়কর সব যুক্তি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়ার বেশ কিছুদিন পূর্বেই লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Royal

Asiatic Society-র Journal-এ (১৯০৭) ভাণ্ডারকারের ভারতের সংস্কৃতির ব্যাপক ভিত্তি এই ভাগবত ধর্ম সম্পর্কিত মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং বৃন্দাবনের ভগবান কৃষ্ণ আশ্রিত ভাগবত ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে এই দুজ্ঞেয় তথ্য প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি আত্মপ্রকাশ করতেও বিলম্ব হয়নি। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি এই গভীর আনুগত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে Knight hood-এ বিভূষিত করে ভাণ্ডারকারের এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করা হয়। এই ভাবেই সংস্কৃতির জগতে ভারত-মানসের উদ্ভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন পূর্ণব্রহ্মরূপে গণ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্ম পাশ্চাত্য থেকে সমাগত খ্রীষ্টীয় ধর্মেরই প্রতিচ্ছবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ভারতে ইতিহাস চর্চা করে যে দুজন পারদর্শী পণ্ডিত 'নাইট' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার তাদের অগ্রণী ; এবং ভারত সংস্কৃতির মূল্যায়নে তার এই অবদান ঔপনিবেশিক ইংরাজ রাজশক্তির অপার গুণ-গ্রাহীতারই পরিচায়করূপে গণ্য হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওয়েবার তার মতবাদ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রচার করতে শুরু করলেও সেই মতবাদের তেমন প্রতিবাদ হয়নি যা ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্তই দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে তা খণ্ডিত হয়নি। অবশ্য খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লোরিনসারের গীতার উপর বাইবেলের প্রভাব সম্পর্কিত মতবাদ সুপ্রযুক্ত যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেন। ইলিয়াড কাব্য থেকে রামায়ণের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছিল ওয়েবারের এই মতেরও (Uber des Ramayanam, 1870) তেলাঙই প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন (1873)। এই প্রতিবাদের ভিত্তিতে কিন্তু ওয়েবার তার মত থেকে প্রতিনিবৃত্ত হননি। (Indian Antiquary-IV, 1875)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে' ওয়েবারের মতবাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ করলেও ভাগবতীয় গোপিনীঘটিত কাহিনী সম্পর্কে তাঁরও সন্দেহ ছিল, এবং তিনি ঐ কাহিনী সমূহকে প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল সত্যানুসন্ধানে আধুনিক (অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধরনের) রীতির তুলনা ও বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খুব জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ১৮৮৩ সালে বোম্বাই-এর প্রার্থনাসমাজের এক সভায়। এই যুক্তিবাদের পথ অনুসরণ করেই তিনি বৈষ্ণব ভক্তিধর্মকে খ্রীষ্টধর্মের ছায়াবলম্বনে বিবর্তিত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। অবশ্য এর অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র ওয়েবার প্রবর্তিত মতবাদের যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। এরপর প্রখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বৈষ্ণব ধর্মের ও খ্রীষ্ট ধর্মের তুলনা করে উভয়ের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের প্রয়োগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এরপর অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর সুপরিচিত Materials for the Study of the early History of Vaisnava Sect নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উপর খ্রীষ্টীয় প্রভাবকে উপযুক্ত যুক্তি বিচারের দ্বারা খণ্ডন করেছিলেন।

একদিকে যেমন বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উপর একশ্রেণীর পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অন্য দিকে আর একশ্রেণীর পণ্ডিত ঐ ভক্তিবাদের উপর সুফী মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন দেখা যায়। তবে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম যে সুফীমতবাদের প্রভাবপ্রসূত এ তথ্য প্রমাণ করা তেমন সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদেরা যে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিল এ তথ্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কোন দেশীয় ভারততত্ত্ব জিজ্ঞাসু দ্বারা উচ্চারিত হতে বড় দেখা যায় না। বরং প্রায় সমস্ত দেশীয় ভারততত্ত্ববিদেরাই পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণে পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তেরই অনুসরন করেছেন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ লাহার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যারা পাশ্চাত্যরীতিতে পাশ্চাত্যধারার যুক্তিবিচার প্রয়োগ করে ভারততত্ত্বের চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন নরেন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম। তিনিই প্রথম একথা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বহিরঙ্গ বিচারেই তৎপরতা দেখিয়েছেন। কদাচিৎ তাঁরা এই ধর্ম ও সাধনার অন্তরঙ্গ ও গভীরতায় প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারত সভ্যতার কালনির্ণয়ে প্রায় সর্বদাই এই সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে প্রমাণ করবার কৃতঘ্ন প্রয়াস করেছেন দেখা যায়। (The western scholars have been Chiefly interested in the outer element of Indian religions and not their inner elements of spirituality and Sadhana .. ..western scholars have tried to prove, as far as possible the comparatively lated date of our civilization and that they picked up the pen with a questionable motive to cast doubts upon facts which constitute an object of pride to the Indians!—Studies in Indian History and Culture, Calcutta 1925.)

পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর লাহার এই উপলব্ধি ভারতীয় ভারততত্ত্বজিজ্ঞাসুদের মধ্যে এখনও তেমন দেখা দেয়নি। পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিচারে যেভাবে যে সব যুক্তি প্রয়োগ করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই ধরনের যুক্তি ও বিচারের সাহায্যেই তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা যায়। সে চেষ্টা উপযুক্ত ভারতীয় ইতিহাসবেত্তারা বড় একটা করেননি। তবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর বিস্ময় যে অনেকের মনেই সংগুপ্ত রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারত সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণশক্তি শ্রীকৃষ্ণচিন্তা যে এমনি এক বিস্ময় যার কোন প্রত্যয় যে এখনও হয়নি বারংবার কৃষ্ণচেতনা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াসই তার প্রমাণ। Eliot ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তার Hinduism and Buddism নামে পুস্তকে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব 'ভক্তিধর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে J. Gonda তার সুপ্রচারিত Visnu নামে গ্রন্থে মহাভারতে উপস্থাপিত বাসুদেব কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনে গোপজনাধ্যুষিত লালিত কৃষ্ণ যে এক নন

এই যুক্তি উত্থাপন করে কৃষ্ণবিষয়ক বিতর্ককে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। Aspects of Early Vaisnavism নামে সুবৃহৎ গ্রন্থে তিনি বাসুদেব কৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিবর্তনের বিস্তৃত রূপরেখা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন।

এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন করে ঔৎসুক্যের কিছু বিরাম ঘটেনি। যদিও ওয়েবার ও ভাণ্ডারকার এই শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্মকে খ্রীষ্টধর্ম প্রভাবে উদ্ভূত এবং ভারতে আভীর সম্প্রদায় কর্তৃক আনিত এবং প্রসারিত এই তথ্য প্রচারের দ্বারা শেষ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন বলে বিবেচনা করেছিলেন তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণ-ভাবনা নিয়ে বিস্ময় ও বিচার বিশ্লেষণের কোন অবসান ঘটেনি। সম্প্রতি আমেরিকা অধিকৃত হাওয়াই দ্বীপ থেকে Milton Sangar সম্পাদিত (১৯৬৬) Krishna, Myths, Rites and Attitudes নামে একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থিত সংগ্রহ থেকেই কৃষ্ণ যে এখনও কি পরিমাণে ঔৎসুক্য ও বিস্ময়কে জাগ্রত রেখেছেন তা প্রমাণ করেছে।

॥ ভারতজিজ্ঞাসায় নূতন চিন্তা ॥

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সুপ্রাচীন কাল-বাহিত খ্রীষ্টীয় পরিবেশই ক্রিয়াশীল ছিল। কিছুদিন হল ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির বিচারের পাশ্চাত্যের অন্য এক বিশ্লেষণধর্মী গোড়া মতবাদ সক্রিয় হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। কার্লমার্কস্ প্রবর্তিত কমিউনিজম নামে পরিচিত এই মতবাদ সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিবর্তনকে নূতন করে পরীক্ষার প্রয়াস প্রচলন করেছে যা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গকেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ ও সেই বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রণোদিত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কিছু কিছু বিশ্লেষণমূলক পরিচয় দিতে বেশ কিছু মার্কসীয় ঐতিহাসিক তৎপর হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণতত্ত্বও তাদের দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। ডি. ডি. কোশাম্বী ছিলেন এই মার্কসীয় বিশ্লেষণবাদীদের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি প্রারম্ভিক চর্চার দিক থেকে ছিলেন গণিতজ্ঞ। পরে ইতিহাসবেত্তা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার তাঁর Vaisnavism Saivism etc. গ্রন্থ রচনায় কোশাম্বীর কাছ থেকে কিছু উপকরণ প্রাপ্তির ঋণ স্বীকার করেছিলেন। স্বভাবতই মনে হয় ভাণ্ডারকারের মতবাদের কিছু প্রভাব হয়ত কোশাম্বীর উপরও ছিল। পরে কোশাম্বী ভগবদ্গীতা অবলম্বন করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। [Avatara Syncretism and possible sources of the Bhagavatgita—Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society, XXIV—XXV ; Social and economic background of the Bhagavadgita—and the Social functions of the same, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. IV.] এই সব প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের উপর নানা বিপর্যয়কর প্রভাব এবং কিভাবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ধর্মকে জনগণের পরিচালনের এবং শোষণের কাজে ব্যবহার করেছিল তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দেখা যায়।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ভারতসংস্কৃতি চর্চার এই বিবর্তন নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্বানুরাগী যে অনুশীলনপর্বের (descipline) ভেতর দিয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুসরণে অগ্রসর হন তাতে বর্তমানে অনুশ্রিত একদেশদর্শিতা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। ইতিহাস-বিবর্তনের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতি এবং তার পেছনে কোন অমোঘগতি-নির্দেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তাদের এখনও কোন সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করেনি। বহুদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যে ইতিহাস ছিল মূলত বস্তুবিবাদের ঘটনার বিবরণ। পরে ইতিহাসের অন্তরালে কিছু মানবতাবাদী ধারণার সন্ধান হতে থাকলেও বর্তমানে প্রজ্ঞাবাদী মার্কসীয় দর্শানুগামীরা ইতিহাসকে তাদের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত-চেতনার এবং ভারতীয় জ্ঞানপ্রজ্ঞার চিরোৎসারিত সাধনমননের এবং এই সাধনমননের অন্যতম অবলম্বন 'মহাভারততত্ত্বধার' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যেতে পারে।

●

॥ বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে বর্ষা ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

বৈষ্ণবমহাজনগণের সাহিত্যসর্জনা বাঙালীর প্রাণের সম্পদ। বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য কেবল বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে নয় বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আজ যুগজীব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মহাকাল তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবপদসাহিত্যে ঋতুপ্রকৃতি বিচিত্র-রুচির। ঋতুসমূচ্চয়ের মধ্যে সেখানে বর্ষা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সে বর্ষা আসিয়াছে প্রধানতঃ অভিসার ও বিরহকে কেন্দ্র করিয়া। সে বর্ষায় অনেক মেঘ, অনেক গর্জন, অনেক বিদ্যুৎ, অনেক অশনিপাত এবং ঘন-গহন-অন্ধকার। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবগোস্বামীর প্রথমশ্লোকে বৃন্দাবিপিনের উপর আকাশে মেঘেমেঘে মেদুরতার উল্লেখে লিখিয়াছিলেন 'মেদৈর্মেদুরমম্বরম্'।

চণ্ডীদাসের রাধাসন্নিধানে এক কৃষ্ণাভিসারের পদ। রাধা অভিসারে আসিতে পারেন নাই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছেন অভিসারী। সে এক ঘোর রাত্রি। মেঘের ঘন আড়ম্বর। তাহাতে ধারাপাত। কৃষ্ণ সর্বাঙ্গে সিক্ত পরিপ্লুত হইয়া রাধার অঙ্গনবর্তী। রাধা হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠেন, সে উক্তিতে বর্ষা-বর্ণনা ও কৃষ্ণদুঃখদর্শনে আপনার আর্তি উভয়ই প্রকাশিত :

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

চণ্ডীদাসের মতো বিদ্যাপতিতেও বর্ষা আছে। তাহার আরম্ভ অভিসার-সময়ে। কৃষ্ণ আপন কুঞ্জে থাকিয়া রাধাভিসারের কাঠিন্য স্মরণ করিতেছেন। এমন অন্ধকার যে মনে হইতেছে যেন রাত্রি সঞ্জিত হইয়াছে কজ্জলে। জলদদল ঘন হইয়া আসিয়াছে, বর্ষণ করিতেছে জলধার। এ সময় দূরপথের গমনাভিসার কঠিন :

কাজরে সাজলি রাতি।
ঘনতএ বরিসএ জলধর পাঁতি॥
বরিস পয়োধরভার।
দূরপথ গমন কঠিন অভিসার॥

বিদ্যাপতি বিহিত আর এক রাধাভিসারের পদে দেখি সেখানে শর্বরী এমনই সন্ত্রাসিনী যে মনে হইতেছে সে যেন কাজল বমন করিতেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; কিন্তু সে মেঘ বিদ্যুৎ-বিহীন। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিকালোকে পথ দেখিবার উপায় নাই। অভিসারের আশার সংশয় সমুপস্থিত :

কাজর রুচ বমন জনি রাতি। অইসন বাহর হোইতে সাতি॥
তড়িতহ তেজলি মিত আঁধিয়ার। আসা সংশয় পক্ষ অভিসার॥

ত্রিপদী-ধ্রুবলিত বিদ্যাপতি-রচিত অন্য এক পদে দেখি তখন বর্ষা-বিভাবরী নিদারুণ অন্ধকারে কোমলাবলা রাধিকা চলিয়াছেন অভিসারে। পথে পথে সহস্র নিশাচরের সঞ্চার। তাহার উপর সঘনবর্ষণ :

বারিস জামিনী কোমল কামিনী
দারুণ অতি আঁধিয়ার।
পথ নিশাচর সহসে সঞ্চর
ঘনপর জলধার।

বিদ্যাপতি-ভণিত মাথুর-বিরহের পটভূমিকায় বর্ষার এক নূতনরূপ। সেখানে তাপিনী রাধা একাকিনী সজি-বিরহিণী হইয়া রহিয়াছেন মন্দিরে। তখন বর্ষাপ্রবেশ। 'বরিসা পয়বেস।' নবীন মেঘের দল চারিদিক ঝাঁপিয়া আসিয়াছে। 'নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল।' মিলনের শুভমুহূর্তে প্রিয়-বিরহে রাধিকার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। তাহার উপর মেঘের 'ঘন ঘন গরজিত'। আরো আছে, পাপিয়া পিউ পিউ ডাকিয়া প্রিয়াকে আলিঙ্গন দিতেছে, আর তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে কেহ নাই। 'পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙর ভ্রমি ভ্রমি দেই তনু কোর'।

বিদ্যাপতিরচিত বর্ষাবিরহের এক অনুপম পদ এখানে আমরা উৎকলন করি :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর অন্তি সন্তি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন　　কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া।
হুলিশ শত শত　　পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি　　ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি　　ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ　　কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

—'হে সখি আমার দুঃখের অবধি নাই। এই ভরা বাদলের ভাদ্রমাসে আমার মন্দির শূন্য। মেঘসমূহ কাঁপিয়া আসিয়াছে, অবিরত গর্জন করিতেছে, ভুবন ভরিয়া তাহার বর্ষণ-ধারা। এমন সময় প্রিয় আমার প্রবাসী জন। দারুণ মদন প্রখর শর হানিতেছে। শত শত বজ্রপাতে আনন্দিত ময়ূর নৃত্য করিতেছে। মত্ত দাদুরী ও ডাহুকী ডাকিয়া চলিয়াছে। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তিমিরে পরিপূর্ণ ঘোর রাত্রিতে অস্থির বিদ্যুতের চমক। বিদ্যাপতি বলিতেছেন রাধা হরি বিনা তুমি কি করিয়া দিবস-শর্বরী অতিবাহিত করিবে।'

ভাদ্র দিনের ভরা বাদল। বর্ষা এখানে নিবিড় করিয়া আসিয়াছে। গর্জনে বর্ষণে অশনিপতনে চপলাচমকনে বর্ষা ঘনঘোর। তাহার উপর আনন্দিত ময়ূরের নৃত্য, উন্মত্ত দাদুরী-ডাহুকীর উল্লসিত রব। পথিকপ্রিয়া বিরহিণীর নিকট সর্বত্র যেন সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের জালপাতা।

জ্ঞানদাসের এক অভিসার-পদে বর্ষা। মেঘময়ী যামিনী। অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে। বিদ্যুৎ সব দিক ব্যাপিয়া চমকাইতেছে। খরতর মেঘে ঝর ঝর বর্ষণ।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার। ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশদিক আপি। নীলবসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥
দুইচারি সহচরী সঙ্গহি নেল। নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিষত ঝর ঝর খরতর মেহ। পাওল সুবদনি সঙ্কেত গেহ॥

যেমন অভিসারের পদে তেমনি উৎকণ্ঠিতা ও মাথুরের পদেও বর্ষা। উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা মেঘ-গর্জিতা দামিনী-চমকিতা রজনীর কথা বলিলেন। ভাষা বাঙলা :

ঐ ঘোর রজনি　　মেঘ গরজনি
কেমনে আয়ত পিয়া।
সেজ বিছাইয়া　　রহিনু বসিয়া
পথপানে নিরখিয়া॥
... ...
দহুরে দামিনী　　ঘন ঝলমলি
পরাণ যাবারে হানে।

তুলনীয় :

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
... ...
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥—চণ্ডীদাস

মাথুরের পদে জ্ঞানদাস বলিতেছেন আকাশ নবীন বারিদে ভরিয়া গিয়াছে। নব নব বেশে বর্ষা আসিয়াছে—নামিয়াছে ঝরঝর ধারায়। ভাবুকী প্রিয়বিরহ জাগরিত করিয়া তাকিতেছে—হরণ করিতেছে প্রাণ। চকিত চাতকদল নিকটেই তাকিতেছে—নিকটেই শোনা যাইতেছে মদনবিজয়ী কোকিলরব। আষাঢ়ের বিরহ প্রগাঢ়।

গোবিন্দদাস কবিরাজকৃত শ্রীমতীরাধার এক বর্ষাভিসারের পদে দুস্তর বাদলের দোলন, ঘনঘনরবে মর্মবিদারণ ঘন ঘন বজ্রপতন, দশদিকব্যাপী দামিনী দহনবিস্তার :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহিঁ অতি দুরতর বাদর দোল। বারি কি বারই নীলনিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস-সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥
দশ দিক দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উচকই লোচন তার ॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ। প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার। দুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার ॥

শ্রীমতী আজ অভিসার সুজের বর্ষাভিসারিকা। মন্দির বাহিরের কঠিন কপাটে মন্দির দ্বার রুদ্ধ। পঙ্কিল পথে চলিতে কতোনা শঙ্কা কত আশঙ্কা। তাহাতে বর্ষার বেগ অতি দুঃসহ। নীলিমনিচোলে বারি নিবারণ হইতেছে না। সুন্দরি কিরূপে অভিসার করিবে? মানস সুরধুনী গঙ্গার অপর পারে তোমার প্রাণের হরি। ঘন ঘন ঝন ঝন অশনিপাতে শ্রবণের সঙ্গে মর্মস্থল জর্জরিত। আর, বিদ্যুতের বহ্নি-জ্বালা দশদিক ঘিরিয়া। দেখিতেই চক্ষু ঝলসাইতেছে। সুন্দরি শ্রীমতি, এ সময়ে যদি গৃহত্যাগ করিয়া অভিসারে চল তবে দেহের মায়া ছাড়িয়া যাইতে হইবে। গোবিন্দদাস বলেন যে বাণ ছুটিয়াছে শতযত্নেও তাহা ফিরেনা। হরিতের প্রতি অনুরাগিণী যাইবেনই—দেহ? সে তো তুচ্ছ।

অভিসার পদের পটভূমিকায় দুর্যোগময়ী বর্ষা থাকিয়া যে তত্ত্বেরই সূচনা করুক না কেন, রোম্যান্টিক কবি-মনের প্রকাশ যে সুচিত হয় তাহা নিঃসংশয়িত সত্য।

বর্ষা প্রসঙ্গে রায়শেখরকে মনে পড়ে। কৃষ্ণকুঞ্জে রাধাভিসারের পটভূমিতে মেঘমেদুর, বিদ্যুৎবিলসিত, অশনিপাতপঙ্কিত পবনাস্ফালনময় বর্ষার চিত্র আঁকিলেন তিনি :

গগনে অবঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥

ভানু সিংহ তাঁহার পদাবলীর অভিসার-বিষয়ক একপদে অনবদ্য সুন্দর বলিয়াছেন শ্রাবণগগনের ঘোর ঘনঘটায় এক নিশীথ যামিনী, উন্মদপবনে যমুনার তর্জন, মেঘের সঘন গর্জন। পথভুল লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তাহাতে দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আকাশে নীরদপুঞ্জ রিম্‌ঝিম্ শব্দে বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, শালপিয়াল, তালতমালের কুঞ্জে নিবিড় তিমিরের সঞ্চার। ভাবনা : কুঞ্জপথে অবলা কামিনী কি করিয়া যাইবে :

শাওন গগনে ঘোর ঘন ঘটা, নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে, সখি কৈসে যাওব অবলা কামিনীরে।
উন্মদপবনে যমুনা তর্জিত ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠিত থর থর কম্পিত দেহ।
ঘন রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম বরখত নীরদপুঞ্জ।
শালপিয়ালে তালতমালে নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

ভানুসিংহ রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষাকে লইয়া কত কবিতা কত সঙ্গীতই না রচনা করিয়াছেন।

●

॥ সিনিওলচুর পাদদেশে কয়েকটি দিন ॥

শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(দুই)

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দুঘণ্টা চলার পর আবার আমরা জেমুহ্রদের তীরে গিয়ে পৌঁছই। হিমালয়ের সব নদীর একই রূপ। উচ্ছল চঞ্চল গতি। নদীর পাশে পড়ে থাকা বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে এগুতে থাকি। আমাদের ডানদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের বিস্তৃত একটি অংশ ধসে গিয়ে বিরাট আকারের পাথরগুলি গড়িয়ে নিচে নেমে এসে একটির ওপর আরেকটি বিচিত্ররূপে দাঁড়িয়ে আছে। যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে পাথরের উপর দিয়ে চলতে থাকি। সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢেকে ছিল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি সারা পথে পেয়েছি। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। পাথরের প্রান্তরটি অর্ধেক অংশ পার হবার পর মুষলধারায় বৃষ্টি নামে। চলার গতি কমে আসে। সন্তর্পণে প্রতিটি পাথরে নজর রেখে প্রায় দুঘণ্টা চলার পর একটি হিমবাহের পাশে গিয়ে পৌঁছই। হিমবাহের নিচে বরফের গলা দিয়ে প্রবাহিত জেমু নদীকে দেখে গোমুখের ভাগীরথীকে মনে পড়ে। বৃষ্টি অনেকটা কমেছে। ২০।২০ মিনিট হিমবাহের উপর দিয়ে চলার পর আবার বিস্তীর্ণ এক পাথুরে প্রান্তরে উপস্থিত হই। পাথরের উপর দিয়ে আবার পথ চলা। পদচারণ হচ্ছে বলেই পথ বলছি। পথের কোন চিহ্ন নেই। মালবাহকদের অনুসরণ করে চলেছি। বিকেল চারটার সময় জেমু নদীকে ছেড়ে ডান দিকের

পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় এক কিঃ মিঃ উপরে যাবার পর সিনিওলচুর পথে আমাদের প্রথম ক্যাম্পের উপযোগী স্থানে পৌঁছই। জায়গাটির নাম ত্তেলেমু। উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট।

ত্তেলেমুর পরিবেশটি অতি মনোরম। চারিদিকে বিরাট আকারের গাছ। মাঝখানে অনেকটা প্রশস্ত সমতল জায়গা। গাছপালা ঝোপঝাড় নেই। ক্যাম্প করার উপযুক্ত স্থান। জলের ধারাটি সামান্য দূরে, অবশ্য জল আনবার লোকের অভাব নেই। ত্তেলেমুতে পৌঁছে দেখি সবকয়টি তাঁবু খাটানো হয়ে গেছে। কুলিরা মালপত্রগুলি গুছিয়ে রেখেছে। রাত্রের আহারের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। প্রথম দিন ১২।১৩ কিঃ মিঃ পাহাড়ী পথে পরিক্রমা করে সারা শরীরে ক্লান্তি নেমে আসে। সামান্য আহারাদি সেরে আমার জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে ঢুকে পড়ি।

পরদিন ঘুম ভাঙে কুলিদের কোলাহলে। ঘড়িতে দেখি পাঁচটা বেজেছে। তাঁবু খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি চারিদিক সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। এমন সূর্যালোক প্যারিসকে দেখেছিলাম। লাচেনে একদিনও দিনমণির উজ্জ্বল মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সর্বক্ষণই আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। উপযুক্ত শীতবস্ত্র গায়ে দিয়ে তাঁবুর বাইরে যাই। আমাকে দেখতে পেয়ে একজন হাই অল্টিটিউড পোর্টার এক গ্লাস গরম চা দিয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করি আমার তাঁবুতে গিয়ে চা দাওনি কেন? সে জানায়, বারণ ছিল। অভিযানের নেতা বিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীমান অমূল্য সেনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি আজ আমাদের এখানেই থাকতে হবে। সেইজন্য ভোরে বেড্ টি দিয়ে আমাকে জাগানো হয়নি। খুবই বিস্ময় জাগে তার কথা শুনে। অমূল্য জানায়—আমাদের এই ক্যাম্প থেকে সামান্য দূরে একটি পাহাড়ী নদী আছে। পাকো ছাড়া সে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পাকো তৈরি করে নিতে হবে। আজ সারাদিন ধরে কুলিদের সাহায্যে পাকোটি তৈরি করতেই হবে। একদিন থেকে যাওয়ার খেসারত বাবদে। টাকা। চল্লিশজন কুলি আছে, প্রত্যেক কুলিকে, তিন টাকা করে প্রতিদিনের পারিশ্রমিক দিতে হচ্ছে। তাই অমূল্যর কথা শুনে খুবই বিস্মিত হই। নদীটি কতোখানি চওড়া ও পাকোছাড়া পার হওয়া যায় কিনা দেখার উদ্দেশ্যে একজন কুলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলি। নদীর কাছে পৌঁছে দেখি কুলিরা পাকো তৈরির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। সত্যই পাকো ছাড়া এ নদী পারাপার করা অসম্ভব। বেশ বেগবতী নদী। সারাদিন লেগে যায় পাকোটি তৈরি করতে। জঙ্গল থেকে পাইন, সেগুন গাছ কেটে এনে সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাকোটি তৈরি করে। এই পাকোর ওপর দিয়ে ভিড়তেও হবে। বেশ মজবুত কাঠামোর পাকোটি তৈরি করে। ১২শে মে সকাল সাতটার মধ্যে সমস্ত মালপত্র, তাঁবু, বাঁধাছাঁদা করে পূর্ববর্তী ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। পাকোটি পার হবার পর অত্যন্ত দুরূহ পথের সম্মুখীন হই। দীর্ঘপথে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। প্রতিটি পাথরের ওপর এক ইঞ্চি পরিমাণ তাওলা পড়ে আছে। সেই তাওলা-পড়া পাথরের ওপর দিয়ে পথ চলা। সিকিমের উত্তরাঞ্চলে সাত মাস বৃষ্টি ও পাঁচ মাস তুষারপাতের ফলে এমন তাওলার সৃষ্টি। কুলিদের দেখি মালের বোঝা নিয়ে বেশ দ্রুতগতিতে তাওলা

বিছানো পাথরের ওপর দিয়ে চলতে। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করি। সতর্ক দৃষ্টি রেখে পা রাখি, তবু মাঝে মাঝে পা হড়কে যায়। এ পথকে পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কারণ দ্বিতীয় কোন পথ নেই। প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে স্যাওলাযুক্ত পাথুরে প্রান্তরটি অতিক্রম করতে। সামনে জঙ্গলাকীর্ণ সুউচ্চ পাহাড়। দীর্ঘ গাছের পাতাগুলি চন্দ্রাতপের মতো হয়ে আছে। দ্যাতস্যাতে মাটি। পিচ্ছিল পথে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকি। জঙ্গলের মধ্যে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে বিরাট আকারের গাছ মাটিতে পড়ে পথচলার প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এমনভাবে গাছগুলি পড়ে আছে যে, হয় গাছের তলা দিয়ে না হয় গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে পার হতে হয়। গাছের গুঁড়ির উপরে স্যাওলার পুরু আবরণ, গুঁড়ির নিচে কাদায় থকথক করছে। বনসম্পদের এমন অপচয় কোন সভ্য দেশে হয় বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রা শেষ হয় গোইকে নামে এক জায়গায়। গোইকের উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। বেশ কনকনে ঠাণ্ডা এখানে। চারিদিকে নাতিদীর্ঘ গাছ ও ঝোপঝাড়। স্বল্প পরিসর জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রাত কাটাতে হয়। সকাল ছয়টা নাগাদ তৃতীয় দিনের পদযাত্রা শুরু হয়। কুলিদের সর্দার সাংবা জানায় আজ প্রায় ১৮ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করতে হবে। বিকেলের মধ্যে মূল-শিবিরের জন্য নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে যাবো। সেইজন্য সকাল সকাল যাত্রা শুরু করা হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে অরণ্যাকীর্ণ ছেড়ে একটি উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। এখানেই প্রথম তুষারপাতের সম্মুখীন হলাম। মাঝে মাঝে হাওয়ার গতি প্রচণ্ড হ্রাস নিচ্ছে। হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি এলাকার মতো হাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বামদিকের সুউচ্চ পাহাড়ের পাশে বসে খানিক বিশ্রাম নিই। পাহাড়টি কিছুদূর প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে যেন পথ অবরোধ করে আছে। সাংবা জানায় সামনের ঐ পাহাড়টি অতিক্রম করলে পথে আর কোন চড়াই পড়বে না। গতবছর এভারেস্ট বিজয়ী বিখ্যাত পর্বতারোহী সোনাম্ ওয়াঙ্গেলের নেতৃত্বে সিনিওলচু অভিযান হয়েছিল। কেবলমাত্র সিকিমবাসীরা সে অভিযানের সঙ্গে ছিলেন এবং ভারত সরকার সেই অভিযানের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। সাংবা সেই দলের একজন সভ্য ছিল। এদিকের পথ সম্বন্ধে এবং আবহাওয়ার বিষয়ে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সে লেখাপড়াও করেছে।

সামনের পাহাড়ের কাছে পৌঁছে দেখি সমগ্র পাহাড়টি ঢেকে আছে রডোডেনড্রন ফুলে। এতো রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন রঙের রডোডেনড্রন ফুল হয় জানা ছিল না। যতোদূর দৃষ্টি যায় কেবলমাত্র রডোডেনড্রন ফুল। তারই মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। চড়াই পথ। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে যাই এবং দু'এক পা নিচের দিকে পিছু হেঁটে যাই। দেখি সামনে একটি বিষধর সাপ ফণা তুলে স্থির হয়ে রয়েছে। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতে পিছন থেকে দাঁড়িয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। বলি, সামনে বিরাট সাপ। একজন উৎসাহী সঙ্গে সামনে এগিয়ে আসে, সাপটি দেখে গম্ভীর স্বরে বলে, ওটি সাপ নয়, ওটি ফুল। হ্যাঁ, ওটিকে বলে কোব্রালিলি। অবিকল ফণাবিশিষ্ট সাপ। সিকিমের

উত্তরাঞ্চলে প্রচুর কোব্‌রালিলি ফোটে। বিচিত্র ফুল। তারপর যতো উপরে উঠি ততোই দেখি অসংখ্য কোব্‌রালিলি ফুটে আছে।

বেলা একটা নাগাদ একটি বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহারাদি সেরে নিই। বসার উপায় নেই। সমস্ত সবুজ প্রান্তরটি একটি জলাভূমি। যদিও কোথাও জল দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবে যায় নরম মাটির মধ্যে। ইহাই সিকিমের বিখ্যাত কিচ্ছড়। কিচ্ছড়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। কিচ্ছড়ভূমি পার হবার পর জুতো মোজা খুলে ঝরণার জলে ধুয়ে নিই। খালি পায়ে থাকা বা পথচলা ভীষণ কষ্টকর। পকেটে শুকনো মোজা নিয়ে সকালে যাত্রা শুরু করেছিলাম। শুকনো মোজা প'রে ভিজে জুতো পরতে হয়। একজোড়া জুতো সঙ্গে করে আনা সম্ভব নয়। আমাদের প্রত্যেক সদস্য হাল্টার হু ব্যবহার করছে। এ পথে হাল্টার হু অচল। গামবুট এ পথের উপযুক্ত জুতো। পদযুগলকে বাঁচানোর জন্য এ পথে গামবুট ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেকটি কুলির পায়ে গামবুট। লাচেন গ্রামবাসীদের পায়েও দেখেছি গামবুট।

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

(পাঁচ)

ঐ ত এককোণায় মাসীমা বসে। চুপচাপ খেয়ে চলেছেন। একটু দূরে চিনিদি ওঁর ইয়া লম্বা চওড়া স্বামীর সাথে হাসিতে খুশীতে উচ্ছল, খাওয়া উপভোগ করছেন। ইস্ ঐ সব টেবিলে একটা জায়গা হল না? এখন তিনদিন তিন রাত তিন সকাল এদের মুখোমুখি বসে খেতে হবে?

বিকেলে ম্যাকিনস্ দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহাজ থেকে নেমে বাস। বাসে করে সারা দ্বীপ ভ্রমণ, সাথে গাইড্। ইচ্ছে না হলে বন্দরের আসেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াও আর তা না হলে ডেকে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখ। নামার দরজার মুখে হুড়োহুড়ি করবার উপায় নেই। যে যার কেবিনে বসে আছে। মাইকে নম্বর ডাকা হচ্ছে। এক থেকে পঞ্চাশ আপনারা বেরিয়ে আসুন আপনাদের বাস নম্বর এক। অতি সুন্দর ব্যবস্থা।

জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় নেবেই মনটা আনন্দে ভরে যায়। ছোট্ট ছিমছাম্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন্দর। গুচ্ছ গুচ্ছ নরনারী, বিভিন্ন পোষাকে, বিভিন্ন ভাষায় কলকলিয়ে ছোট্ট দ্বীপে ইতিউতি আপন আপন খেয়ালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন ভাষের আদান প্রদানের বিশ্বমেলা বসেছে। দ্বীপের ঐতিহ্য বজায় রাখতে এখানের সেই আদিকালের পাথরের তৈরী কোন

বাড়িই তাদা হয়নি। এখনও ক্বচিৎ কদাচিৎ যে সব তৈরী হয়, সেগুলোও সেই আগের ধরনের বাড়ির গড়নে তৈরী হয়। ছোট্ট ছোট্ট সরু সরু গলির মধ্যে ছোট ছোট ঘরদাওয়ালা বাড়িগুলো গুহার মত দেখতে লাগে। সব বাড়ির রঙ সাদা। এতে নাকি সূর্যকিরণ বাড়ির গায়ে পড়ে প্রতিফলিত হয়ে যায়, বাড়ির ভেতরটা গরম হতে পারে না। নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রব এদের জীবনযাত্রা। চিমনীর ধোঁয়া নেই, বাড়ির দেওয়ালে পোষ্টার নেই, আলকাতরার লেখা নেই, রকে ছেলে ছোকরার দল নেই, রাস্তার ওপর পাড়ার কুচো চ্যাঙাদের খেলাধুলো নেই, সর্বত্রই যেন একটা সহজ সরল আন্তরিক ভাব। মেয়েরা ঘরের দরজা হাট করে খুলে টুলের উপর বসে হাতের কাজের জিনিষ তৈরী করছে নিবিষ্ট মনে। পাশেই দেওয়ালে প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রীর জন্ত ঝোলানো। ইচ্ছে হলে উল্টে পাল্টে দেখ, জিনিষের গায়ে দাম লেখা আছে। পোষালে নাও, নইলে চলে যাও। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির বালাই নেই। বেশী উৎসুক হলে অনুমতি নিয়ে ঘরের ভিতরেও দেখে এস। মেয়েরা একগাল হেঁসে আরও বসতে সায় দেবে। সবচেয়ে বেশী ভীড় Wind-Mill-এর সামনে। আমাদের দেশে, গ্রামে, ধানের মরাই-এর মত বিরাট বিরাট দুটো গোলাকার পাথরের তৈরী ঘর। ঘর দুটো খড় দিয়ে ছাওয়া, ওদের ছাদ ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে এক প্রকাণ্ড কাঠের বল্লী। সেই বল্লীর মাথায় বসানো আছে মস্ত মস্ত পাখাওয়ালা এক অতিকায় কাঠের চাকা। বাতাসের জোরে কখনও ঘুরছে আস্তে আস্তে, কখনও বনবনিয়ে। অতীতে এগুলো মানুষের নানান কাজে লাগতো, এখন দর্শনীয় বস্তু। এরকম বেশ কয়েকটা Wind-Mill দ্বীপের চারিপাশে ছড়ানো, ছেটানো, কোনটাই বহাল তবিয়তে নেই, সবগুলোই স্মৃতি রক্ষার্থে, স্মৃতিভারে জর্জরিত। ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা দ্বীপ, গাছগাছালির সংখ্যা নগণ্য। জমি নেই বললেই চলে, সবই পাথর, তাই ধুলোর বালাইও নেই। চাষবাসও নেই। সমুদ্রের ধারে পাথরের ওপর চাটাই বিছিয়ে রাস্তা থেকে একটু দূরে এক চালাঘরের পাশে একগুচ্ছ স্থানীয় নরনারী বসেছে আসর জমিয়ে। সামনে থালা পাতা পয়সার জন্তে কিন্তু কেউ মুখঝুটে চাইবে না, ইচ্ছে হলে কিছু দাও নইলে গান শুনে নাচ দেখে চলে যাও, হ্যাচ্‌ড়ামোর কোন বালাই নেই। তারের যন্ত্র বাজছে দ্রুতলয়ে, হাতের ভুগি বাজছে তালে তাল মিলিয়ে, সমবেত গান গাইছে গলা মিলিয়ে, জোড়ায় জোড়ায় নাচছে কোমর দুলিয়ে, হাসছে খলখলিয়ে। শরীর দুলছে, মন দুলছে, দুলছে জীবন-স্বামী। পশ্চিমাকাশে দেবাদিদেব শেষ বিদায়ের আগে দোদুল্যমান। রবির অপরূপ ছটায় সমুদ্র এখন গলিত সোনার ভাণ্ডার। তার ওপর ভাসমান দ্বীপ এখন ভাসমান স্বর্ণবলয়। আর সেই স্বর্ণবলয়ের ওপরে ছোট্ট গ্রামটী যেন স্বর্গপুরী।

সামান্ত রাস্তা হেঁটেই ফেরা যায় কিন্তু পাছে দেরী হয় তাই আবার বাসে করেই ফিরি। কেবিনে যাবার আগে আবার রিসেপশন লাউঞ্জে জমায়েৎ। ঐ ডিরেকটর মাত্র সাত আট মিনিটের একটী বক্তৃতা দিলেন। "আপনারা যে যার কেবিনে ফিরে যান এবং পরিষ্কার হয়ে আসুন, আজ ঠিক সাতটায় ক্যাপটেনস্ ডিনার হবে। ক্যাপটেনের খাতিরে আপনারা সবাই স্যুট-টাই পরে আসবেন।" এখানে সন্ধ্যেবেলায় এক কাপ চা অথবা কফির কোন বন্দোবস্ত

নেই। দুপুরের খাওয়ার পর সরাসরি রাতের খাওয়া তাও আবার সন্ধ্যে সাতটায়। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিরবচ্ছিন্ন হুল্লোড় চলবে রাত্রি দুটো পর্যন্ত। ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে বার এবং কফির শুমটী। সঙ্গে স্যুট-টাই নেই অথচ ক্যাপটেনস্ ডিনার ছাড়তেও পারিনা। সবাই যাবে স্যুট-টাই পরে আর আমি একলা যাব শর্ট পেন্টুলুন পরে, তাও হয় না, সর্বোপরি খেতে না পেলে নিরম্বু উপবাস। ব্যবস্থা একটা করতেই হয়, গুটী গুটী এগোই ঐ ডিরেকটরের দিকে। বললাম—"ভদ্রে, স্যুট ত নাই তবে কি ক্যাপটেনস্ ডিনার-এ যোগ দিতে পাব না?" উনি বিনয়ের সঙ্গেই জবাব দিলেন—"আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে আমি আশা করছি সবাই স্যুট পরেই আসবে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে তুমিই ভেবে দেখো.....।

"যদি আমার ন্যাশনাল ড্রেস-এ আসি?"

"ও সিওর ইউ আর মোষ্ট ওয়েলকাম"। জরির পাঞ্জাবীটা তাঁজ পড়েছে, চোস্ত পায়জামাটা একটু ময়লা হয়েছে, নাগরাটার মুখটা খেবড়ে গেছে। সবই হুটকেশে গাদাগাদির ফল; তবুও ঐ পরেই বেরুলাম।

"ওহ্ মেরে ফেললে হে ছোকরা..." বললেন একগাল হেসে মাসীমা। পাশাপাশি কেবিন একই সাথে বেরিয়ে পড়েছি দুজনে। সরু করিডোরে ধৈয়াধেষি হয়ে ধাক্কা লাগালাগি করে এগোচ্ছি। জাহাজ দুলছে এই সবেমাত্র বন্দর ছেড়েছে। "আমার সবই আছে হে, টাকা আছে, সময় আছে, ইচ্ছে আছে, শুধু বয়সটাই নাই।

"মহারাজা···মহারাজা" (মহারাজার অপভ্রংশ) হুল্লোড়বাজীর গলায় মাসীমার অভিজাত গলা ঢাকা পড়ে গেল। চার চারটে ছুঁড়ো আরব আমার পানে ধেয়ে আসছে, ওদের সাথে আমার কেবিনমেট্ মহম্মদ। হাত ঝাঁকাঝাঁকি হল, সেলামও হল। চারটেই ইয়াং হয়ে জাহাজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মহম্মদ অতিশয় উত্তেজিত হয়ে একপাশে চেপে ধরল, মাসীমা পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। করিডোরে চলতে চলতেই মহম্মদ শুরু করল—"তেরু ত রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকবে। আমি বোধ হয় তারপরে কেবিনে ফিরব। তুমি দরজা বন্ধ করে শুয়ো না, খালি দরজাটা ঠেলে রেখে দিও।"

ক্রমশঃ

●

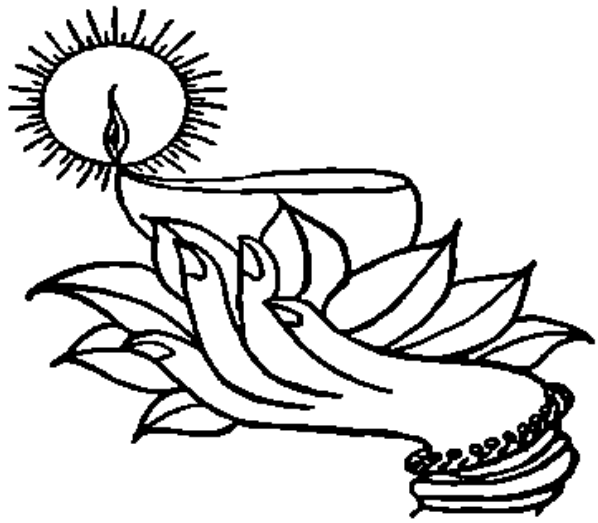

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(বারো)

ময়রার দোকানে শো-কেস্‌এ সাজানো বিভিন্ন আকার ও অলংকরণের ছাঁচে তৈরী সন্দেশ সকলেই দেখেছেন। কেউ কেউ হয়তো তাঁদের নিজেদের বাড়িতে কিংবা অন্য কারুর বাড়িতে উৎসব-পার্বণ-উপলক্ষে ছাঁচের সন্দেশ তৈরী হতেও দেখেছেন। যাঁরা তা দেখেছেন—তাঁরা সম্ভবতঃ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সন্দেশ তৈরীর উঁচুনীচু নক্সাকাটা ছাঁচগুলো তৈরী হয়েছে পোড়ামাটি অথবা পাথরে। এই ছাঁচের ওপর ছানা, অল্প ক্ষীর কিংবা নারকেল দিয়ে তৈরী মণ্ড আঙুলে টিপে টিপে সন্দেশ বানানো হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে পোড়ামাটি কিংবা প্লাষ্টার অব্ প ্যারিসের ছাঁচে মাটি টিপে বিভিন্ন ধরণের সিরামিক্‌স্‌ও তৈরী করা হয়ে থাকে। সিরামিক্‌স্ তৈরীর এই পদ্ধতিকে ইংরাজীতে বলা হয় Pressing method—যার বাংলা নামকরণ করা যেতে পারে চাপন পদ্ধতি।

গ্রামের মেলাতে যেসব মাটির পুতুল দেখতে পাওয়া যায়—সেই পুতুলগুলোর অধিকাংশই তৈরী করা হয় চাপন পদ্ধতিতে। এই পুতুলগুলোর আঁদরা গড়বার পর ওই আঁদরা থেকে সাধারণ মাটিতে ছাঁচ তৈরী করে ওই ছাঁচ আগুনের আঁচে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। আজকাল অবশ্য প্লাষ্টার অব্ প্যারিস্‌এও পুতুলের ছাঁচ তৈরী করা হয়ে থাকে। পোড়ামাটির ছাঁচে নমনীয় ও আঁঠালো মাটি আঙুলে টিপে টিপে ছাঁচ থেকে পুতুলের ছাপ তোলা হয়। ওই পুতুল রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে রং করা হয়।

গ্রামীণ পুতুল তৈরীর এই পদ্ধতিতেই বিভিন্ন ধরণের সিরামিক্ ভাস্কর্য, পাত্র, টালি ইত্যাদি নির্মিত হয়ে থাকে। তবে চাপন পদ্ধতিতে সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে হলে মাটি নমনীয় এবং আঁঠালো হওয়া দরকার। সাধারণ মাটি—অর্থাৎ নদী, পুকুর ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত মাটি এমনিতেই বেশ নমনীয় এবং আঁঠালো হয়ে থাকে। পোর্সিলেন, ফাইন

আর্দেনঅক্সাইড ইত্যাদি মিশ্রিত মাটির মত সাধারণতঃ বিশেষ নমনীয় কিংবা আঁঠালো হয় না। তাই এ ধরণের মাটির নমনীয়তা বাড়াবার জন্য বেন্‌টোনাইট্ (Bentonite) নামে পরিচিত খনিজ মাটির সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে।

সিরামিক্স্ তৈরীর আদিপর্বে—অর্থাৎ যে সময়ে সিরামিকনির্মাণে চাক-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়নি, এমনকি কুমোরের চাকও যখন আবিষ্কৃত হয়নি, সে সময়ে যেসব পদ্ধতিতে সিরামিক্স্ নির্মিত হতো—সেসব আদিম পদ্ধতির কিছু কিছু এখনও অনুসৃত হয়ে থাকে। এসব পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো বিড়ে পাকানো পদ্ধতি। সিরামিকনির্মাণের এই পদ্ধতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Coiling method। সরু মোটা বেত কিংবা গাছের শেকড় দিয়ে বিড়ে পাকিয়ে ঝুড়ি, টুকরি ইত্যাদি তৈরী করতে অনেকেই হয়তো দেখেছেন। নমনীয় ও আঁঠালো মাটি দু'হাতে পাকিয়ে দড়ির আকার দিয়ে ওই দড়িতে বিড়ে বানিয়ে বিড়েগুলো একটির ওপর একটি বসিয়ে সিরামিক-এর বিভিন্ন গড়ন গড়ে তোলবার পদ্ধতিকে গাছের শেকড় অথবা বেতের সাহায্যে ঝুড়ি বানাবার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে সিরামিক-নির্মাণের এই আদিম পদ্ধতিটির এখনও প্রচলন রয়েছে।

বড়ো বড়ো সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রগুলোতে অবশ্য বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে সিরামিক্স্ নির্মিত হয় না। কিছু কিছু ষ্টুডিয়ো-সিরামিষ্ট্ (Studio Ceramist)-দের মধ্যে এখনও এ-পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। ষ্টুডিয়ো-সিরামিষ্ট্রা সাধারণতঃ স্বহস্তে স্বল্পসংখ্যক শিল্পিত সিরামিক তৈরী করে থাকেন। এঁদের কাছে সিরামিকনির্মাণে বিড়ে পাকানো পদ্ধতির এখনও আদর রয়েছে। নির্মাণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যটি সঠিকভাবে বজায় রাখতে চান্ বলে অধিকাংশ ষ্টুডিয়ো-সিরামিষ্ট্ বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে তৈরী সিরামিক-এ প্রতিটি বিড়ের খাঁজ যথাযথভাবে রাখবার পক্ষপাতী। কেউ কেউ এই খাঁজগুলো রাখতে চান্না বলে বিড়ের খাঁজগুলো ভর্তি করে দেন আলাদা মাটি দিয়ে এবং স্ক্রেইপার-এর (Scraper) সাহায্যে চেঁছে ও ঘেঁষে স্মুজ-এ ঘষে সিরামিক-এর দেয়ালকে করে তোলেন সমান ও মসৃণ। ফলে এধরণের সিরামিক বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে তৈরী করা হলেও সম্পূর্ণ হবার পর কুমোরের চাক কিংবা স্লিপ্ ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরী সিরামিক-এর মতো মসৃণ দেখায়।

বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে সিরামিক তৈরী করতে হলে যেসব উপকরণ এবং হাতিয়ারের দরকার হয়—সেগুলো হল নমনীয় ও আঁঠালো মাটি, ষ্ট্যাণ্ড-এ বসানো নিরেট লোহার চাকা (সহজেই যেটি ঘোরানো যেতে পারে), মাঝারি সাইজের একটি কি দুটো ছুরি, লোহার পাতে তৈরী স্ক্রেইপার এবং কিছুটা সরু তার। এছাড়া লাগবে জল রাখবার জন্য এনামেল করা একটি বড়ো বাটি এবং খানিকটা স্পঞ্জ।

চাকার মাঝখানে নমনীয় মাটির একটি গোলক বসিয়ে হাতের চেটো কিংবা এক টুকরো চ্যাপ্টা কাঠের চাপে গোলকটি দরকারমতো চ্যাপ্টা ও পুরু করে সিরামিকপাত্রের তলার মাপ ও আকার অনুযায়ী ছুরির সাহায্যে কেটে নিতে হবে। মেঝে অথবা টেবিলের

ওপর একতাল মাটি দু'হাতের সাহায্যে পাকিয়ে দরকার মতো সরু কিংবা মোটা কয়েকটি মাটির দড়ি তৈরী করতে হবে। এই মাটির দড়িগুলো ভেজা কাপড়ে ঢেকে রাখা দরকার; তা না হলে হাওয়া লেগে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। এবারে চাকার ওপর বসানো মাটির তৈরী তলাটির ওপর প্রথম মাটির বিড়েটি বসাতে হবে। সিরামিকপাত্রের আকাঙ্খিত আকার অনুযায়ী এরপর একটির পর একটি মাটির বিড়ে প্রথম বিড়েটির ওপর বসানো দরকার। বিড়েগুলো বসাবার আগে সামান্য জলে একটু ভিজিয়ে নিলে সহজেই একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে যাবে। পাত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে একখণ্ড সরু তার দু'হাতে টান্ করে ধরে পাত্রটির তলার ধার থেকে ওধারে টেনে দিলে লোহার চাকা থেকে পাত্রটি সহজেই আলাদা হয়ে খুলে আসবে। থ্রোয়িং অথবা চাক্-এ সিরামিক তৈরী করতে হলে যেমন দীর্ঘদিনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন, তেমনই অনুশীলনের প্রয়োজন হয় বিড়ে পাকানো পদ্ধতিতে দক্ষতালাভ করবার জন্য। অবশ্য শিল্পকলার যে কোনো মাধ্যমে সুফলতা লাভ করবার জন্যই প্রয়োজন সুদীর্ঘ অনুশীলনের।

দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তবমালা : পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক : মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দক্ষিণা : তিন টাকা।

তন্ত্রশাস্ত্রে যতগুলো প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' তাদের মধ্যে অন্যতম। মা চণ্ডীই শারদোৎসবে মা দুর্গা-রূপে পূজিতা হন ভক্তের হৃদয়ে। সেজন্য তিনি 'দুর্গা-সপ্তশতী'-নামেও পরিচিত। বর্তমান গ্রন্থটি মূল শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকেই নেওয়া কতকগুলো স্তবের সংকলন বা সহজ ভাষায় অনুবাদ করেছেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। ফলে যাঁরা নিত্য চণ্ডীপাঠ করতে চান তাঁরা পণ্ডিত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তবমালা' অর্থসহ পাঠ করে উপকৃত হবেন। এছাড়া বইটিতে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচিতি' এবং 'মহাশক্তি মহামায়া'—এই দুটি প্রবন্ধ-সংযোজন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই ভালই।

সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ : শ্রীমনি বাগচি। প্রকাশক : সৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। মূল্য : ১৬৲ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে ঘিরে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন উনবিংশ শতকে লক্ষিত হয় তার দীপশিখা আজও অব্যাহত। কিন্তু সেদিনের সেই 'রামকৃষ্ণ'-আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা তাঁদের বিষয় সাধারণ মানুষ আজও অজ্ঞ। অথচ রামকৃষ্ণ-দর্শনের প্রকাশ তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানদের জীবনদর্শনকে ঘিরেই। 'সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ'-গ্রন্থটি রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইসব সন্তানদেরকে নিয়ে যাঁরা সেদিন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনকে' পূর্ণরূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঠক বইটি পাঠ করলে দেখতে পাবেন যে শ্রীমনি বাগচি তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তাভাবনার দ্বারা রামকৃষ্ণের ষোলজন লীলাপার্ষদের আলাদা আলাদা জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। জীবন এবং দর্শনের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই এইসব সন্ন্যাসীসন্তানদের জীবনদর্শনই তার প্রমাণ এটাই বারবার বলতে চেষ্টা করেছেন শ্রীমনি বাগচি তাঁর এই গ্রন্থে। ছাপা ও বাঁধাই নিখুঁত।

সাহিত্যতীর্থ : বনফুল স্মরণিকা। সম্পাদক : শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। প্রকাশক : ৬৭ পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য : ছয় টাকা।

পৃথিবীতে কিছু লোক আসেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে—কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে কি দর্শনে, মনে হয় সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। সেইসব স্রষ্টা সৃষ্টির আনন্দে আপনভোলা হয়ে থাকেন। 'বনফুল' সেই আপন-ভোলাদেরই একজন যিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও একধাপ এগিয়ে দিলেন। বর্তমান গ্রন্থটি বনফুলের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রায় ষান-তিরিশেক প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। এছাড়া বনফুলের নিজস্ব অপ্রকাশিত লেখাও এখানে আছে। 'বনফুলের রচনায় কৌতুকরস', 'বনফুল প্রসঙ্গে', 'বনফুল প্রশস্তি', 'স্মৃতির কণিকা', 'বঙ্গসাহিত্যে বনফুল' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলো বনাইলার-সম্বন্ধে গবেষক-পাঠকদের সাহায্য করবে। এছাড়া বনফুলের বিভিন্ন সময়ের কিছু ছবিও এখানে সংযোজন করা হয়েছে। শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সম্পাদনা যে দৃষ্টিসম্পূর্ণ এবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

বেদান্তালোকে যীশুর জীবনী ও বাণী : স্বামী তপানন্দ। প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ, কেতিকা, পুরুলিয়া। মূল্য : পঁচিশ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি যীশুর জীবন ও উপদেশকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হয়েছে। স্বামী তপানন্দ ঐতিহাসিক পটভূমিতে যীশুর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন। যীশুর জন্মের পূর্বে প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা কি রকম ছিল এবং পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ প্রথম তিরিশ বৎসর যীশু কিভাবে দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেছিলেন, পরিশেষে একদে তোজসভায় যোগদান ও জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতা এবং যীশুর শত্রুহস্তে বন্দী ও বিচার—এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো লেখক তাঁর প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ছাপা ও প্রচ্ছদপট নিখুঁত বলা চলে।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বৈঠকী গান : শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ কয়চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান : এস. চক্র এণ্ড কোং। ৩, কিদ্‌রাই রোড, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ১০·০০ টাকা।

'বৈঠকী গান' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে লেখক সকলের প্রীতিভাজন হয়েছেন। বর্তমানে এই রাগ-সংগীত সারা বাংলার অন্যান্য গানের মত বেশ প্রচলিত হয়েছে। গ্রন্থখানি ছোট আকারে হলেও লেখক তাঁর সাধনালব্ধ বস্তুগুলি পরিবেশন করেছেন। তাঁর স্ব-রচিত গানের স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। এই ধরনের রাগ-সংগীত-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে সাধুবাদ জানাই।

আমি : স্বাগতা ঘোষ। **পরিবেশক :** ইন্ডেন্টস্ চীপ সেন্টার, আশুতোষ বিল্ডিং, গ্রাউণ্ড ফ্লোর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। **মূল্য :** ৫·০০ টাকা।

গ্রন্থখানির লেখিকা স্বাগতা ঘোষ। তাঁর নিজের ভাব-ভাবনার-লেখা কবিতাগুলি নিঃসন্দেহে পাঠকদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ ভাল। প্রচ্ছদপটটিও ভাল।

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

●

। শোক-সংবাদ ।।

প্রয়াত স্বামী স্বরূপানন্দ (ননী মহারাজ)

শিলিগুড়ি বেদান্ত মঠের স্বামী স্বরূপানন্দ অর্থাৎ ননী মহারাজ গত ১৭ই আগস্ট সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্তে স্থানীয় হাসপাতালে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। ১২ই আগস্ট সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত মহারাজকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। বয়স হয়েছিল অনুমানিক ৭২ বৎসর। স্বামী স্বরূপানন্দ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

★

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৯১) হুগলি জেলার প্রসাদপুরে নিজ নিবাসে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সাধক পরিবারের সন্তান। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। বাল্যে পিতা নকুড়চন্দ্রের কাছে হাতেখড়ি, পরে তালিম পান নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ধ্রুপদ ও পদাবলী কীর্তনে বিশেষ অধিকার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কথকতাও করতেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র, বেদান্তদর্শন ও রামকৃষ্ণসাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর অনুজ।

●

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রদাসপল্লী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

শীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিপ্লবী	৭·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

সারা মাসের টিকিটের দাম
কয়েকদিনের ভাড়ার সমান ।
বিনা টিকিটে চড়ার খেসারত অনেক ।
কারণ শুধু অর্থদণ্ডেই
লেগে যায় কয়েক মাসের ভাড়া ।
বিনা টিকিটের যাত্রীকে দিতে হয় ভাড়া
ছাড়াও কমপক্ষে ১০ টাকা জরিমানা ।
তাছাড়া বিচারে জেল এবং ৫০০ টাকা
পর্যন্ত অর্থদণ্ড হ'তে পারে ।

পূর্ব রেলওয়ে

34
বছরের স্বাধীনতা
সাফল্য ও সম্ভাবনা

☐ আমরা এক আধুনিক স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি

☐ খাদ্যে আমরা স্বনির্ভর হয়েছি শিল্প ক্ষেত্র বহুমুখী ও ব্যাপক করেছি এবং বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যায় লক্ষণীয় প্রগতি করেছি

1985-এর মধ্যে
আমরা সমগ্র জনসংখ্যার আরও এক ষষ্ঠাংশকে দারিদ্র-সীমার ওপরে তুলতে চাই এবং সমস্যা পীড়িত সব গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করতে চাই

2000 খৃষ্টাব্দের মধ্যে
কুষ্ঠ ব্যাধি নির্মূল করা এবং জন্মের হার হাজারে 36 থেকে 21-এ আনা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

"নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি দীপ নিভিবে না—"
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

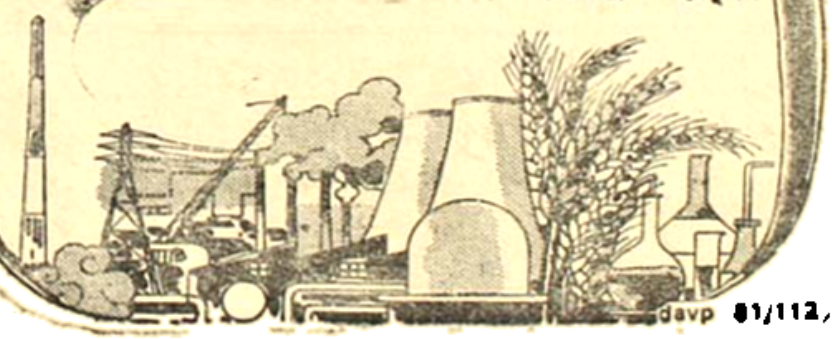

davp 81/112,

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত

একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,

কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

Space Donated by—

A WELL WISHER

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3·00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2·00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	15.00	Music of the South-Asian Peoples, Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its From, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda
Indian Music in Relation to Art and Culture.
Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R N. 13733 57
43rd Year, September 1981
VOL. VII

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (শাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৫০১৯৩, ৩২৬৪৩, ৩৫১২৩২
Cable:'Cookmapers','Omnispica'
Telex:0212591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6895 Calcutta-70
jaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Dulf Street, Calcutta-700006
PRICE Rs. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১.৫০ টাকা

বিশ্ববাণী

আশ্বিন , ১৩৮৮
শ্রাবণ ,
ভাদ্র ,
আশ্বিন ,
কার্ত্তিক , ১৩৮৯
পৌষ , ১৩৯৭

সম্পাদক :
মী সদাত্মানন্দ
মী প্রজ্ঞানানন্দ
হঃ সম্পাদক :
শান্ততোষ ঘোষ

স্বামী অভেদানন্দ
প্রতিষ্ঠিত
বিশ্ববাণী
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত পীঠ, কলিকাতা

তেত...
শারদীয়া সংখ্যা
আশ্বিন
১৩৮৮

STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR

(The largest Bank of Rajasthan)

OFFER ATTRACTIVE INTEREST ON YOUR DEPOSITS
AVAIL OF OUR VARIOUS DEPOSIT SCHEMES
AND INCREASE YOUR SAVINGS

PLEASE CONTACT ANY OF OUR FOLLOWING BRANCHES AT CALCUTTA :-

- **14, Netaji Subhas Road,**
- **204, Rash Behari Avenue, Ballygunge,**
- **4, Synagogue Street, Brabourne Road,**
- **66 & 66/1, Sri Arabindo Road, Salkia, Howrah.**
- **Plot No. 227A/227B, Acharya Prafulla Chandra Road, Shyambazar.**

ALSO OPENING SHORTLY AT :-
94, Vivekananda Marg, Cornwallis Street.

SERVING THE NATION THROUGH MORE THAN 510 BRANCHES SPREAD ALL OVER INDIA

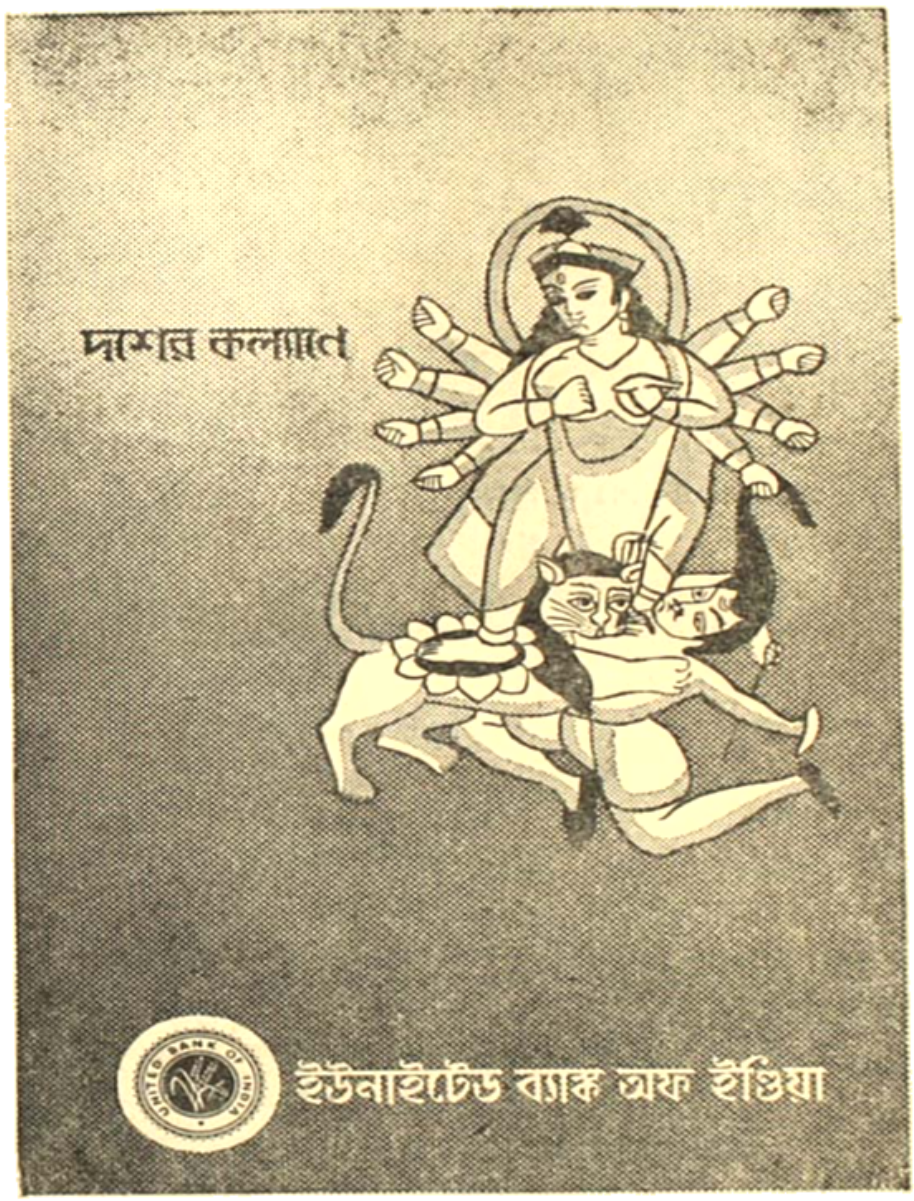
দশের কল্যাণে
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও তপঃসংগ্রেষ	
স্বামী অভেদানন্দ (তাশীতপন্থী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৬·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মনুষ্য	২৫·০০	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	৫·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ		হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চায়েলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)
১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পুজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙে তাঁর ঘামে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী ?

কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

মেট্রো রেলওয়ে

দুলালের তালমিছরী

রাঁচী ও পুরী হোটেলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য

Puri Hotel

Ranchi Hotel

বনময়রঙ্গভিত রাঁচী এবং ঊর্মিমুখর পুরী—দক্ষিণপূর্ব রেলের এই দুটি হোটেলের স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবং উপাদেয় খাদ্যের সঙ্গে প্রকৃতির অবাধ আনন্দ উপভোগ করুন।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং অকুণ্ঠ আতিথেয়তায় আন্তর্জাতিক খ্যাতির উত্তরাধিকার নিয়ে পুরী হোটেল জনপদের কোলাহল থেকে বহুদূরে। আর রাঁচী হোটেল অবস্থিত প্রাকৃতিক বেষ্টনীর মধ্যে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করা যায়। আজকের রাঁচীর উপত্যকা শিরমুর।

কিন্তু এই হোটেলের পরিবেশ প্রশান্ত-যা একাধারে মনোরম এবং সুস্বপ্নন

যোগাযোগ করুন :

পুরী : ম্যানেজার, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে হোটেল, পুরী ফোন : পুরী ৬৩

রাঁচী : ম্যানেজার, দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে হোটেল, রাঁচী ফোন : রাঁচী ২১-২৪৫

কোলকাতা : ডেপুটি চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (কেটারিং) ফোন - ২৩-২৯৩৬

সতত সেবায় নিরত

দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে

একটি বিশিষ্ট ধরনের গেঞ্জী

মতী গেঞ্জী

রেজিঃ নং ২২৮৭০৭

প্রস্তুত কারক:
চেরীগ্রুপ
দি ইষ্টএণ্ড হোসিয়ারী মিলস্ (প্রা-)লিঃ
১০০ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট ● কলিকাতা-৬ ● ফোন: ৩৫-৪১১২

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিস্টার্ড নং ১৩৭৩৯/৫৭, ফোন : ৪৫-১৮০০

আশ্বিন, ১৩৮৮

সম্পাদক : স্বামী মহাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅনিলকুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীনাথগোপাল ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীরঞ্জনাথ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী মুক্তাত্মানন্দ
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ
শ্রীবিমলেন্দু সেনগুপ্ত

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সদন
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

কার্যালয় :

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

সহ-কার্যালয় :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীসনীরঞ্জন সোমগুপ্ত

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরাধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীদুর্গা প্রেস

৫ নং ব্রাদার্স ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

বঙ্গবাসী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

১৩৬, বেনেটোলা লেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সদন—সভাগৃহে

• স্বামী প্রজ্ঞাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমদ্ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য-বিরচিত শ্রীভজগোবিন্দম্ আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী সত্যাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিদ্যা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

• অধ্যাপকগণ প্রফেসর ডঃ গৌর গোপাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), বি. ই.এম্ (বিলাত) প্রতিবার ও অধ্যাপক সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী-ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি [illegible] সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'মেডিসাল্ফি-প্রসঙ্গ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীরঞ্জনাথ চক্রবর্তী-মহাশয় প্রতি দ্বিতীয় শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় [illegible] আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি [illegible] সাত ঘটিকায় 'ভজন' ও আরতি।

"শিরদার তো সরদার, মাথা দিতে পার তো নেতা হবে।"

ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি ভাব-গুরুরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর অমোঘ বাণী নিজ জীবনে বহন করেছেন সকল নেতার নেতা সেই নেতাজীর সচিত্র পূর্ণজীবন-কাহিনী কার্টিজ কাগজে অফসেটে ছাপা বোর্ড বাঁধাই—

NETAJI—A PICTORIAL BIOGRAPHY—Rs. 50·00

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ **বিবেকানন্দ চরিত** ১৫·০০ **ছেলেদের বিবেকানন্দ** ২·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ **শ্রীগৌরাঙ্গ** ৬·০০ **ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু** ৪·০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ **রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা** ৮·০০

সুভাষচন্দ্র বসু ॥ **তরুণের স্বপ্ন** ১০·০০

শঙ্করী প্রসাদ বসু ॥ **নিবেদিতা লোকমাতা** ৪০·০০ **আমাদের নিবেদিতা** ৬·০০

সৌরীন্দ্র মিত্র ॥ **খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে** ৪০·০০

কিশলয় ঠাকুর ॥ **পথের কবি** ২০·০০

অম্লান দত্ত ॥ **ব্যক্তি মুক্তি সমাজ** ৫·০০

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **সূর্য পথিক শ্রীঅরবিন্দ** ৮·০০

শান্তিদেব ঘোষ ॥ **রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য** ৫·০০

রাণী চন্দ ॥ **পথে ঘাটে** ১৫·০০

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ **মাধুরীলতার চিঠি** ৫·০০

রাধারাণী দেবী ॥ **শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প** ১৫·০০

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত ॥ **ফুলের বাগান** ২০·০০

শিবকালী ভট্টাচার্য ॥ **চিরঞ্জীব বনৌষধি** (পাঁচ খণ্ডে) ১ম ৪র্থ খণ্ড ২৫·০০

৫ম খণ্ড ৩০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৮৮

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	দুর্গাস্তুতি	২৯১	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য
২।	শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য	২৯২	অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর স্মৃতিতীর্থ, স্বামী ধর্মাচার্য্য-স্মৃতিতীর্থ
৩।	জাগো মা আবার জাগো	২৯৪	পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ স্মৃতি-তর্ক-জ্যোতির্ভূষণ সাম্যুদ্রিকরত্ন
৪।	বালী দেওয়ানগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ	২৯৮	স্বামী প্রভানন্দ
৫।	আমিই সেই	৩০১	প্রিয়
৬।	ঈশ্বরেচ্ছা, কর্মবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছা	৩০২	স্বামী সোমানন্দ
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ নররূপে : পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের চোখে	৩০৬	শ্রীশঙ্কর ঘোষ

Phone : { Office : 33-5953
Resi : 27-7082

With best Compliments from:—

SHARDA TRANSPORT AGENCY

PREMIER ROAD CARRIERS

For WEST BENGAL, BIHAR, U.P., M.P., BOMBAY, PUNJAB & ALL OVER INDIA

37, KALIKRISHNA TAGORE STREET,

CALCUTTA-700070

Phone : 77-4408

With Best Compliments From :—

M/S QUALITY CHEMICAL & STORAGE (P) LTD.

Regd Off :—82A, BRAHMO SAMAJ ROAD, CALCUTTA-700034

Factory :—MAHESHTALA, BANERJEE PARA,

Dt. 24 PARGANAS.

Manufacturers of Magnesium Oxychloride Flooring Composition.

With the Compliments of :—

BATLIBOI & COMPANY LIMITED

Regd. Office : P. O. Box 190A, V. B. Gandhi Marg,
Fort, Bombay-400 023

MACHINERY DIVISION

26, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700 001

Tel : 23-8831/4
Telex : 021 7289
Cables : BATLIBOICO

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৮।	ভুবনভরে আছ মা ভবানি	৩০৭	শ্রীহরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ
৯।	সৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ	৩০৮	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য
১০।	মধ্যযুগের বাংলার বেদান্ত	৩১৩	ডক্টর শ্রীভবতোষ দত্ত
১১।	রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম	৩২৪	ডক্টর শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
১২।	বাংলাগানে আদ্যাশক্তি মহাকালীর প্রভাব	৩২৮	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন
১৩।	ভক্তিতত্ত্বে রামমোহন থেকে বঙ্কিম	৩৩৩	শ্রীরঞ্জন দাশগুপ্ত
১৪।	মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান রহস্য	৩৩৭	ডক্টর শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
১৫।	তোমার নির্দেশ	৩৪৫	শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

পশ্চিমবঙ্গে
মাঝারী ও বড় শিল্পস্থাপনের পরিকল্পনা থাকলে
আমাদের কাছে আসুন

নতুন শিল্পস্থাপন (যার যন্ত্রাংশ বাবদ বিনিয়োগ ২০ লক্ষ টাকার বেশী) অথবা বর্তমান শিল্পের সম্প্রসারণ যাই করতে চান, সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারি।

শিল্প নির্বাচন থেকে সুরু করে উৎসাহবর্ধক নানারকম সরকারী অনুদান এবং মেয়াদী ঋণ আমরা দিতে তো পারবই এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপনেও সহায়তা করব।

শিল্পোন্নয়নে সহায়তার নির্ভরযোগ্য নাম

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন পর্ষৎ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিফোন : ২২-৮৩৮৫ (৫টি লাইন)

টেলেক্স : ০২১-৭৫৫৮-বি-আই-ডি-সি-ইন

- **ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য**
  ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য একাদমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বই। [৩০·০০]
- **উপনিষদের দর্শন**
  হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। [২০·০০]
- **উপনিষদের কথা**
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। [১০·০০
- **তন্ত্রের কথা**
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। [১০·০০
- **চীন-ভারত ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ**
  গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। কয়েকটি বিরল মানচিত্র। ১০·০০
- **সংস্কৃত নাটকের গল্প**
  অমিতা চক্রবর্তী। ১০টি প্রাচীন সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [১০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

॥ শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য ॥

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ., ডি. ফিল.—মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প ২৫·০০
[পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]
ডক্টর বীরেন্দ্র দেবনাথ, এল. এ., পি-এইচ. ডি.—ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ২৫·০০
ডক্টর বৈদ্যনাথ শীল, এম, এ., ডি. ফিল.—বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ২০·০০
[পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ]
গুপময় ধারা—গদ্যের সৌন্দর্য্য ১০·০০
ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ., ডি লিট্.—বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ ২০·০০

এ, কে, সরকার এণ্ড কোং

১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১২

রং

অক্ষয় কুমার লাহা

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম : কলারম্যান ফোন : ২৩-২৭৬৫

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১৬।	প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতে শিবপ্রসঙ্গ	৩৪৬	শ্রীত্রিপুরা বসু
১৭।	রবীন্দ্র-জীবন সাধনায় সঙ্গীত	৩৫৩	ডক্টর শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী
১৮।	গুরুচরণ সরোজে মন মজরে	৩৫৯	শ্রীমতি অনুরাধা বিশ্বাস
১৯।	ইরাণের চিত্রিত সিরামিক-এর ভূমিকা	৩৬০	শ্রীদিবাকর সেনরায়
২০।	অজন্তা পরিচয়	৩৬৮	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
২১।	প্রণাম হয়ে	৩৭২	শ্রীশান্তশীল দাশ
২২।	গান	৩৭২	শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস
২৩।	ভারত-সংস্কৃতিতে ঘনচেতনা	৩৭৩	ডক্টর শ্রীকল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

With Best Compliments from :—

M G F

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(ESTD. 1930)

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

১৬৫, শরৎ বসু রোড

কলিকাতা - ২৬

ফোন্ : ৫৫-৪৪৫৭

পি. রায় এণ্ড ব্রাদার্স

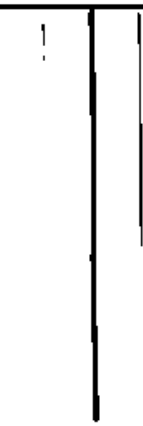

কোণারক ব্র্যাণ্ড সিমেণ্ট এজেণ্ট

সকল প্রকার রং, ইমারতী দ্রব্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬/৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

So innocent... So perplexed.

Sanju has just been to the hospital to see his baby brother. He has also decided what he wants to be when he grows up. A doctor.

Now it is up to you. To plan his education in such a way that he will never feel insecure.

So think ahead...Visit your nearest Bank of India branch. There are a number of savings schemes to suit your every requirement.

Come, secure your child's future with India's largest nationalised bank.

Bank of India

Where service makes the difference.

CONCEPT-BOI-0007

Gram : BANDUKGHOR Phone : 23-3147

J. BISWAS & CO.

Arms & Ammunition Dealers

Purchase/Sale/Repairing/Safe Keeping of Weapons

Air Guns and Pistols (No Licence)

2, JAWAHARLAL NEHRU ROAD

CHOWRINGEE ROAD

CALCUTTA-700013.

সেণ্ট্রাল কার্ড

॥ নতুন সুবিধার উদ্ভাবন ॥

- সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষ হইতে এই প্রথম দেশে এ ধরণের সুযোগ প্রবর্তন ।
- এই কার্ড কাছে থাকলে আপনি ভারতবর্ষ এবং নেপালের বিভিন্ন নথিভুক্ত সংস্থার নিকট থেকে পন্যদ্রব্য ক্রয় ও পরিসেবায় সুযোগ পাবেন ।
- বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কের কলিকাতা নিকটবর্তী এলাকার যে কোন শাখায় আসুন ।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

রেজিওন্যাল অফিস

৩, ডের্কাস লেন,

কলিকাতা ৭০০০৬৯

মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীসাধনাদেবী

তেতাল্লিশ বর্ষ	অষ্টম সংখ্যা	আশ্বিন ১৩৮৮

॥ দুর্গাস্তুতিঃ ॥

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

দুর্গতিহারিণি। শঙ্করি। দুর্গে।
সিংহবিহারিণি। পার্ব্বতি। দুর্গে।
সুন্দরবদনত্রিনয়নধারিণি। দুর্গে।
সঙ্কট নিরসনকারিণি। দুর্গে। ॥ ১ ॥
কাঞ্চনরুচিতনুশালিনি। দুর্গে।
শশিতপতলমালিনি। দুর্গে।
চণ্ডি। নগেশ্বরনন্দিনি। দুর্গে।
নারায়ণি: তব শর্ম্ম দুর্গে। ॥ ২ ॥
দক্ষমখোৎসবনাশিনি। দুর্গে।
দশমহাশক্তিরূপিণি। দুর্গে।
ত্রিজগন্মঙ্গল সাধিনি। দুর্গে।
কাত্যায়নি। কুরু করুণা দুর্গে। ॥ ৩ ॥

শবশিববক্ষসি রাজসি দুর্গে।
কালি। কুলাময়ি। চিন্ময়ি। দুর্গে।
নীলকলেবরধারিণি। দুর্গে।
নীলসরস্বতি। তারিণি। দুর্গে। ॥ ৪ ॥
ষোড়শি। ভগবতি। সুন্দরি। দুর্গে।
ভুবনেশ্বরি। পরমেশ্বরি। দুর্গে।
ভৈরব মোহিনি। ভৈরবি। দুর্গে।
ছিন্নমস্তাবরূপিণি। দুর্গে। ॥ ৫ ॥
ধূমাবতি। তত্ত্বহারিণি। দুর্গে।
পীতাম্বরধরবগলে। দুর্গে।
মাতঙ্গিনি। জগদীশ্বরি। দুর্গে।
বিত্তবিধায়িনি। কমলে। দুর্গে। ॥ ৬ ॥

বিলসিতনিজমাস্যে। নিত্যচৈতন্যকার্য্যে।
সকলজনশরণ্যে। চারুভূর্ত্তে। বরেণ্যে।
রিপু বিদলনহস্তে। বেদতত্ত্বপ্রশস্তে।
বিতর বিতর শান্তিং বিশ্বরূপে। নমস্তে।

।। শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য ।।

অধ্যাপক শ্রীশশধর স্মৃতিতীর্থ, শাস্ত্রী-ধর্ম্মাচার্য্য-স্মৃতিরত্ন

ও অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্য
অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।

ইতি দেবীসূক্তে ঋগ্বেদে।

আম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়া এই সূক্তে বলিতেছেন—"আমিই একাদশরুদ্র ও অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণকে ধারণ করিয়া আছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করিয়া আছি, আমি অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি।"

জগজ্জননী স্বয়ং আম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি হইয়াছিলেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি নকাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।
ভক্ত্যামামভিজানাতিযাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোক।

অর্থাৎ ব্রহ্মভূত ব্যক্তি প্রসন্ন হন, তিনি শোক করেন না, কোন আকাঙ্ক্ষাও করেন না। তিনি সর্বজীবে সমভাবাপন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট ভাগবদ্ভক্তি লাভ করেন। আমার স্বরূপ ও প্রকৃত তত্ত্ব ভক্তি দ্বারা তিনি জানিতে পারেন। তারপর আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া আমাতেই লীন হইয়া থাকেন।

আম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ স্বয়ং বাগ্দেবী-স্বরূপা হইয়া ঋগ্বেদের সুপ্রাচীনকালে এইভাবে ব্রহ্মভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্ম অব্যক্ত হইলেও ব্রহ্মানন্দ লাভকরা সুদুষ্কর বা অসাধ্য নহে।

শম, দম, তিতিক্ষাদি গুণে বিভূষিত হইয়া নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের অনুভূতি লাভকরা যায়, শ্রীগুরুর কৃপায়, 'সিদ্ধিমূলা গুরোঃ কৃপা", "কৃপৈব কেবলম্", ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে আমরা সাধনপথে অগ্রসর হইলে শ্রীগুরু আমাদের তৎপদ দর্শন করাইয়া দিবেন,

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃস্যাদ্ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরুধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।"

এই তন্ত্রের বচনানুসারে গুরুশব্দের যোগার্থই হইল—অন্ধকার অর্থাৎ মায়ার নিরোধ, গুরু তাহা করিতে পারেন। বেদেও দুর্গা শব্দের উল্লেখ আছে। সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভগবতী দুর্গার অর্চনা চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবীস্তবচে দেখা যায়,—

"নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা।"
অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ।
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোক-দুঃখ-ভয়ঙ্করীম্। —ইত্যাদি।

সুতরাং স্বয়ং ব্রহ্মাও দুর্গানাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, অথবা শত্রুমধ্যগত অথবা বিষম-দুর্গমে, ভয়ার্ত্ত হইলে, এই মায়ের শরণাগত হইলে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ্ বিপদ্ কাটিয়া যায়। সুতরাং এমন দুর্গতিহারিণী দুর্গামায়ের শরণাপন্ন কে না হইবে? শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দুর্গানামের আরও একটি কারণ লিখিয়াছেন—

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।" শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৫০

দুর্গানামের অপার মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই। সামান্য, অল্প-জ্ঞানী ব্যক্তির আর কি কথা। তবে শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে দুই একটি কথা বলিয়া আমার এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী,
যা মহিষোন্মূলনী যা চণ্ডমুণ্ডঘাতিনী
যা রক্তবীজশমনী শক্তি যা নিশুম্ভধ্বংসী পরা।
সা দেবী নব কোটি—মূর্ত্তিসহিতা—।
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।"

এই চণ্ডীধ্যানেই মা দুর্গার স্বরূপ অনেকটা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মধুকৈটভ, মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন, শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি অতি বলশালী দৈত্যের নিসূদনী শক্তিই এই দুর্গা। ভগবতী মহাশক্তি চণ্ডীতে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালীরূপে প্রকটিতা হইয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ ত্রিচরিত্রা। তাই চণ্ডীতে তাহার তিনটি মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে যেমন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিন যোগের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও সেইভাবে ত্রিচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

"দেব্যা যয়া তত্তমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ-দেবগণ শক্তি-সমূহ-মূর্ত্ত্যা
তামম্বিকা-মখিল দেব মহর্ষি পূজ্যাং
ভক্ত্যানতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সাঃ।"
"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্,
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।"

দেবী ত্রিভুবনব্যাপিনী অখিল দেবতার শক্তিভূতা, তিনি নিখিলমহর্ষি ও দেবতাদের পূজ্যা। সেই দেবী আমাদের শুভ করুন।

তিনি জগন্মূর্তি, অর্থাৎ নিরাকারা সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও সময় সময় জগদ্ধিতার্থে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এইভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও ভগবতী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি,
তদা তদা অবীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম।

মা জগদ্ধাত্রী দুর্গা কৃপা করিয়া মর্ত্যভূমিতে পদার্পণ করিয়াছেন। সন্তানবর্গের দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্গতি মোচন করিতে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব। আমরা ভারতবাসী সমবেত কণ্ঠে :

"আয়াহি বরদে দেবি" বলিয়া স্বাগত জানাই। অশ্বযুক্ত রুক্মপক্ষ, প্রেতপক্ষ বা পিতৃপক্ষ গিয়াছে। সেইপক্ষে পিতৃলোকের পার্বণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ব্রতপক্ষ ছিল। ব্রতপক্ষে সংযমপূর্বক ব্রতপূজাদি করিয়া মানুষ যেন ক্ষীণ-পাপ হইয়াছে।

তারপর আশ্বিন দেবীপক্ষ। সৌরাশ্বিনের নবমীকে বুধনবমী বলে, এই বুধনবমীতে অনেকে মা দুর্গার ঘট বসাইয়া মায়ের অর্চনা আরম্ভ করেন, আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে সন্ধ্যায় বিল্বতরুমূলে বোধন ও আমন্ত্রণ করিয়া দেবীআবাহন করিয়া থাকেন।

সপ্তমী তিথিতে ব্রহ্মঘট, গণপতি ঘট, দেবী ঘট প্রভৃতি বসাইয়া শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা আরম্ভ হইয়া থাকে।

আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিকে মহাষ্টমী ও মহানবমী বলা হয়। এই তিথি-গুলিতে বিশেষ ভাবে দেবীর স্মরণ, কীর্ত্তন, গৃহমার্জ্জনাদি করিয়া দেবীর মহাস্নান করিবার বিধান, তারপর সিংহ-বাহিনীর ধ্যান ও পূজাদি হইয়া থাকে। গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব সঙ্গে আসিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা, দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের পূজা ও লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিবার বিধান শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। মহাধুমধামে, মহাউৎসাহে এই পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজা মহোৎসবে বাঙ্গালীর, তথা ভারতবাসীর আকুল কণ্ঠের ব্যাকুল আকুতি ও স্তুতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। ধনী, দরিদ্র, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ সকলে মানব-প্রাণের অর্ঘ্য-নিবেদন করিয়া মনপ্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া থাকেন।

দেবীর ত্রিচরিত্র বর্ণনা করিতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করা হইয়া থাকে। মা আর্ত্তমানবের ব্যর্থমনোরথ পরিপূর্ণ করেন—আসুন, আমরা মায়ের স্তুতি সমবেত কণ্ঠে গান করি—

"ওঁ শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি, নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

ওঁ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং, শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে, নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ওঁ দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ-জন্তোঃ।
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিং মতীব শুভাং দদাসি॥
দারিদ্র্য-দুঃখ-হারিণি কাস্বদন্যা।
সর্বোপকার-করণায় সদার্দ্রচিত্তা॥"

॥ জাগো মা আবার জাগো ॥

পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ, সামুদ্রিকরত্ন

আজ তুমি মাতা সবার হৃদয়ে আছ তুমি সব স্থানে,
আছ তুমি দেবী অনলে অনিলে আছ মুনিদের ধ্যানে।
অন্ধ আমরা খুঁজে তোমা মরি,
ভুলে যাই তুমি ভবার্ণব-তরি,
ভুলে যাই তুমি সবার আশ্রয় সকলের মাঝে আছ,
যাহারা তোমার করুণা-ভিখারী ভকতি তাদের যাচ।

সকল সময়ে আছ তুমি মাতা তাই বিশ্ব আছে বাঁচি,
দাও মা অভয় অঁভয়-দায়িনি অভয় তোমায় যাচি।
তোমার পায়ের নূপুর-নিক্কন
করে যে সবার হৃদয় হরণ—
করত সদা নিখিল বিশ্বে তোমার মহিমা গান,
তুমি আছ তাই রয়েছে পৃথিবী আছে সবাকার প্রাণ।

তবুও আমরা ভুল ক'রে ভাবি, শরতে কেবল আস ;
এই ভুল নিয়ে করি মাতামাতি এ-আত্তি মোদের নাশ।
শরতেতে তাই কুমুদ-কহ্লার
সরোবর বুকে আনে সমাচার,—
আসিতেছ তুমি বৎসর পরে নূতন রূপেতে সাজি,
মুগ্ধা প্রকৃতি হেথায় হোথায় ছড়ায় কুসুম-রাজি।

তৃণদল বুকে শিশির-বিন্দু ঝলমল করি' উঠে,
বাগানে বাগানে শেফালি যুথি অজস্র শোভায় ফুটে।
পাপিয়ার গানে আগমনী তব
কিবা অপরূপ কিবা অভিনব
নিখিল ভুবন প্লাবিত করিয়া তুলে মা মধুর তান,
তটিনীর বুকে মধুর ঝঙ্কারে উঠে আনন্দ-বান।

উদয়-অচল-তুঙ্গ-শিখরে অরুণ-কিরণ হাসে,
নিখিল ধরণী করিয়া প্লাবন পৃথিবীর তমঃ নাশে।
সকলের মুখে আনন্দের হাসি
ক্ষণেকের তরে গ্লানি সব নাশি
বিশ্বের বুকে ছুটাইয়া তুলে স্বর্গের শোভাচয়,
ভুলে যায় সবে দুঃখ বেদনা হৃদয়ের যত ভয়।

যুগে যুগে তুমি নবরূপ ধরি জাগ মা ধরার বুকে
দানব-দলনী মানবে নাশিয়া মানবে রাখিতে সুখে—
কত শত রূপে দেখি মা তোমায়,
তোমার তত্ত্ব কেবা খুঁজে পায় ?
ত্রিতাপনাশিনি, কলুষবারিণি, তুমি ছাড়া আছে কেবা ?
তুমিই জননি হৃদয়ে থাকিয়া লইছ সবার সেবা।

মহিষাসুরের কঠোর পীড়নে পীড়িতা ধরণী যবে
ডাকিল তোমায় আর্তকণ্ঠে আবির্ভূতা হ'লে তবে।
দশ হাতে ধরি দশ প্রহরণ
তিমির ভেদিয়া তব আগমন
জাগাল হর্ষ পুলক বিস্ময় মর্ত্যবাসীর মনে,
নাশিলে অসুরে ভীষণ সমরে যুঝিয়া তাহার সনে।

কালিকার রূপে চণ্ডমুণ্ডে করিয়াছ তুমি নাশ,
নাশিয়াছ তুমি রক্তবীজেরে বিশ্বের মহাত্রাস।
প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখি তব
আসিয়াছে বুকে অতি অভিনব
তব বিশ্বয় প্রীতি আনন্দ হৃদয়ের ভাব যত,
অতি অপরূপ মহিমা তোমার কে পারে বর্ণিতে তত।

বিশ্বের মাঝে যাহা কিছু দেখি বিরাজিতা তাতে তুমি,
ওগো লীলাময়ী, তোমার লীলায় মুগ্ধ মর্ত্যভূমি।
কন্যা জায়া রূপে ঘরে ঘরে মাতা,
চিরকাল ধ'রে আছ বিরাজিতা,
তোমার চরণ অভয়-শরণ যে করে আশ্রয় তার,
মহাভয় হ'তে লভি পরিত্রাণ মুক্ত সে হয়ে যায়।

ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী ওগো ব্রহ্মময়ি, অপরূপ তব খেলা,
মর্ত্যতরির তুমি কাণ্ডারী ভাসাও মুক্তি-ভেলা।
যাহাদের আছে জ্ঞানচক্ষু মাগো,
তাহাদের বুকে সদা তুমি জাগো,
যাহারা অজ্ঞ, যাহারা মূর্খ অন্ধকূপেতে রত,
মুক্তি-পথ তুমি দেখায়ে তাদের নাশ মা তাদের ভয়।

অসুর আজিও পায় নাই লয় কত বা হ'য়েছে হত।
নাশিতে তাদের পারিবে কি মাতা অস্ত্র আছে কত শত?
ধরতরি অসি অতি খরশান
বিমোহিত ক'রে তাহাদের প্রাণ
গগনস্পর্শে প্রলয়-অগ্নি ছড়াও ধরণী 'পর,
নাশিতে তাদের মরণাস্ত্র নিয়ে হও মা অগ্রসর।

মর্ত্যভূমির দারিদ্র অজ্ঞতা হেলায় করিয়া দূর
নূতন ছন্দে নূতন আলোতে ধরা কর ভরপুর।
উজ্জ্বল হোক্ ধরণীর ধূলি—
যতেক অশিব আছে মাথা তুলি
কর মা ধ্বংস, কর মা চূর্ণ তোমার প্রভায় মাগো,
কলুষ-অসুরে নাশিতে ধরায় জাগো মা আবার জাগো।

॥ বালী-দেওয়ানগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরের বন্যায় বালি-দেওয়ানগঞ্জ থেকে ধনিয়াখালি পর্যন্ত অঞ্চল ডুবে গিয়েছিল। প্লাবন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল হুগলি চুঁচুড়াতেও। আবার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের দুঃসহ বন্যা ও পরবর্তী খরা এই অঞ্চলের বহু পরিবারকে ঘর ছাড়া করেছিল। এল ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বনাশা বন্যা। বন্যার জল নেমে গেছে, কিন্তু তার দাপটে সেখানকার মানুষ এখনও ঘুরছে।

এই বালি-দেওয়ানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে পূত। শুধু তাই নয়। তিনি এখানে একটি বাড়ীতে তিন রাত্রি বাস করেছিলেন। সেই বাড়ীটিও শেষ বন্যার গ্রাসে ধ্বংস হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী। 'জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতার অমাট'। বিচিত্র সুন্দর তাঁর জীবন।

১২৮৩ সন হতে পর পর তিন বছর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। সাধারণতঃ স্নানযাত্রার পরে পঞ্চমীর দিন তিনি দেশে যেতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতেন দুর্গাপূজার পূর্বেই।

সেবার ১৮৮৫ সন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখেন, পঞ্চবটী থেকে একটি সংকীর্তন তরঙ্গ বকুলতলার দিকে আসছে, বকুলতলা থেকে বাঁক নিয়ে কালীবাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছে, শেষে গাছের আড়ালে অন্তর্হিত হচ্ছে। এই দর্শনের কিছুকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেশে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমা ও ভাগনে হৃদয়রাম।

সে-সময়ে কলকাতা হতে ঘাটাল পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল করত। এক মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টীমারে সম্ভবতঃ বন্দর নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে দারকেশ্বর-নদের ভিতর দিয়ে বালী গ্রামে গিয়েছিলেন।[১]

বালি-দেওয়ানগঞ্জের বাসিন্দাদের মতে কলিকাতা থেকে দেওয়ানগঞ্জে যাবার দুটি পথ ছিল। প্রথমটি কলিকাতা থেকে কোলাঘাট, কোলাঘাট থেকে ষ্টীমারে রাধাচক ও সেখান থেকে নৌকায় দেওয়ানগঞ্জ। দ্বিতীয়টি নদীপথে নৌকায় কলিকাতা থেকে ঘাটাল হয়ে দেওয়ানগঞ্জ।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গী হৃদয়রাম পরবর্তীকালে 'মাষ্টারমশাই'কে বলেছিলেন যে তাঁরা নৌকা করেই গিয়েছিলেন। নৌকার ভাড়া পড়েছিল ১০৲ দশ টাকা। এই তথ্য মাষ্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন।[২]

পুরানো বইপত্র ম্যাপ ও প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ নৌকা-পথেই দক্ষিণেশ্বর থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর নৌকা হুগলী ধরে এসে গেরোঘাটিতে রূপনারায়ণে ঢুকেছিল। নৌকা কোলাঘাট হয়ে সোজা গিয়েছিল বন্দর। সেখান থেকে শিলাই নদী ঘাটাল

১। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য : শ্রীশ্রীসারদাদেবী, ৭ম সং, পৃঃ ৪০

২। পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ১৪৭।

হয়ে চলে গেছে। নৌকাটি বন্দর থেকে দ্বারকেশ্বর নদ ধরে বালির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। (চিত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল, বালি থেকে পাল্কী করে কামারপুকুর যাওয়া।

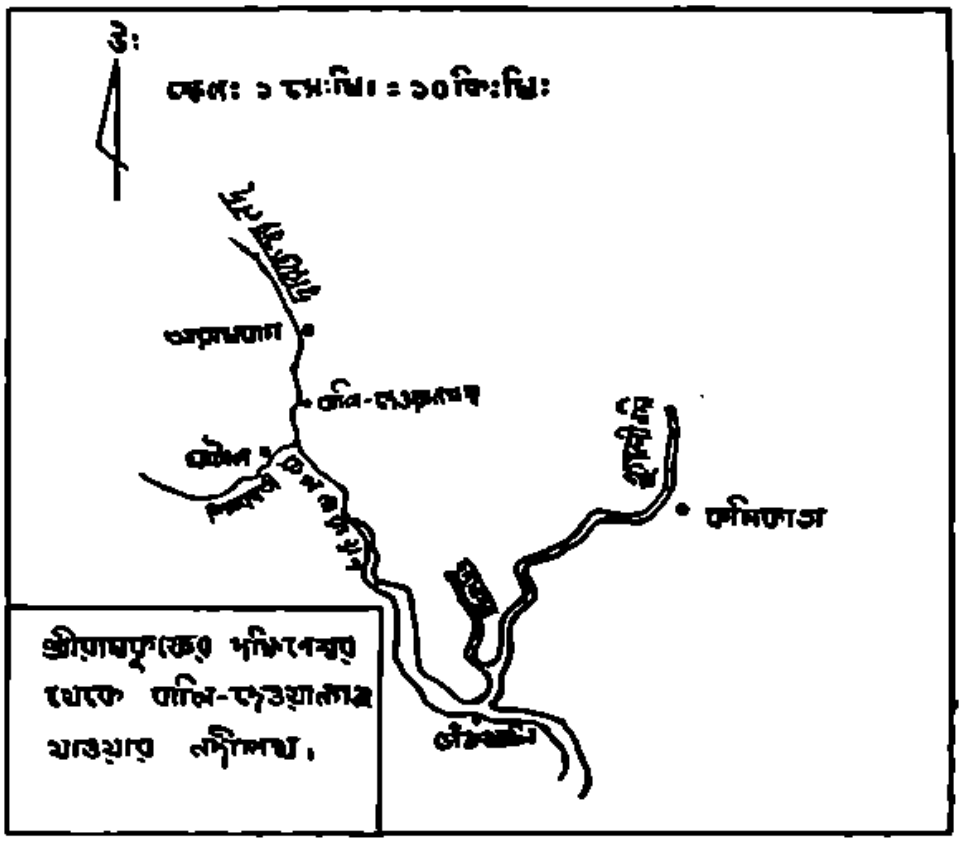

এই যাত্রাপথের একটি মধুর স্মৃতিচিত্র পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং শ্রীমা। তিনি মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেন: একসঙ্গে এক নৌকায় বালি হয়ে দেশে যাওয়া—একসঙ্গে খাওয়া, গান গাওয়া, পরস্পর প্রসাদ খাওয়া।

এইবারেই একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেন: আমি জানি তুমি কে; কিন্তু এখন বলবো না।

আবার তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলেছিলেন: এর ভিতর সব আছে।[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ কি পুনরায় ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি ও জগন্মাতা একাধারে অবস্থান করছেন?

দেওয়ানগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ। পুরাতন ধারা অনুযায়ী এখানে কাসা পিতলের বাসনপত্র বিশেষতঃ কলসী তৈরী হত। তসরের কাপড় তৈরী হত। রেশম, তসর ও তুলো মিশিয়ে রঙিনা তৈরী হত। এই ধারা এখনও বজায় রয়েছে।[৪] দেওয়ানগঞ্জ থেকে বালী হাট প্রায় দুই কিলোমিটার। বালি দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত।

৩। পূথনীর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ১৭৮

৪। Amiya Kumar Mazumdar: Gazeteer of India: West Bengal: Hooghly (1972)

সেই গ্রামে বাস করত একটি বিশেষ ভক্তিমান পরিবার। মোদক পরিবার। কাছেই কয়েকঘর গোস্বামীর বাস ছিল। মোদক-বাড়ীর কর্তা বংশীধর ও তাঁর স্ত্রী গিরিবালা[৫] সজ্জন বলে সুপরিচিত ছিলেন। বংশীধর বসবাসের জন্য একটি নূতন বাড়ী তৈরী করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল গৃহপ্রবেশের পূর্বে কোন সাধুসজ্জনকে ঐ বাড়ীতে তিন দিন রেখে সেবা করার।

বালি-দেওয়ানগঞ্জ থেকে কামারপুকুরের দূরত্ব চার ক্রোশের বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিনই কামারপুকুরে যেতে পারেন না, কারণ যখন তিনি বালীতে পৌঁছান সেসময়ে,

ঝরে মেঘ ঝুরু ঝুরু দিবা অবসান।
হৃদয় জাগিলা করে বাসার সন্ধান॥
ভক্তিমান মহারার কাছে এল পরে।
সৌভাগ্য-উদয় মহা সমাদর করে॥
পরিচয় পাইয়া প্রণত বারবার।
বাসা দিল নূতন আবাসে আপনার॥
... ...
জানে না মোদক এঁরা বটে কোন জন।
কেবা সেবাপর হয়ে আত্মীয়স্বজন॥
পাইয়াও নাহি পায়, দেখেও না দেখে
লীলা নিত্য উভয়েই ইন্দ্রিয়ে না ঢুকে॥[৬]

সেই নূতন বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও হৃদয়রাম আশ্রয় নেন।[৭] এদিকে 'গর্জিয়া করিছে মেঘ বৃষ্টি নাহি যানে', ওদিকে বংশীধর,

'এখানে সেখানে ছুটে দ্রব্য-আয়োজনে।
পাড়াগাঁয়ে যতদূর যাহাদ্রব্য জুটে।
দুনো মূল্যে তরান্বিত আনিল আকুটে॥
রাত্রিকার মত সাধ্য হৈল যতদূর।
যতনে মোদক সেবা কৈল শ্রীপ্রভুর॥'

বৃষ্টি পড়তে থাকে। অঝোরে পড়তে থাকে। অন্য উপায় না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণকে সেখানেই থাকতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাড়ীতে তিন রাত্রি বাস করেন।

৫। বংশীধরের প্রপৌত্র দুলাল মোদক ও তাঁর বৃদ্ধা মা পুরানো দিনের কথা বলেন। ইদানীং দুলাল একটি সাইকেল মেরামতের দোকান চালাচ্ছেন।

৬। অক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, ৯ সং, পৃঃ ২১৫

৭। ১৯৫৮ সালের বন্যায় এই বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ঐ স্থানে একটি পাকা বাড়ী করে দেওয়া হয়। একটি ঘরে শ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও শ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি বসান রয়েছে।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। মথুরবাবুর গুরু, কেশবচন্দ্রের গুরু বলে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচিত। তখন অধিকাংশ লোক তাঁকে ডাকত 'পরমহংসদেব' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণের খবর 'পাড়ায় পাড়ায় সাড়া পড়ে গেল পড়ে'। বৈকণ্ঠ প্রধান স্থান। বৈষ্ণবেরা এসে ভীড় করে, নানা জাতের মানুষ এসে ভীড় করে, বাড়ীতে লোকের মেলা বসে যায়।

প্রবীন গোঁসাইরা উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের মিষ্ট ব্যবহার, মিষ্ট কথা, ততোধিক মিষ্ট গান শুনে চমৎকৃত হন। সমাগত লোকদের তিনি ঘরোয়া কথায় উপদেশ দেন। আনন্দ-আসর জমে যায়। পুঁথিকার লিখেছেন,

যত লোক গ'লে পড়ে প্রভুর কথায়।
কেহ নাচে কেহ হরি-গুণ-গীতি গায়।
হয়েছে আনন্দময় মোদক ভবন।
দিনে রাতে পরিপূর্ণ আছে লোকজন।

আনন্দের দিনগুলি যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। চতুর্থ দিনে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীদের নিয়ে কামারপুকুর যাত্রা করেন।[৮] খালি-দেওয়ানগঞ্জের ভক্তদের চেতনায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকে মধুর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি। এই সুখ-স্মৃতি মূলধন করে বাকী জীবন আনন্দে কাটিয়ে দেন বংশীধর মোদক ও তাঁর স্ত্রী।

●

।। "আমিই সেই" ।।*

শ্রীম

কহিলে সেবকে বলরামমন্দিরে
ঈশ্বরের রূপ দেখা যায়—
সাকার চিন্ময় রূপ—সাধনার ফলে,
ভুবনমোহন রূপ তাঁহার কৃপায়,
দিব্যচক্ষু হলে পায় সাধক দেখিতে।
নিবেদিলা দাস
পঞ্চম বরষকালে শিশু একজন
দেখেছিল আনন্দ কুয়াসা
ওতঃপ্রোত হয়ে আছে চরাচর বিশ্ব-
নবদুর্বাদলবাস—সুশোভিত ক্ষিতি
জল অন্তরীক্ষ দ্যুলোক দ্যুলোক,
অশ্ব অশ্বপাল সুন্দর সরোবর
নরনারী প্রাণীগণ বিহঙ্গম সবে
পশুআদি ভূচর খেচর ;
বল প্রভু কেন এ সুন্দর স্মৃতি
এখন জাগিছে হৃদয়ে তাহার।
ভক্ত দেখেছিল যাহা তপস্যার বলে
বহু জন্মার্জিত সু-সংস্কার ফলে,
খুব ভাল কহিলা দাসেরে,
পরব্রহ্ম প্রকাশেন ভক্তের হৃদয়ে
হয়ে জীবজগৎ কিংবা চতুঃবিংশতি তত্ত্ব ;
জানিবে হে তুমি—
সাকার দর্শন সত্য যথা নিরাকার
সাকার চিন্ময়রূপ কিম্বা নররূপ।
যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী, রাম তিনি কৃষ্ণ
জানিবে নিশ্চয় যিনি খৃষ্ট শ্রীচৈতন্য
সেই আমি ইদানীং রামকৃষ্ণ।
আস্বাদন করেছিল বালক সু-ভক্ত
আনন্দস্বরূপ নিরাকার
তাঁরি মাঝে সর্বভূত, সর্বভূতমাঝে
তিনি ; আবার যুগে যুগে অবতীর্ণ
সাকার বিগ্রহ এই দেখিছ আমারে।

৮। পুঁথিকারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ খালি-দেওয়ানগঞ্জ হতে সোজা শিবপুরে গিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মিলে না, যুক্তিযুক্তও মনে হয় না।

* ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রচিত। শ্রীঅনিল গুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

।। ঈশ্বরেচ্ছা, কর্মবাদ ও স্বাধীন-ইচ্ছা ।।

স্বামী সোমানন্দ

ঈশ্বরই এই জগতের কর্তা, তিনিই সব করাচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই জগৎ চলছে। তাহলে মানুষ আবার সুখ দুঃখ নানা কর্মফল ভোগ করে কেন? তাঁর ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু কাজ নির্বাহিত হয়, তবে মানুষের কর্মফলের জন্যে দায়ী কি তিনি নন? দুর্যোধন বলেছিলেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—(তুমি হৃষিকেশ অন্তর্যামীরূপে সর্বজীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করে যেমন কাজ করাচ্ছ তেমনি আমি করছি)।

ভারতীয় ধর্মদর্শনে একথা সকলেই বলছেন যে কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারের নাম কর্ম এবং সুখ, দুঃখ, মোহ, ভোগ তার ফল। কৃত কর্মের ফল নষ্ট হয় না (কৃত প্রণাশ), আবার অকৃতকর্মের ফল লাভও হয় না (অকৃত অভ্যাগম)। একে বলা হয় কর্মবাদ। কার্যকারণ নীতির ভিত্তিতে এই কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত ব'লে এ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মতবাদ। শুভ কর্মের ফল সুখ আর অশুভ কর্মের ফল দুঃখ। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কারণ ভোগ ব্যতীত কর্মের ফল কখনও—এমন কি কল্পকল্পান্তরেও নাশ হয় না।

ঈশ্বর কর্মের নিয়মে বা অদৃষ্ট বা দৈববিধি অনুসারেই জগৎ সৃষ্টি করেন। এই কর্মের বিধান বা অদৃষ্ট জড় বা অচেতন। যে-কোন কর্ম করলেই তার একটা প্রভাব অদৃশ্যাকারে বর্তমান থাকে। এর নাম অদৃষ্ট বা কর্মসংস্কার। এই কর্মসংস্কার পরবর্তীকালে কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল বিধান করে। চেতন কোন কিছুর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অচেতন অদৃষ্টের পক্ষে যার যা প্রাপ্য তা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বলা হয় ঈশ্বর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কর্মানুসারে জীবের সুখদুঃখ বিধান করেন। কোন কর্মের ফল আগে আসে, কোন কর্মের ফল পরে আসে। কোন্‌টা আগে আসবে কোন্‌টা পরে আসবে, কোন্ কারণের কী ফল দেখা দেবে—এ রহস্য বোঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই—ঈশ্বরই তার বিধান-কর্তা।

সংস্কারের ফলে বাসনার প্রভাবে মানুষ সৎকর্ম ও অসৎকর্ম করে এবং তা করার স্বাধীনতা তার আছে। কর্মের স্বাধীনতা আছে মনে করেই মানুষ পুরুষকার বলে অগ্রসর হতে চায়, প্রচেষ্টা চালায়, উৎসাহ উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলে। আবার মানুষ নিজের চেষ্টা দ্বারা তার স্বভাবেরও পরিবর্তন করতে পারে। কর্মের স্বাধীনতার মধ্যে সঙ্গের পরিবেশের প্রভাব, উপদেশের প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু যদি পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা বর্তমান কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে কর্মে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়?

কর্মের ফল দুটি—একটি মুখ্য ফল, একটি গৌণ ফল। মুখ্য ফল হচ্ছে ভোগাত্মক, যা ভোগ করছি বা করতে হবে, আর গৌণ ফল হচ্ছে বাসনাত্মক বা সংস্কারাত্মক। ভোগাত্মক কর্মফলকে কেউ রোধ করতে পারে না, ভোগ দিয়ে সে কর্মফল নাশ প্রাপ্ত হয়। ভোগের ফলে সুখ বা দুঃখ আসবে। বাসনাত্মক গৌণ ফল হিসাবে কৃতকর্মের 'সংস্কার' চিত্তের মধ্যে অবস্থান করে এবং পূর্বকৃত কর্মের পুনরাবৃত্তির বাসনা জাগ্রত করে। পরবর্তী জন্মে 'প্রারব্ধ'-

কর্মরূপে সুখ ও দুঃখ ভোগদ্বারা এই সংস্কারের কর্মফল লাভ হয়। পুনরাবৃত্তির বাসনার ফলে অনুরূপ কর্মদ্বারা পুনরায় মুখ্য ও গৌণ ফলের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবে জন্ম-জন্মান্তর চলতে থাকে।

কর্ম তিন প্রকারের—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামী বা ক্রিয়মান। যে কর্ম জমা আছে (সংস্কাররূপে), এখনও পরিপক্ক হয়ে ফল দিতে আরম্ভ করে নি, তা সঞ্চিত। যে কর্মের ফল পরিপক্ক হয়ে এ জন্ম লাভ হয়েছে এবং কর্মের ফল সকলে ভোগ করছে তা প্রারব্ধ। এ জন্মের কর্মের দ্বারা যে সংস্কার তৈরী হচ্ছে যা পরবর্তী জন্মে ফল দেবে, তা আগামী বা ক্রিয়মান কর্ম। বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে তার মধ্যে উৎকট কর্মের ফল এ জন্মেই ভোগ করতে হয়। তবে এরূপ কর্ম দ্বারা যে সংস্কার তৈরী হবে, তা 'আগামী'-রূপে থাকবে। 'আগামী' কর্ম পরবর্তী কালে 'সঞ্চিতে'র মধ্যে জমা হবে, প্রারব্ধরূপে তা দেখা দেবে।

সংস্কারের ফলে যে বাসনা জাগ্রত হয়—মানুষ তীব্র ইচ্ছা সহায়ে চেষ্টা করলে, সাধনা বলে অথবা সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাবে তা নিস্তেজ করতে পারে। শুভ কর্মদ্বারা অশুভ কর্মের সংস্কার দুর্বল হতে থাকে। ফলে ভোগ হয় ঠিকই, কিন্তু ভোগের শক্তি কমে যায়—অর্থাৎ দুর্ভোগ কম হয়। এখানেই এই কর্মের সংস্কারের ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত কর্মফলে মানুষের হাত নেই। আবার এ কর্মফল তো মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এর উপর প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে একেবারেই হাত নেই—একথাও কিন্তু বলা যায় না।

কাজেই ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনিই কর্তা, তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন, একথা ঠিক—কিন্তু কর্মবাদী মানুষ যতদিন না ঠিক ঠিক তা অনুভব করছেন, ততদিন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা 'ফ্রি উইল'—এই মনোভাবটি থাকবেই। তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন —এই ভাবটি যতদিন না ঠিক -ঠিক অনুভব হবে, ততদিন পুরুষকার থাকবেই, নিজে করছি এই ভাবটি থাকবে এবং কর্মফল ভুগতে হবে। সাধন সহায়ে পুরুষকার বলে যখন বাসনাকে দুর্বল করা যাবে, তখন অশুভ সংস্কারের বন্ধন শক্তিহীন হতে থাকবে, শুভ সংস্কার প্রবলতর হবে এবং সবই ঈশ্বরেচ্ছায় হচ্ছে—এ সত্যও প্রতিভাত হতে থাকবে। নিষ্কাম কর্মদ্বারা সঞ্চিত কর্মের বাসনারূপ সংস্কার দুর্বল হতে থাকে, ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তের মল যথা —ঈর্ষা, দ্বেষ, অনুরাগ, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সংস্কার নিষ্কাম কর্মদ্বারা দুর্বল হয়ে যায় এবং উত্তম সংস্কারগুলো যেমন ঈশ্বর-চিন্তা, ভগবানে ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য প্রবল হতে থাকে। চিত্তশুদ্ধি এই ভাবেই হয়। কিন্তু সংস্কার তখন একেবারে নাশ হয় না, দুর্বল অবস্থায় থাকে মাত্র।

শুদ্ধচিত্ত লাভের পর সাধনা দ্বারা যদি জ্ঞান লাভ করা যায় তবেই সঞ্চিত কর্মের সংস্কার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হলে তবেই কর্মফল ভোগবিনা ক্ষয় হয় বলা যায়। জ্ঞান লাভ হলে সঞ্চিত কর্ম এবং আগামী কর্ম ক্ষয় হয়, প্রারব্ধ থাকে। প্রারব্ধ ভোগের পর এই দেহ নাশ হয়—কোন কর্মসংস্কার আর থাকে না বলে

এঁদের আর জন্ম হয় না। তাই পুরুষকারের মূল্য প্রবর্তক ও সাধকের কাছে বিশেষভাবে রয়েছে। পুরুষকার থাকলে স্বাধীন-ইচ্ছা মনোভাবটিও থাকবে। স্বাধীন-ইচ্ছা বলতে সত্যকার কিছু কি আছে ?

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, আলু-বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু-বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানেনা যে নীচে আগুন আছে। মানুষ বলে ইন্দ্রিয়েরা আপনা আপনি কাজ করছে। ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা জানে না।

স্বামী সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখেছেন (সাধকভাব)—দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা নিরঞ্জনানন্দের সহিত মানবের স্বাধীন-ইচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'স্বাধীন-ইচ্ছা কিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে ? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি জানিস, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে—গরুটা খোঁটার একহাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছাটা যত লম্বা ততদূর গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা যাক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক—মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে করে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভূমিকায় এই স্বাধীন-ইচ্ছা সম্পর্কে একটি নতুন ধরণের উদাহরণ দিয়েছেন— '…জীবন তাসের ব্রীজ খেলার মত। খেলাটা আমরা উদ্ভাবনও করিনি আর তাসের আকারপ্রকারও আমরা স্থির করিনি। নিয়মকানুনও অঙ্কে বেঁধে দিয়েছে, আর কার ভাগ্যে কি কি তাস পড়বে তাও খেলোয়াড়রা স্থির করতে পারে না। অথচ যে তাস আমাদের বন্টন করে দেওয়া হয়, ভাল হোক বা মন্দ হোক তাই নিয়েই খেলতে হবে। এ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ নিয়তির অধীন। তা সত্ত্বেও খেলায় ভালমন্দ আছে। দক্ষ খেলোয়াড় খারাপ হাত পেয়েও গেম জিততে পারে আর খারাপ খেলোয়াড় ভাল হাত পেয়েও সব গোলমাল করে ফেলে। আমাদের জীবনও বাধ্যতা ও স্বাধীনতা, দৈব ও নির্বাচনের মিশ্রণ। যথোপযুক্ত নির্বাচন দ্বারা আমরা সমস্ত উপাদানগুলিকে স্থিরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাকৃতিক নিয়তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন (কথামৃত ৪র্থ)—তিনিই সব করছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপ করতে পারে। তা নয়—যার ঠিকঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা' তার আর বেতালে পা পড়ে না।

—ইংলিশম্যানরা যাকে স্বাধীন-ইচ্ছা বলে, সেই স্বাধীন-ইচ্ছাবোধ তিনিই দিয়ে রাখেন। যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর এই স্বাধীন-ইচ্ছাবোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ করছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত।

—যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে, দেখতেই স্বাধীন-ইচ্ছা, বস্তুত তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ি।

বেদান্তের দৃষ্টিতেও স্বাধীন-ইচ্ছা প্রমাণ করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন (বাণী ও রচনা ৩য়, পৃঃ ৬৪)—ইচ্ছাকে স্বাধীন বলা একেবারে নিরর্থক। যখনই সেই অনন্ত সত্তা যেন এই মায়াজালের মধ্যে পড়ে, তখনই উহা ইচ্ছার আকার ধারণ করে। ইচ্ছা মায়া-জালে আবার সেই পুরুষের কিঞ্চিদংশ মাত্র, সুতরাং 'স্বাধীন-ইচ্ছা'-বাক্যটির কোন অর্থ নাই, উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

অতএব দেখা যাচ্ছে স্বাধীন-ইচ্ছা কার্য-কারণের নিয়মের অধীন—প্রকৃত স্বাধীন-ইচ্ছা কিছু নেই। ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষকে কম শক্তি বা বেশী শক্তি দিয়েছেন। সেই শক্তি অনুসারে মানুষ কর্ম করে এবং তার ফল ভোগ করে। এখানে মানুষের ইচ্ছাই প্রধান। পণ্ডিত ও সাধক গোপীনাথ কবিরাজ 'অসংবেদনে' বলেছেন—'শক্তিদৃষ্টিতে বলিতে হয়, ঈশ্বর যেমন দিতেছেন, তাহার সেই প্রকার যোগ্যতা হইতেছে। জীবের কর্ম ও কর্মফল কথার কথা।··· ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কেন দেন, তাহার জন্য জীবের কর্ম দায়ী নহে। কারণ জীবের কর্ম তো তেমনই হইবে যেমন প্রেরণা ঈশ্বর হইতে সে পাইবে। জীব তো তাঁহারই হাতের পুতুল মাত্র। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাই প্রধান। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেন বিভিন্ন হয় তাহার কারণ কেহই জানে না।'

তাই শরণাগতিই উপায়। নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ভালমন্দ, সুখদুঃখ সকলই তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে এইভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরী করা প্রয়োজন। তথাকথিত কর্মবাদীদের ও স্বাধীন-ইচ্ছাবাদীদের চেয়ে শরণাগত ভক্ত অনেক বেশী শান্তির অধিকারী হয়ে থাকে।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ নবরূপে : পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের চোখে ॥

শ্রীশংকর ঘোষ

অগ্রজ রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন তখন কলিকাতায় ব্রিটিশ রাজত্ব। নিভৃত পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যোগসাধনায় নিমগ্ন হন। সে সাধনা ও সিদ্ধি ছিল সর্বধর্মের সমন্বয়ের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সনাতন ধর্মের ধারকই নন, তিনি নবতম ধর্মের পথিকৃৎ। প্রফেসর উইলিয়াম আরনেষ্ট হকিং-এর ভাষায়, সমস্ত রামকৃষ্ণ আন্দোলন ভারত ও ভারতের বাইরে—হল সেই মহামানবের প্রলম্বিত ছায়া।

স্বদেশী বহু বিশিষ্ট জনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদেশীদের মধ্যে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড হেষ্টির নাম স্মরণীয়। হেষ্টি সাহেবই স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম রামকৃষ্ণদেবের সমাধির কথা বলেন। কেশবচন্দ্র সেন "এ হিন্দু সেন্ট"-শীর্ষক রচনায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ "মাই-মাস্টার" শীর্ষক বক্তৃতায় বিদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের ওপর আলোকপাত করেন।

বিদেশীদের মধ্যে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে আকৃষ্ট হন প্রখ্যাত জার্মান মনীষী ম্যাক্সমূলর। ২৮মে ১৮৯৬ খৃঃ বিবেকানন্দের সঙ্গে মূলরের সাক্ষাৎ হয় অক্সফোর্ডে। তিনি স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, "শ্রীরামকৃষ্ণকে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য কি করছেন আপনারা?" তিনি নিজেই উদ্যোগী হন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখতে। তারই ফলশ্রুতি "এ রিয়েল মহাত্মা"-নামক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় "নাইনটিনথ্ সেনচুরি" পত্রিকায় (আগষ্ট ১৮৯৬ খৃঃ)। সারদানন্দ স্বামীজীর নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী ও বাণী ইংরাজীতে অনুবাদ করে মূলরের কাছে পাঠান। মূলর তখন "রামকৃষ্ণ : হিজ লাইফ এ্যাণ্ড সেয়িংস্" শীর্ষক বহুপঠিত জীবনীগ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৯৮ খৃঃ অক্সফোর্ড থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অজস্র মানুষকে প্রভাবিত করেছে। অন্তরকে করেছে আলোড়িত। ইংলণ্ডের প্রফেসর হার্বার্ট জি উড বলেন যে, মূলরের রচনা পড়েই তিনি রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অনুপ্রাণিত হন।

মূলরের বেশ কিছুদিন পরে যে দ্বিতীয় পাশ্চাত্ত্য মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন তিনি হলেন বিশ্ববন্দিত ফরাসী সাহিত্যিক ও মানবপ্রেমিক রোঁমা রোলা। প্রফেসর জি. ই. মোনড হামডেন (আফগানিস্তান) এবং বি. কে. মুখার্জী একদিন রোঁমা রোলার বাড়ী বসে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক আলোচনা করেন। রোলার শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লেখার সেদিনই ছিল সূত্রপাত। এ ব্যাপারে যাঁরা রোলাকে আরো উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বনগোপাল মুখার্জী, দিলীপ রায়, ডঃ সত্যানন্দ ঘোষ প্রমুখ। সর্বোপরি ছিলেন রোলা-ভগিনী ম্যাডেলাইন রোলা যিনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষা দুইই জানতেন। ফলে রোঁমা রোলার লেখায় প্রচুর সুবিধা হয়। তারই ফলশ্রুতি সাড়াজাগানো জীবনীগ্রন্থ "দ্য লাইফ অব রামকৃষ্ণ"। মূল গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় লেখা, প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। এক বছর পরে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আরেক ফরাসী লেখক ও সাংবাদিক জিন হার্বার্ট স্বীকার করেন যে,

রোঁলার গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরেই ইউরোপে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতি ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে।

তৃতীয় বিদেশী লেখক হলেন থ্রইফার ইসারউড। ইসারউডের জীবনীগ্রন্থটির নাম "রামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড হিজ ডিসাইপল্‌স্"। ইসারউডের গ্রন্থটি আরো সম্পূর্ণাঙ্গ, তার কারণ রামকৃষ্ণ-জীবনীর দুটি মূল গ্রন্থ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে"র সঙ্গে ইসারউড গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন।

বিদেশের পণ্ডিতরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মহৎ বলেছেন বলেই যে তিনি মহৎ—তা নয়। তাঁর মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব স্বয়ংসিদ্ধ। জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেই আরেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হে বিলেত যাবে না কি?" ভক্তের হয়ে ঠাকুরই উত্তর দেন, "আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে"। তবু বিলাতে তাঁর বাণী পৌঁছাল। শুধু বিলাত নয়—সারা পৃথিবীতে তিনি দেবতার মর্যাদায় আদৃত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিদেশী মনীষীরা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছেন ও বলেছেন, তা গবেষণাযোগ্য। মূলর, রোঁলা, ইসারউডের মত সর্বজনপ্রিয় মনীষীদের লেখনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের তাৎপর্য ও মহিমা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের সমীচীনতা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু বাংলার নন, শুধু ভারতের নন, তিনি সারা বিশ্বের। ফরাসী মনীষী ডঃ সিলভেঁ লেভীর উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটি শেষ করছি, "রামকৃষ্ণের জীবন ও মন যেমন সমস্ত মানুষ ও সব দেশের জন্য, তাঁর নামও তেমনি, সব মানুষের সাধারণ সম্পত্তি"। ●

।। ভুবন ভ'রে আছ মা ভবানি ।।

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

ভুবন ভ'রে মা আছ ভবানি, কে তা তোমাকে দেখে
বন্দিত রাতুল চরণের রেণু কুসুম বুকেতে মেখে।
নয়ন ভোলান পদরেখা নিয়ে কুমুদ ও শতদল—
ভক্তিময়ী তবার অঙ্গকি অলক্ত রাগে উজ্জ্বল।
রেখেছ অভয়ে দশদিকে দশ তুলে যে অভয় পাণি
মায়া করুণা স্নেহ স্রোতধারে সিক্ত ভুবনখানি।
আকীর্ণ আহা, অধরের হাসি লাখ লাখ ফুলদলে
ভুবান শোভন লালচেলি ভোরে পূবাকাশে ঝলমলে।
ভবানি, তোমার অঙ্গ লাবণি জ্যোৎস্নায় উঠে ভাসি
বারিদ পুঞ্জে কুঞ্চিত কালো এলায়িত কেশরাশি।
নিখিলের বুকে মায়াপাশ তব পাতা আছে মহামায়া
কে চিনি আমরা চরণে তোমার সঁপে দিই স্বীয় কায়া!
তাপিত তনু হয় যে শীতল ক্ষণিকের আঁখি পাতে
তোমার পূজার অর্ঘ্য তবু সাজাই না মোরা হাতে।
মার্জনা কর অপরাধ মোদের ঢালো অমৃতধারা
কে আছে বা বল পাপী-তাপীদের তুমি জিনয়নী ছাড়া।
স্নেহ এ দেহেতে পরম স্নেহেতে চাঁদ রাঙা পা দুখানি
খেল মা, কিলেক এ'বুকের পরে লীলাময়ি, উমারাণী।

●

।। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ।।

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ একটি প্রসিদ্ধ কথা। এই কথাটির অর্থ কি এবং এই মতবাদীদের মূল-বক্তব্যই বা কি—এ'সম্বন্ধে অদ্বৈতবেদান্তের প্রসিদ্ধ আচার্যগণ বহু যুক্তিপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচনার মূল বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমে জগৎ-সম্বন্ধে অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করা দরকার। যা-কিছু দেখি, অনুভব করি সে সমস্তই মিথ্যা, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, অদ্বৈতবেদান্তের এই সিদ্ধান্ত চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু মিথ্যা বলতে কি বোঝায় তা-ই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যা নেই, তাই মিথ্যা—এ'কথা অনেকেই মনে করেন। রজ্জুতে সর্প নেই, সুতরাং সেখানে সর্প মিথ্যা। সাধারণভাবে একথা বলা গেলেও এখানে বিশ্লেষণযোগ্য অনেক কথা থেকে যায়। যা কোথাও নেই—একথার অর্থ কি? বস্তু আছে—কি নেই, জানাই তার একমাত্র মাপকাঠি। যা একেবারেই নেই তার জ্ঞান কখনও হয় না। আকাশকুসুম এর দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কোনস্থানেই 'আছে' বলে যার প্রতীতি হয় না, কেবল তাকেই একেবারে নেই বলা যায়। কিন্তু রজ্জুসর্প প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্পের প্রতীতি হয়, সুতরাং কোথাও যার প্রতীতি হয় না, তাকেই মিথ্যা বলা হলে রজ্জুসর্পকে মিথ্যা বলা যায় না। সুতরাং বলতে হবে—যা কোথাও আছে বলে প্রতীয়মান হয় না, তাকে মিথ্যা না বলে অসৎ বা অলীক বলা যায়। এই অসৎ বা অলীক এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। আকাশকুসুম কোনদিন কোনস্থানেই আছে বলে অনুভূত হয় না, অতএব তা অসৎ বা অলীক। কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাকে মিথ্যা বলা হয় তার আপাতপ্রতীতি হয়। অল্প অন্ধকারে বা দূরত্বের ফলে লম্বমান রজ্জুকে দেখে সাপ বলে প্রতীতি হয়। এ'জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। যদিও সেখানে সাপ নেই তাহলেও যথার্থজ্ঞানের পূর্বপর্যন্ত সেখানে সাপ আছে বলেই প্রত্যক্ষ হয়। এই সাপটি 'আছে' বা 'অস্তি'—এই প্রতীতির বিষয় হয় বলে একে অসৎ বা অলীক বলা যায় না, কিন্তু একে মিথ্যা বলা হয়, সুতরাং মিথ্যা এবং অসৎ এক নয়।

কিন্তু যেখানে সাপ নেই সেখানে সাপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কিভাবে হয়—এটাই আসল সমস্যা। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হয়, চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ সেই বস্তুটিরই গ্রাহক হয়—এই নিয়ম সর্ববাদীসম্মত। মিথ্যাজ্ঞান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, কারণ চোখ বন্ধ থাকলে দড়িকে সাপ বলে ভুল করার সুযোগ নেই, অর্থাৎ দড়িতে সাপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে সে ক্ষেত্রে দড়ির সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগের ফলেই সাপের প্রত্যক্ষ হয়। এটিই রহস্য। এক্ষেত্রে দড়ির সঙ্গে চক্ষুর সংযোগে দড়ির প্রত্যক্ষ না হয়ে সাপের প্রত্যক্ষ হচ্ছে, অথচ সাপ সেখানে নেই। নেই বলেই তার সঙ্গে চক্ষু সংযোগের সম্ভাবনা নেই। মিথ্যাজ্ঞানে চক্ষুঃসংযুক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ

না হয়ে চক্ষুর সঙ্গে অসংযুক্ত বিষয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হচ্ছে। এটি কিভাবে সম্ভব? অদ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলেই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের মূলসূত্রটি জানা সম্ভব হবে।[১]

বেদান্তের সিদ্ধান্ত-অনুসারে মিথ্যাজ্ঞান স্থলে যে বিষয়টিকে দেখা যায় সে' বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সেখানে নেই, কোনদিন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু যিনি দেখেন—সেই দর্শনকারীর অন্তঃকরণের মধ্যে ঠিক ঐ সময়ে ঐরূপ একটি বিষয় সৃষ্টি হয়। অন্তঃকরণবিত্ত সে বিষয়টিকে দ্রষ্টা বাইরের বস্তুর সঙ্গে এক ক'রে অনুভব করেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। একটি শুক্তি (ঝিনুক)-কে সম্মুখে দেখে আলোক প্রতিবিম্বিত উজ্জ্বল শুক্তিকে রজত বলে ভ্রম হয়, অর্থাৎ দ্রষ্টা বস্তুটিকে শুক্তিরূপে না দেখে রজত বলে প্রত্যক্ষ করে। এটা ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা—একে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হল—যে রজতটিকে দেখা যায় সেই রজতটির প্রকৃত স্বরূপ কি? যে বস্তুটিকে রজত বলে মনে হয়, তা যে প্রকৃতপক্ষে রজত নয়—সে কথা সন্দেহাতীত। অথচ তাকে রজত বলে মনে হয়, তাও অনস্বীকার্য। এটা কেমন ক'রে সম্ভব? এ'প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যিনি রজত দেখেন তাঁর অন্তঃকরণে তখনই রজতের উৎপত্তি হয়। উৎপত্তির পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা যায়—প্রথমে আলোকিত উজ্জ্বল শুক্তির সঙ্গে তাঁর চক্ষুঃসংযোগ ঘটে; কিন্তু কোন দোষের (চক্ষুরোগ, দূরত্ব অথবা মনের অনবধানতা প্রভৃতি) ফলে চক্ষুর সংযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুটির নিজস্ব যে অসাধারণ স্বরূপ অর্থাৎ শুক্তিত্ব ধর্ম তার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু কেবলমাত্র উজ্জ্বল শুক্লবর্ণের একটি বস্তু বলেই প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রতীতির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, ঐ প্রতীতি গ্রাহ্য বিষয়ের বিশেষ স্বরূপটিকেই প্রকাশ করে। অথচ এখানে কোন একটি দোষের ফলে চক্ষু-সংযুক্ত বস্তুর বিশেষ অবস্থাটি প্রকাশিত হয় না—কেবল, 'এটি একটি উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ বস্তু' এই আকারের সামান্য প্রতীতিই থাকে; বস্তুটির বিশেষ স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। তার ফলে রজতের সাদৃশ্য বশতঃ পূর্বানুভূত রজতের সংস্কার জাগ্রত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণস্থ সমান রজতাকারে পরিণত হয়।

১। ভারতীয় দর্শনে মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। ন্যায়বৈশেষিক এবং ভাট্ট-মীমাংসকের মতে যথার্থ বস্তু যা অন্যত্র রয়েছে তারই অন্যত্র প্রত্যক্ষ হয়—একেই মিথ্যাজ্ঞান বলে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের স্থলে এঁরা বলেন অন্যত্র যে সর্প রয়েছে, আনুষঙ্গিক কতকগুলো কারণে সেটিই তারই প্রত্যক্ষ হয়। এই মতবাদ অন্যথা-খ্যাতিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জলদর্শনও ভিন্ন যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। প্রভাকর মীমাংসক, সাংখ্য এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ ভ্রমজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান স্বীকারই করেন না। এজন্য এঁদের অখ্যাতিবাদী বলা হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে আন্তর-বিজ্ঞান সর্পাকারে পরিণত হয় এবং তাকেই বাইরের সাপ বলে বোধ হয়। এঁদের মতবাদকে আত্ম-খ্যাতিবাদ বলে। শূন্যবাদী বৌদ্ধ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য মিথ্যাজ্ঞানের বিষয়কে অসৎ বা অলীক বলেন। এই মতবাদের নাম অসৎখ্যাতিবাদ। অদ্বৈত বৈদান্তিকগণ অনির্বাচ্যত্ববাদ স্বীকার করেন। এই প্রবন্ধে তারই আলোচনা হচ্ছে।

অজ্ঞানের পরিণামস্বরূপ এই রজত চক্ষুঃসংযুক্ত বহিঃস্থিত উজ্জ্বল শুক্লবর্ণের বস্তুটির সঙ্গে অভিন্ন বা এক বলে বোধ হয়; এই হল ভ্রমজ্ঞানের মূল রহস্য।[২]

এতে বোঝা যায় যে, ভ্রমজ্ঞান হতে হ'লে সেখানে প্রথমে বস্তুর সঙ্গে চক্ষুর সংযোগ হবেই; কিন্তু কোন একটি দোষ থাকার ফলে চক্ষুসংযুক্ত বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ দ্রষ্টা জানতে পারেন না, কেবলমাত্র 'ইহা' এই আকারের একটি সামান্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তারপর চক্ষু-সংযুক্ত বস্তুটির সঙ্গে অন্য একটি বস্তুর সাদৃশ্য দেখার ফলে যে বস্তুটির সাদৃশ্য দেখা হয়, পূর্বানুভূত সেই বস্তুটির সংস্কার জাগ্রত হয়। তখন অজ্ঞান সংস্কারের বিষয়ীভূত বস্তুটির আকার ধারণ করে। শুক্তির সঙ্গে রজতের সাদৃশ্য থাকার ফলে উজ্জ্বল শুক্লবর্ণের বস্তুকে দেখে পূর্বানুভূত রজতের সংস্কার জেগে ওঠে এবং সংস্কারের বিষয়ীভূত রজতাকারে অজ্ঞানের পরিণতি হয়, সুতরাং যেখানেই ভ্রমজ্ঞান হয় সেখানে তিনটি প্রধান কারণ থাকা দরকার। প্রথম কারণ, কোন একটি দোষ; দ্বিতীয় কারণ, যে বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান হয় সেই বিষয়ের সাদৃশ্যজ্ঞান; এবং তৃতীয় কারণ, ঐ ভ্রমের বিষয়েরই পূর্বানুভূত সংস্কার। যে কখনও রজত দেখেনি, উজ্জ্বল শুক্লবর্ণের বস্তু দেখে তার পক্ষে ঐ বস্তুতে রজতের সাদৃশ্য বোধ হতে পারে না। এই সাদৃশ্যবোধ না হলে রজতের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় না এবং না হলে অন্তঃকরণের রজতাকার পরিণতিও সম্ভব হয় না। অতএব ভ্রমজ্ঞান যেখানে হবে সেখানে একটি যথার্থ বস্তু থাকবেই এবং ঐ বস্তুটির সঙ্গেই চক্ষুঃসংযোগ ঘটবে, কিন্তু বস্তুটির বিশেষ স্বরূপ প্রকাশিত হবে না। এই যথার্থ বস্তুটিকে অধিষ্ঠান বলা হয়। যেমন—শুক্তিরজত স্থলে শুক্তি অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানের সঙ্গে আরোপিত বস্তুর সাদৃশ্য একান্তই আবশ্যক। এজন্যই রজ্জুতে রজতের ভ্রম হতে পারে না—কারণ, রজ্জুর সঙ্গে রজতের সাদৃশ্য নেই। বরং সর্পের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়। অপরপক্ষে, শুক্তিতেও সর্পের ভ্রম হয় না, রজতেরই ভ্রম হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, যেখানে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে প্রয়োজনীয় প্রধান তিনটি আলোচিত কারণ দ্রষ্টারই ব্যক্তিগত। এজন্যই একজন যখন দড়িকে সাপ দেখে তখন অপর একজন কিন্তু দড়িকে দড়িই দেখে, সাপ দেখে না। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের যা বিষয় তা দ্রষ্টার নিজের ব্যক্তিগত মনের সৃষ্টিমাত্র।

স্বপ্নজ্ঞান এ'বিষয়ের অপর একটি দৃষ্টান্ত। স্বপ্নজ্ঞানের সঙ্গে চাক্ষুষ ভ্রমজ্ঞানের পার্থক্য কেবল এই যে, শুক্তিরজত-প্রভৃতি চাক্ষুষ ভ্রমজ্ঞানে একটি বাইরের বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ভ্রমজ্ঞানটি হয়, কিন্তু স্বপ্নস্থলে বাইরের কোন বিষয় অধিষ্ঠান হয় না, আভ্যন্তরীণ চৈতন্যই সেখানে অধিষ্ঠান; এবং নিদ্রারূপ দোষের ফলে পূর্বানুভূত সংস্কার নানাভাবে জাগ্রত হয়ে

২। কাচকামলাদিদোষদূষিতলোচনস্য পুরোবর্তীদ্রব্যসংযোগাৎ ইদমাকারা চাকচিক্যাকারা চ কাচিৎ অন্তঃকরণবৃত্তিঃ উদেতি। তাদাত্ম্য বৃত্তৌ ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যং প্রতিবিম্বতে। তত্র পূর্বোক্ত রীত্যা বৃত্তেরিন্দ্রিয়দ্বারেণ ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যং চ অভিন্নম্। ততশ্চ প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্ন বিষয়চৈতন্যনিষ্ঠা শুক্তিত্বপ্রকারিকা অবিদ্যা চাকচিক্যাদিসাদৃশ্যসহকৃতদোষবশেন সমুদ্বোধিতরজতসংস্কারপ্রতীতীদা জ্ঞানাসিদোষ-সমবহিতা সতী চক্ষুঃসন্নিকর্ষেণ পরিণমতে। —বেদান্ত-পরিভাষা, প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ।

অন্তঃকরণে তাৎক্ষণিক বিষয়ের সৃষ্টি করে। এইজন্যই স্বপ্নজ্ঞানে চাক্ষুষ ভ্রম-প্রত্যক্ষের মতো সাদৃশ্যের আবশ্যকতা নেই। কিন্তু স্বাপ্নিক প্রত্যক্ষে বিষয় স্বপ্নদ্রষ্টারই ব্যক্তিগত সৃষ্টি—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা যদি না হ'ত তা হলে চৈতন্যরূপী আত্মা সর্বব্যাপী এবং এক বলে সেই চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে যে কোন ব্যক্তির অজ্ঞানের পরিণামরূপ স্বাপ্নিক পদার্থ সকলেরই প্রত্যক্ষ হত। কিন্তু তা যে হয় না, সে কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও স্বপ্নদ্রষ্টার নিজেরই সৃষ্টি।

বিশ্বজগতের যাবতীয় পদার্থকে অদ্বৈত-বেদান্তমতে স্বপ্নের সঙ্গেই তুলনা করা হয়েছে। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য কারিকায় বলেছেন যে, স্বপ্ন এবং মায়া যেমন মিথ্যা হয়েও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় এবং গন্ধর্বনগরও যেমন যথার্থ বলেই মনে হয়, বেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ এই জগৎকে তেমনই দেখে থাকেন।[৩]

আচার্য গৌড়পাদের বক্তব্য এই যে, স্বপ্ন এবং মায়া অর্থাৎ ইন্দ্রজাল দুটির সত্যতা নেই, একথা যুক্তিসিদ্ধ হলেও অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ঐগুলি যথার্থ বলেই মনে হয়। তেমনই এ সমগ্র বিশ্ব যুক্তির দ্বারা অসত্য বলে প্রমাণিত হলেও অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সত্য বলেই মনে হয়। স্বাপ্নিক বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রাকৃতজনের অনুভবসিদ্ধ হলেও স্বপ্নদর্শনের কালে স্বাপ্নিক পদার্থকে অসত্য বলে মনে হয় না। সকলেই স্বপ্নদর্শনকালে স্বাপ্নিক পদার্থকে যথার্থ বলে মনে করে। এই জগৎও স্বপ্নের মতই অযথার্থ হলেও অবিবেকী মানুষ একেই যথার্থ মনে করে। নিদ্রাভঙ্গ হলেই যেমন স্বাপ্নিক পদার্থকে মিথ্যা বলে জানা যায় তেমনই অনাদিকাল থেকে মায়ানিদ্রায় আচ্ছন্ন জীবের অবিদ্যারূপ নিদ্রাভঙ্গ হলে এই জগৎকে মিথ্যা বলে বোঝা যায়।[৪]

এ সমস্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যে কোন মিথ্যাজ্ঞানে যে বস্তুটি অনুভূত হয় তা একমাত্র দ্রষ্টার নিজেরই অন্তঃকরণের সৃষ্টি। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই সিদ্ধান্ত-অনুসারে বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুকে যাঁহারা মিথ্যাই বলেন, তাঁদের মতে জগৎও মিথ্যা বস্তুরূপেই দ্রষ্টার নিজেরই অন্তঃকরণেরই সৃষ্টিমাত্র। মিথ্যা বস্তু যেমন কোন কালেই থাকে না, (প্রতীতির পূর্বকালেও থাকে না, প্রতীতিকালেও তার অস্তিত্ব নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না), তেমনই এই মতে জগতের অস্তিত্বও কোনকালেই নেই। যা কিছু বস্তু বলে অনুভূত হয় তা সমস্তই অনুভবকারীর মনের কল্পনামাত্র। সুতরাং জগৎ বা জগতের সৃষ্টি সমস্তই একটি কল্পনার বিষয়, প্রকৃতপক্ষে এর কিছুই নেই।[৫]

৩। স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ।
—মাণ্ডুক্যকারিকা, বৈতথ্য-প্রকরণ, কারিকা ৬।

৪। অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।
—মাণ্ডুক্যকারিকা, আগম-প্রকরণ, কারিকা ১৬

৫। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।
—মাণ্ডুক্যকারিকা, বৈতথ্য-প্রকরণ, কারিকা ৩২

আচার্য গৌরপাদের এই মতবাদ-অনুসারে ব্রহ্মই সত্য, জীবজগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অর্থাৎ এর কোন সত্তাই নেই। সমগ্র জীবজগৎ কোন একজন দ্রষ্টার মনের কল্পনামাত্র। ফলতঃ ব্যবহারিক-সত্তা এদের নেই। যদিও আচার্য শঙ্কর এবং তাঁর অনুগামী বৈদান্তিক সম্প্রদায় জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ সেই ব্যবহারিক-সত্তাও মন্দাধিকারের জন্যই স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই দুটিই ভাগ—পারমার্থিক এবং অপারমার্থিক। এই অপারমার্থিকত্বকেই অনির্বাচ্য বলা হয়। কারণ, যাকে অপারমার্থিক বলা হয়, বেদান্তের সিদ্ধান্ত-অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী সেই অপারমার্থিকত্বের সিদ্ধি হয় না। কারণ, পূর্বসংস্কার না থাকলে ভ্রম হতে পারে না। যার কোন অস্তিত্বই নাই তার অনুভবও সম্ভব না হওয়ায় সংস্কারও হতে পারে না। সুতরাং অপারমার্থিক জ্ঞানের মূল যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জাগতিক বস্তুর অপারমার্থিক বোধ সম্ভব নয়; কারণ, যে বস্তুর বোধ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও আছে তারই পূর্বানুভবজনিত সংস্কারের ফলে অধিষ্ঠানে ভ্রম সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মে জাগতিক বস্তুর বোধ হওয়ার পূর্বে জাগতিক বস্তুর অন্যত্র অনুভব অসম্ভব বলে পূর্বানুভবজনিত সংস্কার হতেই পারে না। বিশেষত চাক্ষুষ-ভ্রমের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুরই ভ্রম হতে পারে। এদিক থেকেও ব্রহ্মে জগতের ভ্রম অসম্ভব—যেহেতু, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, অথচ কল্পিত জাগতিক বস্তু অপ্রকাশ অর্থাৎ জড়স্বরূপ। অতএব আলোক এবং অন্ধকারের মত পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাব ব্রহ্ম এবং জাগতিক বস্তুর পারস্পরিক ভ্রম হতেই পারে না। অথচ, ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ অধ্যস্ত বা কল্পিত—অদ্বৈতবেদান্তের এই সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ। কিন্তু যুক্তি অনুযায়ী ব্রহ্মে জগতের ভ্রম অসম্ভব। এজন্য আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যের প্রথমেই ব্রহ্মে জগতের ভ্রমের অসম্ভাব্যতা আলোচনা করেছেন। তারপরই আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, ব্রহ্মে জগতের ভ্রম যুক্তিসিদ্ধ না হলেও ব্রহ্মে জগতের ভ্রম অনুভবসিদ্ধ বলেই এর অপলাপ করা যায় না।[৬]

আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—যা যুক্তিসিদ্ধ নয় অথচ অনুভবসিদ্ধ বলে যার অপলাপ করাও যায় না, ভ্রম এমন একটি পদার্থ। এজন্যই একে অনির্বাচ্য বলা হয়েছে। যুক্তিসিদ্ধভাবে যাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না অথচ অনুভবসিদ্ধ বলে অস্বীকারও করা যায় না তাকে অনির্বাচ্য বলা ছাড়া আর উপায় কি? এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এটাই বোঝা যায় যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা, অন্য সমস্তই অপারমার্থিক, অর্থাৎ কল্পিত। কল্পিত বস্তু কল্পনাকারীর নিজের অন্তঃকরণেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ কল্পনাকারী নিজের সৃষ্ট বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করে; এরই নাম দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেছেন, শুক্তিরজতাদির মত জগৎও দ্রষ্টার দৃষ্টি হতেই সৃষ্ট বলে এর মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।[৭]

৬। তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্মাংশ্চ অধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেন অত্যন্তবিবিক্তয়োঃ ধর্মধর্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্" "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ। —বেদান্তদর্শন, অধ্যাসভাষ্য।

৭। শুক্তিরূপ্যাবয়বাদিবৎ দৃষ্টিসৃষ্টত্বমাত্রেণাপি জগতো মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫০৩। [নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে।]

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, শুক্তিরজত প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান বিভিন্ন দ্রষ্টার দৃষ্টি হতেই সৃষ্ট, কিন্তু সেখানে দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিও থাকে, অথচ সেই অপর ব্যক্তি শুক্তিকে রজত বলে দেখে না। এতেই বোঝা যায়, কল্পিত রজত দ্রষ্টার দৃষ্টির সৃষ্টি। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকে কোন্ দ্রষ্টার দৃষ্টি হতে সৃষ্ট বলা যাবে? বিভিন্ন দ্রষ্টার দৃষ্টি হতে সৃষ্ট হলে দ্রষ্টার অবর্তমান অবস্থায় তার দৃষ্ট বস্তু থাকবে না এবং সেই দ্রষ্টা যখন একটি বস্তুকে নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে অন্য সময়ে সেই বস্তুর সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে তাও সম্ভব হবে না। কারণ, দ্রষ্টার দৃষ্টির অগোচরে সেই বস্তুটি থাকতেই পারবে না। অথচ, আমার অগোচরেও আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যে থাকে, পদে পদে তার প্রমাণ আমরা পাই। বাড়ীর বাইরে গেলে আমাদের বাড়ীঘর, জিনিসপত্র, আত্মীয়-পরিজন সমস্তই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অনুসারে এ সমস্ত থাকতেই পারে না। সুতরাং জগৎ কার দৃষ্টি সৃষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তরে আরও বেদান্তিকগণ বলেছেন, জীব একমাত্র হিরণ্যগর্ভ; হিরণ্যগর্ভই মতান্তরে ঈশ্বর, তাঁরই দৃষ্টি-সৃষ্ট এই সমস্ত বিশ্ব। সুতরাং একজীববাদ স্বীকার করেই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এই একজীববাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ অদ্বৈতবেদান্ত শাস্ত্রের বহু ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি[৮] চিৎসুখাচার্যের তত্ত্বপ্রদীপিকা এবং আচার্য পদ্মপাদ-রচিত পঞ্চপাদিকা টীকা প্রভৃতিতে এ বিষয়ক বহু আলোচনা রয়েছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই বলে এখানেই প্রবন্ধটির উপসংহার করা হ'ল।

●

॥ মধ্যযুগের বাংলায় বেদান্ত ॥

ডক্টর শ্রীভবতোষ দত্ত

রাজা রামমোহন রায় আমাদের দেশে বেদান্ত-চর্চার প্রবর্তক বলে পরিচিত। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বেদান্ত-গ্রন্থ প্রকাশ করলেন এবং তার পরেই বেদান্তের আলোচনা নানা সূত্রে আরম্ভ হয়ে যায়। এ-আলোচনা শুধু পণ্ডিতের টোলে চতুষ্পাঠীর অধ্যয়ন নয়, বেদান্তচর্চা আমাদের দেশে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলল বা আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রায়, মূল্যবোধে, আদর্শ-রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করল। আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবের নানা উল্লেখ নবযুগের প্রসঙ্গে করে থাকি, কিন্তু বেদান্তের প্রভাব আমাদের আধুনিক চিন্তায় ও মননে কোন সুদূর প্রভাব ফেলেছে, সে-সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত কিনা সন্দেহ।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশে বেদান্তের পঠন-পাঠন যথার্থই হ্রাস পেয়েছে। তখন চতুষ্পাঠীতে যে-সব বিষয় পড়ানো হত, বর্তমানে বেদান্ত তার মধ্যে গৌণ স্থান

৮। স চ দ্রষ্টা এক এব তদ্বাদে যানাভাবাৎ।—অদ্বৈতসিদ্ধি, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৩৯।

নিয়েছে। দেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিবরণ জানা যায় পাদরী অ্যাডাম এবং ওয়ার্ডের বই থেকে। অ্যাডাম ওয়ার্ডের বইই ব্যবহার করেছিলেন। ওয়ার্ডের বই প্রকাশিত হয় ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে। অ্যাডামের শিক্ষা-বিষয়ক বিখ্যাত প্রতিবেদন ১৮৩৮-এ, সুতরাং এ-দুজনের সাক্ষ্যেই তৎকালীন সংস্কৃতশিক্ষা বিশেষত বেদান্তশিক্ষার অবস্থার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যাডাম তাঁর প্রতিবেদনে সেকালে তিন শ্রেণীর সংস্কৃত-শিক্ষালয়ের উল্লেখ করেছেন। এক শ্রেণীর চতুষ্পাঠীতে প্রধানত পড়ানো হয় ব্যাকরণ সাহিত্য অলংকার এবং কখনো কখনো পুরাণ এবং স্মৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি এবং পুরাণই প্রধানত পড়ানো হয়। কোনোটিতে আবার বিশেষভাবে ন্যায়ই পড়ানো হয়ে থাকে। এ'প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর আনুমানিক হিসাব দিতে গিয়ে ওয়ার্ড বলেছিলেন এক হাজার ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীর মধ্যে কাব্যের ছাত্র হয় চারশ থেকে পাঁচশ, অলংকারের ছাত্র হয় পঞ্চাশ জন, স্মৃতি পড়ে প্রায় চারশ জন, তন্ত্র পড়ে দশজন, ন্যায়ের ছাত্রের সংখ্যা হয় সাধারণত তিনশ, মীমাংসার সাংখ্য এবং বেদান্ত পড়ে মাত্র পাঁচ—কি ছয় জন।* এই হিসাব নিখুঁত না হতে পারে, কিন্তু এটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না যে, বেদান্তের প্রতি আগ্রহ তখন কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। বস্তুত তখনকার দিনে লোকে বিশেষ করে স্মৃতি অধ্যয়নের প্রতিই বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত। ন্যায়ের ছাত্রসংখ্যা থেকেও ধারণা হয়, স্মৃতির পরেই ছিল তার স্থান। রামমোহন আমহার্স্টকে শিক্ষাবিষয়ক যে-পত্র লিখেছিলেন, তাতে দেশে সংস্কৃত-শিক্ষার অবস্থাবর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যাকরণ এবং ন্যায়চর্চার উল্লেখ করেছিলেন—

'We now find that the Government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundit to impart such knowledge as already current in India. This seminary can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practicable use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as already commonly taught in all parts of India'.

প্রায় পঞ্চাশ্লিশ বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যযুগের বাঙালির শিক্ষা ও মননচর্চার প্রসঙ্গে একই কথা বলেছিলেন—

'Along with this species of poetical literature, Bengal was developing within itself two other systems which were the peculiar property of the Bengalee intellect—Law and Nyaya Philosophy. The Bengalee

* Adam : State of Education in Bengal (1941), edited by Anath Nath Basu, C. U.) p. 18-19.

had lost all dignity of character and all manliness ; but he had not lost his acuteness of intellect. So from the days of Kulloka Bhatta to those of Jagannatha volume after volume and commentary after commentary were written to interpret and expand and alter and mystify a system of law, which already in the hands of its original framers had gone beyond the proper limits of legislative interference, and set unbearable restraints on individual freedom of action. And this unlimited expansion and development of an already ponderous system of law, or rather of law and religion welded into one solid mass, tended only to multiply *ad infinitum* the iron bonds under which the Bengalee alreay groaned—until all his pleasures and his aspirations became restricted to his bookah and his lovesongs. In weightier matters the spiritual guide and the interpreter of law regulated, even still regulates his destiny.*

স্মার্তের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমীহবোধ ছিল, কিন্তু স্মার্তের কঠোর যুক্তিবোধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছত না। ফলে বাঙালি চালিত হয়েছে স্মৃতির শাসন দিয়ে—আচারবিচার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি দিয়ে—সর্বমানবিক উদার দৃষ্টি ঠিক যেন গড়ে উঠতে পারে নি। বহুদেববাদে সমাকীর্ণ, বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্বে জর্জরিত, নানা ক্রিয়া-পদ্ধতিতে খণ্ডিত এই সমাজে একটা পূর্ণায়ত জীবনবোধের সৃষ্টি হয় নি। এমন একটা জীবনতত্ত্ব ছিল না যা সমগ্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। চৈতন্যের পরবর্তীকালে একটি বৈষ্ণব সমাজ তৈরি হয়েছিল কিন্তু মূলত সে-সমাজ স্মৃতি-শাসিত হিন্দু সমাজ—নানা জাতিভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, প্রথা এবং আচারে বিদীর্ণ। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা উপধর্মে ও আচারভেদে শতধাবিভক্ত হিন্দুসমাজ জড় আনুষ্ঠানিকতায় বদ্ধ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও বলেছিলেন রঘুনন্দনের রক্ষণশীল অনুশাসনে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার স্বাভাবিক পরিণামেই শূদ্রের একদিন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানসর্বস্ব আচার-বিধির প্রাধান্য কমবেই। এমনি করে সতীদাহ অপ্রচলিত হবে, মানবতাবিরোধী বলেই সহমরণ প্রথা নিশ্চিহ্ন হবে।** দেখা যাচ্ছে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত সকলেই মনে করেছেন স্মৃতি এবং স্মার্ত বিশেষ করে স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে বাঙালি জাতির মধ্যে খণ্ডতা ও নানা রকমের বিচ্ছিন্নতা প্রশ্রয় পেয়েছে। এ কথা সত্য বৈষ্ণবের মধ্যে 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' এবং শাক্তের মধ্যে 'প্রবর্তে ভৈরবীচক্রে সর্ববর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ'—এ'রকম উক্তির দ্বারা একটা

---

* Bankimchandra Chattopadhyaya : 'A Popular Literature for Bengal', 1870.

** রমেশচন্দ্র দত্ত The Literature of Bengal. (Cultural Heritage of Bengal নামে পুনঃপ্রকাশিত ১৯৬৯) *Raghunandan and His Institutes.*

সামাজিক সমতার ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু সর্বত্রই এই মন্তব্য বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতাতেই সত্য, এর সর্বব্যাপক প্রয়োগ ছিল না। ক্রমশ আচার-অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে উঠেছে ফলে—

'Bereft of the spiritual fervour and religious vitality that had given reality to its social appeal, it lost most of its distinctiveness as a reforming influence. The usages of Hindu re-established themselves within the sect, until the Goswamis and the householders were as much subject to caste rules as the orthodox society itself'.*

অর্থাৎ সেই স্মৃতি-শাসিত জীবনযাত্রাই বড়ো হয়ে উঠল। ভেদবিরহিত, আচারশূন্য, একত্ববোধ গড়ে উঠবার কোনো পথই আর থাকল না।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য মানুষকে যেমন জড় করে ফেলে, অতিরিক্ত উদ্দেশ্যহীন তর্কপ্রবণতা তেমনি মানুষকে করে অবলম্বনহীন। জীবন ও সমাজের প্রতি কোনো আদর্শমূলক মূল্যবোধ এতে তৈরি হয় না। জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শহীন, হৃদয়স্পর্শশূন্য তর্কের মোহ যখন সমাজকে পেয়ে বসে তখন কোনো গঠনমূলক মানবিক ধারণা গড়ে তুলবার কথা মনে থাকে না। শুধু কথার জন্যই কথা, শব্দের জন্যই শব্দ—এর সঙ্গে মানুষের প্রেম, নীতি, কর্তব্য বা হৃদয়ের কোনো যোগই থাকল না। এই জন্য ন্যায়ের চর্চা বাঙালির বুদ্ধিকে শাণিত করেছে সত্য, কিন্তু কোনো সামাজিক কল্যাণে প্রযুক্ত করে নি।

বাঙালি বেদান্তের চর্চা করে নি তা নয়। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই ভক্তিবাদের যে বিশেষ রূপ এদেশে প্রবর্তিত হ'ল তার উৎস ছিল বেদান্তের দ্বৈতভত্ত্ব। তারও পূর্ব থেকেই আদিম সহজিয়া-সাধনায় যে তত্ত্বচিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল, চৈতন্যের ধর্মে তাকেই বৈদান্তিক দ্বৈতবাদে পরিমার্জিত ও সুসংস্কৃত করা হয়েছে। এই আদিম পুরুষ-প্রকৃতিরূপ দ্বৈতভাবনা যে কত দৃঢ়মূল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙালির সংস্কৃতিতে। এখানে বিশুদ্ধ-জ্ঞানমার্গ সে-রকম স্থায়ী কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে দুই অসাধারণ বাঙালিকে একই সঙ্গে আবির্ভূত হতে দেখতে পাই—তাঁরা দু'জন বৈদান্তিক চিন্তার বিপরীত প্রান্তবর্তী। অদ্বৈতসিদ্ধির দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে মথুরানাথ তর্কবাগীশের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়ে পরে কাশীতে গিয়ে অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়ন করেন। শোনা যায় যে, বৈষ্ণব-মত প্রতিষ্ঠা করবার অভিপ্রায় নিয়েই তিনি অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে তিনি উপযুক্ত গুরু পান নি। কাশীতে রামতীর্থের কাছে অদ্বৈতবেদান্তে পাঠ নিতে গিয়ে তিনি অদ্বৈতবাদী হয়ে যান, আর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। পরে তিনি নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তখন দেশে চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদেরই প্লাবন। তাঁর দুর্ধর্ষ পাণ্ডিত্য অদ্বৈত-মতকে সাধারণগ্রাহ্য করতে পারে নি।**

* M. T. Kennedy, The Chaitanya Movement, 1925. Two Centuries of Decline.

** জীব গোস্বামী মধুসূদন সরস্বতীর কাছে অদ্বৈতবেদান্ত পড়েন, এ রকম একটি কিংবদন্তী আছে।

চৈতন্যের জীবনীতে আমরা তাঁর আবির্ভাব-কালে জীবিত একজনকে পাই—অদ্বৈতাচার্য। তাঁর মূল নাম কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। প্রেমবিলাসের উক্তিতে মনে হয় অদ্বৈতাচার্য এককালে মায়াবাদই প্রচার করতেন। 'জ্ঞানভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মূখ্যতর' অদ্বৈতাচার্য জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে দোলায়িত ছিলেন বলেই মনে হয়। চৈতন্যের পূর্বে অদ্বৈতবাদ বাঙলাদেশে তেমন প্রচারিত ছিল না। তখন পরিবেশ ভক্তিবাদেরই অনুকূল ছিল। কাশীতে আবার তেমনি চৈতন্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। সেখানে অদ্বৈত মতেরই প্রাধান্য। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায়—

কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম তাবকালি
কাশীতে গ্রাহক নাই যত না বিকায়।—মধ্য। ২৫

কাশীতে বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ চৈতন্যদেবের প্রভাবে ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন—চৈতন্যচরিতামৃতে তার উল্লেখ আছে। ইনি সম্ভবত 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'-রচয়িতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। কাশীতে অদ্বৈতবাদীকে বশতে নিয়ে আসার এই একটিই দৃষ্টান্ত। অবশ্য এ' ঘটনাটিকে সকলে সন্দেহাতীত মনে করেন না।* চৈতন্যদেব পুরীতে আর একজন বৈদান্তিককে ভক্তিবাদীতে পরিণত করেন। অদ্বৈতমকরন্দের টীকাকার বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাতদিন-ব্যাপী বিচার চলেছিল। এই বিচারের ফলে বাসুদেব চৈতন্যের ধর্মে দীক্ষিত হন। পরে বৈষ্ণবমতে তত্ত্বদীপিকা নামে বই লেখেন। ষোড়শ শতাব্দীর এই দুই অসামান্য ব্যক্তির প্রভাব পরবর্তীকালে বাঙালী সংস্কৃতিতে কী রকম হয়েছিল, সেটা মোটামুটি সকলের জানা। মধুসূদন সরস্বতী এবং চৈতন্যদেব উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। মধুসূদন কয়েকখানি (১৭ খানি) গ্রন্থও রচনা করলেন। চৈতন্যদেব জ্ঞানের চর্চাকে মিথ্যা অভিমান বলে কিছুই লিখে গেলেন না, অথচ তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। চৈতন্যধর্মের দর্শন-প্রস্থান রচিত হল তাঁরই অনুগামীদের হাতে। মধুসূদনের অন্তত একজন বাঙালী শিষ্য বলতন্ত্র সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ রচনা করলেন। মধুসূদনের গ্রন্থের নানা তন্ত্র পরবর্তী কালে রচিত হয়েছে কিন্তু সেসব বাঙালীর দৈনিক জীবনাচরণে প্রভাব ফেলেছিল এমন কথা বলা যায় না। বাংলাদেশে তাঁর কোনো সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে নি। অপরন্তু চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিবাদের উচ্চাঙ্গ দার্শনিক গ্রন্থ এবং আচরণবিধি অনতিবিলম্বে গড়ে উঠল; বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দিন দিনই ছড়িয়ে গেল। নানা শাখা উপশাখা মঠ মন্দির আখড়ায় বাংলাদেশ ভরে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করেন। জয়পুরে অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে বিচারে বলদেব বাংলার বৈষ্ণবদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেন ব'লে প্রসিদ্ধি। বলদেবের শিক্ষাগুরু ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। নদীয়ার দেবগ্রামে তাঁর জন্ম। বিশ্বনাথ বাঙালির সুপরিচিত বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থের রচয়িতা। দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করেছেন আরও বহু বাঙালি তর্ক-পণ্ডিত, তাঁদের সকলের

* S. K. De, Early History of Vaisnava Faith & Movement 1942, p. 75. এবং অদ্বৈতসিদ্ধি: প্রথমোভাগো যোগেন্দ্রনাথ তর্কদাংখ্যবেদান্ততীর্থ এবং রাধেন্দ্রনাথ ঘোষ সং (১৩৮১) ভূমিকা, পৃ: ৫৮।

উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। চৈতন্যের প্রভাবে পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে যে বিপুল সাহিত্য রচিত হল, পদে, কীর্তনে, অনুবাদে নানা শাখাবিস্তার-কাহিনীতে তার বিবরণ সকলেরই সুজ্ঞাত। বাঙালির জীবন ও সমাজের সঙ্গে চৈতন্যের ভক্তিবাদ যেভাবে জড়িয়ে গেল, জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতবাদ তার সঙ্গে কোনোক্রমেই তুলনীয় হতে পারল না। অদ্বৈতবাদ কোনো কোনো পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে খুঁটিগত আলোচনার মধ্যে বিদ্যাবিলাস হয়ে রইল।

বৈষ্ণবদর্শন বেদান্ত-বিবর্জিত নয়। উপনিষদেরই অন্য নাম বেদান্ত। বেদান্ত থেকেই দ্বৈত-বাদী এবং অদ্বৈতবাদী মতের সৃষ্টি। ঐতরেয়, কৌষিতকী, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ঈশ, বৃহদারণ্যক, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য—এই বারোখানি উপনিষদের সূত্র অবলম্বনে রচিত ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য রচনা করে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অপরদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য ভাগবতকে উপনিষদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। ব্রহ্মসূত্রও প্রয়োজনমতো তাঁরা ব্যবহার করেছেন। জীব গোস্বামী তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে সোজাসুজি বলেছেন যে, ব্যাসের ভাগবতই তাঁর নিজের রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যমাত্র।* ভাগবতের উপরেই মূলত ভিত্তি করেই জীব-গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভে ব্রহ্মসূত্র এবং শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের সূত্র প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ তত্ত্বসন্দর্ভে আছে সাতবার, ভাগবতসন্দর্ভে সাতবার, পরমাত্মসন্দর্ভে তেরোবার, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চারবার, ভক্তিসন্দর্ভে একবার এবং প্রীতিসন্দর্ভে ছয়বার। শারীরক-ভাষ্যের উল্লেখ ভাগবতসন্দর্ভে চারবার, পরমাত্মসন্দর্ভে একবার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তিনবার। প্রীতি-সন্দর্ভে একবার।** তাঁর দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যার সমর্থনে ব্রহ্মসূত্র এবং শারীরক-ভাষ্যর প্রযুক্ত। পরমাত্মাসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ব্রহ্মসূত্র এবং গায়ত্রীর মূলতত্ত্বটিরই সারাৎসার হিসাবে। অথচ শঙ্কর নিজে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করেন নি। ব্যাস-সংকলিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রকে একেবারে উপেক্ষা করার উপায় নেই, অথচ বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদকে এক রকম করে বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে খাপ খাইয়েও নিতে হয়েছে। এ'জন্যই চৈতন্যধর্মের ইতিহাসকার বলেন—

'Though admitting of various degrees, the essential dualism involved in a religious attitude of Bhakti, in making a distinction between the devotee and the deity and implying an emotional realisation of a personal god in the individual consciousness, had to be reconciled with the absolute impersonal and non-dualistic interpretation given of the *Vedanta-Sutra* by Sankara. Each of these schools, therefore, wrote a fresh commentary on the Vedanta-Sutra in which an attempt was made to establish a theory which would permit the

* রামমোহনের মত ঠিক এর বিপরীত '...এই সকল বিবেচনায় বোধ হয়। নিশ্চয় হইতেছে যে বেদান্ত-সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্বন্ধ মাত্র নাই।' —গোস্বামীর সহিত বিচার।

** Dr. S. K. De, Early History of Vaisnava Faith & Movement (1942) p. 316.

individual exercise of love and piety in a world of reality, some of them maintaining a frankly dualistic position and others expounding various degrees of qualified dualistic views'.*

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ—দুইই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন্‌টা যুক্তিসঙ্গত আমাদের পক্ষে তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়, সম্ভবও নয়। কিন্তু এই দুই মত নিয়ে বিচার-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ চিরকালই চলে এসেছে। বাঙালির সমাজে সারা মধ্যযুগে, এমন কি এখনও, দ্বৈতবাদেরই প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত এটাই স্বীকার্য যে অদ্বৈতোপলব্ধি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারাই সাধ্য এবং সেটা ব্যক্তিতান্ত্রিক। দ্বৈতবাদের প্রায়োগিক রূপ হচ্ছে ভক্তিধর্মে। একটা সমাজ যখন ভক্তিধর্মকে গ্রহণ করে তখন নানা আচারে অনুষ্ঠানে পূজাবিধিতে ক্রিয়াকর্মে সে স্পষ্টরূপ লাভ করে। এর পরিণাম দুভাবেই হতে পারে—সংহতিতে এবং বিচ্ছিন্নতায়। চৈতন্যধর্ম একটি বৈষ্ণব-সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজেই দেখা গিয়েছে এই সমাজ বারবার খণ্ডিত হয়েছে। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব এবং নবদ্বীপের বৈষ্ণব—এই বিভাগটি ঘটতে বেশি সময় লাগে নি। আবার খণ্ডিত সমাজের মধ্যেও নানা শাখা-উপশাখা সমাজকে বহুধাবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। পুরাণকে ভিত্তি করার জন্য নানা দেব-কল্পনা ধর্মকে আচ্ছন্ন করল। ভক্তি জ্ঞানকে অবজ্ঞেয় করে তুলল। সগুণ-ঈশ্বর নানা মানবিক রূপকে ভক্তচিত্তকে মুগ্ধ আবেগে অন্ধ করে দিলেন। বেদান্তের বিচারপ্রবণতা না থাকায় এই আবেগমূলক ধর্ম বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টি অর্জন করতে পারেনি। চৈতন্যধর্মে জাতিভেদ ছিল না কীর্তনে বা পূজায়, কিন্তু সমাজগঠনের কোনো গুরুতর চিন্তা বা ভাবনাও এই ধর্মে ছিল না। বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মধ্যে আচারপালনে কিছু স্বাধীনতা বা বন্ধনমুক্তি থাকলেও প্রথাগত গুরুবাদ এতে লঙ্ঘিত হয় নি। পুরানো স্মৃতির অনুশাসন অব্যাহতই রইল। ফলে ভক্তির ধর্ম সংহতি আনতে গিয়ে পরোক্ষে বিচ্ছেদকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

চৈতন্যধর্মের অন্য নাম প্রেমধর্ম। সর্ববস্তুতে কৃষ্ণকে অনুভব করে জীবমাত্রের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ বোধ করা এই ধর্মের একটা বড়ো এবং অসামান্য গুণ।

যস্য সর্বাণি ভূতান্যাত্মনোবাভূদ্বিজানতঃ।
সর্বভূতেষু যাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

উপনিষদের এই ব্রহ্মবাদ বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মে সর্বভূতে প্রেমোপলব্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে একটি অখণ্ড সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে পারত। বস্তুত এর পরিণাম হ'ল দুভাবে। একভাবে এই প্রেমধর্ম ক্রিয়াকলাপে এবং আদিরসের অতিচর্চায় ছড়িয়ে পড়ল যার ফলে বৈষ্ণব গুরুর সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত জীবনের জৈব বাসনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনাকে উদ্দীপনাময় করে তুলল। আর-একভাবে এই প্রেমধর্ম আচার-শ্লিষ্টতাকে অতিক্রম করতে না পারায় গোষ্ঠীপ্রীতিতে মাত্র পর্যবসিত হল। বৃহত্তর সমাজের ভাবনা বা প্রীতি এর ছিল না।

* S. K. De: Early History, p. 3.

শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মতো বিচিত্র সাম্প্রদায়িকতাকে মানবধর্মের বৃহত্তর প্রেরণা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে নি।

বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি তান্ত্রিক সাধনার একটা শক্তিশালী ধারা এদেশে প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবদের মতো শক্তিতান্ত্রিকরা গোষ্ঠীবদ্ধ ছিল না। বৈষ্ণবদের চৈতন্যদেব যেমন সংহত করে দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে তান্ত্রিক দার্শনিক দেখা দিয়েছেন এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে একটি মতবাদ রচিত হয়েছে, অবৈষ্ণবদের মধ্যে এ রকম কোনো ধর্মনেতাকে অবলম্বন করে কোনো গোষ্ঠীবন্ধন হয় নি। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময় স্থির করা শক্ত,—সম্ভবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী। বাঙলাদেশে তখন থেকেই রচিত তন্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশের বাইরে বহু তন্ত্রগ্রন্থই রচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু তান্ত্রিক সাধকদের গ্রন্থ রচনা করে* বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বাইরে তন্ত্রসাধনা বাঙালি সমাজে কত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

তন্ত্র বহু প্রাচীন—সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরও পূর্বেকার। তাই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান কিছু কিছু হিন্দু দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই রয়ে গেছে। তন্ত্রের প্রভাব আমাদের জীবনে নানা দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় ছড়িয়ে আছে। তা ছাড়া তন্ত্রের আর একটা গুহ্য দিক আছে। সেটা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্য। আমাদের বাঙালি-সমাজের পূজা-দেবীরা এক মহাদেবীর বিভিন্ন বিকাশ। তাঁদের নিয়ে রচিত হয়েছে পুরাণ, কিংবা লৌকিক দেবী হলেও পৌরাণিক-দেবীমাহাত্ম্যের সঙ্গে তাদের যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের মূলীভূত এক শক্তির সঙ্গে অভিন্নতাবোধ থাকলেও লৌকিক দেবীরা নানা প্রতিমায় এবং পূজানুষ্ঠানে বিচিত্র এবং বিভিন্ন। সে-বিভিন্নতাকে উত্তরণ করা সম্ভব হয় নি। কারণ শক্তিসাধনা ritual** বা অনুষ্ঠাননির্ভর। তন্ত্রের সে-দিকটা গুহ্য, লোকসমাজের অন্তরালবর্তী নানা অনুষ্ঠানবিধিতে জটিল। দীক্ষা, মন্ত্র, পূর্ণাভিষেক, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, হোম, তর্পণ ইত্যাদি পুরশ্চরণ, যন্ত্রদ্বারা উপাসনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রে ক্রিয়াকাণ্ডই প্রধান। অ্যাডাম ১৮৩৮ মফঃস্বল অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিবেদন প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন—

The Tantra scriptures, prescribing the ritual observances of Hinduism, are exclusively religious.***

স্বভাবতই ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বৈদান্তিক জ্ঞানবিচারের আভাস-মাত্র নেই। গুহ্য এবং প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক-প্রক্রিয়া দেশকে আকীর্ণ করেছিল। এই প্রক্রিয়ার মূলে যে 'অন্তর্যোগ' তার তাত্ত্বিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা সঙ্গত। কারণ বেদান্তের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও

---

* এই সমস্ত গ্রন্থের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, Tantras : Studies on their Religion and Literature (1936)—Chapter IX. Tantric Authors and their works.

** শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

*** Adam : State of Education in Bengal, 3rd Report. 1838, (C. U.).

বেদান্তের লক্ষ্য এবং তন্ত্রের লক্ষ্য এক। সেখানেই রামমোহনের বেদান্তচর্চারও অনুকূল ভূমিকা।

এখানে বলা উচিত যে, অ-বৈদিক বলে তন্ত্র বৈদিক আলোচনার ক্ষেত্রে উপেক্ষিতও হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর তন্ত্রের অপ্রামাণিকতার উল্লেখ করেছেন।*। অন্যান্য পরবর্তী ভাষ্যকারেরাও এ' বিষয়ে শঙ্করের সঙ্গে একমত। তন্ত্রের 'বিচুয়ালিজ্‌ম' অনুষ্ঠানবাহুল্য তার নানা গুহ্য ক্রিয়াকলাপের ফলে বেদপন্থী সমাজে বিশেষত বেদান্ত-আলোচনায় তন্ত্র নিন্দিত হয়ে এসেছে। পরবর্তী কালে অবশ্য নানাভাবে এর কৌলীন্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিত্যাষোড়শিকার্ণবের টীকাকার ভাস্কররায় তন্ত্রকে বেদের অঙ্গ—উপনিষদেরই জ্ঞানকাণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন• কয়েকটি তান্ত্রিক উপনিষদ্, কৌলোপনিষদ্, রুদ্রোপনিষদ্ প্রভৃতিও রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবদের গোপালতাপনী উপনিষদের মতো তন্ত্রের এই উপনিষদও আদি উপনিষদ নয়, শঙ্কর তার কোনো স্বীকৃতিও দেন নি।

মূলত প্রক্রিয়াপ্রধান ব'লে তন্ত্রের সঙ্গে বেদান্তের কোনো যোগ দেখানো সম্ভব নয়। স্মৃতি এবং জ্ঞানচর্চা যেমন বাঙালীর আদর্শহীন সুস্থতাবিলাসের প্রতি আকর্ষণের ইঙ্গিত দেয়, তেমনি তন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের বাহুল্য বুঝিয়ে দেয় নিয়মানুগত্যের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ। যে-জ্ঞান বা যে সাধনা মানুষকে বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি চালিত করতে পারে—জাতিসীমানিরপেক্ষ, আচারাতিক্রান্ত মানবপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তার অনুকূল জ্ঞানার্জন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এ' আদর্শ কি বেদান্ত দিতে পারত? প্রথমত বেদান্তের অদ্বৈতবাদী চিন্তা আমাদের সমাজে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি দেখা গেল। বেদান্তের দ্বৈতবাদী চিন্তা বৈষ্ণব-ধর্মাচরণে প্রভাব বিস্তার করেছিল সত্য, কিন্তু বাঙালির জাতিগত স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে যে আদিম সহজিয়া সংস্কার নিহিত ছিল, বেদান্তের দ্বৈতত্ত্ব তাকেই পুষ্ট করেছে—কৃষ্ণ-রাধার সহজিয়া প্রীতির সঙ্গে মধ্বাচার্য বা নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ)-বাদ সঙ্গতি রক্ষা করেছে মাত্র। আমাদের সংস্কারের মধ্যেই এই প্রীতিসাধনা সাকার-উপাসনার নানা বৈচিত্র্যে বিকাশ লাভ করেছে। তার যা স্বাভাবিক পরিণাম তাই ঘটে এসেছে। শাক্তের সাধনাতেও দ্বৈতবাদী চিন্তারই ফল। সমাজে তার পরিণামও স্বাভাবিক পথেই এসেছে। কিন্তু তন্ত্রসাধনার গুহ্য-তত্ত্বটি যে দ্বৈতকে অবলম্বন করেও অদ্বৈতবোধে পৌঁছয়, এই বিশেষত্বটির একটি সত্যের তাৎপর্য আছে। কেননা আধুনিক কালে রামমোহন যে অদ্বৈতবাদী বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করলেন, তাঁর প্রেরণা এসেছিল তন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই।

অদ্বৈতবাদের দার্শনিক শঙ্করাচার্য তন্ত্রের অপ্রামাণিকতার উল্লেখ করলেও আধুনিক পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন তাঁর প্রচারিত মায়াবাদের (?) মূলে তন্ত্রের প্রভাব থাকতে পারে।

---

* চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, Tantras: Studies on their Religion & Literature p. 34. ভাস্কররায়ের অন্য নাম ভাস্করানন্দ নাথ। তিনি দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোরের অধিবাসী এবং শ্রীবিদ্যার উপাসক।

সে-বিচার আমাদের পক্ষে ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়; কিন্তু অপরপক্ষে এটাও অনুমান করা হয়ে থাকে যে তাঁর অদ্বৈত চিন্তা তন্ত্রদর্শনকে রূপান্তরিত করেছে। কারণ তন্ত্রের তত্ত্বের মধ্যেই দ্বৈতকে অতিক্রম করে অদ্বৈতবোধকে জাগিয়ে তোলার কথা আছে। অদ্বৈত-বৈদান্তিকের মতো তন্ত্রসাধকেরও লক্ষ্য অবশ্য মোক্ষ। মোক্ষ লক্ষ্য হওয়াতেই দ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও তন্ত্রের সঙ্গে বৈষ্ণবের পার্থক্য। বৈষ্ণব মোক্ষ চায় না। আবার জীব এবং শিবের ভেদজ্ঞান দিয়ে অর্থাৎ উপাসনা পূজার মধ্য দিয়েই জীব-শিবের অভেদজ্ঞানে পৌঁছতে হবে। তন্ত্র-দার্শনিক বলেন—

'তন্ত্রে এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ দ্বৈত জগৎকে প্রথমেই উপেক্ষা করবার ব্যবস্থা নাই। সুদূরস্থিত পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে হইলে যেমন এই পৃথিবীতেই পদক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে তদ্রূপ অদ্বৈততত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইলেও ধীরে ধীরে দ্বৈত জগতের মধ্য দিয়াই প্রস্থান করিতে হইবে। দ্বৈত জগৎকে চিরকাল সাধনার শত্রু বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে অদ্বৈতসিদ্ধি সুদূর পরাহত। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অদ্বৈতজ্ঞানকে সাধনার শত্রু না বলিয়া মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। দ্বৈত জগৎ মন্থন করিয়া যিনি অদ্বৈততত্ত্বে ডুবিয়াছেন, দ্বৈতাদ্বৈত উভয় জ্ঞানের লীলামাধুর্য তিনিই বুঝিয়াছেন।*

এই মোক্ষ-সাধনা ব্যক্তিগত হলেও শুধুই ব্যক্তিগতই নয়। ব্যক্তি একক নয়, নিঃসঙ্গও নয়। জীবন একটা বৃহত্তর জগৎসত্তার অঙ্গ সেই জীবন গোষ্ঠী শ্রেণী সমাজ এবং তারও পরবর্তী স্তরে বিশ্বগত রূপে প্রসারিত। ব্যক্তির জীবন কূপবদ্ধ নয়। জীবন আত্মপ্রবুদ্ধ, সম্পূর্ণতর এক বৃহৎ বিশ্বজীবনের সঙ্গে এক। এই বিশ্বের থেকে মুখ ফিরিয়ে সে থাকতে পারে না। জগৎকে মিথ্যা ভ্রম মায়া বলে নিজেকে সংকীর্ণ করে ফেললে মোক্ষ আসবে না:

He cannot therefore pursue his ends and work out his values irrespective of the entire scheme into which he is integrated. In other words, his own realization—or as we have put it, the solving of his own basic equation of thou and That—cannot be effected by methods of simple negation, ignorance and escape.**

তন্ত্রদর্শনের এই ব্যাখ্যা খুবই আধুনিক শোনায়। ব্যক্তিগত সাধ্য বস্তু হিসাবে মোক্ষ নামক অধ্যাত্মলক্ষ্যটিকে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তার জায়গায় যদি বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যানুভূতি লাভকেই পরম লক্ষ্য বলে গ্রাহ্য করি, তবে তো তন্ত্রদর্শনকে আধুনিক জীবনের আদর্শ থেকে তেমন আলাদা মনে হবে না। তন্ত্রের এই দ্বৈতাদ্বৈতের সূত্রেই উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন বেদান্তের চর্চা করে যেমন অদ্বৈতবোধকে জাগাতে চেয়েছেন তেমনি জগৎকে মিথ্যা না বলে লোককল্যাণমূলক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

---

* শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তন্ত্রতত্ত্ব (সবভাষার্থ—প্রথম সংস্করণ ১৩০০), পৃঃ ৪২-৪৩।

** The Cultural Heritage of India, Vol. III (1969)—'Philosophy of the Tantras', p. 438.

তন্ত্রের মধ্যে আধুনিক আদর্শের আরও কিছু বীজ ছিল। তন্ত্রে জাতিভেদ ছিল না, আর সেই সঙ্গে ছিল মহাশক্তির অভিপ্রকাশ রূপে নারীর মর্যাদা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ দুটি বস্তু পালিত হতে পারে নি, একথা সর্বজনবিদিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কৌলীন্য প্রথা এবং সতীদাহ থেকেই তা প্রমাণিত। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে গুপ্ত তন্ত্রসাধনা ছিল আলাদা। সুতরাং তত্ত্বের দিক দিয়ে যেমন, আচারবিধির দিক দিয়েও সমাজে তার প্রভাব সেরকম পড়ে নি। তবু অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধক রামপ্রসাদের গানে সেই অভেদ-উপলব্ধির ইশারা তো পাওয়া যায়—

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব　　ভেদ ভাবে শিবা শিব
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিনী।
মায়াতীত নিজে মায়া　　উপাসনা হেতু কায়া,
ত্রয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ কাননে ধাম　　ফল কি তারিণী নাম
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন,　　বিষয় মুক্তিবিহীন
নিজ গুণে তারয় ত্রিলোকতারিণী॥

রামপ্রসাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন—

'যাহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্রচিত্ত হইবেন, যেহেতু ইহা জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখ পূর্বক যাঁহার ভজন ও উপাসনা করেন, ইনি "কালী" উচ্চারণ পূর্বক তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক। যথার্থ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয় পক্ষেরই তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থপর্যটনাদি ক্রিয়া কর্ম গ্রাহ্য করেন না, ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন।'*

আধুনিক নিরাকারবাদীদের প্রথম পুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়।

●

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রচিত 'কবিজীবনী' (১৮১৮), পৃঃ ৩৩১। সংবাদপ্রভাকর ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩।

॥ রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' ॥

ডক্টর শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

(১)

'মানুষের ধর্ম'—বক্তৃতামালার পূর্বসূচনা রবীন্দ্রনাথের অক্সফোর্ডে প্রদত্ত (১৯৩০ সালে) রিলিজিয়ন অফ ম্যান'—বক্তৃতামালায়। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শ্রোতাদের কথা মনে রেখে 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' (বা মানুষের ধর্ম) বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার পটভূমিকে বিশ্লেষণ করে যে কথাগুলি বলেছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত য়ুরোপের মরুভূমি-প্রায় চিত্তে সে কথাগুলি যে বাংলার শ্যামল মেঘের অজস্র ধারাবর্ষণের মতো প্রতিভাত হয়েছিলো—সেকথা সহজেই অনুমেয়। চিরায়ত বেদ-উপনিষদ থেকে বাংলার পথে পথে শোনা আউল-বাউলের গানে গানে রবীন্দ্রনাথ আপন মনের সত্যসন্ধানের প্রতিরূপ দেখতে পেয়েছিলেন—সেই অনুভবের জগৎকে বাঙালী মনের উপযোগী করে প্রকাশ করা এককথা। পাশ্চাত্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির উপস্থাপনা আর এক ব্যাপার। তবু 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান' বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-দার্শনিকের ভাবনাধারার পরিচায়করূপে সেকালের দুনিয়ায় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবি যখন বাংলায় 'মানুষের ধর্ম' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শান্তিনিকেতনে লিখিতভাষণরূপে (১৯৩৩ সালে) পাঠ করলেন, তখন রবীন্দ্রজীবনজিজ্ঞাসার এক পরিণতরূপ হিসাবে তা যেমন অভিনন্দিত হল, তেমনি রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত রবীন্দ্রকাব্যোপলব্ধির একটি বিশেষ দিকও শ্রোতা বা পাঠকদের মনে নতুন সংকেত নিয়ে এল। আমরা এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবির প্রথম ভাষণটি অনুধাবনে প্রয়াসী।

মানবচৈতন্যের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য মানুষের মননক্ষমতায়। অতি সামান্য আকারে বুদ্ধিগত বা অনুভবগত কিছু প্রয়াসে আর সব প্রাণীতে মানুষের সাধর্ম্য মিললেও মনোজগতের অন্তহীন বিস্তারে মানবপ্রগতির কোনো সীমা নেই। আর এই মননশক্তিতেই মনুষ্যত্বের মূল উপাদান।

কথাটি রবীন্দ্রনাথ প্রায় কবিতার ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে : "পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টি-ব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা"।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় যে গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা করেছিল সেই বিবর্তনবাদে মানুষের এই 'মন' নামক পদার্থটির বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে কতটা আলোচনা আছে জানি না। মনকে যাঁরা বস্তু বলেন, তাঁরাও মানেন আর সব বস্তুর মতো নয় এই মনের স্বভাব। এমন অবস্তুকে বস্তু বলার দার্শনিক সংজ্ঞাগত কারণ যাইহোক, কবি যখন 'ভিতরের লীলা' বলেন, তখনই আমাদের কাছে মনের গতিপ্রকৃতি অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেই 'ভিতরের লীলা'-র নিখিল মানবমানস মিলিত। জ্ঞানে কর্মে ভাবে মানুষের এই যোগ যত বেশি, মানুষের সভ্যতা তত বেশী অগ্রসর। কবির ভাষায়—'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা'।

এই বৃহৎ মানুষের সাধনার দুটি পথ—একদিকে আপন অন্তরে বিশ্বের সর্বমানবের। এমনকি সর্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত ঐক্য অনুভব করা। একে বলা যায় আধ্যাত্মিক সাধনা। আর একদিকে আছে মানবিক চেতনার দিক থেকে এই ঐক্যের সত্যকে উপলব্ধি করা। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হলেও 'মানুষের ধর্ম'-গ্রন্থে তাঁর মূল প্রত্যয় মানবিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।

মানবসভ্যতা স্থূল-বস্তুগত প্রয়োজন থেকে সূক্ষ্মতর ভাবজগতের দিকে যাত্রা করেছে একদিকে। আর একদিকে ফিরে ফিরে মানুষের অন্তরচারী মানবসত্তা আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোষণা করে চলেছে। কবি মানুষের এই মহত্তর সত্যসন্ধানে যাত্রার দিকটি যতটা বড়ো করে দেখেছেন, মানুষের অন্তরালে যে পশুটি ছল-আবরণে সুযোগসন্ধানী, তার কথা বা তার সমস্যা তেমনভাবে আলোচনা করেন নি।

স্বভাবতঃই বেদ, উপনিষদ, ধম্মপদ, বাইবেল, বুদ্ধ, যীশু—এ'সব মহাগ্রন্থ বা এই ধরনের ব্যক্তিরাই 'মানুষের ধর্মে'র ভাবাকাশে বার বার আবির্ভূত। তবু এইসব গ্রন্থ বা ব্যক্তির আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের ঊর্ধ্বচারী কোনো নির্গুণ ভাবনাতীত সত্তার প্রতীক হিসাবে দেখেন নি। মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর আদর্শানুসন্ধান।

কবির মতে—'মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা'। এই 'বৃহৎ মানুষ' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'পাকা আমি'। তবে সে 'পাকা আমি' আধ্যাত্মিক অর্থে পরিপূর্ণ মানুষ—তিনি যাকে বলতেন 'মান হুঁস'। 'মানুষের ধর্ম' বা 'The Religion of Man'-গ্রন্থ-দুটিতে 'মানুষ' বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন, সে-মানুষ ওই আধ্যাত্মিকতার অনেকটা কাছাকাছি, কিন্তু 'মানুষ'-সীমার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অন্বেষণের শেষ।

মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থসীমা পেরিয়ে যত দিকে যত ভাবে বিস্তার সম্ভব—সে সবই রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে'র অন্তর্ভুক্ত। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সংগীতে—যে দিকেই মানবচেতনার বিস্তার—সেদিকেই মানুষ নিজেকে নূতন করে বিকশিত করছে, জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

'The Religion of Man'-গ্রন্থে কবির মন্তব্য—'Every true freedom that we may attain in any direction broadens our path of self-realization, which is in superseding the self. The unimaginative repetition of life within a safe restriction imposed by Nature may be good for

the animal, but never for Man, who has the responsibility to outline his life in order to live in truth'. উদ্ধৃত অংশটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—'আমাদের আত্মোপলব্ধির বিস্তারে সহায়ক যে কোনো দিকে সভ্যিকার স্বাধীন অগ্রগতি আমাদের সঙ্কীর্ণ 'আমি'কে অতিক্রম করে যায়। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বিশেষ জীবনধারার পুনরাবর্তন করে যাওয়া পশুর পক্ষে ধর্ম হলেও মানুষের পক্ষে তা কখনো ধর্ম নয়। মানুষের পক্ষে নিজের জীবনসত্তাকে অতিক্রম করে গিয়েই সত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবনযাপন করতে হবে'।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূলেই এই প্রয়াস—যা আছে তাকে অতিক্রম করেই মানুষ নব নব সত্যের সন্ধান পায়। সেইজন্য বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞপ্রধান কর্মকাণ্ড বুদ্ধদেবের কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। 'গীতা'-য় দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত।

অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে কর্মকাণ্ডের নিজস্ব ভূমিকা অস্বীকার্য নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা যত মহত্তর সত্যের অভিমুখী হয়, ততই তা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছেড়ে মননপ্রধান সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রসর। রামমোহন একদা সহমরণের পক্ষপাতীদের উদ্দেশে এ কথাটিই উত্থাপন করেছিলেন—স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়ে বহুকাল স্বর্গবাসের মতো সকাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ, না, নিষ্কাম বৈধব্যব্রতের দ্বারা ঈশ্বর চিন্তা শ্রেষ্ঠ? সকামকর্মের পক্ষপাতীরা যে যুক্তিই দিন, ও-জাতীয় কর্ম বা ধর্মাচরণের ফলাফল যে ক্ষণস্থায়ী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মানবমানসের স্তরপরম্পরা-অনুসারে সত্যের ধারণা বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু মানবসত্তার মূলনীতিগুলি আমরা অনেকটা একভাবেই বিভিন্ন দেশে কালে অনুসৃত হতে দেখি। একহিসাবে ইহুদীদের 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' (ঈশ্বরের দশটি আদেশ)—যা পুরানো বাইবেলে পাওয়া যায়, খৃষ্টানদের নীতিকথা, বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গিক মার্গ, রাজনারায়ণ বসু-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের মূলনীতি ('হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' দ্রষ্টব্য)—এগুলি বিচার করলে মানবজাতির নীতিগত ধারণার সৌসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই নীতিগত মহত্ত্বের থেকে আরো উচ্চস্তরে সর্বমানবের একত্ব উপলব্ধির দিক থেকে 'মানুষের ধর্ম'কে বিচার করেছেন। কিন্তু সে ধর্মের ভিত্তি এই নীতিগত দৃঢ়তা। ঠিক তেমনি বলা চলে সর্বজীবে ঐক্যোপলব্ধিরই রূপান্তর আমাদের নীতিবোধ। যতদিন তা না ঘটে, আমাদের নীতিবোধ সম্পূর্ণ হয় না।

মানবজীবনের একদিকে 'জীবভাব', আর একদিকে 'বিশ্বভাব'। এ'দুটি ভাবের মধ্যে শুধুমাত্র প্রয়োজনের সীমায় যারা আবদ্ধ, তারা জীবনের সত্যকে খুব সংকীর্ণ সীমায় অনুভব করে। নিজেকে আমরা যত অতিক্রম করতে থাকি, তত আমরা বিশ্বভাবের দিকে যাত্রা করি। ব্রহ্মচর্য-আশ্রম থেকে বিশ্বভারতী অবধি শান্তিনিকেতনের পরিণতি অনেকটা এই ধরনের। এই বিশ্বভাব যতদিন গোষ্ঠীগত ধারণাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য বজায় রাখবে, ততদিন বিশ্বভারতীর অগ্রগতি সুনিশ্চিত।

ব্যক্তিমানুষকে কবি মানবদেহের জীবকোষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরিবর্তনশীল জীবকোষগুলি একত্র হয়ে মানবদেহকে ধারণ করে আছে। প্রত্যেকটি জীবকোষের নিজস্ব জীবন আছে, কিন্তু সমগ্র দেহকে পূর্ণ করে তোলায় তাদের সার্থিক সার্থকতা। এ' নিয়মের

ব্যতিক্রম ঘটলে কর্কট বা 'ক্যান্সার'রূপে তা অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সভ্যতার নানা সঙ্কটের মূলে এই বিশ্বভাব থেকে সরে এসে জীবভাবের আতিশয্য।

আমরা জানি আর নাই জানি অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই সমাজ ও সভ্যতা অগ্রসর হয়ে চলেছে। খুব স্বার্থপর পিতামাতাও নিজের সন্তানদের জন্য সবরকম দুঃখকষ্টবরণে প্রস্তুত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'দস্যু হয়ে—প্রেমের প্রেরণ'। ('সখার প্রতি' কবিতা দ্রষ্টব্য।) চোর-ডাকাতের কাজের উদ্দেশ্য তার আপনজনদের ভরণপোষণ। সুতরাং হীন স্বার্থপরতার আড়ালেও কোনো না কোনো ধরনের ত্যাগ মানুষকে পরিচালিত করেছে। ক্রমে যখন এই ত্যাগ বিশ্বজনের কল্যাণে প্রসারিত হয়, তখনই বিশ্বভাব। রত্নাকরের বাল্মীকি হওয়ার গল্প বা জগাই-মাধাইয়ের পরম-বৈষ্ণবে রূপান্তরের কাহিনী এই বিশ্বভাবেরই যুগোপযোগী রূপায়ণ। আইনষ্টাইন বা সোরেংসার কবির 'বিশ্বমানব'সত্তার যোগ্য প্রতিনিধি। গান্ধী-নেহেরু-ষ্বাট্জার রাসেল প্রভৃতির মধ্যেও ঐ একই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি।

"মানুষের চিত্তবৃত্তির যে-উৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি"—মানুষকে একদিকে যেমন নিজস্ব মৌলিকতায় ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হতে হবে, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বজনের প্রতি প্রসারিত হৃদয়ে সমগ্র মানবসত্তার একাত্ম অংশীদারও হতে হবে। একালে আমাদের মনীষী কবিদের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং কবিই এর সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ। এই বিশ্বভাব-সচেতনতাই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবিতে পরিণত করেছে। নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) সে পরিচয়লাভে সহায়তা করেছে মাত্র।

ভারতবর্ষের সাধক-যোগীরা বলেন—'উল্টা-সাধন'। এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযাত্রাকে যেমন আধ্যাত্মিক সত্যলাভের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায়, মানবজীবনের সব বড়ো প্রচেষ্টায়। কবি, শিল্পী, গায়ক, বৈজ্ঞানিক—সবার ক্ষেত্রেই কতো আত্মত্যাগ, কতো নিরলস প্রযত্ন, কতো তন্ময়তা—তবে তো সিদ্ধি। হয়তো একথা ভেবেই জীবনের সব কর্মকে সাধনায় পরিণত করতে বলেন মহাপুরুষেরা।

জীব-বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাটির সমান্তরালে কীট থেকে আরম্ভ করেও পশুপক্ষীরা যেভাবে চলা-ফেরা করে, তাদের সঙ্গে শিরদাঁড়া সোজা করে মানুষের আকাশের দিকে মাথা তুলে চলার পার্থক্যটি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। "উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে"। মানুষ যেমন প্রসারিত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখতে পায়, তেমনি তার আর এক দৃষ্টিও রয়েছে,—সে তার কল্পনাশক্তি। সব মিলিয়ে মানুষ যেমন কাছের দৃশ্য থেকে দূরের দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে, তেমনি পারে অন্তরের অন্তর্লোকে আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করতে। বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি—এ দুয়ে মিলে মানুষের যথার্থ পরিচয়। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা—এসব কিছুর সমবায়ে মানবসত্তার পূর্ণতা। এর কোনো একটির প্রতি উপেক্ষার অর্থ মানব-জীবনের উপলব্ধির ক্ষেত্রে দরিদ্র থাকা। কিন্তু একালের শিক্ষাপদ্ধতিতে কার্যকরী জ্ঞানের

অভিপ্রাধান্য মানুষের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করেই চলেছে। এর প্রতিকার সন্ধান আজ কর্তব্য।

অনেকেই বলবেন—অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান না করে উচ্চচিন্তার সার্থকতা কি? অন্নবস্ত্র দরকার, কিন্তু যে মানবদেহের জন্য দরকার সে মানবের অন্তরে যদি মানুষ হওয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে ধারণা না থাকে, তাহলে অর্থনীতি বা রাজনীতির মুক্তির বাণী অচিরে শৃঙ্খল হয়ে মানুষকে পদে পদে জড়িয়ে ধরে। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ বিপ্লবই তার ধ্বজাধারীদের হাতে নিহত। ধর্মের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা অনেক সময়ই মূল আদর্শকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

কবির বাণী—'যেখানে মানুষের বাস্তভিটে সেই লাখেরাজ দেবত্রভূমি প্রকৃতির এলেকার বাইরে। সেখানে জোর তলবের দায় নেই। সেখানে সকলের চেয়ে বড়ো দারিদ্র্য স্বাধীন দারিদ্র্য, তাকে বলব আদর্শের দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের দারিদ্র্য'। মানুষের অন্তর্লোকে স্থূল বৈষয়িক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যে আনন্দের লীলা—তারই প্রকাশ তার সব শ্রেষ্ঠ কীর্তিতে। এমন কি বিপ্লবও এই আনন্দেরই লীলা, যতক্ষণ মানবমুক্তির ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ। কিন্তু এককালের বিপ্লব যখন আর এককালে প্রতিবিপ্লব হয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষের মুক্তি সুদূরপরাহত হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারের প্রাধান্য ঘটে। তখন আবার নতুন করে 'মানুষের ধর্ম' কি—সে-জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। প্রত্যেক যুগের অবসানে আমাদের ফিরে ফিরে মনে রাখতে হয়—"এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য; এই সত্যের আদর্শেই বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র—এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সে পরিমাণে সে বর্বর"।

মানুষের ধর্ম এই আত্মপরিচয়লাভে। সে-পরিচয় মানুষ আপন সাধনায় লাভ করবে—কোনো দলমত সেক্ষেত্রে তাকে বাধা করে সত্যের পথে নিয়ে যেতে পারবে না। নিজের মধ্যে এই স্বাধীনতার উপলব্ধিই মনুষ্যত্বের সূচনা।

●

॥ বাংলাগানে আদ্যাশক্তি মহাকালীর প্রভাব ॥

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

হিন্দু-পুরাণশাস্ত্রে ও তন্ত্রসমূহে শক্তিস্বরূপিণী মহাকালীর নানা বর্ণনা আছে। কখনো তিনি দশপ্রহরণধারিণী চণ্ডিকা দুর্গা, কখনো তিনি বীণাপাণি বাগ্দেবী, কখনো তিনি কমলদল-বিহারিণী লক্ষ্মী, কখনো বা করালবদনা প্রলয়ঙ্করী কালী। 'দেবী ভাগবতে' এবং 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে' পরমা-প্রকৃতি এই দেবীর নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য এই মহীয়সী জগজ্জননীর স্তব রচনা করলেন তাঁর 'আনন্দলহরী'-তে। যে মহাশক্তির অনুশাসনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, যাঁর মহিমায় সূর্য-চন্দ্র দীপ্তিমান, যাঁর প্রভাবে ধরিত্রী অনন্তপ্রসবিনী-শক্তিসমন্বিতা,

যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা যাঁর আরাধনা করেন, যিনি অসুর-বিনাশিনী সংসার-পাপ-তাপনাশিনী মোক্ষদায়িনী, তিনি যে—

'স্মরা হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা।
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপহরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ॥
তথা হি তত্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং।
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্॥'

'আগমকল্পদ্রুমপঞ্চশাখা'-তে এই দেবীকেই বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

'অখিলজনভীষকমলিনী বামেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখাদ্যেন
তন্ত্রেন কুচদ্বয়ং শেষাঙ্গেনেপাণী সাধকমন্ত্রভেদাৎ
সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ'।

তিনি ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা, মুক্তকেশী, মুক্তমালিনী, তিনি খড়্গিণী খড়্গধারিণী, তিনি ভয়ানাং ভীষণানাং। কিন্তু তাঁর আর একটি রূপও বড় মধুর। তিনি বেদমতী মহালক্ষ্মী, ত্রিনয়নী ত্রিকালদর্শিনী, একহাতে তাঁর বরাভয়, আর একহাতে আশীর্বাদ, একহাতে তাঁর কল্যাণ, আর একহাতে ক্ষমা। চতুর্ভুজা তিনি, চার হাতে চারদিক তিনি রক্ষা করছেন। গভীর নিশিযামে তাঁর অর্চনা। ঘরে ঘরে তখন দেয়ালী উৎসব। অন্ধকারের গর্ভ থেকে একটি একটি ক'রে দীপশিখা জেগে উঠে ঘোষণা করে তমোনাশিনী মহাদেবীর মাহাত্ম্য। মর্ত্যলোকে মানুষের স্তব তখন আরম্ভ হ'য়ে ওঠে : 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং-গময়'।...

আর্যসমাজ একদা যে যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে শক্তিস্বরূপিণী এই দেবীর রূপ প্রকরণ করেছে, হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্রসমূহ সেই সেই রূপেরই নানা ব্যাখ্যা ক'রে গণমানসের সামনে উপস্থিত হয়েছে। কি ভক্তকবি রামপ্রসাদ, কি পরমহংসদেব এই দেবীরই ধ্যান ক'রে দেবীমাহাত্ম্যের মধ্য দিয়ে জীবমুক্তির সন্ধান করেছেন।

ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষ ক'রে বাংলাসাহিত্যে তন্ত্রসাধনার গোড়া থেকে শুরু ক'রে এই দেবী নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছেন। বাংলার কালীকীর্তন থেকে শুরু ক'রে শ্যামাসঙ্গীতের ছড়াছড়ি। বাংলাগানে মহাকালীর প্রভাব অসামান্য। রামপ্রসাদের গানে বঙ্গভূমি আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। তাঁর সঙ্গীতে বাংলা গীতি-কবিতার সৌন্দর্য অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে—যেমন উঠেছে কমলাকান্ত প্রভৃতি গীতিকারদের মাতৃসঙ্গীতে। রামপ্রসাদের—

'আমায় দাও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।'...

অথবা—

'এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা ব'লে দু'নয়নে পড়বে ধারা।'...

কিম্বা—

'হৃৎ-কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দোলাইছে দিবস-রজনী ও মা।...'

প্রভৃতি গান অজস্র এবং অসামান্য।

রামপ্রসাদের এজাতীয় গানকে ব্যঙ্গ ক'রে আজু গোঁসাঞি একসময় কিছু হাস্যরসের সৃষ্টি করেন; যেমন—

রামপ্রসাদ—

'আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥'

আজু গোঁসাঞি—

'পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথা গিয়ে দেখবি যে তোর মেসো আর মাসী।'

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আজু গোঁসাঞির কালীভক্তি কিছু কম ছিল না।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের—

'পড়িয়ে ভব-সাগরে ডুবে মা তনুয় তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥'

দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর—

'ওগো জেনেছি জেনেছি তারা
তুমি জানো ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেম্‌নি ভাবে,
তাতেই তুমি হও মা রাজি॥'...

কুমার নরচন্দ্রের—

'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥'...

অথবা—

'যে ভালো করেছ কালী,
আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চ'লে যাই॥'...

প্রভৃতি গান যেমন উচ্চাঙ্গের ভাববিশিষ্ট, তেমনি মধুর। এরকম কিছু গান পরবর্তীকালে কমলাকান্তের রচনা ব'লে প্রচলিত হ'তে দেখা যায়। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের নিজস্ব গানেও এ মাধুর্য কিছু কম নয়, যেমন—

'আর কিছু নাই শ্যামা মা তোর,
কেবল দু'টি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি,
দেখে হলাম সাহসভাঙ্গা॥'

অথবা—

'তাই কালোরূপ ভালোবাসি।
কালী জগন্মনমোহিনী এলোকেশী॥'

শাক্ত রাজাবাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রও কম গান রচনা করে যাননি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এবং রসিকচন্দ্র রায় প্রমুখ বহু পাঁচালীকার তখন নানা শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা 'তরজা' গানেও বিশেষ ক'রে শ্যামাবিষয়ক বহু পদের গান পাওয়া যায়। কবিয়ালদের মধ্যেও বহু কবি যেমন কৃষ্ণবিষয়ক, তেমনি শ্যামাবিষয়ক গান রচনা ক'রে গেছেন। এঁদের মধ্যে নীলমণি পাটুনীর দলের একটি গান—

'এবার বেঁধেছি মন আঁটি আঁটি, করেছি মন খুব খাঁটি,
তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি,
আর পালাতে পারবি নে।
তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা,
হৃদয়-কাননে।'···

রামমোহনের সমসাময়িক নীলমণি ঘোষের একটি গানের দু'টি লাইন—

'কে জানে তোমায় তারা?
তুমি সাকারা কি নিরাকারা।'

পরমহংসদেব বলতেন: 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; আবার যখন ভাবি—তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি কালী বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি' (কথামৃত: ৩।১।৬: ব্যাখ্যা: 'বাণী ও বিচার': স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)

'মহানির্বাণতন্ত্রে' পাই—

'ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারী কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥' (৪।১৪)

—'হে জগন্মাতঃ, স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যক্ত-অব্যক্ত, সাকার নিরাকার—সবই তুমি। তোমায় কে জানতে সমর্থ?'

শ্রীরামকৃষ্ণের 'বোধি' নিয়েই বোধিক্রম হয়ে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মা তথতারিণীর পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীবাহক হ'য়ে তিনি প্রচার করলেন বেদান্ত। তাঁকে বেদমূর্তি আদ্যাশক্তির মহা উদ্ভাবও বলা যায়। তাঁর বিখ্যাত 'Kali the Mother'-এর বঙ্গানুবাদ করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

'মৃত্যুরূপা মা আমার আয়।
করালি। করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখরৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।...'

—এর সঙ্গে স্বামীজীর আর-একটি গানও তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা—

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর;
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।'...

পরমহংসদেব যেমন মাতৃসঙ্গীত শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হতেন, তেমনি নিজেও গাইতেন রামপ্রসাদের গান। সঙ্গীতের বাণীতে ও সুরে মিলে রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ একাকার হ'য়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-গীতিসাহিত্যেও কালী বা শ্যামা একেবারে অনুপস্থিত নন। তাঁর 'শ্যামা নাচে তালে তালে' প্রভৃতি গান এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্ত দেশের শিক্ষা, সংস্কার ও স্বাধীনতাব্রতে জীবন উৎসর্গ ক'রে যে মহাশক্তি উপলব্ধি করেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি ঘটে একটি গানে, যথা—

'শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো, তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এতবড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
আয় মা দেখা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হবো শিব পা ছুঁয়ে যা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা, দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।'...

তেমনি চারণকবি মুকুন্দদাসের কণ্ঠের একটি গান—

'মা আমার বিশ্বরাণী, আমি মায়ের আদরের ছেলে।
যত রতন মাণিক হীরে সোনা সব দিয়েছি মায়ের পদতলে।
আমি গুরুর কৃপা পেয়েছি,
খাঁটি সোনা হয়ে গেছি,
তাই মুকুন্দ আনন্দে নাচে জয় তারা জয় তারা ব'লে।'

শ্যামাসঙ্গীতে মুসলমান কবিদের দানও কম নয়। একদা অখণ্ড-অবিভক্ত বাংলার মুসলমান ফকিরদের মুখে একই সঙ্গে শোনা যেতো সত্যপীরের গীত, লক্ষ্মী-বন্দনা ও কালীসঙ্গীত। এঁরা প্রধানতঃ ছিলেন সুফী-মতাবলম্বী দরবেশ। এতদ্ব্যতীত অষ্টাদশ শতকে মীর্জা হুসেন আলী ও দরাব আলী খাঁ বিশেষ খ্যাতিমান শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। এঁদের একটি গান—

'যারে শমন এবার ফিরি।
এস না মোর আঙ্গিনাতে
যোহাই লাগে ত্রিপুরারি।...'

উনিশ শতকের শেষাশেষির কবি ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের শ্যামাসঙ্গীত রচনাও এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে কাজী নজরুল ইস্‌লামের মতো বোধ করি এমন ব্যাপক কালীবিষয়ক সঙ্গীত আর কোনো কবি বা গীতিকার রচনা করতে পারেন নি। তাঁর—

'বল্ রে জবা বল,
কোন্ সাধনায় পেলি রে তুই শ্যামা মায়ের চরণতল ?
তোর সাধনা আমায় শেখা (জবা), জীবন হোক্ সফল।'…

অথবা—

'আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম,
যা হবেন মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হবেন মনস্কাম।'…

অথবা—'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হলো মহাকালী' প্রভৃতি সঙ্গীত বাঙলার ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছে। রেকর্ডে শ্যামাসঙ্গীতের যে প্রাচুর্য, তার কাছে বহু সঙ্গীতই হার মানে।

এ থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, বাঙালীজীবনে এবং বাংলা গানে মহাকালীর প্রভাব কী অসামান্য! কখনো তিনি শ্যামা, কখনো তিনি তারা, কখনো তিনি ত্রিপুরারি নিরাকারা, কখনো বা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা। বাঙালী গীতিকারদের লেখনীতে দেবীর এই সমুদয় রূপই মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

●

।। ভক্তিতত্ত্বে রামমোহন থেকে বঙ্কিম ।।

শ্রীরতন দাশগুপ্ত

পুরাতন যুগের শেষে নতুনের অভ্যুদয়। আসলে এই পুরাতনকে সহজেই পরিহার করা যায় না। নতুনের অভ্যুদয়ে তার চিহ্ন থেকে যায়। সংস্কারের মধ্যে সমন্বয়ের ওটরেখার কিছু চিহ্ন বর্তমান থাকে পরে তাকে আশ্রয় ক'রে নতুনকে বরণ ক'রে নিতে হয়। এই প্রকাশের প্রাক্কালে সমাজে একটা নতুন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে একটা মূল্যায়নের চেষ্টা হয়। তাকে কেউ বলেন পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভ্যাল্। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রিভাইভ্যালিজিমের চরমপ্রকাশ দেখা যায়। প্রথমে ধর্ম ও সমাজ নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়, বাংলা রামমোহন রায় হলেন তার প্রধান হোতা। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই মূল মন্ত্র দিয়ে শাস্ত্রবিচারের ধারাকে নতুনভাবে ভাবিত করে তুললেন। গতানুগতিকতার পথ দিয়ে এতদিন যে ধারা বয়ে চলেছিল তাতে ছিল না প্রাণের স্পর্শ, আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে তা ছিল বদ্ধ, তিনি যে পথ দেখালেন তা হোল যুক্তিবিচারের পথ দিয়ে শাস্ত্রানুমোদিত ধারার। বিতর্ক ধর্ম-শাস্ত্র, পুরাণ-উপপুরাণ মন্থন করে দেখালেন এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে নেই কোন ধর্মীয় চেতনা,

এর ভিত্তিভূমি হোল কতগুলি লৌকিক আচার আর অনুষ্ঠান। যাকে ধর্মীয়রূপে অলৌকিকতায় পরিণত করা হয়েছে। শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা দেখিয়ে তাকে সমাজে আরোপ করা হয়েছে। এতে নিয়ম কানুনকে আরো কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফল হোল শাস্ত্রানুমোদিত নির্দেশের চাইতে ব্যাখ্যাকারেরা পুঁজিত হয়েছেন।

বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যপ্রকাশ করলেন রামমোহন (১৮১৬-১৭)—যার আধার ছিল শঙ্করভাষ্যে। তারমধ্যে একটি বিধান আছে পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাসনার বিধি আছে তাহা দুর্বল অধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত। বস্তুতঃ ব্রহ্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মকে সর্বময় মনে করলে তাকে বিশেষ রূপেতে পূজার প্রয়োজন হোত না। পুরাণ তন্ত্রশাস্ত্রে যে রূপকল্পনার কথা আছে তার উত্তরে রামমোহন বলেন—যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপ ও কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক। পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই কি-না? তার উত্তর—ব্রহ্মের একই অবস্থা, ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার উভয়ই একথা অশাস্ত্রীয় ও যুক্তি বিরুদ্ধ।*

বেদান্ত ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের মধ্যে তিনি প্রকাশ করলেন নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ। বেদাদিতে যে উপাসনার কথা আছে তা উক্ত মতেরই সমর্থক। অবশ্য এ যুক্তি শঙ্কর ভাষ্যের মত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজকে একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেবার চেষ্টা হোল। প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাকে বর্জন করে তার সত্য রূপের সাক্ষাৎ পাবার চেষ্টা হয়েছে। কিছু কিছু অনুষ্ঠানের রদবদল করা হয়েছে, তাতে পুরাতন প্রথাকে বর্জন করে নতুনের সংযোজন করা হয়েছিল। মহর্ষি যদিও পুরাতনের সমূল উচ্ছেদ চান নি। যুক্তি ও বিচারে যা গ্রহণযোগ্য তাতে তিনি বাধা দেন নি। মহর্ষির এই ঔদার্য্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে পরবর্তী জীবনে। তা সত্ত্বেও বিভেদ-প্রবণতা বেড়েই চলেছিল, ফলে তা রূপ নিল বিচ্ছেদের। নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে জন্ম নিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান। In 1866 the schism came and Debendranath Tagore's section of the society called the adi Brahmo samaj was seperated from Keshab chandra Sen's group, which assumed the name of the Brahmo Samaj of India or the new convention. (Nava Bidhan)**

বিভেদের মূল কারণ ব্রাহ্মসমাজ শুধু ধর্মসাধনার কেন্দ্র হবে না, সেই সঙ্গে জীবনের সার্বিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। জাতিভেদ প্রথার অবসান, উপবীত ত্যাগ, স্ত্রী-শিক্ষা

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
**History of the Freedom Movement in India—Dr. Tarachand.

প্রচার, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি যাতে সমাজে প্রচলিত হয় তারজন্য চেষ্টা করা। গণতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ গড়ে তোলা, যাতে সকলেই সমমর্যাদার অধিকারী হয়। ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা তাঁর হাতেই ছিল। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মরা আচার্য্য হিসাবে নিয়োগ হোত। নবীনরা এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন না। মহর্ষির আত্মকর্তৃত্ব নবীন ব্রাহ্মদের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব এনে দিয়েছিল ফলে মত পার্থক্য তীব্র হয়ে দেখা দিল।

এবার নববিধান-সমাজের নেতা হলেন কেশবচন্দ্র, তাঁর বাগ্মীতায় সকলেই মুগ্ধ, তাঁর ইংরাজী ভাষণে আসমুদ্র হিমাচলে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। বিলাতে তাঁর বাগ্মীতায় সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত। দেশে ও বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো—Punch পত্রিকা লিখল,

Big as a lion or small as a wren
Who is this Chunder Sen ?

কেশবচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে মহর্ষির আদর্শের মূল-পার্থক্য হোল হিন্দুশাস্ত্রের ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের মধ্য থেকে ধর্ম্মের প্রেরণার বাণী সংগ্রহ করে তাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপ দেওয়া। কেশবচন্দ্র মনে করতেন মানবজাতির উদার ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এনে তাকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা। মহর্ষি মনে করতেন,—বৈদিকধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ধারা প্রকাশিত হয়েছে উপনিষদে, তেমনি পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রকাশ হয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানে।

কেশবচন্দ্রের এই ব্যাপক চিন্তা কিন্তু পরিশেষে এক জটিল ভাবসংঘাতের মধ্যে পড়ে দ্বিধাবিভক্ত হোল। ফলে সৃষ্টি হোল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। পরবর্ত্তী জীবনে ধর্ম্মের নৈতিক বৃত্তবলয়ের বাইরে এসে সমাজসংস্কার ও স্বাজাত্যবোধের মধ্যে দেশের মুক্তিসংগ্রামে রূপ নিল।

রামমোহনের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে মূর্ত্তিপূজার যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে পরবর্ত্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় কুমার দত্তের মধ্যে সেই বিশ্লেষণাত্মক মনোভঙ্গি ছিল না। তাঁরা মূর্ত্তিপূজার অসারতা সম্বন্ধে কেবল প্রতিবাদীর ভূমিকা পালন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে তাঁকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ বলে মন্তব্য করেছেন। কেশবচন্দ্র হিন্দু দেব-দেবীর রূপকাশ্রয়ী ধ্যানের মধ্যে দিব্যজীবনের স্বাদ অনুভব করেছেন। ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা, মহাবিদ্যাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, নিরাকার গণেশপূজা, জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকের পূজার মধ্যে একটা আকার নিরাকারের সমন্বয়ী ভাব রয়েছে। রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী চিন্তাভাবনার মধ্যে যার যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রামকৃষ্ণের মাতৃভাবনা একটা বিশেষ তাৎপর্য্যমণ্ডিত। সমস্ত শক্তিকে মাতৃপদবন্দনার মধ্যে সংহত করে নিজের আত্মতত্ত্বের বিলোপ ঘটানো। এই মাতৃভাবনার অনুধ্যানের মধ্যে কেশবচন্দ্র নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সেন (নববিধান সমাজের অন্যতম প্রবক্তা) লিখলেন—ভগবানের মাতৃভাব সম্বন্ধীয়ভাব ব্রাহ্মসমাজ পরমহংসের জীবন হইতে প্রাপ্ত হন। বিশেষভাবে আমাদের আচার্য্য

(কেশবচন্দ্র সেন) তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিতে এবং শিশুর মত সরলতা ও অভিমান লইয়া আবদার করিয়া প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করেন। ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম জ্ঞান প্রধান এবং শুষ্ক তর্কযুক্তিতে পূর্ণ ছিল। পরমহংসের জীবনাদর্শের আদর্শে ব্রাহ্মধর্ম হইতে শুষ্কতা দূর করিয়া উহাকে অধিক প্রিয়তর করিয়া তুলিল।*

কেশবচন্দ্রের দৈনিক প্রার্থনাতে এই মাতৃভাবের আর্তি যেভাবে ফুটে উঠেছে তা রামকৃষ্ণের মাতৃভাবনার অনুরাগ।

> 'মা এই ভবে বলি যদি পাগলী হয়ে আমার মাথা খেলি তবে এই দলভঙ্গ সকলকে পাগল করে দে। সকলের মাথা খা। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলের মাথা খা। পাড়াশুদ্ধ সকলকে পাগল কর। মা বড় সুখে আছি। আর বাকি রইলো কি? এত আমোদ তোমার বাড়ীতে। মাতাল-কটা বসে আছে আর মদ যোগাচ্ছে। প্রেম সুরা যোগাচ্ছে।'

মাতৃমন্ত্রের অভিষেক তার সমসাময়িক যুগের চিত্তে একটা নতুন প্রেরণা এনে দিল। তন্ত্র ও পুরাণের প্রভাব নতুন করে দেখা দিল। আগে যেখানে বেদ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের উপর তত্ত্বচিন্তার প্রভাব ছিল, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত হোত। সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মের উপাসনাই জুড়ে বসলো, কেশবচন্দ্রের সমসাময়িক যুগেই মহাভারত হরিবংশের কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যাত হোল ভগবদ্দীতার অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে, পুরাতনবিশ্বাস-প্রচলিত শাস্ত্রবাণীর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে পাশ্চাত্য যুক্তিপদ্ধতির মাধ্যমে। কৃষ্ণই আদর্শ পুরুষ। কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যুগপুরুষ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করলেন তার কৃষ্ণচরিত্রে। সমস্ত অলৌকিকত্ব বাদ দিয়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণাভিব্যক্তির মধ্যে তার আসন স্বীকৃত হোল। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম এই তিন বৃত্তির সুসমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীন চমৎকর্ষতার মধ্যে ভগবানের অবতার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাভূমি। জীবকল্যাণে এই অবতারের আবির্ভাব, এ বিশ্বাস তার ছিল। বঙ্কিম বললেন, জগতের সকল মহাপুরুষের সমস্ত গুণ একত্র মিলিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে। সকল ধর্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান। শ্রীভগবানের অবতার ছাড়া কোন মনুষ্যে এত মহিমা এত সদ্‌গুণ এইরূপ পরিপূর্ণ আদর্শের চরিতার্থতা দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব ধর্মীয় ব্রজলীলার মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপাস্য নন। তিনি কাব্যের নায়ক, প্রেমধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি এতে থাকলেও মানবজীবনের কল্যাণকর দিকটি এখানে অনুপস্থিত। শক্তিতত্ত্বের দিকটি বঙ্কিমের কাছে স্পষ্ট নয়। শক্তিমানরাই পূজার অধিকারী। যারা শক্তিহীন তাদের এ পূজার অধিকার নেই। জীবের কল্যাণকর দিকটিকে উদ্ঘাটিত করার জন্য শক্তির প্রয়োগকে তিনি শক্তিপূজা মনে করেন। প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে রূপ, ধন, যশ এ প্রার্থনা তাঁর কাম্য নয়। তিনি চেয়েছেন শিবের জন্যের আশা। মানসবৃত্তির পূর্ণতর সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে শক্তিপূজার অধিকার ভেদ। আনন্দমঠ-রচনার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অনুশীলন

---

* (ধর্মতত্ত্ব—১লা আশ্বিন ১৮০৮ শক)।

ভক্তের আভাস. দেশমাতৃকার বন্দনা। জগন্মাতাকে দেশমাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠা করা। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গারূপে কল্পনা।

দেশমাতৃকার উপর এই মাতৃতান্ত্রিকরূপ কল্পনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যে মন্ত্রগুলির শপথ নিয়েছেন তার মূল লক্ষ্য ছিল পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা। এই চিন্তাভাবনাগুলি মূলতঃ ইতিহাস-চেতনার আলোকে ধর্মীয় চিন্তার একটা নূতন প্রকাশরীতি। আমাদের দেশের ইতিহাস পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে মিশ্রিত। অলৌকিক ঘটনায় তা ভরপুর। বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিককে পরিহার করে ঐতিহাসিক সূত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাজেই ভক্তিরসাশ্রয়ী ভাবমূর্তির গভীরে ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে একটা যোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই যোগ রসের আধারে আপ্লুত হয়ে রসিক-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পরবর্তী ধারায় এই ভক্তিভাবনার লৌকিক চিত্রটি ভক্তিরসাপ্লুত হয়ে সাধারণের মধ্যে প্রবেশ করে লোকজীবনের সঙ্গে একটা নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ঐশ যোগ প্রেমের নিগড়ে বাঁধা পড়েছে।

●

॥ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান-রহস্য ॥

ডক্টর শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাব সম্পর্কে তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলি নীরব থাকায় এ বিষয়ে নানাবিধ কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়েছে এবং পণ্ডিতমহলে আজ পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনারও অভাব নেই। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগ সম্পর্কে একেবারেই নীরব। এই শোকাবহ কল্পনায় বিবরণ দিতে তাঁদের ভক্তগণ স্বভাবতঃই মুহ্যমান হয়েছিল। কবিরাজ গোস্বামী কেবলমাত্র বলেছেন যে ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হয়েছিল। মুরারি বলেছেন যে প্রভু জগৎ উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠবাসীদের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে নিজালয়ে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করেছিলেন (মুঃ কঃ ১।২।১৪)। কবিকর্ণপুরের মতে গোপীজনের বিরহে কাতর হয়ে প্রভু তাদের কাছেই চলে গিয়েছিলেন।

প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে সুস্পষ্ট বিবরণের অভাবহেতু মহাপ্রভুর দেহত্যাগ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী বা মতবাদ গড়ে উঠেছে সেগুলি প্রধানতঃ চারটি : (১) জগন্নাথ-মন্দিরে বা গম্ভীরাবাড়ীতে জগন্নাথবিগ্রহে মহাপ্রভুর দেহলীন হয়েছিল (২) টোটা গোপীনাথের মন্দিরে গোপীনাথবিগ্রহে তাঁর দেহ মিশে গিয়েছিল (৩) দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শ্রীচৈতন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ায় সাগরজলে তাঁর দেহ ভেসে গিয়েছিল, (৪) পুরীর পাণ্ডারা অথবা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বিরোধীশক্তি চক্রান্ত করে জগন্নাথ-মন্দিরে বা গম্ভীরাবাড়ীতে মহাপ্রভুকে গুপ্তভাবে হত্যা করে তাঁর দেহ গোপন করেছিল। বাঙালী কবিভক্ত লোচন দাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গলে, উড়িয়াভক্ত

কবি ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবতে, অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতায় ও দিবাকর দাসের চৈতন্য-ভাগবতে গুণ্ডাবাড়ীতে জগন্নাথবিগ্রহে শ্রীচৈতন্যের দেহলীন হওয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হয়েছিলেন জগন্নাথ-মন্দিরেই। শ্রীমদ্ভরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে এবং উৎকলীয় কবি সদানন্দ জানিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য টোটা গোপীনাথের বিগ্রহে লীন হয়েছিলেন। সমুদ্রে দেহ-বিসর্জনের কাহিনী লিখেছেন T. M. Kennedy—"The Chaitanya Movement" গ্রন্থে। একমাত্র জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে রথযাত্রার সময়ে নৃত্যকালে পায়ে ইটের আঘাতজনিত ক্ষত থেকে প্রবলজ্বরে মহাপ্রভুর স্বাভাবিক মৃত্যুর বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণবগণ জয়ানন্দের কথায় বিশ্বাসী নন। কিন্তু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দের বিবরণকেই যথার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। পায়ে ক্ষতজনিত প্রবলজ্বরে গুণ্ডাবাড়ীতে মহাপ্রভুর দেহত্যাগের পরে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে তাঁর দেহ গোপনে সমাহিত করা হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন।

মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল বলে নাকি পুরীতে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রতাপরুদ্রদেবের অসাধারণ চৈতন্যভক্তি এবং মহাপ্রভুর অসাধারণ প্রভাববৃদ্ধির ফলে জগন্নাথ-মন্দিরের পাণ্ডাদের স্বার্থহানি ঘটায় পাণ্ডারা তাঁকে জগন্নাথ-মন্দিরে গোপনে হত্যা করে মন্দির-মধ্যেই সমাধিস্থ করে তাঁর দেহ জগন্নাথবিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করে। গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী "চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য"-গ্রন্থে এই কাহিনীকেই গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি ডঃ অরুণদেব মুখোপাধ্যায় "কাঁহা গেলে পাই" গ্রন্থে (কাড়গ্রাম-১৩৮৫) উপন্যাসের আঙ্গিকে মহাপ্রভুকে গুমখুন করার কাহিনীটি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বলে গ্রন্থ মধ্যে বলা হয়েছে। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

১। দীনেশচন্দ্র সেন 'Chaitanya and his age'-গ্রন্থে লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের প্রচণ্ড আঘাতে (great shock) উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গালায় ৫০ বৎসর কীর্তন বন্ধ ছিল।

২। উৎকলে স্মার্তপণ্ডিতরা মহাপ্রভুর উপর রুষ্ট হয়েছিল।

৩। প্রতাপরুদ্রদেবের বৌদ্ধবিদ্বেষের ফলে উড়িষ্যার বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্যের উপরে রুষ্ট হয়।

৪। পুরীর পূজারী ও পাণ্ডারা মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিল।

৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ মহতাব (History of Orissa Vol. I. p. 319)-এর মতে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যভক্ত হওয়ায় উড়িষ্যার সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট প্রতাপরুদ্রদেবের পরাজয়ের কারণ হিসাবে বিপক্ষদল শ্রীচৈতন্যকে নির্দেশ করতো।

৬। উৎকলের সিংহাসনলোভী হীন ষড়যন্ত্রকারী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভেবেছিল যে প্রতাপরুদ্রের রাজকার্যে সকলপ্রকার পরামর্শদাতা এবং সর্বজনের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে

অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যকে পৃথিবী থেকে না সরালে প্রতাপরুদ্রের সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব নয়। মহাপ্রভুর নিকট অদ্বৈতকর্তৃক প্রেরিত গুপ্তার এই ইঙ্গিত ছিল। গোবিন্দ মহাপ্রভুকে ও পরে প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র কাশীনাথদেব ও কপাকরদেবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেছিল।

৭। উৎকলীয় কবি বৈষ্ণবচরণ দাসের 'চৈতন্য চন্দ্রিকা' অনুসারে মহাপ্রভুর দেহপাতের পর রাজা প্রতাপরুদ্র দারুণ ত্রাসে বিদ্যানেসী বা কটকে পলায়ন করেছিলেন, তবে তিনি মহাপ্রভুর মরদেহ হরিনাম সহকারে সমাধিস্থ করার আদেশ দিয়েছিলেন। রাত্রি দশদণ্ডের সময়ে (প্রায় ১১টা) মহাপ্রভুর দেহ জগন্নাথ-মন্দিরে গরুড়স্তম্ভের পিছনে পতিত হলে চোটা গোপীনাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৮। লোচনের বিবরণে মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করার পরই গুণ্ডাবাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন যে মহাপ্রভু অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় দেহত্যাগ করেছিলেন ও রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের অনুমত্যানুসারে ঐ সময়ের মধ্যে সমাহিত করে মেরামত করা হয় এবং জগন্নাথবিগ্রহে লীন হওয়ার সংবাদ প্রচার করা হয়।

৯। সেই বৎসরে রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে এসে শচীদেবীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করায় শ্রীক্ষেত্রে বাস মহাপ্রভুর কাছে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক হয়েছিল।

১০। মহাপ্রভু একদিন আকস্মিকভাবে অন্তর্হিত হয়ে চোটা গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর বেশে ষোলা দুবলীগ্রামে আত্মগোপন করে কালযাপন করেছিলেন। সেদিন তিনি আত্মগোপন না করলে গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচরেরা তাঁর জীবনান্ত ঘটাত।

১১। রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন যে তাঁর উৎকলীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই গোবিন্দ বিদ্যাধরের পাপচক্রের চর।

১২। সম্বলপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যভাগবতে লিখেছেন যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তাঁর অনেক ভক্ত স্বশরীরে অন্তর্ধান করেছিলেন।

১৩। মহাত্মা শিশিরকান্তি ঘোষ তাঁর অমিয়নিমাই চরিতগ্রন্থের ষষ্ঠখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ের শেষে পাদটীকায় লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর তাঁর ভক্তগণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদর চেতনা ফিরে পান নি। তাঁর হৃদয় ফেটে প্রাণ বেরিয়েছিল। এ থেকে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান-স্বরূপ দামোদরকে এমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল যে তাঁর গভীর ক্ষত থেকে রক্তপাত দেখা গিয়েছিল।

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় উপরি-উক্ত যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে উড়িষ্যার মার্ত-বৌদ্ধ ও বিদ্যাধরের লোকেরা সমবেতভাবে ষড়যন্ত্র করে শুধু শ্রীচৈতন্যকে নয় তাঁর অনেক ভক্ত-পরিকরদেরও হত্যা করেছিল। অবশ্য কিভাবে কখন কোথায় চৈতন্যদেবকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কোথায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়েছিল তা ডঃ মুখোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে বলেন নি। তিনি পাঠকদের উদ্বেগে রেখে এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে সকল ব্যাপার

বিশদভাবে জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যুক্তিগুলি যে সারবত্তাবিহীন সেকথা বলাই বাহুল্য। যুক্তিগুলির সারবত্তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়।

১। দীনেশচন্দ্র সেন-কথিত শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের পরে ৫০ বৎসর বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় কীর্তন বন্ধ ছিল এ ঘটনা তথ্য-সমর্থিত নয়। গৌড়বঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত আচার্য জীবিত ছিলেন। তাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেছেন, হরিনাম সঙ্কীর্তনও করেছেন। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস অনুসারে মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই বৎসর পরে খড়দহে নিজগৃহে কীর্তন নর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভু অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। উড়িষ্যায় যদি বৈষ্ণব নিধন হয় তাহলে তবে বাঙ্গালায় কীর্তন বন্ধ হবে কেন? গৌড়-বাঙ্গালা তখন মুসলমান সুলতানদের শাসনভুক্ত। উড়িষ্যার ভীতি এখানে থাকার কথা নয়। তাছাড়া দীনেশচন্দ্র জয়ানন্দবর্ণিত মহাপ্রভুর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই স্বীকার করেছেন। ৫০ বৎসর ধরে কীর্তন বন্ধ থাকলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে খেতরির মহোৎসবে এত বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণবসমাগম ও সাড়ম্বরে কীর্তন গানের অনুষ্ঠান সম্ভব হোত না।

২। উড়িষ্যার শার্তরা মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন, এ নিছক অনুমান। ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।

৩-৪। প্রতাপরুদ্রের বৌদ্ধবিদ্বেষের সঙ্গে প্রেমধর্মের প্রবক্তা দুঃখী পণ্ডিতের ভ্রাতা গৌরচন্দ্রের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্যের উপরে রুষ্ট হয়ে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে কেন? বৌদ্ধরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে প্রতাপরুদ্রের ক্রোধ বর্ষিত হওয়ার কথা। এ ব্যাপারটিও অনুমানমাত্র। অবশ্য জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের স্বার্থহানি হওয়া সম্ভবপর। সেইজন্য তাঁরা রুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এও নিছক অনুমান। প্রতাপরুদ্রদেব জীবিত থাকতে অনুচরবেষ্টিত চৈতন্যদেবকে হত্যা করার কাহিনী নিছক আজগুবি কল্পনা।

৫-৬। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মহতাব উড়িষ্যার সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও বিজয়নগর রাজ্যের কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে প্রতাপরুদ্রের পরাজয়ের কারণ হিসাবে রাজার চৈতন্যানুরক্তি ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের ফল বলে ঘোষণা করলেও এ অভিমত যথার্থ নয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী—আত্মভাবরসে নিমগ্ন। তিনি বিষয়ী প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করতেই অস্বীকার করেছিলেন। তাঁরপক্ষে রাজকার্যে পরামর্শ দেওয়া অসম্ভব। রামানন্দের ভ্রাতা গোপী পট্টনায়ক রাজার দুই লক্ষ কাহন কড়ি আত্মসাৎ করায় রাজা তাঁর প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। প্রভুর ভক্তগণ গোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুকে বারংবার প্রার্থনা করায় মহাপ্রভু বিরক্ত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই করেন নি। বরঞ্চ বিষয়ীদের উপদ্রব থেকে মুক্তির জন্য তিনি পুরী ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। শেষে রাজগুরু কাশী মিশ্র আর কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে না বলে আশ্বাস দিলে তিনি পুরীতে থাকেন (চৈ. চ. অন্ত্য. ১ পরি.)।

প্রতাপরুদ্রের পরাজয়ের জন্য শ্রীচৈতন্য কোনপ্রকারেই দায়ী ছিলেন না। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে অসম্মানজনক সর্তে সন্ধি, বীর সাহসী যুবকপুত্র বীরভদ্রের মৃত্যু

অকালমৃত্যু—অপর দুই পুত্রের অকর্মণ্যতা প্রতাপরুদ্রকে তমোৎসাহ ও ধর্মের দিকে মনোযোগী করে তুলেছিল। তিনি চৈতন্যসংস্পর্শে আসার আগে থেকেই গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের মৃত্যুর পর (১৫৩৩) হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সচেষ্ট হন নি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিতান্ত হতাশাস হয়েই প্রতাপরুদ্রদেব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন এবং ধর্মের দিকে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। উড়িষ্যার পতনের জন্য দায়ী প্রতাপরুদ্রের বংশধরদের দুর্বলতা ও রাজনীতার হীন ষড়যন্ত্র। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর অল্প পরেই গোদাবরী কৃষ্ণার অববাহিকা অঞ্চল উড়িষ্যার হাতছাড়া হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের ৮।৯ বৎসর পরে উড়িষ্যা মুসলমানশক্তি-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সুতরাং উড়িষ্যার পতনের জন্য সর্বত্যাগী দিব্যভাবোন্মাদ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে কোন প্রকারেই দায়ী করা চলে না। ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন, "R. D. Banerjee has done great injustice to the memory of the great saint by holding him responsible for military decline of Orissa in the reign of Prataprudra" (Gajapati Kings of Orissa—pp. 91-92).

গোবিন্দ বিদ্যাধর কখনও অচেতন কখনও অর্ধচেতন দিব্যোন্মাদ সন্ন্যাসীকে হত্যা করে সিংহাসন লাভের পন্থা নির্ধারণ করলেন কি করে তা বুদ্ধির অগম্য। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও প্রতাপরুদ্র জীবিত ছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর অপদার্থ পুত্রদের আসলে উড়িষ্যার সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়েছিল। কবিকর্ণপুরের বক্তব্য যদি বিশ্বাস্য হয় তবে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিয়োগব্যথা লাঘব করতে চৈতন্যলীলা নাট্যাভিনয় দর্শন করেছিলেন।

অদ্বৈতের তর্জায় মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল, একথা কি গ্রাহ্য হতে পারে? অদ্বৈতপ্রেরিত হেঁয়ালিতে শ্রীচৈতন্যের কাককাল শেষ হওয়ার অথবা নিত্যানন্দ প্রচারিত চৈতন্যধর্মের ত্রুটির ইঙ্গিত ছিল বলে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। নবদ্বীপ-শান্তিপুরে অবস্থান করে উড়িষ্যার গোবিন্দবিদ্যাধর পুরীর স্মার্ত বৌদ্ধ প্রভৃতিদের চৈতন্যহত্যার সম্মিলিত চক্রান্ত সম্পর্কে পুরীতে অবস্থিত মহাপ্রভুকে সাবধান করা কিভাবে সম্ভব? ষড়যন্ত্রের কথা নবদ্বীপ-শান্তিপুরে যদি পৌঁছে থাকে তবে প্রতাপরুদ্রদেব ও উড়িষ্যার স্থিত চৈতন্যভক্তদের পক্ষে সর্বাগ্রে অবগত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

৭। বৈষ্ণবচরণ দাসের 'চকড়া' কোন্ সময়ে লেখা আমাদের জানা নেই। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার প্রমুখ বিভিন্ন গ্রন্থকার প্রদত্ত উৎকলীয় চৈতন্যভক্তদের তালিকায় বৈষ্ণবচরণ দাসের নাম নেই। 'চৈতন্য-চকড়ার' যদি কোন প্রামাণিকতা থাকেও তাহলেও বৈষ্ণবচরণের বক্তব্য গ্রাহ্য হতে পারে না। মহাপ্রভুকে হত্যা করার পরই প্রবল প্রতাপান্বিত উড়িষ্যাধিপতি তাঁর মৃতদেহ সমাহিত করার আদেশ দিয়েই দারুণ ত্রাসে পুরী ছেড়ে বিদ্যানগরী বা কটকে পলায়ন করলেন, তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীচৈতন্যের হত্যাকারী বা সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের অনুসন্ধান না করে—এ কাহিনী কেমন করে বিশ্বাস্য হতে পারে? প্রসিদ্ধ উড়িয়া ভক্তরা শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক তিরোভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন।

৮। দীনেশচন্দ্রের বক্তব্যানুসারে বৈকাল ৪টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখে যদি মহাপ্রভুর মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে, তার দ্বারা হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হয় কিসে? বিশেষতঃ দীনেশচন্দ্র হত্যার কথা বলেন নি। লোচন দাস বলেছেন যে আষাঢ়ের সপ্তমীতে রবিবারে বেলা তিনটার সময় মহাপ্রভু গুণ্ডাবাড়ীতে জগন্নাথে লীন হয়েছিলেন—মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে-সময় মন্দিরে একজন পাণ্ডাব্রাহ্মণ মাত্র ছিলেন। তিনি 'কি কি বলে' ছুটে এলেন। বাইরে আছেন ভক্তগণ, ব্রাহ্মণ কপাট খুলে বাইরে এলেন। ভক্তগণ তাঁকে দেখে বললেন, 'কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা', পড়িছা বললেন, প্রভু জগন্নাথে তিনি বিলীন হয়ে গেছেন। সাত ঘণ্টা দরজা বন্ধ রাখার কথাও লোচন বলেন নি। রথযাত্রার ছ'দিন পরে, গৌড় থেকে আগত ভক্তগণ হয়েছেন, মহাপ্রভুর স্থায়ী সঙ্গী ও ওড়িয়া ভক্তগণ মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে সাত ঘণ্টা দরজা বন্ধ রাখা কি সম্ভব? রাজা ত তখন পুরীতে ছিলেন। তিনি কি করছিলেন?

৯। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে শচীদেবীর মৃত্যু হয়েছিল, পূর্বে নয়। জয়ানন্দ লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করে শচীদেবী মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' অনুসারে মহাপ্রভুর তিরোধানবার্তা অরূপ দামোদর নবদ্বীপে শচীদেবী ও শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখে শচীদেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে মহাপ্রভুর জীবন সম্পর্কে বীতরাগ হওয়াটা নিতান্তই অবাস্তব। সবার অলক্ষ্যে গোপীনাথে পলায়ন আরও অবাস্তব।

১০। টোটা গোপীনাথে গিয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ছোলা হুগলী গ্রামে মহাপ্রভুর আত্মগোপনের কাহিনী শুধু অবাস্তব নয়,—চৈতন্য চরিত্রের বিরোধী এবং শ্রীচৈতন্যের অসাধারণ চরিত্রমহিমার পক্ষে অসম্মানজনক। যিনি জগাই, মাধাই, নাগোজী দস্যু, পাঠান বিজলী খাঁর মত ব্যক্তিদের নির্ভয়ে সম্মুখীন হয়ে তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, যিনি নির্ভীকভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান শাসকের শাসন উপেক্ষা করে কাজীকে শাসন করেছিলেন, যিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি কখনও, যিনি তৃণের মত হীন অথচ তরুর মত সহিষ্ণু, তাঁর পক্ষে কিছু সংখ্যক লোকের ষড়যন্ত্রের অথবা প্রাণনাশের ভয়ে ছদ্মবেশে পলায়ন করে প্রাণ-বাঁচানোর গল্পকাহিনী কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য নয়—বিশেষতঃ যখন তিনি কুরুক্ষেত্রে প্রায় বাহ্যজ্ঞানহারা।

১১। রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দ পত্র মারফতে মহাপ্রভুকে ছদ্মবেশী উৎকলীয় ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায় না। যদিই বা রামানন্দ কয়েকজন ভক্তবেশী চরের সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে থাকেন, তাহলে তদ্বারা কি গুপ্তহত্যা প্রমাণিত হয়?

১২। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তাঁর অনেক ভক্তের স্বশরীরে অন্তর্ধানের ব্যাপারটি যেমন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না, তেমনি ভক্তদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল, এমন অর্থ করাই বা যায় কিভাবে? কোন কোন ভক্ত প্রভুর বিরহ সহ্য করতে না পেরে

হয়ত অল্পকালের মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে শ্রীনিবাস আচার্য মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পরেই নীলাচলে এসে গদাধর, বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, শিখি মাইতি, মাধবী দাসী, বাণীনাথ পট্টনায়ক, গোবিন্দ, শংকর, গোপীনাথ আচার্য প্রমুখ চৈতন্যভক্ত পরিকরগণের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে খেতরির মহোৎসবের আগে নরোত্তম দাস ঠাকুর নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর পরিকরদের অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয়গণ
সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন। (ভ. র. ৮:২৬১)

ভক্তিরত্নাকরের মতে গোপীনাথ আচার্য, শিখি মাহাতি, মামু গোস্বামী, গোপাল গুরু, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি চৈতন্যপরিকরবৃন্দের সঙ্গে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল। নরোত্তম বিলাসের মতে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল গোপীনাথ আচার্য, শিখি মাহাতি, বাণীনাথ পট্টনায়ক, কানাঞি খুঁটিয়া, মামু গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে (ন. বি. ৪ বি.)। খেতরির মহোৎসবে বৈষ্ণবভক্তদের যেভাবে সমাবেশ হয়েছিল, তাতে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব জনন হয়েছিল একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। খেতরির উৎসবেও উৎকল থেকে ভক্তগণ এসেছিলেন,—

রসিক মুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি।
উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইলা খেতরি। (প্রেম বি. ১৯ বি.)

সুতরাং চৈতন্যভক্তদের হত্যার কাহিনীটিকে অলীক বললে বোধহয় ভুল হয় না।

১৩। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ উল্লিখিত স্বরূপ দামোদরের হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হওয়ার গল্প সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন। কারণ লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' অনুসারে স্বরূপ মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে প্রেরণ করেছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী-রচিত 'বৈষ্ণবাচার দর্পণ"-গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে (পৃঃ ৭৭)। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তা-চরিতের ৪র্থ শ্লোক থেকে ডঃ সুশীলকুমার দে অনুমান করেন যে স্বরূপ জীবনের শেষদিনগুলি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছেন।

"হৃদয় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল" বা "বুক ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল"—বাক্যটি বাঙ্গালা ভাষার একটি বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা। আক্ষরিক অর্থে কথাটি কেউ গ্রহণ করে না। ছুরিকাঘাতে বক্ষস্থলে গহ্বর সৃষ্টি করাও এই কথার বোঝায় না। গভীর দুঃখ শোক পাওয়া বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। স্বরূপ দামোদরের বুকে ছুরি মেরে বুক কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এরকম অর্থ নিতান্তই হাস্যকর। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে স্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য পাওয়া যায় না।

সুতরাং ডঃ মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও উৎকলস্থিত তাঁর ভক্তদের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের গল্প প্রতিষ্ঠিত হয় না। জয়ানন্দের মতে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে রাত্রিকালে চৌটায় মহাপ্রভুর মায়াশরীর পড়ে রইলো। জয়ানন্দ ও লোচনের হিসাবে মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে অর্থাৎ রথযাত্রার চারদিন পরে মহাপ্রভুর ইহধাম থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন। রথযাত্রা থেকে পুনর্যাত্রা পর্যন্ত

৮।১০ দিন পুরীতে তীর্থযাত্রীর ভিড় থাকেই। বহু তীর্থযাত্রীর ভিড়ের সময়ে সমাগত গৌড়ীয় ভক্ত ও উৎকলীয় ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্বরূপ দামোদর, গোবিন্দ ও গদাধরের সতর্ক প্রহরাধীন শ্রীচৈতন্যকে গুণ্ডিচা গৃহে হত্যা করে দীর্ঘকাল আটকে রেখে সমাধিস্থ করাও অসঙ্গত বিবেচিত হয়। জয়ানন্দের বক্তব্যকেই এ স্থলে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভু রথের দিন রথাগ্রে নৃত্য করতে করতে পথের ইটকে চরণে আঘাত পেয়েছিলেন। বহুলোকের সমাগমে এবং অশ্ব হস্তী প্রভৃতির মলমূত্রাদিতে এই সময়ে পুরীর পথের ধূলি বিষাক্ত হয়েছিল মনে করা অযৌক্তিক নয়। সেই বিষাক্ত ধূলিলিপ্ত ক্ষত যদি সেপ্টিক হয় বা বসন্তাকারে পরিণত হয় তাতে অসম্ভাব্যতা কি আছে? সুতরাং প্রবল জ্বর-রোগের আক্রমণের ফলে মহাপ্রভুর মায়া-শরীর যদি চৌটার পঙ্কে থাকে, তবে তাতে অবিশ্বাস করার হেতু কি? জয়ানন্দ চৈতন্যভক্ত তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলেই মনে করেছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়রাজ্যে লীলা গমনকালে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি রায়ের গৃহে উপনীত হয়ে শিশুর নামকরণ করেছিলেন 'জয়ানন্দ'। সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বৎসরে (১৫১৪) মহাপ্রভু গৌড়ে এসেছিলেন, তখন জয়ানন্দ শিশু। মহাপ্রভু তাঁর নতুন নামকরণ করেছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর মহাপ্রয়াণকালে (১৫৩৩) জয়ানন্দের বয়স ১৯।২০ বৎসর। রথযাত্রার সময় পুরী যদি তিনি এসে থাকেন তাহলে তিনি স্বচক্ষে দেখে থাকতেও পারেন, আবার বাঙ্গলাদেশে বসেই অন্যের মুখে শুনে থাকতেও পারেন। জয়ানন্দের ভক্ত ব্যক্তি অনর্থক মিথ্যা বলে আরাধ্যের অগৌরব করবেন কেন? এখন প্রশ্ন জাগে পাঞ্চভৌতিক দেহের ত লয় আছে, সে দেহ গেল কোথায়? জগন্নাথের বিগ্রহে অথবা গোপীনাথের বিগ্রহে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত অলৌকিক ঘটনা আজকের মানুষ বিশ্বাস করে না। সর্বদা ভক্ত-পরিবেষ্টিত সতর্ক প্রহরায় অবস্থিত শ্রীচৈতন্যের দেহ সাগর-জলে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। জগন্নাথের মন্দিরে, চৌটাগোপীনাথের মন্দিরে অথবা গুণ্ডাবাড়ীতে—যেখানেই হোক দ্বার বন্ধ করে সাধারণের অগোচরে তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়েছিল এই সত্যই গ্রাহ্য হতে পারে। মহাপ্রভুর ভাগবত্তা প্রচার করার জন্যই দেববিগ্রহে বিলীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বৈষ্ণব ভক্ত মহাজন, চৈতন্য ভক্তদের শ্রীচৈতন্যের মত অলৌকিক প্রয়াণ বর্ণনা করা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারদের একটা রোগ বিশেষ। 'অদ্বৈত প্রকাশ' এবং 'গৌরগণোদ্দেশিকা'-গ্রন্থ অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে নবদ্বীপস্থিত স্বগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের দারুবিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। প্রেমবিলাসের মতে ভক্তগণসহ কীর্তন-নর্তনকালে নিত্যানন্দপ্রভু অকস্মাৎ অন্তর্হিত হন। 'নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার' অনুসারে অদ্বৈতাচার্য গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে গৌরাঙ্গগুণকীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ হঠাৎ খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করে বিগ্রহ আলিঙ্গন করে বিলীন হয়ে যান, তৎপরে পুনরায় দেহ গ্রহণ করে দুই পত্নী জাহ্নবা ও বসুধাকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি একচাকা গ্রামে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে মিশে গিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ও রাজবল্লভ সোম্যাজীকৃত মুরলীবিলাস গ্রন্থে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে কাম্যবনে গোপীনাথের বিগ্রহে লীন

হয়েছিলেন, 'অদ্বৈতপ্রকাশে' অদ্বৈত আচার্য গৌরনাম কীর্তন করতে করতে মদনগোপালের বিগ্রহে মিশে গিয়েছিলেন। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে গদাধর গোস্বামী গৌরাঙ্গবিরহে ক্ষীণতনু হয়ে অকস্মাৎ একদিন অন্তর্হিত হয়েছিলেন। উক্ত গ্রন্থে গদাধর দাস বিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রকটের পরে কার্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অদৃশ্য হয়েছিলেন। অনুরূপভাবে নরহরি সরকারও একদিন সকলের দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিলেন (ভ. র.)। নরোত্তম দাস ঠাকুর গঙ্গাস্নান করার পরে গঙ্গাতীরে তাঁর আদেশে তাঁর দুই অনুচর রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণ তাঁর অঙ্গমার্জনা করার সময়ে গঙ্গার জলে ডুব হয়ে মিশে গিয়েছিলেন (নরোত্তম বিলাস—১০ অঃ)।

এত যখন বিলীন হওয়ার ছড়াছড়ি তখন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই বা জগন্নাথ অথবা গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হবেন না কেন? সুতরাং মহাপ্রভুর নরদেহের উল্লেখ কোন গ্রন্থে না থাকার জন্য তাঁকে গুমখুন করা হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত কি গ্রহণীয় হতে পারে?

●

।। তোমার নির্দেশ ।।

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

এবার কি তবে
মাটির প্রদীপগুলো জ্বেলে দিতে হবে
এক এক ক'রে
　শেষের প্রহরে,
　　হে ভাগ্য-বিধাতা।
কাঁকরে-পাথরে গাঁথা
　ঐ প্রাসাদের—
ভিতে-ভিতে জমানো আঁধার,
　আজও বুঝি তার
বজ্রৌটের বুক চিরে চিরে,
　অশথ-বটেরা খোঁজে
　　হারানো সে জীবন-মাটিরে,
　পায়না সন্ধান,—
　　শুধু ব্যর্থতার গ্লানি
　　নিয়ে ফিরে যায় অভিমানী।
ওখানে কি কাজ দিলে
　আমায় এবার,
মাটির প্রদীপ জ্বালাবার।

আমার আকাশে
তোমার নির্দেশ ভেসে আসে
　গোধূলী আলোয়:
　কালো রাত্রি তার
　খুলে দিয়ে যায়
পশ্চাতে দাঁড়ায়ে রয়,—
　কথা কয়,—
　কী কথা কী জানি।
কোন্ রাগ, কোন্ বা রাগিণী
　বেজে ওঠে সকরুণ সুরে,
　কাছে আর দূরে,
আমি তারে চিনি বা না চিনি
　শুধু চেয়ে দেখি,
তোমার নির্দেশ ব'য়ে সেও
　　এসেছে কি,
　ম্লান গোধূলীতে
　নিয়ে—সকল বিস্মৃত,
হে আমার নিঃশব্দ,—নির্ভয়।

●

প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শিবপ্রসঙ্গ

শ্রীত্রিপুরা বসু

প্রাগার্যকালের যে সমস্ত দেবতা পরবর্তী বৈদিক ধর্মে অবলীলাক্রমে স্থানলাভ করেছে তাদের মধ্যে 'শিব' বা 'মহেশ্বরের' প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার এবং তার উৎখননের ফলে যে ত্রিমুখবিশিষ্ট এক পুরুষ দেবতার মূর্তি অঙ্কিত শীলমোহর পাওয়া গেছে, সেটিই বোধ হয় এপর্যন্ত প্রাপ্ত এদেশীয় (মূর্তিটি যে পশুপতি শিবের তা স্যর জন মার্শাল তাঁর রিপোর্টে বলেছেন) শিব-সাধনার প্রাচীনতম নিদর্শন। সিন্ধু সভ্যতা যেহেতু খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের, সেই হিসাবে শিব ভারতবর্ষে হয়তো তার অনেক আগে থেকেই মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। মূর্তিটির বিবরণ হল, দেবতা এক পা অন্য পায়ের ওপর দিয়ে পদ্মাসনের ভঙ্গিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর দুহাতে বালা-জাতীয় অলংকার, গলায় হার। এঁর পুরুষাঙ্গটি ঊর্ধ্বমুখ। দুটি হাত বিস্তৃত অবস্থায় দুই হাঁটুর ওপর ন্যস্ত। তাঁর চারিদিকে দিক-নির্দেশক হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মহিষ দণ্ডায়মান। আসনের নীচে মৃগ বা মেষজাতীয় প্রাণী ছাড়াও ওপরে আছে কয়েকটি হরফ ও মানুষ। তাঁর মুখ তিনটি এবং মাথায় মহিষের একজোড়া শিংএর মুকুট। এই বিবরণ অনুযায়ী শিবকে 'মহাযোগী', 'পশুপতি' এবং 'ত্রিমুখ' রূপে দেখতে পাই।

বৈদিক রুদ্রদেবতা আদিশিবের প্রতিরূপে কল্পিত হন বলে অনেকের ধারণা। ঋগ্বেদে রুদ্রকে উদ্দেশ করে তিনটি সূক্ত আছে। এর ১০।৮৮।৮ সূক্তে বলা হয়েছে—

'স পিত্র্যাণ্যায়ুধানি বিদ্বানিন্দ্রেষিত আপ্যো অভ্যযুধ্যৎ।
ত্রিশীর্ষাণং সপ্তরশ্মিং জঘন্বাংস্ত্বষ্টুশ্চিচ্ছিপ্রিঃ সচতে গিরোগাঃ॥'

অর্থাৎ, 'আপ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়ে নিজ পিতার যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করলেন। সপ্তরশ্মি ত্রিশিরাকে বধ করলেন। ত্বষ্টার পুত্রের গাভীসকল অপহরণ করলেন।'*

১০।৮।৯ সূক্তে বলা হয়েছে—

'ভূরীদিন্দ্র উদিনক্ষন্তমোজাহবাভিনৎ সংপতির্মন্যমানম্।
ত্বাষ্ট্রস্য চিদ্বিশ্বরূপস্য গোনামাচক্রাণস্ত্রীণি শীর্ষা পরা বর্ক॥'

অর্থাৎ, 'শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপীতেজোবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিশীর্ণ করলেন। তিনি গাভীদের আহ্বান করতে করতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করলেন।'*

১০।৯৯।৬ সূক্তে বলা হয়েছে—

'স ইদ্ধানং তুবীরবং পতির্দন্যূষলক্ং ত্রিশীর্ষাণং দমনৎ।
অত ত্রিতো যোজস্য বৃধানো বিশ্বা বরাহমরো আয়সাহন্॥'

অর্থাৎ 'সেই প্রভু ইন্দ্র বহুলচিৎকারী দাস জাতীয়কে শাসন করেছেন, মস্তকত্রয়বিশিষ্ট হরিচক্ষু শত্রুকে দমন করেছেন। ত্রিত-এর তেজে তেজস্বী হয়ে লৌহের ন্যায় তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা বরাহকে বধ করেছে।'

এছাড়াও ১।৩৩।১২ সূক্তে বলা হয়েছে, ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করেন এবং শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ককে বিবিধ প্রকারে তাড়না করেন। অন্যত্র 'বৃষশিপ্র', 'বৃষানিন' ইত্যাদি শৃঙ্গযুক্ত মুকুটধারী 'দাস' বা 'দস্যুদের' কথাও বেদকর্তা বলেছেন। সুতরাং বেদে যে ত্রিশীর্ষ, ষট্‌চক্ষু এবং বৃষ বা মহিষের শৃঙ্গশোভিত আর্যশত্রুটির বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর শীলমোহরটির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আর্যজনগোষ্ঠীর নেতা ইন্দ্র 'দাস'-সম্প্রদায়ের নগরগুলি বিধ্বস্ত করেছিল। ঐ আক্রমণের ফলে ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপ বা তার অনুগামীরাও বিধ্বস্ত হয়ে থাকবেন। আবার বৈদিক রুদ্রের সঙ্গেও বিশ্বরূপ শিবের সাদৃশ্য মিলে যায়। এ ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত টানা আজো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে মহাভারতে শিবকে 'ত্রিশীর্ষ', 'ত্রিবক্ত্র', 'যোগাধ্যক্ষ', 'ঊর্ধলিঙ্গ', 'শার্দুল', 'নাগচর্মোত্তরচ্ছদ', 'পশুপতি' ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা ছিল মুখ্য। সৃষ্টি এবং উৎপাদনের সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক কল্পনা করে কৃষির দেবতা হিসাবেও শিবকে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদে যাকে ত্বষ্টার পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে 'শতপথ ব্রাহ্মণে' তিনি 'বৃত্র'। ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের সংঘাতকে কেন্দ্র করে লোককথারও অভাব নেই। এর মধ্যে একটি হল, দাসবংশীয় বৃত্র সপ্তনদের জল বাঁধ বেঁধে রেখেছিল। আর্যগোষ্ঠীর নায়ক ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আহত বৃত্র জলের মধ্যে আশ্রয় নেয়, পরে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু ঘটে। ইন্দ্র 'দাস'-সম্প্রদায়ের নগরী বিধ্বস্ত করে নদীর বাঁধ ভেঙে দেয়। প্রত্ন-অভিযানেও প্রমাণ পাওয়া যায়, মহেঞ্জোদাড়ো নগরীও জলপ্লাবনে ধ্বংস হয়। এই দুই শক্তি হয়তো জলরোধকারীশক্তি এবং জলরাশির মুক্তিদাতারূপে রূপকের মাধ্যমেই সেকালে বিবৃত হয়ে থাকবেন। এই 'বৃত্র' পরবর্তীকালে বৈদিক সাহিত্যে ত্রিশীর্ষমূর্তির উপাসকরূপে বিকৃত হন। পরবর্তীকালে আর্যদের মধ্যে ঐ ত্রিশীর্ষ যথেষ্ট মর্যাদা পেলেন কিভাবে সেও এক রহস্য। বিধ্বস্ত দাসপুরীর নারীরা ইন্দ্রের হাতে বন্দী হয়। এরা ইন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও দেবকল্পনা নিয়ে। ধীরে ধীরে এদের সন্তান-সন্ততিরা মাতৃকুলের পূজাবিধি অনুসরণ করতে থাকে। এভাবে ইন্দ্রশত্রু ত্রিশীর্ষ শিব এলো বৈদিক সমাজে আরাধ্য দেবতারূপে। শিবের পশুপ্রতীক হিসাবে মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও চানহুদাড়োতে ব্যবহৃত 'ষণ্ড' বা 'ষাঁড়'ও সেইসঙ্গে সম্মান পেতে থাকে। এসম্পর্কে আলোচক বলেন, "ত্বষ্টা তথা বৃত্র তথা শিবের শত্রু ইন্দ্র এই বৃষ ও মহিষকুলকে ভোজন করে নিঃশেষ করতে চাইলেও পরিণামে তিনি নিজেই গ্রস্ত হয়ে গেছেন বৃষপতি মহেন্দ্রের দ্বারা। পরাভূত প্রাগার্যদেবতা অপহৃতা সিন্ধুজনপদবালাদের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে কালক্রমে প্রধানতম হিন্দুদেবতা শিবমহেশ্বর (>মহিষ-ঈশ্বর ?) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বৈদিক রুদ্রদেবতা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।" এ ব্যাপারে পণ্ডিতজন আরো বলেন, "সংস্কৃতে 'রুদ্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তবর্ণ, এবং দ্রাবিড় ভাষাতেও শিব-শব্দের মানে হচ্ছে রক্তবর্ণ। এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে শর্ব ও ভব এই দেবতাদ্বয় প্রাচ্যদেশীয় অসুরগণ ও বাহীকগণ কর্তৃক পূজিত হন। কিন্তু বাজসনেয়ী সংহিতায় এ দুটি দেবতা অশনি, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, উগ্রদেব প্রভৃতির সঙ্গে আর্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়ে অগ্নি দেবতার সঙ্গে

সমীকৃত হয়েছেন। অগ্নিদেবতার সঙ্গে সমীকরণের ফলে শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে আমরা হর, মৃড, শর্ব, ভব, মহাদেব, উগ্র, পশুপতি, শঙ্কর, ঈশান প্রভৃতি দেবতাকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে দেখি।"

রাঢ়ভূমির অতিখ্যাত লোকদেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবের সম্পর্ক আছে। ধর্মপুরাণ অনুযায়ী শিব ধর্মঠাকুরের সন্তান। উইলিয়াম ওয়ার্ড এ সম্পর্কে বলেছেন, "Another form of Shiva. A black stone of any shape becomes the representative of this God". মনে হয় রাঢ় অঞ্চলে শৈব ও শাক্তধর্মের একদা ব্যাপক প্রসার, বৌদ্ধ মতবাদকে কোণঠাসা করে রাখার উদ্দেশ্য ইত্যাদি কারণে ধর্মদেবতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। শিবের গাজন উৎসবের সঙ্গে নীলের গাজনের নানা ব্যাপারেই সাদৃশ্য ও সম্পর্ক লক্ষ্য করার মতো। শিবের পূজাচার, প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্য সারা ভারতেই প্রচলিত। দক্ষিণভারতে শিবপূজার এবং প্রাচীন ধারা প্রবাহিত।

কৃষিদেবতা ক্ষেত্রপাল শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'কুলার্ণবতন্ত্র', 'মেরুতন্ত্র', ইত্যাদিতে ক্ষেত্রপাল-প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ইনি ত্রিশূল, ডমরু ও খট্টাঙ্গধারী, কোন কোন ক্ষেত্রে ভয়ংকর দৃশ্য, বিকটদণ্ড, গোলাকার নেত্র-বিশিষ্ট। 'তন্ত্রসার' অনুযায়ী ইনি মাংসভক্ষক। কৃষ্ণশাস্ত্রী তাঁর 'South Indian images of Gods and Goddesses' রচনায় বলেছেন, দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন শিবালয়ে বিকটদর্শন ক্ষেত্রপালের মূর্তি দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর অভিমত, বাংলার নানাস্থানে এর পূজা ব্রতরূপে পালন করা হয়। ক্ষেত্র বা ভূমির উর্বরতা ও কল্যাণকামনায় এর প্রতি আদিম মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ছিল। এঁর ধ্যানমন্ত্রটি নিম্নরূপ :—

'মূর্ধ্নিপিঙ্গলকেশং ঊর্ধ্বত্রিলোচনং সর্পাভরণটাকলাপম্।
দিগ্‌বাসসং ভুজঙ্গকৃষণমুগ্রদংষ্ট্রকং ক্ষেত্রেশং শম্ভুতনয়ং ভজে।'

বাংলাদেশে লৌকিক শৈবধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে গ্রন্থের পণ্ডিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক দেবসমাজের মধ্যেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিকসাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাঁহার এক শান্ত সমাহিত শিবমূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত সীলমোহরগুলির মধ্যে যোগাসনারূঢ় এক দেবমূর্তির পরিচয় হইতে মনে হয় যে, যোগীন্দ্র শিবের পরিকল্পনা প্রাগার্য (Pre-Aryan) সমাজ হইতে উদ্ভূত; কালক্রমে তাহাও আসিয়া পৌরাণিক পরিকল্পনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। এইভাবে ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সেইজন্য একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ—আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র (বাং মঃ কাঃ ইঃ, পৃঃ ১৭৭-১৭৮)।" শিব বা মহেশ্বরকে কেন্দ্র করে ভারতে যে

প্রাগৈতিহাসিক লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রচলিত ছিল, সেগুলিই কালচক্রের আবর্তনে পূর্ব-ভারতের নানা এলাকায় গাজন উৎসব নামে পরিচিত হয়। সেকথায় পরে আসছি।

এ'দেশের প্রাচীন মুদ্রাতে শিবের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। প্রাচীন ঔদুম্বররাজের মুদ্রায় শিবের চিত্র অঙ্কিত হয়। গবেষক এ-ব্যাপারে জানিয়েছেন, "Interest lies also in the fact that the coin reveals that the administrative authority of the city—state was vested in the goddess of the town. This kind of administration, though it appears strange, is not unusual in the history of India. State administration in the name of gods and goddesses was well in vogue in the various parts of the country. The tribal republics of the Punjab—The Audumbara. Kuninda and Yaudheya—who were almost contemporary to this city—State, had almost similar administration". এইসঙ্গে সেইসব রাজবংশ বিভিন্ন দেবদেবীর নাম ও প্রতীককে মুদ্রা বের করে। এরমধ্যে মহাদেব (শিব) এবং ছত্রেশ্বরের (শিব) নাম করা যায়। এই রীতি মধ্যযুগ পর্যন্তই প্রায় অব্যাহত ছিল। ঔদুম্বরের তাম্রমুদ্রার বিবরণ এইরকম : রেলিংএর গায়ে গাছ, ডানদিকে হস্তী। খরোষ্ঠীতে লেখা 'মহাদেবস রণ রুদ্রদাসস।' মুদ্রার অপরদিকে চূড়াযুক্ত শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মীতে পূর্বোক্ত লিপি। গৌড়রাজ শশাঙ্কের একটি প্রাপ্তস্বর্ণমুদ্রার বিবরণ : ষাঁড়ের উপর উপবিষ্ট শিব। লিপি 'শ্রী শ।' অপরদিকে পদ্মের দিকে তাকিয়ে এক দেবী। একটি হস্তী এবং লিপি 'শ্রী শশাঙ্ক'। এছাড়াও, মধ্যযুগীয় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা সদাশিবের স্বর্ণমুদ্রায় উপবিষ্ট হরগৌরীকে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ গুপ্তাধিকার কালের একটি প্রস্তরখোদিত চিত্রের (প্রাপ্তিস্থান : বিহারের পাটনা জেলার চণ্ডীনৌ গ্রাম) বিষয় এসে পড়ে। এতে কিরাতার্জুনীয়ের চিত্রটি হল, বামদিকে অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিরাতরূপী মহাদেবের চরণবন্দনা করছেন, এবং দক্ষিণদিকে কিরাতরূপী মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে নিজের রূপ প্রদর্শন করাচ্ছেন, অর্জুন কৈলাসপর্বতের শৃঙ্গে উপবিষ্ট হরপার্বতীকে দর্শন করছেন। যাই হোক, শিব ছাড়াও, অনেক ভারতীয় মুদ্রায় ষাঁড়ের চিত্র দেখা যায়। এদের মধ্যে মগধ, কৌশাম্বী, ঔদুম্বরিক, পুষ্কলাবতী (স্বর্ণ), কৌশাম্বীরাজ নর, অযোধ্যারাজ বিশাখদেব, হরিদত্ত, কুমুদসেন, সত্যমিত্র, শিবপালিত, মারাঠী সদাকন কলালয় (সীসা), সেবক রাজবংশ, জননেতা মিহিরকুল, রাজা অমৃতপাল ইত্যাদি মুদ্রা নাম করা যায়।

কাশ্মীরের প্রাচীন শিবসাধনার ইতিহাসে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে শিব ও শক্তি। এখানকার 'ত্রিকতত্ত্বদর্শনের' তিনটি বিভাগ হল 'আগম', 'স্পন্দ' ও 'প্রত্যভিজ্ঞা' এ তিনখানি শাস্ত্র। আগমশাস্ত্রের মূলকথা শিব। 'শিবসূত্র' কাশ্মীরের ঐ ত্রিকতন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত ক্ষেমরাজ রচিত এই 'শিবসূত্র' আবিষ্কার করেন পণ্ডিত বসুগুপ্ত। শোনা যায়, শিব স্বয়ং নাকি বসুগুপ্তের অন্তরে আগমতন্ত্রের প্রেরণা সঞ্চার করেন। বসুগুপ্ত নবম শতকে কাশ্মীররাজ অবন্তী বর্মণের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর শিবসূত্রে 'চরমতত্ত্বপরামর্শিৎ', 'বিশ্বসৃষ্টি',

'বন্ধন' এবং 'মুক্তি' এই চারটি পরিচ্ছেদে তত্ত্বআলোচিত হয়েছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এসম্পর্কে বলেছেন, "চরমতত্ত্বশিব 'স্বভাব' নামে পরিচিত এবং শিবশক্তির নাম 'বিমর্শ'—যার আর এক নাম 'কর্তৃত্বশক্তি'। এই শক্তি আসলে চিতিরূপিনী পরাশক্তি বা পরাবাক্। এই পরাশক্তি বা পরাবাক্ থেকে বিচিত্ররূপে বিশ্ববিকাশ সম্ভব হয়েছিল। 'চিৎ' অর্থে শিব এবং 'চিতি' অর্থে মহাশক্তি। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ারূপিনী এই মহাশক্তি। এই মহাশক্তি বা চিতিশক্তি থেকেই বিচিত্র তত্ত্বের প্রকাশ। তত্ত্ব—যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সদাশিবতত্ত্ব বা সদাখ্যতত্ত্ব, ঈশ্বর বা ঐশ্বরতত্ত্ব, সদ্‌বিদ্যা বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি। তাছাড়া শিবস্বরূপের বিকৃতিরূপে আছে মায়াতত্ত্ব ও পঞ্চকঞ্চুক প্রভৃতি (বিশ্ববাণী, শারদীয়া ১৩৮৭)।"

বিভিন্ন রাজবংশের আমলে এদেশে শিবের বিভিন্ন ধরণের প্রস্তরমূর্তিও নির্মিত হয়েছে সংখ্যাতীতভাবে। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এসমস্ত জাতীয় মূল্যবান সম্পদ রক্ষিত হয়ে আছে। বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরেও আছে শিবের প্রস্তরমূর্তি, শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট ইত্যাদি। শিব-সাধনার অন্যতম প্রাচীন দৃষ্টান্ত হিসাবে এগুলির গুরুত্ব কম নয় আদৌ।

দক্ষিণভারতে, কন্যাকুমারী থেকে কিছুদূরে যে 'শুচীন্দ্রম্' মন্দির আছে, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে পূজিত। কিংবদন্তী এরূপ যে অহল্যার সতীত্বনাশ করে অভিশপ্ত ইন্দ্র কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলে মহাদেব তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং প্রতিটি রাত্রিতে ইন্দ্র মহাদেবের পূজা করবেন, এই স্বীকৃতি আদায় করে মহাদেব ইন্দ্রকে শাপমুক্ত করেন। ইন্দ্র এখানে পবিত্র হন বলে এই প্রাচীন শিবালয় 'শুচীন্দ্রম্' নামেই খ্যাত। এছাড়াও চিদাম্বরমের 'মহাশিব' মন্দির ও স্বর্ণময় শিবলিঙ্গের কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

শিব বা শৈবধর্মকে অবলম্বন করে মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা 'শিবমঙ্গল' বা 'শিবায়ন' কাব্যচর্চার মাধ্যমে পুষ্ট হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা হয়, ১৬শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শিবসম্পর্কিত নানা ধরণের গীত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে মিথিলা অঞ্চলেও যে শিবসম্পর্কিত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তা জানা যায় মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রচিত পদ থেকে। বাংলাদেশে শিবকে বাংলারই একজন সহজ সরল মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে বাঙালী গার্হস্থ্যজীবনের রসে রঞ্জিত করেই রচিত হয় শিবমঙ্গল কাব্য। এতে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় উপাদানই মিশ্রিত হয়।

১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত খলিয়া রসপুরের কবি রামকৃষ্ণ রায়ই সম্ভবতঃ বাংলার প্রথম শিবায়ন কাব্য রচনা করেন। 'কাশীখণ্ড', 'হরিবংশ', 'কালিকাপুরাণ', 'বৃহন্নারদীয়', মহাভারতের 'শান্তিপর্ব', 'স্কন্দপুরাণ' ইত্যাদি থেকে শিবপ্রসঙ্গ সংগ্রহ করে তাঁর কাব্যে শিবচরিত্র অঙ্কন করেন। এঁর কাব্য মোট ২৬টি পালায় বিভক্ত। এতে শিবের জন্ম থেকে বাণরাজার উপাখ্যান পর্যন্ত বিষয়গুলি বর্ণিত।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কবি শঙ্কর কবিচন্দ্র রচনা করেন শিব-মঙ্গল কাব্য। মল্লরাজ বীরসিংহের আমলে আনুমানিক ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এ কাব্য রচিত হয়।

১৮শ শতকের প্রথমভাগে মেদিনীপুর জেলার (তাৎকালিক ঘরদা পরগণা) ঘাটাল মহকুমার বহুপুর গ্রামের কবি মেদিনীপুরের নিকটবর্তী কর্ণগড়রাজ যশোবন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের কালে রচনা করেন সার্থক শিবায়ন কাব্য। বাংলাভাষায় এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় শিব-মঙ্গল কাব্য। এখানে শিব-পার্বতীর গৃহস্থালীর বর্ণনায় একটি দরিদ্রবাঙালী পরিবারের সার্থক চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

১৮শ শতাব্দীর প্রথমদিকে দ্বিজ কালিদাস রচনা করেন 'কালিকা বিলাস'-নামক শিবমঙ্গল কাব্য। দ্বিজ মণিরাম নামক একজন কবি ১৮শ শতাব্দীতে রচনা করেন 'বৈদ্যনাথ মঙ্গল'-নামক একখানি শিব-মঙ্গল কাব্য। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীহট্টজেলার মানুষ ছিলেন। দ্বিজ লক্ষ্মণদেবের 'শিবের গীত' এই সাহিত্যধারায় অপর সংযোজন। দ্বিজ রামচন্দ্রের 'হরপার্বতীমঙ্গল' ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'হরগৌরী বিলাস', 'হরিহরমঙ্গল', 'মহেশমঙ্গল' ইত্যাদির পুঁথির নাম পাওয়া যায়। 'মৃগলুব্ধ' কাহিনীর শিবরচিতকথার প্রসঙ্গও দৃষ্ট হয় নানাক্ষেত্রে। তবে এইসব কাব্যগুলিতে শিবের কৃষকচরিত্রটিই অনেকাংশে প্রকটিত।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্ম কোন একসময় মিশ্রিত হয়। ভাঙ ও সিদ্ধিখোর, পরনে বাঘের চামড়া, হাতে ত্রিশূল ও ডমরু ও মাথায় জটাবিশিষ্ট ভোলানাথকে কেন্দ্র করে তখন এদেশে শুরু হয় আরো কিছু অভিনব উৎসব। পুরাতাত্ত্বিকরা 'চড়ক'-নামক শৈব উৎসবটিকে বৌদ্ধপর্ব বলে নির্দেশ করে থাকেন। অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'বাঙালীর পূজাপার্বন' (১৩৭৬) গ্রন্থটির সূত্রে জানা যায়, সেকালের কলকাতার নানাস্থলে এই জাতীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের কথা। মধ্যভারতের বেরারের নিকটবর্তী একটি পর্বতের পাদদেশে বাণগঙ্গা ও পাণগঙ্গা নামক দুটি নদী আছে। ঐ পর্বতের শৃঙ্গের নাম 'বাউ'। প্রাচীনকালে বাণরাজা ঐ পর্বতশৃঙ্গে শিবের তপস্যায় রত হন। কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় রাজা বৃক্ষের নীচে আগুন জেলে, নিজের হাত-পা গাছের ডালে বেঁধে নীচের আগুনের ওপর ঝুলতে থাকেন। এথেকেই 'ঝুল-ঝাঁপ' বা 'হিঁদোলা' উৎসবের সূত্রপাৎ। এরপর প্রাণত্যাগ করার জন্য রাজা পর্বতশৃঙ্গ থেকে তরবারির কাঁটা-ঝোপে ঝাঁপ দেন। এথেকেই 'কাঁটা-ঝাঁপ' উৎসব শুরু। নিজের তরবারি ভূমিতে প্রোথিত করে তার ওপর রাজা ঝাঁপ দেন। এথেকে 'বঁটি-ঝাঁপ' উৎসব শুরু। এইসব শৈব উৎসব গ্রীষ্মকালীন 'গাজন' উৎসবের সঙ্গে এদেশে অনুসৃত হয়। এছাড়া আছে 'বাণফোঁড়', 'পিঠফোঁড়' ইত্যাদি নানাস্থানে নানা নামে। সেকালের কলকাতার ছাতুবাবুর মাঠে চড়ক উৎসবে গাজনের 'সন্ন্যাসীরা' পিঠের শিরে বঁড়শীর বড় কাঁটা বিদ্ধ করে চড়ক কাঠে ঝুলত। এতে অনেক সন্ন্যাসী মারা যায়। ১৮৬৩ সালে সরকার আইন করে এটা বন্ধ করে দেন। গাজন উৎসবে 'নীলপূজা' নামক যে অনুষ্ঠান আছে তা বোধহয় সমুদ্রমন্থনকালে বিষপান করে যিনি নীলকণ্ঠ হন তাঁরই পূজা—তিনিই সেই শিব। এই গাজন উৎসবের মাধ্যমেও বোধহয় আগামী বছরে বা ঋতুতে সুবর্ষণ এবং উত্তম শস্য উৎপাদনের কামনায় দেখা যায়।

বাঙালী কুমারী মেয়েদের মধ্যে 'শিবপুজো' একটি ব্রতবিশেষ। শিবের মতো স্বামীর কামনায় কুমারী মেয়েরা সারা বৈশাখ মাস শিবের পুজো করে। ধর্মীয় নানা নিয়ম-কানুন পালন করে থাকে। এর মাধ্যমেও সেই সুসন্তান বা সৃষ্টির অক্ষুণ্ণ সংযোগের কামনাই প্রকটিত হয়। সেইসঙ্গে লিঙ্গপূজার প্রাচীন সংস্কারের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। পূর্বভারতের প্রায় প্রতিটি শিবালয়েই আছে গৌরীপট্ট। যা যোনীরই প্রতিরূপ। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের 'ক্যানেলপাড়' এলাকার একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের সম্মুখে প্রস্তরে খোদিত একটি 'যোনীরূপ' দীর্ঘকাল যাবৎ নারীসমাজ পুজো করে আসছেন। যাইহোক, শুধুমাত্র বাঙালী নয়, সারা ভারতেই হিন্দুসমাজের মধ্যে শিব নামক অনার্যদেবতার প্রাধান্য যে আজো অনেক-খানিই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে কাশীর শিবালয়ের দৃষ্টান্তই বোধ হয় শেষ কথা নয়।

॥ নির্দেশিকা ॥

১। 'Mohenjo-Daro and Indus Civilisation', Vol. I, 1931—Sir John Marshall.

২। 'বাঙালার ইতিহাস'—১ম, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী সং, ১৯৭১।

৩। 'বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩য় সং, ১৯৭০।

৪। 'ঋগ্বেদ সংহিতা' ১ম ও ২য়, শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬।

৫। 'ভারতের প্রত্নতত্ত্ব'—অমলানন্দ ঘোষ, ১৯৭১।

৬। 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর' ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ১৯৭৪।

৭। 'Coins',— P. L. Gupta, 1969.

৮। 'সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও অবদান'—শ্রীআবদুল মুন্ন, ১৯৮০।

৯। 'The Pre-historic Background of Indian Civilisation'—D. H. Gordon, 1968.

১০। 'সিন্ধুসভ্যতা: শিবপ্রসঙ্গ'—পল্লব সেনগুপ্ত, চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮৪।

১। 'The three-headed seven rayed (monster)'—Muire Sanskrit Texts, Vol. V 1884. P. 230.

●

॥ রবীন্দ্র-সাধনায় সঙ্গীত ॥

ডক্টর শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী

রবীন্দ্রজীবনে সঙ্গীতের আসন যে কত বড় এবং নন্দনলোকের অন্যান্য বিভাগের তুলনায়ও কত বড়—সেকথা রবীন্দ্রনাথের মতো ভালো আর কে জানতেন, আর কার পক্ষেই বা জানা সম্ভব। সঙ্গীতের মধ্যে যাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলি ঐকতান খুঁজে পায়, এবং কথায় ও সুরে জালবোনা নন্দনলোকে মুক্তির সুরভি-নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন তিনি ছাড়া আর কেই বা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই বলা সহজ—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপনসীমা কোথায় হারায়
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।[১]

এই সুরের জগৎকে ভুলে কেবল কাজের জগতে লিপ্ত থাকা তাঁর স্বধর্ম-চ্যুতি—জীবনদেবতা সুরভারতীর কাছে তা স্বধর্মভ্রষ্টতারই অপরাধ; তাই,

'সুর ভুলে সেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে।[২]

এই সঙ্গীতের মহাকর্ষ বস্তু-জাগতিক সমস্ত কর্তব্য-অকর্তব্য ভুলিয়ে রবীন্দ্রজীবনকে কালজয়ী এক আনন্দলোকে জ্যোতি-গন্ধের মতো ভাসমান করে রাখে। সেখান থেকে সমস্ত জগৎ-সংসারকে দেখাই তো মুক্তির আনন্দে দেখা। রবীন্দ্রজীবনে পঞ্চাশোর্ধের এই সঙ্গীতসাধনা তাঁর গভীরতর জীবনবোধেরই অভিব্যক্তি। অন্তরলোকের সঙ্গীতের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান ব্রহ্মাস্বাদ—মুক্তির আনন্দ। সঙ্গীতের ভাষায়ই তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

'দেহ মনের সুদূর গারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি উর্ধ্বে ভাসে।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতসৃষ্টিলোকে আত্মভোলা ছিলেন সাধকের মতোই। রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতসৃষ্টির এক অবিস্মরণীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী এক প্রাক্তন ছাত্র। এখানে সেটি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন—

'তখন আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষের দিকে, আকাশ নূতন বর্ষার মেঘে ঘন নীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনো গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে।

১। সমগ্র গীতবিতান, পূজা, সংখ্যা ২৬, পৃঃ ১৫-১৬।
২। ঐ, ঐ, ঐ সংখ্যা ৯৫, পৃঃ ১৫।
৩। ঐ, ঐ, ঐ সংখ্যা ৩৩৩, পৃঃ ১৪১।

রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন আশ্রমের পশ্চিমপ্রান্তের একটি বাংলোতে। আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন, এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়া মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন, সম্মুখেই পড়িল মেহেদিগাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন, অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুন গুন করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন :

প্রথর সেবার হয় বিরাগী
নিভৃত নীল গন্ধ লাগি।[৪]

'ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন, ভুলিয়া যাইবার আগেই গানটি দিনেন্দ্রনাথকে লিখাইয়া দিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিনুবাবু তখন থাকিতেন দেহলি বাড়িতে। পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যেটুকু সময় বেশি লাগিবে, সেটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো সুরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

'.....উদাসীন দৃষ্টি সেই নিভৃত নীল গন্ধের দিকে বদ্ধ, দেহটা অভ্যাসের বশে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কাব্যে মত্ত গজরাজের পলায়ন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি, এতদিনে এই চিত্রটাকে কবিদের একটা কৃত্রিম অলঙ্কারমাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নন্দলালের এই ধাবিত গতি দেখিয়া আবার মনে এই উপমাটা এক মুহূর্তে নূতন চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি সেদিন অলঙ্করা ঘর্মাক্তির আবরণে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল। সবসুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব।

সঙ্গীতসাধনার চিত্র ও ধ্বনি

রবীন্দ্রসঙ্গীতে চিত্রের জগৎ ও ধ্বনির জগৎ, এবং এই দুই জগতের মিলনলীলা। এই চিত্র-ধ্বনির জগৎকে মনের মধ্যে ধনিয়ে তোলবার পশ্চাতে নিত্যস্পর্শচেতন রবীন্দ্রজীবনের দেখা-শোনা এক জগৎও যে প্রভাব বিস্তার করত তা বলাই বাহুল্য। এবং সেক্ষেত্রে বৃহত্তর শান্তিনিকেতনের ধ্বনি-চিত্রময় এক স্বতন্ত্র জগতের কত যে রাত্রিভোরের নিভৃতিতে, দিগন্ত-উদাস মধ্যাহ্নে, ক্লান্তছায়া অপরাহ্নে, বর্ষারাস সঘনসন্ধ্যায় এবং নক্ষত্র-দীপান্বিতা নিশীথ থেকে উৎসারিত কত বিচিত্র বর্ণ-ধ্বনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের এবং কবিতারও চেতন-অবচেতন প্রেরণা যুগিয়েছে তা কে জানে, কেই বা বলতে পারে।

শান্তিনিকেতন-প্রকৃতির নিত্য ঋতুরঙ্গের প্রাণলীলা পথিক কবির চিত্তলোকে কতো রূপ ধরেছে, কত সুরে ঘরে পড়েছে তা কে বলবে। আবার অন্যদিকে 'কোলাহলের বেগে দেবার খুশি ওঠে জেগে সেই মানবজনতার মধ্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ কত সুরের পরীক্ষা নিয়েছেন তাই বা কে নির্ণয় করবে।

৩। ঐ, ঐ, ঐ সংখ্যা ৭৩০, পৃঃ ৭১৮।

৪। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, প্রমথনাথ বিশী (রবীন্দ্র-অধ্যাপক শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র), পৃঃ ১৪৪-৪৫।

তবে, ছবির জগৎ ছাড়িয়ে যেখানে ধ্বনির জগৎ সেখানেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে আত্মতন্ময় জীবনসাধনা আরও সুগভীর। সেখানে—'রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়' —এবং সেখানেই সঙ্গীত-সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সবার কানাকানি' হয়।[৬] বিচিত্র রূপ ও রেখার প্রত্যক্ষ জগতের অভিজ্ঞতায় শেষে উৎকর্ণ কবির কাছে যে শব্দব্রহ্মের আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রসাহিত্যে তার তুলনা সঙ্গীতে ছাড়া আর কোথায়। সেইখানেই তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের শেষাশ্রয়।

'গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
　　বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে
নিয়ে গেছে গান আমারে,
গান দিয়ে হাত ধরিয়ে বেড়াই
　　এই ভুবনে।'[৭]

প্রত্যক্ষ জগতের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই কবির সামনে খুলে ধরে লোকাতীত জগতের প্রবেশ-দ্বার। আর সেখানে কবির জীবনে স্পর্শময় হয়ে ওঠে সমগ্র জগৎ এবং এই সঙ্গীতই—

কত দেখা সেই দেখালো
কত গোপন পথ দেখালো
চিনিয়ে দিল কত তারা
　　বন্ধ-গগনে।
বিচিত্র সুখদুখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এল
　　কোন্ ভুবনে।[৮]

রূপ থেকে অরূপের দিকেই এখানে সঙ্গীতের দূরযাত্রা, যেখানে 'ডুবলে রে মন রসের তিমিরে'। এবং সেই তিমিরে—

'সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
　　বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।'[৯]

৬। গীতবিতান, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ২৩, পৃঃ ১৩।
৭। গীতাঞ্জলি, সংখ্যা ১১২।
৮। ঐ, সংখ্যা ঐ।
৯। ঐ, সংখ্যা ৭২।

সেখানে 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে'।[১০] আর সেই সুরলোকে 'ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে'[১০] একাকার হয়ে যায় বিরহ মিলন। সেই অরূপলোকে 'সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো গাওয়া।[১০]

সুরের গুরু কাছে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথের কাছে সুরের অমিয় স্পর্শ ছাড়া সমস্ত কর্মময় রূপময় জগৎই যে অর্থহীন ব্যর্থ। সুরদেবীর মোহন অঙ্গুলি-স্পর্শ কবিকে যেমন চিত্রজগতের ধ্বনিময় আনন্দলোকে পলকস্পর্শে পৌঁছিয়ে দেয়, তেমনি ওই স্পর্শই রূপের জগতে কবিকে তন্ময় করে রাখে—সুর-যোগ ছাড়া কোনোই অর্থ থাকে না সমগ্র সৃষ্টির। কবির কাছে সুর হ'ল অর্থ ও অর্থাতীতের মধ্যে বলাকাবাহন। সুরবিরহের ডানা সচল না থাকলে সারাটা জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কেবল যে অর্থহীন মনে হয় তাই নয়, সঙ্গীত-সাধক রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে জানেন যা-কিছু সাফল্য সবি হয় তাঁর জীবনধর্ম-বিরোধী।

'সুর ভুলে সেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে আমার চোখের ভর্ৎসনা যে।
উদার আকাশ উদার ধরা
সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না যে।'[১১]

তাই গানই ছিল কবির কণ্ঠে শেষ পাড়ানির পরম সম্পদ, ছিল, মুক্তির চাবি,—ওপারের অরূপলোকে পৌঁছবার শেষ-সম্বল : 'কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ-পাড়ানির কড়ি'।[১২] সত্যই রবীন্দ্রনাথের পরমতম জীবনসাধনার শেষ-সম্বলই ছিল দুইটি সঙ্গীত এবং মানবপ্রীতি—ধূলিময় জীবনে অনুরাগের শেষ দাবিটুকু।

রবীন্দ্র-জীবনসাধনার সবচেয়ে নিরাভরণ সবচেয়ে নিরাবরণ সমস্ত অহং-বেষ্টন থেকে মুক্ত আত্মরূপটিই তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতে, এবং বিশ্বস্রষ্টা মহাকবির কাছে কবি রবীন্দ্রনাথ তাই কবিরূপে নয়, সঙ্গীত-সাধকরূপেই নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রাণের কথা।

'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার,
তোমার কাছে রাখেনি তার সাজের অহঙ্কার।

* * *

তোমার কাছে খাটে না মোর কবির গরব করা—
মহাকবি তোমার পায়ে দিতে চাই যে ধরা।

১০। গীতবিতান সমগ্র, পূজা, সংখ্যা ৩৯৭, পৃঃ ১৪৭।

১১। গীতবিতান, ১ম খণ্ড, পূজা, সংখ্যা ২১, পৃঃ ১৭।

১২। ঐ, ঐ, ঐ সংখ্যা ৫১।

জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার'।[১৩]

রবীন্দ্রহৃদয়ের অনুরূপ প্রার্থনা—

'যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পুরে—
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।...
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দে বচন নাহি স্ফুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।'[১৪]

—রচনাভীত সুরস্বর্গেই রবীন্দ্রনাথের মহামিলন তাঁর জীবনদেবতার সঙ্গে।

জীবনসাধনার গভীরতর এবং পরিণত স্তরে ষষ্টিবর্ষোত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামগ্রিক জীবনসাধনায় কর্তব্য ও আনন্দের দ্বন্দ্ব-ভূমিকায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান-সম্পর্কে স্বীয় উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একখানি বিশিষ্ট পত্রে। পত্রের অংশবিশেষ এইরূপ :—

'অত্যন্ত গভীর কর্তব্যগুলি দেখলে আজকাল কেবল যে ক্লান্তি আসে—তা নয়, হাসি পায়, মনে হয় ওরা বারোআনাই মুখোস-পরা ফাঁকি। আমি এখানে যে মস্ত একটা কাজ ফেঁদে বসেছি তার মহিমা আমাকে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না।...যখন গান লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন-কিছু গুরুতর জিনিষ নয়—মানুষের ইতিহাসে অমন স্বরাজ বুদ্বুদের মতো উঠেছে আর কেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মতো তারা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতোই...সেইজন্যেই তারা যখন গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসছে যে 'সময় খারাপ, অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।' যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার আর এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন।'[১৫] পত্রখানি বিশ্বভারতী-সমর্পণের মাত্র মাস দেড়েক আগে এবং ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতার মুখে লেখা। সমান গুরুত্বপূর্ণ আর একটি প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র উক্তি—

'গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন বেলা ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।'[১৬]

১৩। গীতাঞ্জলি, সংখ্যা ১২৫।
১৪। ঐ, সংখ্যা ১৩৪।
১৫। পত্র-নিবন্ধ গ্রন্থ 'পথে ও পথের প্রান্তে', সংখ্যা ৪৭।
১৬। চিঠিপত্র ৭, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত, সংখ্যা ৮৭।

'অন্তরে সর্বদা এই গানের সৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে মরে যায়।'[১৭]

কিন্তু পরে লেখা একখানি বিশিষ্ট পত্রেও রবীন্দ্র-জীবনসাধনায় সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রয়োজনাতীত সুষমার সার্থকতার কথা পরিস্ফুট হয়েছে দেখা যায়। সেখানেও ধূলি-লাঞ্ছিত বাস্তবজীবনের অকিঞ্চিৎকরতা ও অপূর্ণতার, তার সীমাসঙ্কীর্ণতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধতার মধ্যে থেকেই গানের বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করাটা যে বিলাস নয়, বরং জীবনেরই শুদ্ধতম উত্তরণ-শক্তির প্রকাশরূপে যে গভীরতর সত্য—আত্মসাধনার সেই গুরুত্বের কথাই রবীন্দ্রনাথ আলঙ্কারিক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

'মেয়েরা শকুন্তল অভিনয় করবে···যারা লোকহিত-ব্রত সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখদৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ দেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই।···অঙ্কে অঙ্কে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোণা উঠে গেল—'দরিদ্রনারায়ণ'কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে।···সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না, তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন··· সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা "বরদার্থীবিব সম্পৃক্তৌ", যাদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।'[১৮]

কিন্তু বহুব্যক্তিস্বমুখী রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশলোক কেবলমাত্র সঙ্গীতলোক বা বিচিত্র নন্দনলোকমাত্রই নয়। বারম্বার তাই কর্মযোগক্ষেত্রে এবং কর্মযোগসূত্রে তাঁর মধ্যে আত্মবিরোধ না ঘটেছে তা নয়। এই বিরোধ থেকে মুক্তির জন্যই ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীতে বিশেষত ১৯০১-১৯২১ সালের মধ্যে বহু প্রত্যক্ষ-যোগ ও নিয়ন্ত্রণ-কালে বহু পার্শ্বপরিবর্তন ও পটপরিবর্তনও ঘটেছে—ঘটেছে প্রতিষ্ঠানিক অসঙ্গতি ও পুরোনো বৈষম্যকে জয় করবার জন্যই। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগত দিক থেকে মুখ্যতই নন্দনশিল্পী "আর্টিস্ট" বা আরো বিশেষত সমগ্র জীবনকালই সঙ্গীতশিল্পী,—তবুও একমাত্র তাই নন বলেই বাস্তব-জীবনের প্রত্যক্ষ-দাবীতে ভাবরূপ থেকে কর্মরূপে রূপান্তরের প্রত্যাশায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীকে গঠন ও পরিচালনা করতে হয়েছে, জমিদারীতে 'স্বদেশীসমাজ' স্থাপনা এবং শ্রীনিকেতনে 'গ্রামোদ্যোগ' কাজে মগ্ন হতে হয়েছে। কিন্তু বৃহৎ ভাবকে কর্মরূপ দান করা যে তাঁর একার কাজ নয়—ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বিশেষত বিশ্বভারতী ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত কালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তা মর্মে মর্মে বুঝেছেন। আত্মজীবনের ঐকান্তিক এক মৌল সাধনার বিপরীত প্রান্তেই প্রতিষ্ঠান গড়ার আত্মদ্বন্দ্ব—তার অকিঞ্চিৎকরতা ও অপূর্ণতাবোধ রবীন্দ্রনাথকে যে পীড়িত করছিল না তা নয়।

সঙ্গীত-সাহিত্যাদি ক্ষেত্রের সাধনা একান্তভাবেই স্ব-নির্ভর, সেখানকার মুক্তিদিশাও স্বতন্ত্র বিষয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়া বহুজননিষ্ঠা-নির্ভর ব্যাপার। সামগ্রিক রবীন্দ্র-জীবনসাধনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান গড়ার এই দ্বন্দ্বই সঙ্গীতসাধকরূপে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কথার পরিশেষে উদ্ধৃতিযোগ্য :

১৭। ঐ ।

১৮। দ্রঃ ৫৮ সংখ্যক টীকা।

'কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্টিটিউট ভাঙে গড়ে এবং পরিবর্তিত হয়, কিন্তু গান-জিনিষটাই জলতরঙ্গের উত্থান-পতনের আঘাতে ডোবে না, তার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। সৃষ্টিকার্যের এই চিরকালীন ভাসান-খেলায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি কিন্তু আমার বাঁশি ফেলিয়া হঠাৎ এঞ্জিনিয়র সাজিয়া হঠাৎ কালস্রোতের মাঝখানে একটা দীপস্তম্ভ করিবার চেষ্টা করি কেন? সে কাজটা ভাল এ কৈফিয়ৎ পাকা কৈফিয়ৎ নহে। ভালর বহুধা রূপকে প্রয়োজনের খাতিরে নষ্ট করা ভাল নহে। ভালর কোন্ রূপের ভার আমার উপরে ছিল?[১৯]— 'Was not I born a music-maker?'[২০] আমি কি সঙ্গীত-শিল্পী হয়েই জন্মাই নি?'

●

॥ গুরু-চরণ সরোজে মন মজরে ॥

(গান)

সুর—পরবারী কানাড়া

শ্রীমতি অনুরাধা বিশ্বাস

গুরু-চরণ সরোজে মন মজরে
ক্লান্ত হয়োনা শুধু ঘুরে ঘুরে।
ওরে, মন-মধুকর মধুলোভ আশে
সংসার কাননে ঘুরিছ আবেশে
এ যে হলাহল বুঝিবে কেবল
গুরু-কৃপা যবে পরশিবে তোরে।
সংসার-কাননে ফোটে যত ফুল
তারি মাঝে রহে সুকঠিন হুল
শ্রীগুরু আশীষে বুঝিবে নিমেষে
জ্ঞান-আঁখি যবে খুলে দেবে রে।
যদি ঘরে থাকো পিপাসা-কাতর
কর পান নাম-সুধা নিরন্তর
এই নাম-সুধা নাশে ভবক্ষুধা
ছিন্ন ক'রে সব মায়াডোরে।

●

১৯। পত্রাবলী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৬০, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শৈলকে লিখিত, ১৩ই কার্তিক, ১৩২৮—১৯২১ খ্রীঃ ['বিশ্বভারতী'-কে পরিষদ হস্তে সমর্পণের মাসদেড়েক আগে লেখা]।

২০। লেটারস্ টু এ ফ্রেণ্ড [আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সি. এফ. এণ্ড্রুজ-কে লেখা, পত্রসংখ্যা ৩, নবম পর্ব।

॥ ইরানের চিত্রিত সিরামিক্স্-এর ভূমিকা ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

ইতিহাসের ধূসর অতীতে সভ্যতাবিকাশের উষালগ্নে ইরানের প্রাচীন ভূখণ্ডে একদা যে সিরামিক-সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিলো—সে-সংস্কৃতির প্রারম্ভকাল, বিশেষজ্ঞদের মতে, আনুমানিক ছ' হাজার বছরেরও আগেকার কোনো এক সময়। পৃথিবীর মানচিত্রে ইরানের ভৌগোলিক অবস্থানটিকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সঙ্গমস্থল বলা চলে। এই অবস্থানের জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইরানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী সংস্কৃতির আলোড়ন ও মিশ্রণের কাজটি ঘটে চলেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অভিযানকারীদের আক্রমণ, রাজ্য স্থাপন এবং ধর্মীয় সংঘাতের ফলস্বরূপ ইরানের দেশজ সংস্কৃতিতে গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়াটির ছাপ ওদেশের শিল্পকলার শাখাপ্রশাখাগুলোতে মুদ্রিত হয়ে আছে। সিরামিকএর ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটেনি। পূর্ব ও পশ্চিমে স্থিত দেশগুলোর সিরামিক-সংস্কৃতির আদান-প্রদান অথবা আন্দোলনের দোলকটি এধার থেকে ওধারে যেতে ও আসতে প্রতিবারই স্পর্শ করে গেছে ইরানকে। এ-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভব্লিউ. ই. কল্ বলেছেন: 'From Arabia to frozen stepps, from India to Greece, from Egypt to Samarkand, from China to coast of Spain the pendulum swung and in the centre of it all was Persia, Iran, land of kings.'

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলশ্রুতি এই যে, খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক ছ' হাজার বছর আগে ইরানের প্রাচীন ভূখণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় সিরামিকশিল্পীদের বসতি গড়ে ওঠে। তৎকালীন ইরানে নির্মিত বলে অনুমিত যেসব সিরামিকপাত্রের নিদর্শন এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোতে নানান্ ধরনের জ্যামিতিক নকশার অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী প্রায় একহাজার বছর পর্যন্ত ইরানে সিরামিক-অলংকরণের এই ধারাটি মোটামুটিভাবে বজায় ছিলো। অবশ্য এর পরবর্তীকালে অলংকরণে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টাও চোখে পড়ে। বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের আকৃতি অনুসরণ করে অলংকরণের নকশায় অভিনবত্ব আমদানীর চেষ্টা করা হয়েছিলো।

খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে নির্মিত বলে অনুমিত ইরানের কিছু কিছু সিরামিক পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় যে, ওগুলো নির্মিত হয়েছিলো কুমোরের চাক্-এ এবং পোড়ানো হয়েছিলো ভাঁটিতে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, পার্শ্ববর্তী মেসোপটেমিয়া থেকে ইরানে কুমোরের চাক্এর আমদানী হয়েছিলো। সুসা, সিয়াক্, হালফ্ এ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে যে-সিরামিকপাত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলো বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে কুমোরের চাক্-এ নির্মিত এবং ভাঁটিতে পোড়ানো হয়েছিলো।

খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছরের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে অনুমিত যেসব চিত্রিত সিরামিকপাত্র ইরানে আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোর গড়ন এবং অলংকরণে রয়েছে সুমেরীয় সংস্কৃতির প্রভাব। এ-ধরনের পাত্রগুলোর জমির রঙ লাল অথবা ছাই এবং জমিতে অলংকরণ করা হয়েছে কালো অথবা গাঢ় খয়েরি রঙ-এ।

টেপে সিয়াক্-এ প্রত্নবিশেষজ্ঞরা যেসব সিরামিকপাত্র আবিষ্কার করেছেন—সেগুলোর নির্মাণ-কাল, ওই বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্টজন্মের আগে আনুমানিক এক হাজার বছরের শেষ ভাগে। এই পাত্রগুলোর গড়ন এবং অলংকরণে প্রাচীন ইরানীয় সিরামিকপাত্রের নির্মাণরীতির পুনঃপ্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ধর্মীয় কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এই পাত্রগুলো নির্মিত হয়েছিলো। মিডির সিরামিকশিল্পীরা এই পাত্রগুলোর স্রষ্টা বলে মনে করা হয়ে থাকে। উইল্ ডুরান্ট্-এর মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে ইন্দোয়ুরোপীয় নৃগোষ্ঠির মিডির নামে পরিচিত একটি শাখা কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী বাসস্থান ত্যাগ করে ইরানের ভূখণ্ডে এসে বসতি স্থাপন করে। ইরানের একবাটানায় (বর্তমান হামাদান্) মিডিয়-সম্রাট ডিয়োসিস্ রাজধানী স্থাপন করে ইরানে মিডিয় রাজবংশের পত্তন করেন।

৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইরানের মিডিয় বংশীয় সম্রাট তৃতীয় দারিয়স্ গ্রীসের সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। গ্রীকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইরানে বিজয়ী জাতির সংস্কৃতি প্রসারলাভ করে। ইরানী শিল্পকলার অন্যান্য শাখার মতো সিরামিক-এও গ্রীক প্রভাবের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গ্রীসের সিরামিক-সংস্কৃতির প্রভাব ইরানের মাধ্যমে সুদূর চীনেও প্রবেশ করে। চীনে তাঙ্ রাজবংশের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব) নির্মিত কিছু সংখ্যক সিরামিকপাত্রে গ্রীক সিরামিক-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

দারিয়ুসএর বংশোদ্ভব সম্রাট প্রথম আর্দাশির ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইরানে সাসানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। জরথুস্ট্রীয় ধর্মমতে বিশ্বাসী ইরানী সম্রাটের সঙ্গে রোমের তৎকালীন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী সম্রাটের সংঘাত শুরু হয়। ইরানের পার্শ্ববর্তী আর্মেনিয়া রোমানরা দখল করে

নেয় এবং বিজিত আর্মেনিয়ানদের খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে বাধ্য করে। আর্মেনিয়া থেকে রোমান ও আর্মেনিয়ান খ্রীষ্টানদের ইরানে অভিযান এবং ধর্মীয় প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস শেষপর্যন্ত দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হয়। এই সংঘাত প্রায় তিন শতাব্দী কাল ধরে চলতে থাকে। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে রাজশক্তির দুর্বলতাকে উপলক্ষ্য করে ইরানের ভূখণ্ডে এক নতুন ধর্মমত প্রসারের পটভূমি তৈরী হয়ে ওঠে।

এই নতুন ধর্মমত ইসলামএর প্রবক্তা ছিলেন আরবের অধিবাসী মহম্মদ। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদএর দেহত্যাগের পর আবু বক্করএর নেতৃত্বে আরবী সেনাবাহিনী ইরানে অভিযান শুরু করে। অবশেষে ইরান মুসলমান খলিফাদের শাসনে চলে যায় এবং পরবর্তী প্রায় দেড়শো বছর ধরে ইরানে খলিফাদের শাসন অব্যাহত থাকে।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইরান যথাক্রমে সামানীয়, গজনোবীয় এবং সেলজুকীয় সম্রাটদের শাসনাধীন থাকার পর মোঙ্গল অভিযানকারীদের হাতে আক্রান্ত হয়। মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিজ খান্ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ইরান অভিযান করেন। চেঙ্গিজএর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র কিছুকাল ইরানের শাসনকার্য চালান। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজএর বংশধর তৈমুরলঙএর মৃত্যুর পর পরবর্তী ৪০ বছরের মধ্যেই ইরানে তৈমুর বংশীয়দের শাসনের সমাপ্তি ঘটে। ইরানের অধিকাংশ অঞ্চল তুর্কীর সুলতানদের দখলে চলে যায় এবং কার্যতঃ ইরান তাঁদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে শাহ ইস্মাইল ইরানে সাফাবিদ রাজবংশের পত্তন করেন। সাফাবিদ বংশীয় সম্রাট শাহ আব্বাস্এর রাজত্বকালে ইরানে শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ঘটে। শাহ আব্বাস্ ছিলেন শিল্পকলার সমঝদার এবং পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দরবারে বেশ কিছু সংখ্যক গুণী চিত্রকরের সমাবেশ ঘটেছিলো। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইরানে সাফাবিদ রাজবংশের পতন ঘটে।

মুসলিম শাসকদের শাসনকাল ইরানী শিল্পকলার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। নবম এবং দশম খ্রীষ্টীয় দশকে মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে ইরানের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘটে। এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে উভয় দেশের শিল্পকলার শাখাপ্রশাখা সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। দুইটি দেশের সিরামিকশিল্পীরাই এই যোগাযোগের ফলে উভয় দেশের সিরামিক সম্পর্কে চাক্ষুষ পরিচয়লাভের সুযোগ পান। এই যোগাযোগে চীনের সিরামিকশিল্পীরাই নাকি লাভবান হয়েছিলেন। কারণ সমসাময়িক চৈনিক সিরামিকশিল্পীদের তুলনায় ইরানী সিরামিকশিল্পীরা উন্নত ধরনের সিরামিকনির্মাণে সক্ষম ছিলেন। আর্থার আপহাম বলেছেন: 'In many cases Persian examples are finer and show greater sensibility than comparable wares of the T'ang period of China.'

মুসলমান শাসকদের আমলে ইরানে নির্মিত সিরামিকএর যে সব নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোতে লাগানো গ্লেজ (glaze) অথবা চিকণলেপএর

যে-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হলো, ওই গ্লেজ কয়েকটি বর্ণের আভাযুক্ত (iridescent) দেখায়। এ-ধরনের গ্লেজ প্রাচীন রোমে নির্মিত বিশেষ ধরনের কাঁচের কথা মনে করিয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মত হলো এই যে, দীর্ঘকাল মাটির তলায় সিরামিকপাত্রগুলো প্রোথিত থাকায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে গ্লেজ-এ ওই ধরনের বর্ণাভাব সৃষ্টি হয়েছে। গ্লেজ-এ টিন্ অক্সাইড্ নামে পরিচিত খনিজের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। গ্লেজকে সাদা এবং অস্বচ্ছ করে তুলবার জন্য টিন্ অক্সাইড্ গ্লেজ-এ মেশানো হয়। ইরানের সিরামিকশিল্পীরা গ্লেজ-এ টিন্ অক্সাইড্এর ব্যবহার ভালোভাবেই জানতেন, এ-থেকে সে-পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্লেজএর ওপর বিভিন্ন বর্ণের লাস্‌চার (lustre) প্রয়োগেও ইরানী সিরামিকশিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সোনা, রুপো, তামা ইত্যাদি ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের আঠালো রাসায়নিক মিশ্রণের প্রলেপ গ্লেজএর ওপর লাগিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় (reducing atmosphere) চুল্লীতে পোড়াবার পর গ্লেজএ যে-অতি উজ্জ্বল ধাতববর্ণের সৃষ্টি হয়—তাকেই বলা হয় লাস্‌চার। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে ইরানে সিরামিকচিত্রণে লাস্‌চারএর ব্যবহার প্রচলিত ছিলো। সবুজ, সোনালী, বাদামী এবং হলদে বর্ণের লাস্‌চারচিত্রিত বেশ কিছু সংখ্যক সিরামিক টাইগ্রিস্ নদীর তীরবর্তী সামারা শহরে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলো খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিলো।

মনুষ্য কিংবা জীবন্ত কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি কিংবা মূর্তি অঙ্কন সম্পর্কে ইসলামধর্মের নিষেধাজ্ঞা ইরানের ঐস্লামিক যুগের সিরামিকশিল্পীরা যে কঠোরভাবে মেনে চলতেন—সেকথা মনে হয়না। কারণ এযুগে চিত্রিত সিরামিকএর বিষয়বস্তুতে মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর চিত্র চোখে পড়ে। এ-ধরনের সিরামিকচিত্রণে ইরানী পুঁথিচিত্রণ অথবা অণুচিত্রের শৈলীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে। অলংকরণে আরবী অথবা কুফিক্ বর্ণমালার হরফের ব্যবহার চোখে পড়ে। এ-বিষয়ে চৈনিক অলংকরণের সঙ্গে ইরানী অলংকরণের সাদৃশ্য দেখা যায়। সিরামিক টালিতেও ইরানী শিল্পীরা অলংকরণে আরবী হরফ ব্যবহার করেছেন। চতুষ্কোণ, ক্রুশ এবং আটটি কোণবিশিষ্ট তারার আকারে নির্মিত ও অলংকৃত টালি মসজিদ্এর দেয়াল এবং গম্বুজে লাগাবার জন্য তৈরী করা হতো। ইরানের রাগেশ্ এবং কাশান্-এ এ-ধরনের প্রচুর টালি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইরানে অগ্নিপূজক ধর্মাবলম্বীদের একটি শ্রেণীর নাম ছিলো 'গাবৃরি'। এই গাবৃরি সিরামিকশিল্পীরা সাধারণ মাটিতে যেসব চিত্রিত সিরামিক তৈরী করেছিলেন—সেগুলো গাবৃরি নামে পরিচিত। লাল জমির ওপর সাদা ও অস্বচ্ছ তরলীকৃত মাটির প্রলেপ (slip) লাগিয়ে ওই প্রলেপ-এ আঁচড় কেটে অলংকরণ করে তার ওপর স্বচ্ছ হলদে গ্লেজ লাগিয়ে গাবৃরি তৈরী করা হতো। অলংকরণের এ-পদ্ধতির ইংরেজী নাম গ্রাফিটো (Sgraffito)।

রাগেশএ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বালিমিশ্রিত মাটিতে তৈরী এবং স্বর্ণাভ বাদামী লাস্‌চার-এ অলংকৃত যে-সিরামিকপাত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোর নির্মাণদক্ষতাও উল্লেখযোগ্য। এই পাত্রগুলোর দেয়াল বেশ পাতলা, ওজনেও এগুলো হাল্কা। এ ছাড়া

কিছু কিছু পাত্রে গাঢ় নীল, সবুজ, হলদে এবং বেগুনি রঙএর গ্লাফিটো পদ্ধতিতে অলংকরণ রয়েছে। চুল্লীর উত্তাপে গলিত গ্লেজ ছড়িয়ে গিয়ে অলংকরণের রেখা যাতে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হয়ে না যায়, সেজন্য সিরামিকএর জমিতে নকশার পরিলেখ (outline) খোদাই করে ওই পরিলেখ-র ভেতরে রঙ লাগানো হয়েছে। এ-ধরনের নকশাযুক্ত সিরামিক লাকাবি পাত্র নামে পরিচিত। কিছু পাত্রে হালকা বাদামী রঙএর গ্লেজএর ওপর কম উত্তাপসহ এনামেল্ অথবা ওভারগ্লেজ রঙএর অলংকরণ দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ-ধরনের অলংকরণে আসল সোনার অতি পাতলা পাতও ব্যবহৃত হয়েছে। এ-ধরনের অলংকরণকে বলা হয় মীনাচিত্রণ। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টীয় শতকে নির্মিত বলে অনুমিত সিরামিকএও ইরানী চিত্রকলার পুঁথিচিত্র অথবা অণুচিত্রের অঙ্কনশৈলী অনুসৃত হয়েছে। চিত্রিত ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্তির মধ্যে রয়েছে উপবিষ্ট সভাসদ, অশ্বারোহী শিকারী এবং যোদ্ধা। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকারে চিত্রিত জন্তুজানোয়ার এবং পাখিও রয়েছে। কাশান্ এবং রাঘি-তে প্রাপ্ত সিরামিক-এ এ-ধরনের অলংকরণ চোখে পড়ে।

সুলতানাবাদ-এ প্রাপ্ত সিরামিক-এর চিত্রণে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। কতক পাত্রে উচ্চাবচ অলংকরণের ওপর লাগানো হয়েছে সবুজাভ নীল, এবং সবুজ রঙএর স্বচ্ছ গ্লেজ। কিছু পাত্রে সবুজাভ নীল গ্লেজএর তলায় কালো রঙ মেশানো তরলীকৃত মাটিতে (slip) চিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে। নকশায় মনুষ্যমূর্তির পোষাক অলংকৃত হয়েছে বিভিন্ন রঙএর বিন্দুতে। অলংকরণে বিন্দুর ব্যবহার চোখে পড়ে একমাত্র সুলতানাবাদ-এর সিরামিকএই। এ-ধরনের বিন্দুযুক্ত অলংকরণের নাম Sultanabad peculiarities। সুলতানাবাদ-এ কিছু-চিত্রিত সিরামিক পাওয়া গেছে—যেগুলোতে চৈনিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এগুলো খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত হয়েছিলো বলে মনে হয়।

লাল জমির যে-চিত্রিত সিরামিক সমরকন্দ-এ পাওয়া গেছে—সেগুলোর অলংকরণের নকশায় প্রধানতঃ পাখি, ফুল এবং লতাপাতা স্থান পেয়েছে। মনুষ্য কিংবা জন্তুজানোয়ারের প্রতিমূর্তি কমই চোখে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অলংকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন রঙএর তরলীকৃত মাটিতে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইরান সাফাবিদ সম্রাটদের শাসনাধীন ছিলো। এ-সময়ে ইরানে চৈনিক পোর্সিলেনএর অনুকরণ করবার ব্যাপক প্রচেষ্টা হয়েছিলো। চীনের মিঙ্ পোর্সিলেনএর অনুকরণে সাদা জমির ওপর গাঢ় নীল রঙের অলংকরণ চোখে পড়ে। ইরানী সিরামিকএর একটি বিশেষ ধরনের অলংকরণরীতি এ-সময়ে পুনঃপ্রচলিত হয়। য়ুরোপে এ-ধরনের অলংকরণ 'গোষরুশ্' নামে পরিচিত। এই অলংকরণ করতে হলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। প্রথমে সিরামিকএর গায়ে অলংকরণের রেখাচিত্র এঁকে ওই রেখাচিত্রের ভেতরের অংশ ছুরির সাহায্যে চেঁছে অত্যন্ত পাতলা করে ফেলা হয়। অলংকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে পাত্রটি পোড়ানো হয় স্বচ্ছ গ্লেজ লাগিয়ে। পোড়াবার পর পাত্রটির চেঁছে ফেলা অলংকরণের অংশে আলো প্রবেশ করে যথা কাঁচএর মতো স্বচ্ছ দেখায়। এ-ধরনের অলংকরণ চৈনিক সিরামিকএ ও চোখে পড়ে। ধানের আকৃতিতে নকশা করে এ-ধরনের অলংকরণ করা হয় বলে চীনে এই অলংকরণ 'ধানশস্য অলংকরণ' নামে পরিচিত।

গোষরুশ্ পাত্রগুলো চৈনিক পোর্সিলেনএর মতো প্রায় স্বচ্ছ হওয়ায় ওগুলো চীনের পোর্সিলেনএর অনুকরণে ইরানে তৈরী করা হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। তবে এ-ধারণা সম্ভবত ঠিক নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের অনেক আগেই ইরানে গোষরুশ্ পাত্র নির্মিত হতো। এঁরা মনে করেন, গোষরুশ্ পাত্রে ইরানী সিরামিকশিল্পীদের মৌলিক উদ্ভাবনী প্রতিভার অপূর্ব দক্ষতাই প্রকাশ পেয়েছে। ইরানী সিরামিকশিল্পীরা চৈনিক ধানশস্য অলংকরণের নকল করেননি। শুধু তাই নয়, য়ুরোপে প্রথম পোর্সিলেন তৈরীর প্রচেষ্টার পেছনে ইরানী সিরামিকশিল্পীদের অবদান রয়েছে বলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এঁদের মতে নরম পোর্সিলেন (Soft porcelain) তৈরীর পদ্ধতি ইরান থেকেই য়ুরোপে নীত হয়। ইরানী পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরের সিরামিকশিল্পীরা নরম পোর্সিলেন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরানের অধিবাসীরা তাঁদের দেশের সিরামিক-শিল্পীদের এ-কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে অবশ্যই গর্ববোধ করতে পারেন।

●

গ্রন্থপঞ্জী :

১। Pottery and Porcelain—W. E. Cox.
২। Pottery through the ages—G. Savage.
৩। World Ceramics—Hamlyn Pub.
৪। Our Oriental Heritage—W. Durant.

*।। অজন্তা পরিচয় ।।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

অজন্তা আবিষ্কার ভারতীয় চিত্র-কলার জগতে এক পরমবিস্ময়। কার্ণ্ডসনের মতে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮১৭ ?) মাদ্রাজ পল্টন বিভাগের একদল ইংরাজ সৈন্য হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যের খান্দেশ জেলায় বাগোড়া নদীতীরে শিবির স্থাপন করে। হঠাৎ একজনের দৃষ্টি পড়ে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি স্তম্ভ আর বিলানের দিকে। দুঃসাহসিক কয়েকজন সৈন্য পাহাড় বেয়ে নদী পেরিয়ে উঠল ওদিকের সেই পাহাড়ে লতা-গুল্মাদি ঝাঁকড়ে ধরে বহু কষ্টে। সহস্রাধিক বর্ষ পরে মানুষের পদচিহ্ন পড়ল নানাজাতীয় পশু-পক্ষী ও বাদুড়ের আস্তানাযুক্ত শৈলগুহায়।

ভিতরে প্রবেশ করে গুহাগুলির অপরূপ চিত্র-কলা দেখে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। অনেকের মতে টলেমী যখন ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন তখন সাম্বাস্তিয়াম্ বলে (Sazantium) যে স্থানটির উল্লেখ করেছেন সেটিই হল অজন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। আবার নারায়ণ সান্যালের মত হল তখন ব্রিটিশ রাজে 'Agent to Governor' থাকতো সেই Agent থেকেই অজন্তা। আসলে নিকটবর্তী একটি গ্রামের নামই ছিল অজন্তা। সেই নামানুসারেই স্থানটির নামকরণ হল 'অজন্তা'। মনে রাখতে হবে এগুলি কোন প্রাকৃতিক গুহা নয়। বৃহৎ পাহাড়কে উপরের দিক হতে ছেনী-বাটালি দিয়ে কেটে নির্মাণ করা হয়েছে এই গুহাগুলি। এর যে সারি সারি স্তম্ভ আছে সেগুলি উক্ত গুহাগুলির ছাদকে ধারণ করে নাই। এগুলি নিছক শোভাবর্ধনের জন্যই নির্মিত। সুতরাং এই স্তম্ভগুলি না থাকলেও ছাদ ধ্বসে পড়বে না। এরূপ কয়েকটি স্তম্ভবিহীন গুহাও আছে অজন্তায়। যাই হোক, তারপর লোকালয়ে ফিরে সৈন্যরা জানালো ঐ বিস্ময়কর বার্তা—কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না তাদের কথা। হায়দ্রাবাদের খান্দেশ জেলায় অবস্থিত 'ইন্দ্রাদ্রি' পর্বতমালার উপত্যকা এলাকায় এই স্থানটি। এপারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ওপারে তাপ্তী নদীর অববাহিকা। বাগোড়া নামে একটি নদী এই পাহাড়ের গা ঘেঁষে বরাবর এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে এবং সাতটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে পতিত হচ্ছে তাই তার নাম সাতমুণ্ড। সেখানে একটি অশ্বখুরাকৃতি বাঁক আছে। সেখানেই রয়েছে ঐ বাঁকের দিকে উঁচু-নীচুভাবে সারিবদ্ধ ৩০টি গুহা। ১৬নং গুহার সামনে দাঁড়িয়ে এটি স্পষ্টতঃই দেখা যায়। কে বা কারা অন্ততঃ দুটি কিংবা তিনটি গুহার নির্মাণকার্য পরিচালনা করেছিলেন তা জানা যায় না। কার্ণ্ডসন সাহেব অনুমান করেন নবম ও দশমগুহা দুটি অন্ধ্রভৃত্য রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। কারণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত ঐ বংশের রাজত্বকাল ছিল। তবে এটুকু জানা গেছে যে গুহাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক হতে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। স্থান নির্বাচনেও শিল্পীমনের এক অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় মেলে এবং গুহাগুলি যে বৌদ্ধ-শ্রমণদের বর্ষাবাসের জন্য প্রথমে নির্মিত হয়েছিল এটুকুও অনুমান করা যায়।

---

* লেখকের "অবিস্মরণীয় দৌলতাবাদ-ইলোরা-অজন্তা।" শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনীর অংশ বিশেষ।

যদিও বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গের জন্য সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতম পথটিই গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন—কিন্তু তাঁরা ছন্ন-ছাড়া এক বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করুক এটি তিনি চান নি। বরং সকলকে একত্রিত করে একই উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা-জীবন বা সংঘ-জীবনের কথাই বলেছিলেন—এরই ফলশ্রুতি সংঘের উৎপত্তি। মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে বুদ্ধের এই পদাঙ্কই অনুসরণ করে গেছেন। যাই হোক, এই সংঘের—সন্ন্যাসীদের জন্য বুদ্ধ 'বিনয়'[১] বা নিয়মের একটি অনুশাসন করে গিয়েছিলেন। সেগুলি হল—সন্ন্যাসীরা রাত্রিবাসের জন্য কোন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে না। লোকালয় হতে দূরে কোন গুহায় তারা বাস করবে। তবে তার ব্যতিক্রমও ছিল—বর্ষাকালে তারা এই অবিরাম পরিব্রাজক জীবন থেকে বিরত থেকে এবং বৎসরের মধ্যে এই একবার মাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করবে। এই কারণে 'বসস্‌বাস' বা বর্ষাবাসের সৃষ্টি হল। 'অজন্তা'ও এমনি এক বর্ষাবাসের জন্যই ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছিল। আদর্শগতভাবে কিন্তু এই 'বর্ষাকাল' ছিল স্বল্পদিনের জন্য।

বর্ষা শেষ হতেই পুনরায় সন্ন্যাসীগণ পরিব্রাজক জীবন শুরু করত। কালক্রমে এমন হল যে বর্ষাবাসের জন্য নির্মিত হলেও আশ্রয়গুলি স্থায়ীরূপ নিতে লাগল বৃদ্ধ ও রুগ্ন সন্ন্যাসীদের জন্য এবং স্থানীয় জনগণও তাদের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের সংস্থান করে দিতে লাগলেন। আরও পরবর্তীকালে দুইপ্রকার আশ্রয়স্থল গড়ে উঠতে লাগল—একটি 'আবাস' সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলে বনস্থলীর সন্নিকটে—নদী বা কোনরূপ জলাশয়যুক্ত স্থানে যেখান হতে সন্ন্যাসীরা অচেষ্টাতেই যেন নিজেদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিতে পারে। এই চিন্তাধারার সঙ্গে অজন্তার বেশ একটি যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়টি হল 'আরাম' যেগুলি গড়ে উঠতে লাগল নগরাঞ্চলে এবং সেখানে সন্ন্যাসীরা বিত্তশালী ব্যক্তিদের সাহায্য-পুষ্ট হতে লাগলেন। 'আবাস'গুলি ছিল অস্থায়ী বসবাসের জন্য। বর্ষা শেষ হলেই সন্ন্যাসীরা সেখান হতে চলে যেতেন স্থানান্তরে।

'আরাম' কিন্তু ছিল অন্য ধরনের। নগরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এবং কোন বিত্তবান ব্যক্তি সংঘকে দান করতেন—চতুর্দিক থাকত প্রাচীর-বেষ্টিত। এগুলিই সন্ন্যাসীদের একত্র বসবাসের স্থান ছিল—এ-থেকেই হল সংঘ+আরাম=সংঘারাম। আসলে এগুলিই পরবর্তীকালে হল সংঘের 'সংস্থা'। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এরূপ তিনটি 'আরাম' ছিল—যেগুলি তখন দান করা হয়েছিল। এর মধ্যে আকর্ষণীয় 'আরাম'টি হল 'জেতবন'। স্বয়ং বুদ্ধদেব যেখানে তিনটি বর্ষা যাপন করেছিলেন। আরও পরবর্তীকালে এই বর্ষাবাসগুলিই অপরূপ স্থাপত্য-শিল্পমণ্ডিত গৃহরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল—অজন্তাও যে সেগুলির অন্যতম নয় তার প্রমাণ কি ?

প্রাচীন কাহিনী হতে জানা যায় কেমন করে একজন ধনী ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম একখণ্ড জমি ক্রয় করে সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় যাবিছু সবই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন

১। 'বিনয়' হ'ল নীতিবাদ সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন। তাছাড়া আছে 'সৌত্র' ও 'অধোবর্ম'। 'সৌত্র' হল ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত গ্রন্থ। আর 'অধোবর্ম' হল সমাধি সম্পর্কিত-ধ্যানের গ্রন্থ। আর আছে বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত সূত্রাবলী তাহুর অংশে।

—যেমন উপাসনাগার, পাঠশালা, গুদামঘর (store-house) স্নানাগার, উন্মুক্ত-কূপ, আবৃত-কূপ, স্নানাগার, পুষ্করিণী, মণ্ডপ, মুঠরী প্রভৃতি। স্বভাবতঃই এগুলি ঔদীচ্যমান ব্যবসায়ীদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল কেবলমাত্র বৌদ্ধশ্রমণদের আশীর্বাদ ভিক্ষার জন্যই নয় পরন্তু পরোক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিযোগিতায় আহ্বানের মনোভাবও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। সেইসময় হতেই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের আশ্রম গঠনের মতই ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য-পুষ্ট হয়ে ধর্মীয় নেতাদের প্রতিষ্ঠান বা আশ্রমগুলি ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে আজও চলে আসছে। আশ্রম নির্মাণের জন্য বিত্তবানদের প্রদত্ত ভূমি ও অর্থসাহায্য একটি আংশিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অজন্তার গুহা-স্থাপত্য-শিল্পে যে অনুপম শিল্প-সৌন্দর্য বিকাশলাভে সমর্থ হয়েছিল তার মূলেও ছিল সাতবাহন, বাকাটক, গুপ্ত ও চালুক্য রাজগণের প্রভূত আর্থানুকূল্য যে জন্য এগুলি স্থায়ী রূপলাভেরও অন্যতম কারণ। এগুলি যে একই সময়েই নির্মিত বা শিল্পীত হয় নাই তারও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য মেলে গুহাগুলির নির্মাণ শিল্পের ধরন দেখে। যে কোন কারণে বৌদ্ধশ্রমণগণ অন্যত্র বসবাসের অসুবিধার ফলে ধীরে ধীরে এখানে (অজন্তায়) চলে আসতে থাকেন হয়তো স্থান নির্বাচনের আদর্শ-পরিবেশ হেতু। ফলে পরবর্তীকালে এতগুলি গুহানির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

বৌদ্ধশ্রমণদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের (পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের শেষপাদ) পর ২৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ছিল হীনযানী সম্প্রদায়ের কাল। এই সম্প্রদায়ের সম্মেলন ঘটে তিনবার। প্রথম সম্মেলন—খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৮২, দ্বিতীয় ৩৭৭ এবং তৃতীয় ২৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোকের সময়। যথাক্রমে রাজগৃহ, বৈশালী ও পাটলিপুত্রে। শেষ যে বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ঘটে তা হয় কুষাণরাজ কনিষ্কের সময় তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে। পণ্ডিত অশ্বঘোষ করেন সভাপতিত্ব, উপস্থিত ছিলেন বসুবন্ধু ও নাগার্জুন। এঁদের সময়েই হয় মহাযান-সম্প্রদায়ের উদ্ভব। পাঠক হয়ত ভাবছেন 'অজন্তা' সম্বন্ধে লিখতে এত 'ধান ভানতে শিবের গীত' কেন? কারণ আছে—অজন্তা-চিত্র বুঝতে হলে এই দুটি সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে—অজন্তা চিত্রদর্শন থাকবে অসম্পূর্ণ ও অপরিজ্ঞাত। যাইহোক, হীনযানীরা ছিলেন একান্তভাবে জ্ঞানমার্গী, ধ্যান, তপস্যা ও চারিত্রিক শীলের দিকে ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। ছিলেন মূর্তিপূজার বিরোধী। তাঁদের সময় ছিল স্তূপ,[২] চরণচিহ্ন পদ্মপুষ্প, শূন্য-সিংহাসন বা শূন্য-ছত্র। কারণ বুদ্ধদেব নিজেকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলে ঘোষণা করে যান নাই। হীন-যানীদের মতগুলি পিটক, সূত্র বা বিনয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় পালিভাষায়। কনিষ্কের আমলে সংস্কৃতে যে মহাযান ধর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে বুদ্ধের মূর্তি গঠন করে পূজার কোন বাধা রইল না। সেই সময় অনুপ্রবেশ ঘটল অনেক দেব-দেবীর। সৃষ্টি হল বজ্রযান নামে এক

২। স্তূপের অস্তিত্ব প্রাক্-বুদ্ধ যুগেও ছিল। তবে সেগুলি আসল স্তূপ নয়। কোন রাষ্ট্রনায়ক ব্যক্তি বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁদের দেহাবশেষ সংরক্ষিত হত মাটির ঢিপির নীচে। তারই অনুকরণে নির্মিত হয় স্তূপ। অশোকের সময়ই রচিত হয় আসল স্তূপ। স্বীকার করতে বাধা নাই যে, বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই বিম্বিসারই প্রথম স্তূপ নির্মাণ করেন।

তন্ত্রমতের ও যাকে বলা হয় Buddhist Tantricism. এজন্ত মহাযান যুগের গুহা-চিত্রে দেখতে পাচ্ছি অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি ও শক্তিদেবী তারা, মামাকী, লোচনা, হেবজ্র, হারিতী প্রভৃতি।

অজন্তা গুহাগুলির নির্মাণ কাজ শুরু হয় হীনযানীদের সময় এবং শেষ হয় মহাযানীযুগে। হীনযানী সমসাময়িককালে অজন্তারও পূর্বে যে সব গুহার সন্ধান মেলে তা হল প্রকৃতপক্ষে অশোকের রাজত্বকালে। তবে সেগুলি হল প্রাকৃতিক গুহা 'বর্ণ সৌশর', 'লোমশ-ঋষি', 'বিশ্বকোপড়ি', 'গোপিকা', 'বহুলিকা' ও 'সীতামারী'। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের নাসিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভাজা, কণ্ডেন, পিঠালকোরা অজন্তার দশমগুহা ও বেদশা, অজন্তার নবমগুহা নাসিক ও কার্লে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এতদ্ব্যতীত ৮, ১২, ১৩ ও ৩০নং গুহা-বিহারগুলিরও নির্মাণকাল হীনযানীদের সময়ে। অজন্তার এই গুহাগুলি আবার দু'ভাগে বিভক্ত চৈত্য বা উপাসনাগৃহ এবং বিহার[৩] বা সংঘারাম শ্রমণদের বসবাসের জন্ত। অজন্তার চৈত্য বা উপাসনাগৃহের সংখ্যা পাঁচটি—৯, ১০, ১৯, ২৬, ও ২৯। বিহারগুলির অধিকাংশই মহাযানীদের সময় নির্মিত। মহাযানীরা ভক্তিমার্গী হওয়ায় বুদ্ধমূর্তি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মূর্তিপূজায় ইচ্ছুক হওয়ায় একাধিকবার তাঁদের যেতে হতে লাগল চৈত্যে পূজাদি নিবেদনের জন্ত—ফলে চৈত্যের নির্জন পরিবেশ হয়ে উঠতে লাগল কোলাহলমুখর যে জন্ত বিহারেও দূরতম প্রান্তে গর্ভমন্দির নির্মাণ করে বুদ্ধ-মূর্তি খোদিত করা হতে লাগল। বর্তমানকালে প্রতিটি আশ্রমসংলগ্ন যে মন্দির আমরা দেখি তাও এই রীতি অনুকরণের ফলশ্রুতি। প্রথম যুগের গুহাগুলি নির্মাণের পর চারশত বৎসরের ব্যবধানে নির্মিত হয় অপর গুহাগুলি (খ্রীঃপূঃ ২০০-৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তখন সাতবাহনদের পর, দক্ষিণে বাকাতক চালুক্য ও উত্তরে গুপ্তবংশের রাজত্বকাল। বাকাতক বংশের সঙ্গে গুপ্ত বংশের ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের (ফাহিয়েনের মতে দেবগুপ্তের) কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বিবাহ হয় বাকাতক বংশের রাজকুমার দ্বিতীয় রুদ্রসেনের। বিবাহের দশবৎসর মধ্যে মৃত্যু ঘটে রুদ্রসেনের—নাবালক পুত্র প্রবর সেনের অভিভাবিকা হন প্রভাবতী দেবী। তখন বিক্রমাদিত্য তাঁর কন্যার নাবালক পুত্রের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনার জন্ত অমাত্যদের পাঠাতে থাকেন বাকাতক রাজ্যে। সেই সময় হতে গুপ্ত-শিল্পকলার প্রচুর প্রভাব পড়তে থাকে বাকাতক শিল্পেও। এই বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতেই সভাকবি ছিলেন কালিদাস। অজন্তা-শিল্পে এজন্ত কালিদাসের ভাষা-বর্ণনার প্রভাবও কম নাই। সে কারণে বাকাতক-গুপ্ত সমন্বয় যুগকে বলা হয় ভারতীয় শিল্প-কলার ক্ষেত্রে 'স্বর্ণযুগ'। আবার সে কারণেই বোধহয় অজন্তার ষোড়শ-সপ্তদশ গুহা-চিত্রে গুপ্ত অঙ্কন-শৈলীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং গুহাগুলির পরবর্তী খনন কার্যের যুগকে চারটি ভাগে ভাগ করলে অসঙ্গত কিছু হবে না :

দ্বিতীয় পর্ব—　৪০০-৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ—৬, ৭, ১৫, ১৬, ও ১৭ নম্বর গুহা-চিত্রে গুপ্ত প্রভাব যথেষ্ট।

৩। বিহারগুলির অধিকাংশই বিহার প্রদেশে। আর চৈত্য গুহাগুলির অধিক সংখ্যা দেখা যায় বেরী মহিলাঞ্চলে।

তৃতীয় পর্ব— ৫০০-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—১৮, ১৯, ও ২০ নম্বর গুহাগুলির ১৯ নম্বর চৈত্য ছাড়া কোন স্থাপত্য চিত্র উল্লেখযোগ্য নয়। অধঃপতনের যুগ।

চতুর্থ পর্ব— ৫৫০-৬০০ খ্রীষ্টাব্দ মাত্র তিনটি বিহার ২১, ২২ ও ২৩ খোদিত হয়।

পঞ্চম ও শেষ পর্বে ৬০০-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই ৪২ বৎসরে খোদিত হল ১—৫, ১৪, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯

দশটি বিহার ও দুটি চৈত্য।

নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা যেমন নির্বাণের পূর্বে দিগন্তলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এই দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালেও তেমনি অজন্তা গুহাচিত্রও পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল যা নির্মিত হয়েছিল। হরিষেনের রাজত্বকালে (বাকাটক বংশের) ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহা-দুটি হয় নির্মিত ও চিত্রিত ৫৭৫-৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—যে দুটিকে বলা হয় অজন্তার স্বর্ণ-পেটিকা (Treasure house)—তাঁর মন্ত্রী বরাহদেব ষোড়শ গুহাটি উৎসর্গ করেছেন বৌদ্ধ-সংঘকে। ঐ বংশেরই রাজকুমার উপেন্দ্রক সপ্তদশ গুহাটিও উৎসর্গ করেন বৌদ্ধ-সংঘকেই। তারপর সপ্তম শতকের শেষপর্ব হতেই এই ধরনের কাজ ও গুহাচিত্র শিল্পন উভয়ই বন্ধ হয়ে যায় ধীরে ধীরে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিহারের অনবদ্য চিত্র-সম্ভার এ যুগেরই সৃষ্টি (দ্বিতীয় পুলকেশী)—এখানে গুপ্ত-প্রভাব অনুপস্থিত, অলংকরণের দিকে ঝোঁক বেশী। এ তো গেল অজন্তার ঐতিহাসিক কাহিনী। এখন অজন্তা আবিষ্কারের ধারাবাহিক বর্ণনার কথায় আসা যাক।

মাদ্রাজ সৈন্যদের দ্বারা অজন্তা-আবিষ্কারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তার পাঁচ বৎসর পরে James E. Alexander নিজাম রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুহাগুলি দর্শন করেন ও তার দেওয়াল-চিত্রগুলিসহ একটি বিবরণ পাঠান 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে। তারপর যান Captain Gresley এবং Ralph ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮২৯। এ সংবাদ প্রকাশিত হয় Transaction এ। তারপর Ralph এর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় 'Bengal Asiatic Society Journal'এ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৬-১৮৪২ সালের মধ্যে জেমস্ ফার্গুসন অজন্তা ও অন্যান্য গুহাগুলি দেখে এসে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'The Rock-cut Temples of India' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে। পরে সেগুলি থেকে ভারতের শৈল-স্থাপত্য বিষয়ে একটি ১২ পৃষ্ঠার বিবরণী পেশ করেন 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'তে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংসদীয় পরিচালকবর্গ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ সেনা-বিভাগের ক্যাপটেন সিলকে নিয়োজিত করেন উক্ত গুহা-চিত্রগুলি অনুচিত্রণের জন্য।

বহু বৎসর যাবৎ (২০ ?) নিরলস পরিশ্রম ও অদম্য কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে সিল প্রায় ৩০ খানিরও অধিক বৃহদায়তন তৈল-রঙা (oil-painting) চিত্র অঙ্কন করলেন। সত্যই তাঁর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৮৬০ (মতান্তরে ১৮৬৬) খ্রীষ্টাব্দে সিডেনহামের ক্রিস্টাল প্যালেসে একটি প্রদর্শনীতে বিস্ময়কর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৫ খানি ছাড়া সব চিত্রগুলিই ভস্মীকৃত হয়ে যায়।

এবার James Furgusson ও Burgessএর প্রচেষ্টায় তৎকালীন ভারত সরকার চিত্রগুলি পুনরাঙ্কনের জন্য বোম্বাই শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জর্জ গ্রিফিথকে অনুরোধ জানান। তিনি তাঁর কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রসহ আসেন অজন্তাগুহায় এবং গুহা-মন্দিরে ১৮৭২-৭৩ ১৮৭৪-৭৫, ১৮৭৫-৭৬ ও ১৮৭৭-৭৮ এই সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে কাজ করে সর্বসাকুল্যে অঙ্কন করেছিলেন ৩৫৫ খানি চিত্র। ভাগ্যের কি পরিহাস! পুনরায় এ চিত্রগুলিরও প্রায় ৫৬টি ব্যতীত সবই ধ্বংস হয়ে যায় আর একটি অগ্নিকাণ্ডে। এই অনন্য প্রতিভার অধিকারী গ্রিফিথই ১৮ বছর পর অদম্য উৎসাহে আবার প্রকাশ করলেন দু'খণ্ডে তাঁর অমর গ্রন্থ "The Paintings in the Buddhist cave of Ajanta—London 1896." যে ছবিগুলি রক্ষা পেয়েছিল ও যেসব স্কেচ্ তাঁর কাছে ভারতবর্ষেই ছিল সেগুলি অবলম্বনে এই গ্রন্থখানিই হল 'অজন্তা-চিত্র' বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ—অধুনা যা একান্ত দুষ্প্রাপ্য। Burgess অজন্তায় আসেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। জেমস্ ফার্গুসন ও বার্জেস্ একত্রে প্রকাশিত করেন 'The Cave Temples of India' নামে অপর একখানি অমূল্য গ্রন্থ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হতে। এটিই এখন অজন্তা বিষয়ে হাতের কাছে প্রাপ্তব্য গ্রন্থ।

এরপর ১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডী-হেরিংহাম ভারতে এসে অজন্তার চিত্র-কলা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কিছুকাল পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আসেন ভারতে—'অজন্তা-চিত্র-কলা'গুলি নকল করার ইচ্ছা নিয়ে। এ কাজে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করেন মিস্ ওরোখিলার্টার। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হয় নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সমরেন্দ্র গুপ্তের কিছু চিত্র "অজন্তা ফেস্‌কোস্ নাম দিয়ে—লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি" হতে।

বাংলাদেশের শিল্পীমহলে অজন্তা-চিত্র সম্ভারের সংবাদ পৌঁছতেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার সমরেন্দ্র গুপ্ত ও মুকুল দে—এইসব শান্তিনিকেতনের শিল্পী গোষ্ঠী যাত্রা করলেন অজন্তার উদ্দেশে—নিয়ে এলেন অজন্তার বহু অনুচিত্র। মুকুল দে প্রথম আসেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। পরের বছর দ্বিতীয়বার। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হতে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ "My Pilgrimage to Ajanta and Bagh."

এখন হিসাবমত দেখা যায় যে সৈন্যাধ্যক্ষ হবার্ট গিল যখন অজন্তা-চিত্রের অনুচিত্রন করতে গিয়েছিলেন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, মনে হয়, তখন অজন্তা-গুহাচিত্রগুলি সবই ছিল অক্ষত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ বার্জেসের সময় ১৬টি গুহাতে চিত্র ছিল অক্ষত। বর্তমানে মাত্র ছয়টি গুহায় চিত্র আছে আংশিক অক্ষত। সেগুলি হল ১, ২, ৯, ১০ ও ১৬, ১৭ গুহা।

ইতিমধ্যে নিজাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে ডঃ গোলাম ইয়াজদানীর সম্পাদনায় ১৯৩১-৪৫ সালের মধ্যে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয় অজন্তার একটি এ্যালবাম্। এটিও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অন্যতম।

●

The Cave Temples of India—James Furgusson & James Burgess.
অজন্তা অপরূপা, শ্যামাপ্রসাদ সান্যাল। (বিশেষ সাহায্য নিয়েছি)
Buddhist Monasteries in the Western Himalaya—Romi Khosla.

॥ প্রণাম হয়ে ॥

(গান)

শ্রীশান্তশীল দাশ

একটি প্রণাম হয়ে আমি
রইবো মা তোর চরণ তলে,
দেব আমার পূজার ডালি
যেদিন ভরা নয়ন জলে।

এই জীবনের অনেক আশা
গেল না তার জাগার ভাষা ;
মনের মাঝেই মিলিয়ে গেল
ব্যথার ভারে পলে পলে।

সব হারিয়ে এখন মা তোর
শরণ নিলাম ওই চরণে,
আমার দুখের মালাখানি
গাঁথবো আমি আপন মনে।

দেব তুলে দু'হাত ভরে
মা তোর রাঙা চরণ 'পরে ;
সকল পাওয়া শেষ হবে মোর
পূজা আমার সাঙ্গ হলে

●

॥ গান ॥

সুর—জীবনশ্রী

শ্রীমতি অনুরাধা বিশ্বাস

মাগো, শূন্য আমার জীবনটাকে
ভরা করে আজ পূর্ণ কর,
তুচ্ছ যত দান অভিমান
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ কর।

আমি মুখে বলি এক
কাজে করি আর,
সদা ভাবের ঘরেতে
চুরি যে আমার

এ যাতনা তো সহে না আর।
এ অধমে মাগো করুণা কর।
তুই, সত্যেরও মা অসত্যেরও মা
সকল দোষ যে করিস্ ক্ষমা
তাই, অপরাধের বোঝার ডালি
রেখেছি তোর চরণ 'পর।
তোরে, সবাই পূজে কুসুম জলে
আমি পূজি' অশ্রু জলে,
আমার আঁধার জীবন-পথে
তোর করুণা-আলো তুলে ধর।

●

॥ ভারত-সংস্কৃতিতে বনচেতনা ॥

ডক্টর শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বহু বৈচিত্র্যে মণ্ডিত এই সৃষ্টি প্রকল্প পরিপূর্ণ হয়ে আছে বহু বিভিন্ন চেতন সত্তায়। ভারতীয় সৃষ্টি জিজ্ঞাসা এই বহু বক্ত্র চেতনা সমূহের অন্তরালে এক অখণ্ড চেতনসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে সেই চেতনা সমষ্টি ও তার স্রষ্টা ও নিয়ন্তাকে এক এবং অদ্বিয় রূপে গণ্য করেছে দেখা যায়। এই উপলব্ধি থেকে ভারত-মানস কেবল মানুষে মানুষে ঐক্য ও পরস্পর নির্ভরশীলতার কথাই স্বীকার করেনি, ভারত প্রজ্ঞা মনে করেছে প্রাণী এবং উদ্ভিদ সমূহে যে প্রাণচৈতন্য ক্রিয়াশীল তাও মানব প্রাণচৈতন্যেরই সমধর্মী এবং মূলত এক। এই উপলব্ধি থেকেই ভারত সংস্কৃতি ধারায় মানব অস্তিত্বের পাশাপাশি পশু ও উদ্ভিদকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই অখণ্ডের অংশীদাররূপে, এবং তার বৈশিষ্ট্য, উপযোগীতা এবং তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাও প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় চেতনা ধারায় দেবতাকে মানুষের আকৃতিতে পরিকল্পনা করা হয়েছে সচরাচর এইটাই অনেক ক্ষেত্রে এইসব প্রতিমাতে অবশ্য দেখা যায়। একাধিক মাথা বা দুটির বেশি হাত দেখতে পাওয়া যায়। এই বহু মাথা বা হাত সম্বলিত দেবমূর্তি যেমন দেবতার অতিমানবীয় ক্ষমতার দ্যোতকরূপে গণ্য হয়ে থাকে। তেমনি অতিমানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আকৃতিতেও ভারতীয় দেবতার পরিকল্পনার অভাব নাই। বরাহ ও নৃসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণুর পরিকল্পনা সুপরিচিত। হস্তীমুণ্ড গণেশ যেমন অতিজনপ্রিয় দেবতা, পুরাণের এক কাহিনী অনুসারে ভগবান বিষ্ণুও নাকি অশ্বমুণ্ড গ্রহণ করে হয়গ্রীব নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিষ্ণু যে প্রয়োজন হলে মৎস্য বা কূর্মের রূপও গ্রহণ করতে পারেন এও সুবিদিত। ঋগ্বেদে ত' অনেক দেবতাকেই হয় পশু বা পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছিল দেখা যায়। পরে পুরাণকারেরা এই পশুবৃত্তকে দেবপ্রতিমার সঙ্গে বাহনরূপে সংযুক্ত করে মানব ও পশু সত্তা যে দেব সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। মানুষ ও পশু সত্তার মূল চৈতন্য যে সমস্ত চৈতন্যসত্তারই অচ্ছেদ্য অংশ, পরিচিত বৈদিক ও পৌরাণিক আখ্যান ও পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত দেবপ্রতিমা দেখলে সহজেই তা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই উপলব্ধিতে উদ্ভিদেরও যে একটা স্থান আছে সে-চেতনাকে অনেক সময়েই এখন আর তেমন মর্যাদা দেওয়া হয়না। এই উপলব্ধি মানুষ ও পশুসম্পর্কিত চেতনার মত ততটা ক্রিয়াশীল বা সচেতন না থাকলেও বৃক্ষও যে ভারতীয় উপলব্ধিতে যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল তারও প্রমাণের কোন অভাব নাই। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতীয় চিন্তায় উদ্ভিদসত্তা সম্পর্কে এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ তার আবির্ভাব কাল থেকেই চার দিকে পরিব্যাপ্ত পরিবেশে পশুপক্ষী ও বৃক্ষের উদ্ভব ও অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা অনুভব করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বিপুলায়তন এবং অমিতশক্তি সম্পন্ন পশু এবং পক্ষী যেমন মানুষের বিস্ময়ের কারণরূপে গণ্য হয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে যেমন দেবত্ব আরোপিত হয়েছে তেমনি

পশু এবং বৃক্ষের ক্ষেত্রেও অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। এই অলৌকিকত্ব আরোপের কারণ অনেক সময় সেই বিশিষ্ট মানুষ, পশু বা বৃক্ষটির অসাধারণত্ব; আবার অনেক সময় এই অসাধারণত্ব পরিকল্পিত হয়েছে ভীতি থেকে কিম্বা তার বিপরীত সেই বিশিষ্ট উদ্দিষ্ট থেকে পাওয়া কোন উপকার থেকে। এই উভয় কারণেই বোধ হয় কোন কোন গাছ ভারতীয় চিন্তায় বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

এই সব গাছের মধ্যে অশ্বত্থ গাছের বিশিষ্ট মর্যাদা খুব প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্বর্তী সিন্ধুপ্রদেশের হরপ্পাও মহেঞ্জোদারো থেকে এক সুপ্রাচীন সভ্যতার বহুপ্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরে ভারতের বহু অঞ্চল থেকেও ঐ সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক উপকরণ পাওয়া গেছে। ঐ সব উপকরণে যে সব লক্ষণ ও চিহ্ন দেখা গেছে তার সঙ্গে পরবর্তী যুগের চলে আসা সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য থাকায় সেই হরপ্পা সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতা ধারার এক সুপ্রাচীন অভিব্যক্তি বলে ধার্য করা হয়েছে। এই হরপ্পা সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত নানা জিনিষের মধ্যে এক ধরনের শিলমোহর বহু সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এই ধরনের কতকগুলি শিলমোহরে অশ্বত্থ গাছের ডাল এবং অশ্বত্থ পাতার প্রতিরূপায়ণ দেখা যায়। এই সব শিলমোহরে অশ্বত্থের ছবি থাকায় পণ্ডিতেরা মনে করেছেন যে হরপ্পা সভ্যতার আমলে অশ্বত্থগাছকে পবিত্র ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্নবলে মনে করা হত এবং সম্ভবত পূজাও করা হত। হরপ্পা সভ্যতার নানা কেন্দ্র থেকে শিলমোহরে যে সব মানুষ এবং পশুমূর্তি পাওয়া গেছে তার অনেকগুলিকেই সেযুগে প্রচলিত বিভিন্ন দেবতার প্রতিরূপ বা প্রতীক বলে মনে করা হয়েছে। এই সব মূর্তির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে গাছ, বিশেষ করে অশ্বত্থ গাছের ছবিও দেখা যায়। এই ধরনের একটি শিলমোহর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মোহরটির উপর চৌকো বিন্যাসে একটি দৃশ্যচিত্র দেখানো আছে। দৃশ্যটি উপরে নীচে দুই অংশে ভাগ করা। উপরের অংশের ডান দিকের কোণে দুই শাখা বিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ গাছ যেন একটি অর্দ্ধ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে; এই অর্দ্ধমণ্ডলের মধ্যে দেখান আছে একটি স্থির হয়ে দাঁড়ান মানুষের মূর্তি যার মাথায় তিনটি শিংএর আকৃতির একটি শিরোভূষণ। এই মূর্তির সামনে হাঁটুমুড়ে বসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে বা পূজা করছে অন্য একটি মানুষ যার পেছনে উপরদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি চতুষ্পদ পশু, যার মুখটা অনেকটা মানুষের মত। ফলকটির নীচের অংশে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাতটি মানুষকে দাঁড়ান অবস্থায় দেখান হয়েছে। এই চিত্রফলকটির কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখনও কেউ দিতে পারেনি। তাতে অর্দ্ধমণ্ডলরূপে দেখান অশ্বত্থ গাছের অভ্যন্তরস্থ মূর্তিটি যে কোন উপাস্য দেবতার মূর্তি এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অনস্বীকার্য। এই সূত্রেই এই দেবতাকে অশ্বত্থগাছের সঙ্গে অভিন্ন বলেই গণ্য করা হত বলেই মনে হয়। ভারতভূমিতে উদ্ভূত মহীরুহকুলের মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষ যে সেই সুপ্রাচীন কালেই এক তুলনাহীন মর্যাদা লাভ করেছিল এই ফলকচিত্রটি তার এক অকাট্য প্রমাণ। হরপ্পা সভ্যতার অন্য অনেক শিলমুদ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের প্রতিরূপায়ণ দেখা যায়। স্বভাবতই মনে হয় পরবর্তী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনায়

বৃক্ষ সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ দেখা দিয়েছিল সেই হরপ্পা-সভ্যতাযুগেই তার সূত্রপাত ঘটেছিল।

বৃক্ষে দেবত্বের আরোপ বৈদিক সভ্যতায়ও বেশ ভালভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ঋগ্বেদের অনেক অংশে বিশেষ করে দশম মণ্ডলে বৃক্ষের নানা উপযোগীতা এবং সেই সঙ্গে বৃক্ষে আরোপিত দেবত্বেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৭তম সূক্তে অশ্বত্থ ও পলাশবৃক্ষে দেবতার অধিষ্ঠান আছে বলে উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে এবং পরে অথর্ববেদে কোন কোন উদ্ভিদের ভেষজগুণের উল্লেখ এবং সেই সূত্রে সেইসব গাছের পবিত্রতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। (ঋগ্বেদ ১০।৯৭; অথর্ববেদ ১১।২৫ ইত্যাদি)। এই বৈদিক সাহিত্যেই নানা উদ্ভিদের বহু রকমের উপযোগীতা, ভেষজ শক্তি, ফল ও মূলের প্রাণসংরক্ষনের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি বিভিন্ন গাছ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার ভাবও লক্ষ্য করা যায়। অতীতে গাছ সম্পর্কে যে সব ধারণা প্রচলিত ছিল তাতে দেখা যায় যে কোন কোন গাছকে অত্যন্ত চেতনা সম্পন্ন জাগ্রত, শ্রবণক্ষম এবং প্রসাদ প্রদানের বা অভীষ্ট দানের ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হত। এই বিশ্বাসের থেকেই কোন কোন উদ্ভিদ ও বৃক্ষের পূজার প্রচলন হয়েছিল। বৃক্ষলতার যে অন্যান্য প্রাণীর মতই স্বার্থানুভূতি আছে এ বোধও ঋগ্বেদের আমলেই উদ্ভূত হয়েছিল। (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ১২৭ সূক্ত)। এই সব বিশ্বাস থেকেই প্রার্থনাপূরক কল্পবৃক্ষের পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। মধ্যপ্রদেশে বেসনগর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকের পাথরের তৈরী প্রায় দুই ফুট উঁচু একটি গাছকে পণ্ডিতেরা এই কল্পবৃক্ষের প্রতিরূপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই গাছের তলাটি একটি চতুষ্কোণ বেদীর উপর স্থাপিত। গাছকে পবিত্র বা দৈবশক্তি সম্পন্ন বলে গণ্য করা হলে সেই ধরনের গাছের তলায় ঐরকম বেদী করে দেয়ার রেওয়াজ সারা ভারতেই, প্রায় বিস্তার লাভ করেছিল। এই ধরনের বেদীতে সন্নিবিষ্ট গাছকে 'বৃক্ষচৈত্য' বলা হত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের গাছের তলায় ফুল, জল নৈবেদ্য দিয়ে পূজারও প্রচলন ছিল: ভগবদগীতায় দেখা যায় যে ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে গাছের মধ্যে অশ্বত্থ বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ভগবান কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে কদম্ববৃক্ষের এবং তমাল বৃক্ষেরও বিশেষ যোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরামের প্রতীক হিসাবে তালবৃক্ষের ব্যবহার আছে।

সাংস্কৃতিক পরিকল্পনায় বৌদ্ধমানসিকতা বৃক্ষচেতনাকে এক বিশেষ সমৃদ্ধি দিয়েছিল। এই চেতনা তাঁরা ব্রাহ্মণ্য মনন থেকেই গ্রহণ করে থাকলে ও এই পরিকল্পনাতে তাঁরা কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যোগ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে বৃক্ষসান্নিধ্য অত্যন্ত অন্তরঙ্গ রূপ নিয়েছিল দেখা যায়। বুদ্ধজননী মায়াদেবী সন্তান জন্ম আসন্ন হলে পিতৃভবন উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে এক শালবনে প্রসব কাল সমুপস্থিত হয়; শিবিকা থেকে অবতরণ করে মায়াদেবী এক বিপুলায়তন শালবৃক্ষের নীচের দিকের একটি শাখা হাত ধরে দাঁড়ালেন; আকাশ মার্গ থেকে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা সেখানে সমুপস্থিত হয়ে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের জন্মক্ষণটিকে মহিমান্বিত করে তোলেন। জীবজগতের দুঃখবিমোচনের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মপ্রবাহের অবসানে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধের অন্তিমকাল উপস্থিত হলে এখানেও এক বিস্তৃত শালবীথি ভগবানের শেষ শয্যায় আশ্রয় বিধান করে। জন্ম ও মৃত্যুর লগ্নে শালবৃক্ষের এই সান্নিধ্য বৌদ্ধ কাহিনীকারেরা যেমন বিশিষ্টতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তেমনি উচ্চবিশিষ্টতা দিয়েছেন তাঁরা কল্পনীয় সান্নিধ্যে এক পিপ্পল বৃক্ষের মূলে বজ্রাসনে উপবেশন করে সন্ন্যাসী গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভকে। স্বভাবতই বৌদ্ধরা এই মহান পিপ্পল বৃক্ষকে ভগবান গৌতমের বুদ্ধত্ব অর্জনের পার্থিব প্রতীক রূপেই চিহ্নিত করেছিল এবং যতদিন ভগবান বুদ্ধের কায়িক প্রতিমা রূপ গ্রহণ করেনি ততদিন অতীতের চৈত্যবৃক্ষের মতই বৃক্ষমূলে বজ্রাসন সম্বলিত এই বোধিপ্রতীক পিপ্পল বৃক্ষকেই তারা ভগবান বুদ্ধের দ্যোতক বলে উপযুক্ত মর্যাদা ও পূজার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধসমাজের পরিকল্পিত বিপশী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনিও কাশ্যপ এই ছয় পূর্বতন বুদ্ধও ছয়টি উল্লেখনীয় বৃক্ষমূলে সিদ্ধি বা বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন এই ধারণা প্রচার লাভ করে। এই বৃক্ষগুলি ছিল যথাক্রমে পাটলী, পুণ্ডরীক বা আম্র, শাল, শীরীষ, উদুম্বর এবং ন্যাগ্রোধ বা বট। বৌদ্ধরা এইভাবে যে কয়টি বৃক্ষকে তাঁদের সংস্কৃতিতে বিপুল মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার সবকয়টিই প্রাচীনতর ভারত সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য মর্যাদা লাভ করেছিল হরপ্পামুদ্রের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এবং বৈদিক এবং বেদপরবর্তী সাহিত্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক সময়ে বিস্তীর্ণ বনভূমিকে বৃক্ষবিমুক্ত করে কর্ষণ ক্ষেত্রে পরিণত করার প্রয়োজন ঘটলে প্রকৃতির এই অকৃপণ দানের উপর মানুষ আক্রমণ আরম্ভ করে। নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে বনকে উৎসাদন করা সমাজের পক্ষে শুভপ্রদ হয়নি এ বোধ থেকেই জন্মেছিল বৃক্ষের মর্যাদা, প্রয়োজনহীন বৃক্ষচ্ছেদনের উপর নিষেধাজ্ঞা। বনস্পতি সম্পর্কেই এদেশে মানুষের মনে এমন শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভাবের সঞ্চার করা হয়েছিল যার ফলে একান্ত প্রয়োজন না হলে বৃক্ষচ্ছেদন প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আবার নূতন বৃক্ষ রোপণের জন্য বিহিত হয়েছিল প্রভূত পুণ্যার্জনের সম্ভাবনা।

এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ধারায় উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে সমীহা শ্রদ্ধা ও অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। উদ্ভিদে উপস্থিত প্রাণচৈতন্য সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় এবং ভিন্ন ভিন্ন গাছের নানা উপযোগীতা ও ভেষজগুণ সম্পর্কে জ্ঞান থেকেও এদেশে গাছের প্রতি মর্যাদা আরোপ ঘটেছে। আবার নানা প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদনের প্রয়োজনীয়তা ও তারা অস্বীকার করেনি। এই প্রয়োজন ভিত্তিক বৃক্ষচ্ছেদন ও যাতে বৃক্ষসম্পদ অকারণে বিনষ্ট না হয় এই উভয়ের উপযুক্ত সামঞ্জস্য

সম্পাদন করবার জন্যই বৃক্ষজীবনের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা আরোপ করা হয়েছিল। এখন পর্যন্তও গ্রাম সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের গাছের উপর গ্রামসমাজের আকর্ষণ নানা ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে দেখা যায়। এই আকর্ষণ এক প্রবহমান সংস্কৃতি ধারারই অঙ্গ; বর্তমানে নূতন করে সমাজে বনসংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের আন্দোলন দেখা দিয়েছে। অতীতে এই বৃক্ষচেতনা সমাজে কি অপরূপ কৌশলে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছিল বর্তমান আন্দোলনের প্রভাবের একান্ত দুর্বলতা দেখে তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ●

আমাদের
শুভেচ্ছা জানাই
★
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১
রেজিঃ অফিস : ৭, হেস্টিংস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

IN CHERISHED MEMORY OF MY
BELOVED HUSBAND

SHRI NITAI CHANDRA ROY

WHO LEFT FOR HIS HEAVENLY ABODE
A YEAR AGO

MAY HIS SOUL REST IN PEACE

By
Smt. Sefali N. Roy

নির্ম্মল লেখার কলম

বিশিষ্ট সাংবাদিক
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—
নির্ম্মল পেন ব্যবহার করে আমি
অত্যন্তিক খুশী। বাজারে কিরী হলেও
খুব কম এই ধরণের পেন যেখানেখানে
খাপ্পাপ ব্যবহার করতে পারেন।

নির্ম্মল পেন

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার বলেন—
আমি দীর্ঘদিন যাবৎ নির্ম্মল পেন
ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহার বিষয়ে
সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই পেন ব্যবহারে যে
যে বিষয়ে সন্তুষ্ট হইবেন সে বিষয়ে
আমি নিঃসন্দেহ।

নির্ম্মল ষ্টোর্স
২, শ্যামাচরণ মল্লিক লেন • মণিহারিপট্টি • বড়বাজার • কলিকাতা-৭

SUSANTA DAS & BROS

Manufacturers of

Dies, Punches, Press Jobs, Valve

WASHER SPRING.

Electrical & Mechanical Parts ETC.

★

3, BANERJEE PARA ROAD,
SARSUNA
CALCUTTA-700061

র‍্যালীর সার এবং কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করুন

★

RALLIS INDIA LIMITED

FERTILISER & PESTICIDES DIVISION

16, HARE STREET

CALCUTTA-700001

Phone : Office : 55-6621
Factory : 55-1861

With the best Compliments of :—

LEONARD CARD-BOARD BOX FACTORY (P) LTD.

Art Printing, Card-Board Makers
Corrugated Board & Box
Manufacturers

Office :
29A, Aurobinda Sarani
Calcutta-5

Factory :
1-1, Galiff Street,
Calcutta-3

With Best Compliments From :

J.K. STEEL (A Division of J.K. Synthetics Ltd.)

7, COUNCIL HOUSE STREET,

CALCUTTA 700 001.

TELEGRAM : 'BALINGHOOP'

TELEPHONE : 23-6181 (7 Lines)

- JUTE BALING HOOPS
- BOX STRAPPINGS
- COLD ROLLED STRIPS
- CABLE TAPES
- HIGH CARBON WIRES & STRANDS
- MILD STEEL WIRES
- WIRE ROPE SLINGS
- STEEL WIRE ROPES

Phone 24-1592

REYNOLD'S

Patent

Products Manufactured by

NATIONAL ASBESTOS CORPORATION

98, MIDDLE ROAD, CALCUTTA-700 014

STEAM. HYDRAULIC

&

RUBBERISED PACKING HEAT-INSULATING 85% MAGNESIA

With Compliments of :—

ASCON CONTROLS

21, GOUR LAHA STREET

CALCUTTA 700006

Phone : 33-1609

With Compliments of :—

CHANDRA KANTA, MANNA & CO. (PRIVATE) LTD.

★

IRON & HARDWARE MERCHANTS

Govt. Controlled Stockists for Iron and Steel

20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-700007

With Best Compliments of :

BRITISH ELECTRICAL & PUMPS PRIVATE LTD.

4, B, B, D, BAG EAST.
CALCUTTA-700001

Grams :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	0212426	22-7826,27,28, & 23-8714

Phone : 55-4096

TARU ELECTRIC STORES

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS AND CONTRACTORS.

Office & Workshop :

17/1, BHIM GHOSH LANE, CALCUTTA-6

Different types of Oil Engine, Dynamo, Electric, Motor, Pump, Fan, Etc. are available on hire and repairing done at moderate rates.
We also supply every type of electrical installation.
House-wiring is our speciality. Trial requested.

With Best Compliments of :—

ECONOMIC ROADWAYS CORPORATION

P-9, NEW C. I. T. ROAD,
CALCUTTA-700 073

★

Phone : 27-7704 7214

Booking Office :
Phone : 27/3534, 69-2414

Delivery Office :
Phone : 55-0515

Phone : 36-1297

THE ARTISAN

107/A, B. B. GANGULI STREET,
CALCUTTA-700012

DESIGNERS, BLOCK-MAKERS & COLOUR PRINTERS

Phone : 26-7168

With Best Compliments of :—

CHATTERJEE BROTHERS

NO. 7, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1

DEALERS IN PHILIPS LAMP AND RADIO
DISTRIBUTOR OF VENUS WATER HEATER &
ALL KINDS OF ELECTRICAL GOODS.

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন · ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুতকারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও 'JECY' ব্রাণ্ড
পলিথিন পাইপ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা - ৭০০০০৯

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-৩

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধাবলী

ডাঃ সেন্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

WE ARE IN THE GOOD BOOKS OF WHOM WE DELIVER THE GOODS
YOUR LARGER OPERATIONS REQUIRE OUR LARGER TRANSPORTATION NET-WORK

INDIAN ROADWAYS CORPORATION

1, SUNYAT SEN STREET,
CALCUTTA-700 012

Telephones : 26-5110 (5 Lines)
26-7551
27-6345

Telex : 021-7010
Gram : INDROADCOR
CALCUTTA

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN.

Cable : CASTINGS

ফোন : ৫৫-৬০৫৩

এ, এম, দে এ ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :
SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসব ও ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, সংযম ও শৃংখলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোনো রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চাঁদা আদায়ের নামে কোনো ধরণের জুলুম যাতে কেউ করতে না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের উপর উৎসবের এলাকাকে সম্প্রসারিত করবেন না—কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাইক্রোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখুন ও তা আরো সম্প্রসারিত করুন। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

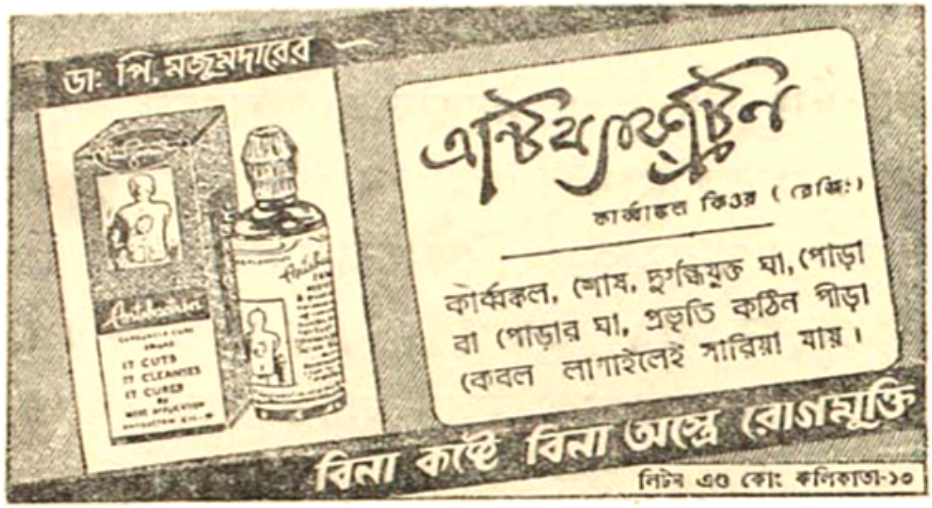

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

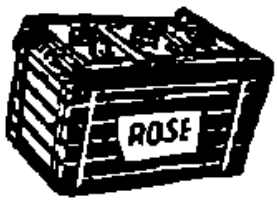

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

[illegible]

INCAB

INCAB HAS OVER SIXTY YEARS' EXPERIENCE IN ELECTRIC CABLEMAKING

From its pioneering venture in 1920 INCAB has played a dynamic roll over its 60 years of life. INCAB product research and development teams study and keep abreast of technological progress in other countries and manufacture the largest range of product required for generation, transmission distribution and utilisation of electrical energy.

★

THE INDIAN CABLE COMPANY LTD.

QUALITY CABLEMAKERS—FIRST AND FOREMOST,
PARAPEX Power Cables—the latest from INCAB carry more power with reliability.

Phone : 34-7399

S. SARKAR & BROTHERS

72 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

ORTHOPÆDIC & DEFORMATIC APPLIANCES

Manufacturers of

Artificial Limbs. Deformatic Shoes. Walking Calipers, Spinal Braces, Lumber Corsets, Hernia Trusses. Abdominal Belts Cervical Collars Etc.

Specialist in ARTIFICIAL LIMBS

Gram : Holselti

Phone : 26-2403, 27-2404, 27-9811

B. K. SAHA & BROS LTD.

TEA MERCHANT

5, POLLOCK STREET, CALCUTTA-700001

(We have No Branch)

বেনারসী সিল্ক সাড়ী পোষাক

শৈলবালা মণিলাল

স্টোর্স

১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি-১২

(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)

বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানা হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

৪০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য মূলগ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রী-ম কথিত

(৫ম খণ্ডে সমাপ্ত) মূল্য : প্রতি সেট : কাপড় ৭০ টাকা, বোর্ড ৬০ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার ভাণ্ডারী, তাঁর "আদিষ্ট" ভাগবতকার হলেন শ্রী-ম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। "কথামৃত" শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলেন শ্রীম'কে—"তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন"। স্বামীজী উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, "...এখন বুঝিলাম...এই মহান ও বিশাল কার্যের জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনীষী Romain Rolland বলেন, Sri M's work is of Stenographic exactitude. মনীষী A. Huxley বলেন, Sri M's work is Unique in the World's literature of bagiography ইত্যাদি।

প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)

১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০ ০০৬। ফোন : ৩৫-১৭৫১।

Space Donated by :—

NABIN TIMBER WORKS

1, RADHA KRISTO SETT STREET,

CALCUTTA-700 006

Phone : 55-4044

With Compliments of :

S. K. Bhattacharyya & Co.

ARCHITECT • ENGINEER • CONTRACTOR

37A, B. K. PAUL AVENUE,

CALCUTTA-700 005

With Compliments from :

M. A. Electric Works

ELECTRICAL ENGINEERS

Specialist in—All Sorts of Rewinding

74, Rafi Ahmed Kidwai Road,

CALCUTTA-700 016

Phone : 55-2626
64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004

(Front of Shyambazar Tram Depi)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timestar, Shreeshyla, Sandoz, Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কে, হোড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে

চুল উঠা বন্ধ করে।

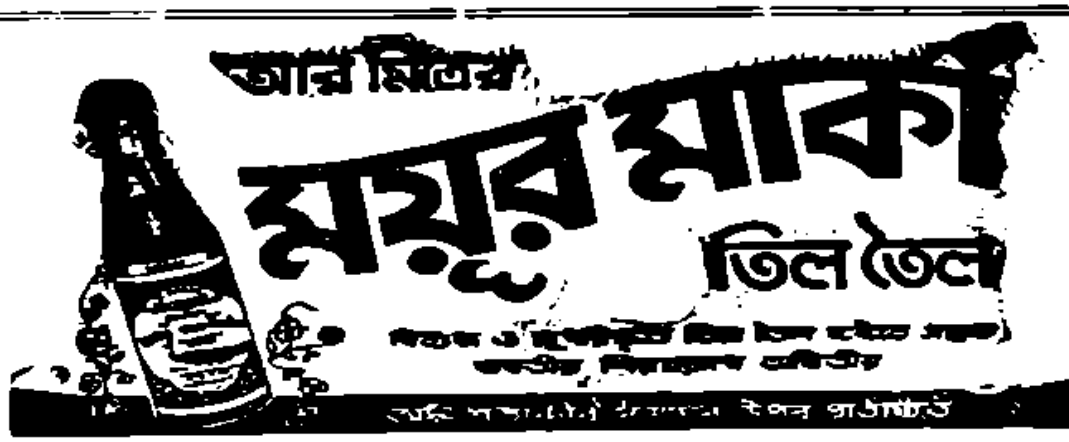

ফোন : ৩৫-২১৪৫

সৌন্দর্যের প্রতীক

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

যাবতীয় বাইণ্ডিং ও কার্টুন কাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনের কিনিবেন
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ লিঃ
৮।২, এস্‌প্লেনেড, কলিকাতা-১
উহাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

Telegram : "BRASSINGOT Calcutta
Tele : { Office & Factory 24-3254 / City Ofsice 33-5114

BENGAL METALS & ALLOYS
MANUFACTURERS & FOUNDERS
OF
INDUSTRIAL-NON-FEROUS-METALS-ALLOYS & CASTINGS
to BSS : ISS : ASTM Specification.

City Office
26, Ram Sebak Mallick Lane,
Calcutta-700 007

Regd. Office & Factory :
19, South Tengra Road,
Calcutta-700 046

"আমার হাতে যেটি তোমরা দেখছ সেটি একটি ধানের শীষ। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা আরো বড় বড় ধানের শীষ দেখতে পেতাম। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এই মাটি আমাদের খাদ্য দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর আমরা যেসব আবর্জনা ফেলছি তাতে তার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হচ্ছে না। তাই আমাদের সেই পুরনো দিনের ধান আর ফলছে না।" —রবীন্দ্রনাথ

এই জমির অভাব পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুষ্টি সাধন। তাই আমরা বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অনুরূপ জমির নিশ্চিত আশ্বাস।

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড
বিপণন বিভাগ,
৪১ নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-৭০০০৭১

এই প্রতীক কী এবং কেন?

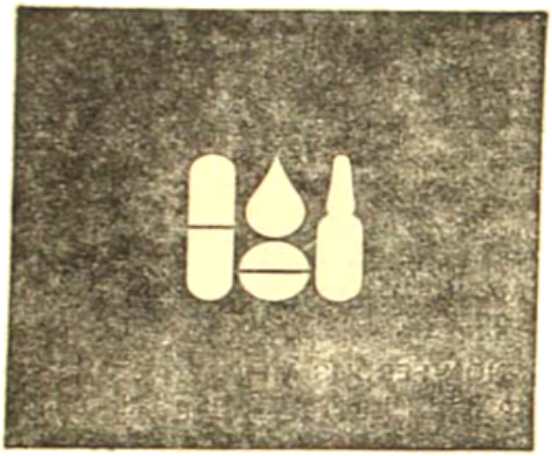

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ই-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর পোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসাথে মুমূর্ষুর সাড়া দেবে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড
আপনাদের সেবায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭৯

EIPCAL/BEN/1

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-সৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৬১, মির্জাগালিব স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এ সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, শ্রাবর্ধ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	১০·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট দপার-অক্-নিষ্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

★

APPRECIATION

We extend our heartiest appreciation to all our well-wishers, particularly to those concerns whose co-operation and contributions in the shape of advertisements and donations have made possible the publication of this Puja Special of VISVAVANI at a nominal price.

Wishing all of them peace and happiness.

With the best Compliments of :

BARINDRA KUMAR PAUL

25C, SWALLOW LANE

CALCUTTA-700 001

With the best Compliments of :

DIPAK MUKHERJEE

25, BIPLABI PULIN DAS STREET

CALCUTTA-700 009

With the best Compliments of :

DECORINA

59, SIMLA STREET

CALCUTTA-700 006

DESIGNER, Interior Decorator and Quality Furniture Makers.

With the best Compliments of :

O SICERIN & BIVA

86B & C, JATINDRA MOHAN AVENUE
CALCUTTA-700 005

STOCKIST OF GLAXO PRODUCTS
&
MANUFACTURERS OF QUALITY FILTER PAPER
FOR
RESEARCH, INDUSTRY, EDUCATION

Phone : 55-5893 **Gram : Filterort**

With best Compliments from :

SRI MA TRADING & FINANCE

45, LENIN SARANI, CALCUTTA

EXPORTERS & IMPORTERS
GENERAL ORDER SUPPLIERS, INVESTORS AND
COMMISSION AGENTS

With best Compliments from :

WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LIMITED

(A GOVT. COMPANY)

MANUFACTURERS OF :

RAILWAY & ROAD BRAKES AND SIGNALLING EQUIPMENTS, AGRICULTURAL PUMPS, POWER TILLERS AND OTHER ALLIED ITEMS.

17, CONVENT ROAD, ENTALLY, CALCUTTA-700 014
Phone No : 24-7161 (7 Lines), Telegram : INTERLOCK
Telex : 021 2348

With best Compliments from :

HINDUSTHAN EQUIPMENTS

119/3, N. S. DUTTA ROAD

HOWRAH

With Best Compliments from :

Westinghouse Saxby Farmer Limited

(A GOVT. COMPANY)

MANUFACTURERS OF :-

RAILWAY & ROAD BRAKES AND SIGNALLING EQUIPMENTS, AGRICULTURAL PUMPS, POWER TILLERS AND OTHER ALLIED ITEMS.

17, CONVENT ROAD, ENTALLY, CALCUTTA-700 014
Phone No : 24-7161 (7 Lines). Telegram : INTERLOCK
Telex : 021 2348

Space Donated By :—

ALLIED ABRASIVE & Co.

SERAMPORE

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
PUJA SPECIAL NUMBER
43rd Year, October 1981
VOL. VIII

Regn. No. WB/NC-14
PHONE 55-1800

26 OCT 1981

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্যাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৫০১৯৩, ৩২৬১৬২, ৩৩১২৩২
Cable:"Cookumpore","Queensplace"
Telex:021 2691 A/B Cooh
Post Box:Burrabazar 6085 Calcutta-70

iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-70000
PRICE Rs. 7.00 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য সাত ট

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রকাশানন্দ
সহসম্পাদক : শ্রীআশুতোষ লোক

সাতচল্লিশ বর্ষ - নবম সংখ্যা
কার্তিক ১৩৮৮

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে যত্রিন 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

ছুটির বার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

WE ARE IN THE GOOD BOOKS OF WHOM WE DELIVER THE GOODS
YOUR LARGER OPERATIONS REQUIRE OUR LARGER TRANSPORTATION NET-WORK

INDIAN ROADWAYS CORPORATION

1, SUNYAT SEN STREET,
CALCUTTA-700 012

Telephones : 26-5110 (5 Lines)
26-7551
27-6345

Telex : 021-7010
Gram : INDROADCOR
CALCUTTA

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৫৫-৬৩৫৩

এ, এম, দে এ ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS CALCUTTA-700005

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অমরত্ব অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :
SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

ফোন : ৪৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিবাদীবাগ সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'জয়ন্তী বিল্ডিংস'

৫২-বি, শ্রীবর্ষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৮-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃ৪ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	৭·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

প্রদেয় কর
চটপট জমা দিলে

★ অর্থদণ্ড বা শাস্তির ভয় থাকে না
★ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় থাকতে হয় না
★ দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দেওয়া হয়
★ দেশ গঠনের কাজে সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করা যায়

কর দেবার শেষ তারিখ
একটা আছে সত্যি, কিন্তু

শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি ?
দীর্ঘসূত্রতা থেকেই গাফিলতি ঘটে
ঠিক মতো কর দিন
দেশের শক্তি গড়তে দিন

ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন
(রিসার্চ, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশান্স)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

ডিএভিপি ৮১/১৫০

সার্বজনীন পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৪-১৮০০

কার্তিক, ১৩৮৮

সম্পাদক : স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস্
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Phone : 55-2526
64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004

(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timestar, Shreeshyla, Sandoz Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

'আর মিত্রের'

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, ডাঃ জগন্নাথ মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • নাগপুর • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৮৮

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৩৭৯	
২।	বলরাম-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৮৮	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ অভেদানন্দ	৩৯৩	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	বুদ্ধ ও কপিল স্বামী অভেদানন্দ	৩৯৫	অনুবাদক : কৃপতিমোচন মুখোপাধ্যায়
৫।	আগমনী গান : কমলাকান্ত	৪০০	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে : শশধর তর্কচূড়ামণি	৪০৩	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭।	ভাবভাষ্য স্বামী বিবেকানন্দ	৪০৮	শ্রীনাচিকেতা ভরদ্বাজ
৮।	শ্রীদের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	৪১১	শ্রীতপন কবিরাজ
৯।	সিংহলচুর পাদদেশে কয়েকটি দিন	৪১৪	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৪১৭	
১১।	গ্রন্থ সমালোচনা	৪১৯	
১২।	সংঘবার্তা	৪২১	

বেনারসী · সিল্ক · সাড়ী · পোষাক

শৈললাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি১২
(বসুমতী অফিসের পাশে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী · শাল · বিছানা · হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড
শান্তিরস সালসা
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
রক্তদোষে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ
সর্বত্র প্রাপ্তব্য
৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

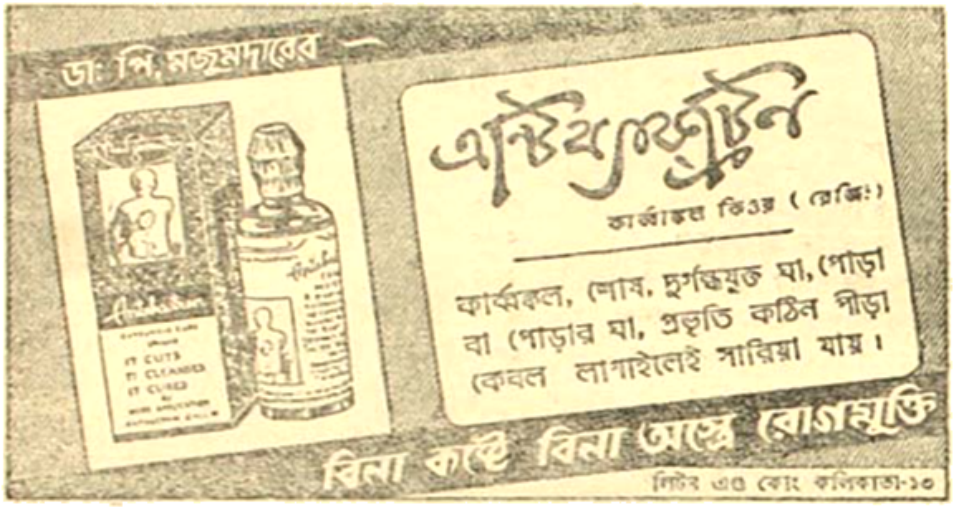

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

JATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

BUDGE BUDGE, HALTU, 24 PARGANAS

Regd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

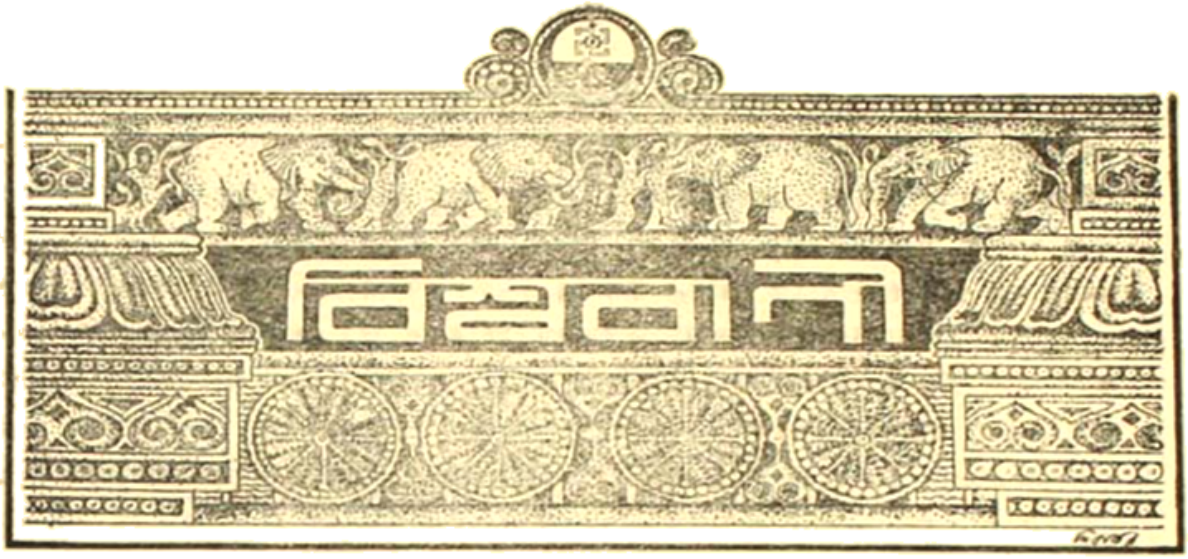

তেতাল্লিশ বর্ষ	নবম সংখ্যা	কার্তিক ১৩৮৮

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(ষোড়শাংশ)

॥ তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত ॥

সাধক রামপ্রসাদ জীবনসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনসায়াহ্নে তিনি মহাশক্তি-কালীকে 'ব্রহ্ম' ব'লে উপলব্ধি করেছিলেন—'কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম, (আমি) ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'। ধর্ম ও অধর্মের এই দুই-দুই জ্ঞান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সন্দেহ-সংশয়রূপ অজ্ঞানের অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে কাটে না। ধর্মাধর্ম—ধর্ম ও অধর্মের ব্যাখ্যা ললিতাসহস্র-নামস্তোত্রে এবং পণ্ডিত ভাস্কররায়-রচিত 'সৌভাগ্যভাস্কর'-ভাষ্যে ভিন্নভাবে করা হয়েছে। ললিতাসহস্রনামে—

চিন্ময়ী পরমানন্দা বিজ্ঞানঘনরূপিণী ॥
ধ্যানধ্যাতৃধ্যেয়রূপা ধর্মাধর্মবিবর্জিতা ।...

পণ্ডিত ভাস্কররায়এর ভাষ্যে লিখেছেন : "যথা ধর্মাধর্মৌবন্ধমোক্ষৌ। ধর্মাধর্মস্য বাচ্যস্য বিযাত্মকবস্তুস্য চে'-তি নিত্যাদ্যদয়রোক্তে···। ধর্মাধর্মশব্দৌ শক্তিশিবাকারবাচকৌ তাভ্যাং বিবর্জিতা পঞ্চদশী ললিতেতি তু রহস্যার্থঃ"। অথবা ভাস্কররায় বলেছেন : "অথবা ধর্মশব্দো মন্ত্রার্থলক্ষণস্য ধর্মিণঃ। অধর্মশব্দো বহুব্রীহিণা ধর্মণঃ। ধর্মিধর্মভাবেন রহিতা"। মোটকথা ধর্ম ও অধর্ম-শব্দদুটি বিভিন্ন অর্থের প্রকাশক বিভিন্ন শাস্ত্রে।

গীতার ৫।২০ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী-স্থিতপ্রজ্ঞ-সম্বন্ধে বলেছেন : "...ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ"—স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রিয়-অপ্রিয়-ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়—'অদ্বিতীয়াত্ম-দর্শনশীলস্য ব্যতিরিক্তপ্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগাৎ ন' ;—অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয়—ভাল-মন্দবোধের সঙ্গে ধর্ম ও অধর্ম-বিচারবুদ্ধি থাকে না, কেননা তাঁর বুদ্ধির অন্বেষণী ও নিশ্চয়করণী-বৃত্তির সমাপ্তি ঘটে চরম ও পরম-বস্তু ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি ক'রে। তখন তিনি 'মুনি' নামে অভিহিত হন—'স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে'।[১] সুতরাং জীবনসিদ্ধ মহামানব রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কালীকে বা শক্তিকে ব্রহ্ম ব'লে দর্শন ও উপলব্ধি করেছেন তখন তাঁরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনি একথা সত্য। তখন শক্তি ও শিবের—কালী ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। এই অভেদদৃষ্টিরূপ জীবনের চরম-অনুভূতির সময়ে সবিশেষ ও নির্বিশেষ—সগুণ ও নির্গুণ—বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত—এই গুণ, উপাধি বা ভেদ এক ও অখণ্ড মহাচৈতন্যসাগরে লীন ও একাকার হয়। একাকার হয় বলতে ভেদ মহাচৈতন্যসাগরে রূপান্তরিত হয় এবং তখন ব্যবহারিক-দৃষ্টি পারমার্থিক-দৃষ্টির প্রভাবে ও চৈতন্যপ্রলেপে এক হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অনুভূতির অবস্থায়ই বলেছেন : 'যাকে ব্রহ্ম বলি, তাকেই শক্তি বলে কই'। ব্রহ্মের অমৃতসত্তা তখন শক্তির মহামায়ী-সত্তাতে এক ও অখণ্ড হ'য়ে অমৃতসত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এক ও অখণ্ডের প্রাতীতিক অবস্থাভেদ তখন মায়িক ও অনিত্য বলেই অনুভূত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'একই জল—কখনও বরফ, কখনও বাষ্প এবং কখনও জল'। জলের অবস্থাই তার সত্য, বরফ ও বাষ্প অবস্থাভেদের পরিবেশ ও দৃষ্টিভেদমাত্র। তেমনি অখণ্ড ও সর্বগত অনন্ত ও ব্যাপক-চৈতন্যমাত্রই ব্রহ্ম। তিনি একাধার, আবার সর্বাধার ; তিনি খণ্ড, আবার অখণ্ড ; তিনি এক, আবার বিচিত্র ও বহু ; তিনি রূপে রূপে বহুরূপ, আবার সর্বরূপ- বিবর্জিত অরূপ এবং কেবলই একাকার মহাপ্রাণচৈতন্যের সত্তা ও সাগর। এই এক এবং অখণ্ড সত্তাই অঘটনঘটনাময়ী মায়ার সংস্পর্শে লীলাময়, আবার লীলাময়ী—সচ্চিদানন্দময়, আবার সচ্চিদানন্দ-ময়ী হয়। সুতরাং নামে, রূপে ও উপাধিতেই কেবল ভেদ, কিন্তু স্বরূপে ও স্বমহিমায় তিনি এক ও অভিন্ন। মোটকথা একটি বিচারের দৃষ্টি ও অপরটি চরম ও পরম-সিদ্ধান্তের দৃষ্টি। এই তত্ত্ব রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয়, আবার জ্ঞেয় এবং অনুভবের বিষয়। তবে দুর্বিজ্ঞেয়, কেননা সাধারণভাবে ও সহজে এই পরমতত্ত্ব বোঝা ও অনুভব করা কঠিন এজন্য যে, মানুষ বাস করে সমস্যাসঙ্কুল বৈচিত্র্যের ও অজ্ঞানের রাজ্যে, অজ্ঞানদৃষ্টি দিয়েই সে বিশ্বের ও বিশ্বাতীত সকল-কিছুকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করে, তাই অজ্ঞানের বা অজ্ঞানসীমার অতীত না হ'লে জ্ঞানের রাজ্যের বা জানার ও যথার্থবোঝার রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। তাই বোঝার ও জানার জন্য মানুষকে বোধ ও জ্ঞানের সমান স্তরে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, অসমান স্তরে তা সার্থক ও সফল হয় না। কথায় বলে—like attracts like—সমানই সমানকে বোঝে ও জানে।

১। গীতার ৭।২৮ শ্লোকে আছে 'মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ'। 'মোক্ষপরায়ণঃ' বলতে মোক্ষরূপ ব্রহ্মভাব-পরায়ণ। এই ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মানুভূতিসম্পন্ন যিনি—তিনিই মুনি।

ব্রহ্ম (সগুণ-ব্রহ্ম) ও শক্তি (বীজরূপী পরমাপ্রকৃতি) যে স্বরূপে এক ও বিরূপে ভিন্ন প্রতীত—এই বোধের নামই জ্ঞান। কিন্তু এই জ্ঞানও কিছুটা অসম বা বিষম-জাতীয় ক্ষেত্র, কেননা এই ক্ষেত্রেও থাকে দ্বৈতবোধ। সেজন্য অদ্বৈতবেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্‌জ্ঞানের জন্য অধিকারী-নির্ণয়ের আলোচনা করেছেন শাস্ত্রকারগণ, কারণ যথার্থ-অধিকারী অনুভব ক'রে উপাধির স্পর্শে তারা ভিন্ন ব'লে মনে হলেও স্বরূপের ও চৈতন্যের ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন।

॥ যথার্থস্বরূপ ও তার জ্ঞান ॥

কিন্তু তাহলেও প্রসঙ্গের বা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে সম্যক্‌জ্ঞান কি ও ব্রহ্মসত্তার যথার্থস্বরূপ কি—তা জানার জন্য। তাছাড়া সকল উপাধিবর্জিত নাম-রূপহীন ব্রহ্মসত্তা কি তা জানতে ও বুঝতে গেলে সাধারণ মানুষকে আপাতপক্ষে উপাধি ও নাম-রূপত্বের স্বীকার করতে হয়। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদ যথার্থভাবে অনুভব করতে হলে সকল বিচারী মানুষকেও প্রথমে দ্বৈতজ্ঞান ও পরে বিশিষ্টাদ্বৈতজ্ঞানের ক্ষেত্র অতিক্রম করতে হয়, এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-জ্ঞানের তত্ত্ব উপলব্ধি হলে তারপর সেই বিশিষ্টজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সেজন্য প্রথমে দ্বৈতবাদ, পরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং পরিশেষে অদ্বৈতবাদ সকল মানুষকে যথার্থ বোঝার ক্ষেত্রে উপদেশ করা হয়েছে—যাকে বলে সোপানবৎ,—একটির পর অপরটি। ছাদে উঠ্‌তে গেলে যেমন এক-একটি সোপান বা সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, তেমনি অদ্বৈতবিচারনির্দিষ্ট-সমজ্ঞানরূপ অদ্বৈতজ্ঞান বোঝার জন্য দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সোপান-দু'টি অতিক্রম ক'রে তারপর অদ্বৈতজ্ঞানরূপ ছাদে ওঠা যায় এবং ছাদে উঠ্‌লে তখনই বোঝা যায় যে, যাদ বা মতবাদগুলি ক্রমোন্নত জ্ঞানের স্তরগুলিকে বোঝার ও জানার জন্য প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্য ছাদে ওঠার কথা ভিন্নভাবে বলেও যথার্থতত্ত্বের কথা সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতেই বলেছেন : 'ছাদে উঠ্‌লে তখন দেখে—যে-চুন-সুরকি দিয়ে সিঁড়ি হয়েছে, সেই চুন-সুরকি দিয়েই ছাদও হয়েছে'। এটিও হলো তত্ত্বদৃষ্টির ও চরমসিদ্ধান্তের কথা। এজন্যই সাধনার ও অনুভূতির ক্ষেত্রে 'সোপানবৎ'—ধীরে ধীরে ক্রমোন্নত অনুভূতির কথা আমরা শাস্ত্রের মধ্যে পাই। প্রথমে ব্রহ্ম ও শক্তি ভিন্ন, তারপর (মায়িক দৃষ্টির ক্ষেত্রে) শক্তিবিশিষ্ট-ব্রহ্ম ও পরিশেষে শক্তির অতীত বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম—যেখানে শক্তি রূপান্তরিত হয়ে ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। শক্তি পরিশেষে ব্রহ্মের সমসত্তাসম্পন্ন এবং শক্তি সেখানে রূপান্তরিত ব্রহ্মচৈতন্য—যেমন রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের ক্ষেত্রে যা দড়ি ও সর্প প্রথমে পৃথক পৃথক, তারপর রজ্জুর সম্যক্‌জ্ঞান হলে সর্পাধ্যাসরূপ মিথ্যাদর্প তখন রজ্জুরূপ সত্তায় (সর্পরূপ ভ্রমের আধার রজ্জুসত্তায়) সঙ্গে এক হয়ে যায় ; সর্পের পৃথক ভ্রমসত্তা তখন সত্তা-রজ্জুসত্তায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি : প্রথমে সাধ্য ও সাধক ভেদজ্ঞান নিয়ে সাধনা, তারপর সাধ্য-দেবতার সঙ্গে বিশিষ্ট বা সম্পৃক্ত-চৈতন্য, অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা ও সাধক, এবং পরিশেষে যথার্থ-অনুভূতির স্তরে সাধ্য ও সাধক—দেবতা ও উপাসক এক ও অভেদ, অর্থাৎ তখন কেবলই চৈতন্য। এই অভেদ-

জ্ঞানের অবস্থায় অনুভূত হয় সর্বানুস্যূতির ও সর্বব্যাপকত্বের অখণ্ডতা, সকল ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত—এক ও অদ্বৈত। তাই সাধনার প্রথমস্তরে বি-সম (বিষম)-চৈতন্য, পরে দেবতাবিশিষ্ট-চৈতন্য এবং পরিশেষে সম-চৈতন্য বা কেবলই অখণ্ডচৈতন্য। সকল-কিছু বিচার, মতবাদ বা মতভেদ দেখা যায় বাদানুবাদ বা তর্কের ক্ষেত্রে, পরে সিদ্ধান্তকৃত সমান বা মিলনের ক্ষেত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই মিলন কিন্তু দুইয়ে মিলে এক নয়, বা খণ্ড-খণ্ডকে নিয়ে অখণ্ড নয়, সেখানে দ্বৈতবোধের বিলোপে বা রূপান্তরে অদ্বৈত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই তত্ত্বেরই নিষ্পত্তি ও সমাধান করেছেন ভিন্নভাবে যে, ব্রহ্ম মন ও বুদ্ধির অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমন ও শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। শুদ্ধমন ও শুদ্ধবুদ্ধি কিন্তু মন ও বুদ্ধি নয়, মন ও বুদ্ধি তখন কেন্দ্র ও আধাররূপ শুদ্ধ ও পরমচৈতন্য। সেজন্য একথাই সত্য যে, ব্রহ্ম বা সগুণ-ব্রহ্ম কিংবা মায়োপহিত কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বর-ব্রহ্ম সর্ববীজময়ী মহাপ্রকৃতি বা শক্তির সহবাসী, সেজন্য বিচারদৃষ্টিতে সর্বাতীত নির্গুণ-ব্রহ্ম থেকে কিছুটা ভিন্ন, কিন্তু যথার্থজ্ঞানদৃষ্টিতে একই চৈতন্য—আধার ও আধেয়-চৈতন্য এক। এখানেও ব্রহ্ম ও শক্তির সমস্যা কিছুটা জটিল—জ্ঞানের অতীত নয়, কেননা পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলি যে, নামে ও আকারে বা রূপেই কেবল ভিন্ন, কিন্তু অভিন্ন স্বরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বরূপজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেই বলেছেন—'শক্তিমান ও শক্তি—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'। শক্তি, মহাশক্তি, অব্যাকৃতি, মহামায়া, মহাপ্রকৃতি, সর্ববীজময়ী প্রকৃতিরই মাত্র ভিন্ন ভিন্ন নাম। প্রলয়ে বা মহাসুষুপ্তিতে বিশ্বের সকল-কিছুই কারণসংস্কার মহাপ্রকৃতিতে লীন বা সুপ্ত থাকে, আবার সৃষ্টির প্রথম-প্রভাতে তারা জাগ্রত হয় এবং এই জাগৃতি বা জাগরণের নামই সৃষ্টি। সৃষ্টি ও প্রলয় সর্বকালগ্রাসী মহাকালের বুকে অনন্ত আবর্ত সৃষ্টি করে। এই আবর্তই সংসার এবং এই আবর্তের পারে যাওয়ার নামই মুক্তি। সেজন্য আচার্য শঙ্কর এবং মধুসূদন সরস্বতী বারবার বলেছেন : 'ব্রহ্মভাবশ্চ মুক্তিঃ'।

॥ পূর্ণ-অনুভূতির কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ॥

কিন্তু তাহলেও বলি যে, বিচারের ক্ষেত্রে ও দ্বৈতজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের স্তরে ব্রহ্ম ও শক্তির ধারণা ভিন্ন থাকেই। স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন জ্ঞানক্ষেত্ররূপ পূর্ণ-অনুভূতিক্ষেত্রের স্বরূপ এই যে, যেখানে ভেদ নাই, বিকার নাই ও বাদানুবাদরূপ তর্কের পর স্বমত-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নাই বলতে সমানুভূতির ক্ষেত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমানুভূতির ক্ষেত্রে উপনীত হতে গেলে—অর্থাৎ ঐ সমানুভূতিরূপ সমদর্শনের যথার্থভাব সম্যক্‌ভাবে বুঝতে হ'লে আমাদেরও প্রথমে বিচারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয় এবং সেজন্য যতরকম শাস্ত্রযুক্তির অবতারণা প্রয়োজন তাও গ্রহণ করতে হয়।

অদ্বৈতবেদান্তে কালী মহাশক্তি, শক্তি, মায়া, মহামায়া, যোগমায়া, সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের অভিন্না শক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণেরও স্বীকৃতি তাই—'মম মায়া দুরত্যয়া'। কিন্তু 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে'—একথাও আবার বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ গীতায়। ব্রহ্মচৈতন্যের যাঁরা উপলব্ধি করেন তাঁদের কাছে মায়ার বা মহামায়ার আবরণ থাকে না, ব্রহ্মের একমাত্র নিরাবরণ সত্তাই

থাকে। বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এই তত্ত্বের রহস্যকথা জানতে গেলে বলতে হয় যে, দড়িতে যখন সাপের অধ্যাস বা ভুলজ্ঞান হয়, তখন অধিষ্ঠানরূপ দড়ির জ্ঞান হলেই ভুল-সাপের অধ্যাস বা ভ্রম নষ্ট (দূর) হয়। তেমনি আধার বা অধিকরণরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হলে তাতে আগন্তু-অজ্ঞানের মিথ্যাভাস (ভ্রম) নষ্ট (দূর) হয়ে যায়। শ্রীগুরুর ইঙ্গিত তাই যে, পরমজ্ঞানরূপ মায়াধিন্ ঈশ্বরের (সগুণ-ব্রহ্মের) জ্ঞান হলে মায়ীন্ ঈশ্বরের আশ্রয়ে যে অজ্ঞানাভাস—তা নষ্ট হয় বলতে অজ্ঞানাভাস রূপান্তরিত হয় জ্ঞানে—যেমন ভুল-সাপের মিথ্যাজ্ঞান সত্তা-অধিষ্ঠান দড়ির প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়—অর্থাৎ মিথ্যাপ্রতীতিরূপ সাপ সত্যপ্রতীতির আশ্রয়রূপ দড়িতে রূপান্তরিত হয়। সুতোই মিথ্যার রূপান্তর ঘটে। তাই পরিণত হয় না, ব্রহ্মরূপ আধার বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে জীবভ্রান্তিরূপ মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত হয় মাত্র এবং এই অপসারণের নামই অজ্ঞানের বা ভ্রমের রূপান্তর ঘটে সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে। তখন অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে সত্যজ্ঞানের প্রকাশ বলতে উপলব্ধি হয়।[২]

॥ আচার্য নিম্বার্কের মতবাদ ॥

'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'—এ'প্রসঙ্গে পূর্বে বহু দার্শনিকের মতবাদের উল্লেখ ও বিচার করেছি, কিন্তু তাহলেও বলি যে, বিচারের শেষ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনদৃষ্টিভঙ্গী বা দার্শনিক মতবাদ আচার্য নিম্বার্কের স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদের বা স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কি-না সেই বিষয়েও কিছু-কিছু আলোচনা করেছি পূর্বে। কিন্তু যথার্থসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য 'আবৃত্তির্সর্বশাস্ত্রানাম্'—বারবার শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করাতে কোন দোষ নাই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দার্শনিক-দৃষ্টি আচার্য নিম্বার্কের অনুরূপ কিনা সে'-বিচার করার পূর্বে নিম্বার্কের দার্শনিক মতবাদ কি ধরনের ছিল তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

আচার্য নিম্বার্ক বলেন : "অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোঽংশঃ, 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ'-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ। 'তত্ত্বমসী'-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপিচ আথর্বণিকাঃ 'ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা'-ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্ব-মধীয়তে"। অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে অংশাংশিভাব গ্রহণ করা উচিত, সেজন্য তাদের মধ্যে ভেদাভেদ বলতে ভেদ ও অভেদ-সম্বন্ধ-স্বীকার করা হয়। জীব পরমাত্মা-ব্রহ্মের অংশ, কেননা 'জ্ঞাজ্ঞৌ-দ্বাবজাবীশানীশৌ—জ্ঞ এবং অজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বর (জ্ঞ) এবং জীব (অজ্ঞ)-এরা উভয়েই অজ অর্থে জন্মরহিত ও নিত্য—এই শ্রুতিবাক্য-অনুসারে ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য দেখানো হয়েছে। আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন বা অভেদও বলা যায় 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের উপদেশ ও বিচার অনুসারে। সেজন্য এমন কি অথর্বশাখিগণ কৈবর্ত, দাস ও ধূর্তগণকেও ব্রহ্ম বলেন, সেজন্য ব্রহ্মের ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদসম্বন্ধই সমীচীন।

২। 'ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষো বর্ততে নিত্যত্বাৎ, ন তু ভবিষ্যতি সাধ্যত্বাভাবাৎ'।

॥ আচার্য শ্রীনিবাস ও নিম্বার্ক ॥

এ'সম্বন্ধে শ্রীনিবাসাচার্য তাঁর ভাষ্যেও এই মতবাদ সমর্থন করেছেন দেখা যায়। তিনি লিখেছেন: 'জীবস্য কর্তৃত্বং ব্রহ্মাধীনমিত্যুক্তমিদানীং ভেদাভেদপ্রস্তাবিরোধেন তয়োঃ সম্বন্ধমাহ—কিময়ং জীবো ব্রহ্মণো ভিন্নঃ—উতাভিন্ন' ? আহোস্বিৎ ব্রহ্মণোঽংশোঽতোভিন্নাভিন্ন ইতি সংশয়ে রাজ্ঞঃ সকাশাৎ পুরুষ ইব পরমাত্মনঃ সকাশাজ্জীবোভিন্নোঽস্তু। অভেদবাক্যানাং গৌণত্বাদজ্ঞসর্বজ্ঞোরভেদাসম্ভবাচ্চ। অথবাঽভিন্ন এবাস্তু, ভেদশ্রুতীনাং গৌণত্বাৎ।···নাহং জীবঃ শ্রীপুরুষোত্তমাদত্যন্তভিন্নঃ, নাপ্যাত্মাভিন্নঃ, কিন্তু পরমাত্মনোঽংশঃ"। এ'ভাবে শ্রীনিবাসাচার্য পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন: "তত্ত্বমস্তুমাত্মা ব্রহ্ম, অয়ং ব্রহ্মাস্মী-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশঃ"।

শ্রীনিবাসাচার্যের ও নিম্বার্কাচার্যের মতে জীবের কর্তৃত্ব যে পুরুষোত্তমরূপ ব্রহ্মের (সগুণ-ব্রহ্মের) অধীন—সেকথা স্বীকার করা যায়; এবং সেজন্য ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদ—এই উভয়-সম্বন্ধ স্বীকৃত। তাছাড়া সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এবং অজ্ঞ বা অসর্বজ্ঞ জীব এদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা অসঙ্গত। সেজন্য 'অংশোনেষ পরস্য'—জীব পরমাত্মা-ব্রহ্মের অংশ, এবং এই অংশ শক্তিরূপ অংশ—'এষ পরস্য শক্তিঃ জীবোঽন্যশক্তিরস্বতন্ত্রঃ'। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নিষ্কল। নিষ্কল অর্থে কলা বা খণ্ডভাগরহিত। সুতরাং নানাদিক বিচার ক'রে বলা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা-ব্রহ্ম ভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত—বলেছেন আচার্য শ্রীনিবাস।

তবে আচার্য নিম্বার্কের বেদান্তসূত্রভাষ্য আচার্য শঙ্করের ও আচার্য রামানুজের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নয়। কিন্তু নিম্বার্কাচার্যের অধিকাংশ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য আবার আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের অনুযায়ী বা অনুরূপও বটে।

॥ ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু পরমকারণ—আবার কারণাতীত তাঁর ব্রহ্ম এবং কার্যরূপ জীব-জগতের মধ্যে কোনরূপে ও কোন স্থানেই অংশাংশীভাব স্বীকার করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমচৈতন্য-ব্রহ্ম কালীঘরে, চৌকাঠে, দরজা-জানালায়, মার্বেলের মেঝেতে, পূজার কোশাকুশীতে ও সর্বত্র বিস্তৃত ও বিরাজিত থাকলেও টুকরো-টুকরো বা অংশ-অংশভাবে নয়, সামগ্রীক-এক ও অখণ্ড-চৈতন্য। তিনি আচার্য শঙ্করের মতো বিশ্বসৃষ্টির করণস্বরূপ শক্তিমান সগুণ-ব্রহ্ম স্বীকার করলেও এবং সেই ব্রহ্ম চৈতন্যরূপে সর্বক্ষণে বিশ্বের সর্বত্র সর্বরূপে প্রকাশ পেলেও বহুরূপের মধ্যে এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তারই অনুসূচ্যুতি একথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতিতে বিচিত্র নাম-রূপের সৃষ্টি হলেও সবার মধ্যে একমাত্র তুলাই থাকে, তুলা-ছাড়া অন্য-কিছু থাকে না। একথা ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্বেতকেতুর সামগ্রীকদৃষ্টিরই অনুরূপ। 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি···'এই প্রশ্নের উত্তরে এক ও অখণ্ডসত্তার কথা আছে: "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (৬।১।৪),—অর্থাৎ মৃৎপাত্রের কারণ মৃত্তিকাসম্পর্কে জ্ঞান হ'লে সকল মৃৎপাত্রের একমাত্র উপাদান যে মৃত্তিকা এই জ্ঞান হয়। উদাহরণ যথা—ভিন্ন ভিন্ন মাটির পাত্র কলস,

গ্লাস, হাঁড়ি প্রভৃতি নামে ও রূপে পৃথক হলেও সকলের উপাদান মাটি বা মৃত্তিকা কিন্তু এক—'বিকারো নামধেয়ং, নামৈব নামধেয়ং' বলেছেন আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে। সিদ্ধান্ত যে, নামে ও রূপেই মাত্র পৃথক, কিন্তু 'পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব সত্যং বস্তুতি'—মৃত্তিকাই সত্য। তেমনি 'লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং'—লোহার নিমিত্ত বা কারণ সমস্ত লৌহদ্রব্যের একমাত্র উপাদান লৌহই; স্বর্ণজাত অলংকারসমূহ নামে ও রূপে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলের কারণ ও উপাদান একমাত্র স্বর্ণই, সেজন্য 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমাদ্বিতীয়ম্'—বিশ্বের বা সৃষ্টির নাম ও রূপযুক্ত সকল উপাদান ও সামগ্রী একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই। আচার্য শঙ্কর এর ভাষ্যে তাই বলেছেন: "সদেব···নির্বিশেষং সর্বগতমেকং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানং ঘনবদমাত্তে সর্ববেদান্তেভ্যঃ"। 'নিরবয়ব' বলতে 'নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য ও নিরঞ্জন'—বলেছেন আচার্য শঙ্কর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামগ্রীকদৃষ্টি এবং সিদ্ধান্তও তাই। তিনি বলিশে, তোষকে, লেপে ও কাপড়ে তুলা ভিন্ন ভিন্ন সজ্জায় ও আকারে থাকলেও প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন (অংশ-অংশ) তুলা বলেন নি, বলেছেন 'একই তুলা' সবার মধ্যে থাকে, তবে এক হয়েও বহুরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্পষ্টই বলেছেন যে, 'মায়া-রূপ গুণের সঙ্গে যুক্ত জীব ও বিশ্ববৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন মায়াবী ও মায়াধীশ ঈশ্বর, কিন্তু বলেন নি যে, সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের স্বরূপসত্তার সঙ্গে বিশ্ববৈচিত্র্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৃহদারণ্যকের 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ',—ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে বিশ্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বরূপ ধারণ করলেন, সুতরাং বিশ্বসৃষ্টি লোকত পৃথক ব'লে মনে হলেও স্বরূপত পৃথক বা ভিন্ন নয়। ঠিক এই কথার মতোই শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: 'মা সব হয়েছেন'। শক্তিরূপিণী মহাকালী ঈশ্বরের সহচারিণী হয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, আবার বিশ্বের সর্বত্র চিন্ময়ীরূপে প্রকাশিত থাকেন, তাই চিন্ময়ী বা চিন্ময়সত্তা-ছাড়া বিশ্বপ্রপঞ্চের ভিন্নসত্তা নাই। এরই নাম অদ্বৈতদৃষ্টি ও অদ্বৈতবাদ। এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় চিন্ময়সত্তার দৃষ্টিই প্রতিপন্ন করে অদ্বৈতবাদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অভেদ ও অদ্বৈতদৃষ্টিরই অনুসারী। সেজন্য বলা যায় যে, রঙ্গ-রামানুজ কিংবা আচার্য নিম্বার্কের মতবাদের ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতের ও সিদ্ধান্তের কোন ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই।

॥ আচার্য রঙ্গ-রামানুজ ॥

আচার্য রঙ্গ-রামানুজের মতবাদ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাহলেও প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী রঙ্গ-রামানুজের মতো বিশিষ্টাদ্বৈতাবলম্বী নয়, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরিণামবাদ স্বীকার করেন নি। আচার্য রামানুজ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন: "সাবয়বত্বাদেব জগতঃ কার্যত্বং ন প্রত্যাখাতুং শক্যোতি। তথাহি চ প্রয়োগাঃ,—বিবাদাধ্যাসিতং ভূ-ভূধরাদি কার্যং, সাবয়বত্বাৎ, ঘটাদিবৎ···"। সৃষ্টি হয় বা উৎপত্তিশীল বলেই সাবয়ব বা সাকার-অবয়বযুক্ত এবং আকার ও অবয়ব থাকলেই রূপ এবং নামও থাকে, সুতরাং সাবয়ব বস্তুর বা দ্রব্যের নাম ও রূপ থাকা

অপরিহার্য। কিন্তু এই নাম ও রূপ সত্য বা নিত্য কি-না? রঙ্গ-রামানুজের মতে ব্রহ্মের ন্যায় তাঁর নাম ও রূপ সত্য ও নিত্য: 'সাধয়বয়বাদিনা কার্যং সর্বং জগৎ'। জগৎ অর্থে সৃষ্টি। সৃষ্টির (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের) অবয়ব, আকার বা রূপ আছে এবং নামও আছে। রঙ্গ-রামানুজ নাম-রূপকে মিথ্যা, তুচ্ছ বা অসত্য বলেন নি। তাছাড়া রামানুজ বিশ্বসৃষ্টির কারণরূপে ব্রহ্মকেই (সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরকেই) নির্দেশ করেছেন। তিনি সগুণ, অনন্ত ও অশেষ শক্তিসম্পন্ন বলেছেন: 'সগুণত্বাৎ স্বরূপস্য, স্বরূপেণ গুণৈশ্চানন্ত্যাৎ'।* * 'নিরতিশয়বৃহত্ত্ব, বৃংহণঞ্চ ব্রহ্মেতি নির্বচনাৎ। তচ্চ ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি বচনাচ্চ'। তাছাড়া রঙ্গ-রামানুজের জগৎকারণ ব্রহ্ম সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষণ বা গুণযুক্ত: 'তথা সতি সবিশেষত্বং, তদভাবে প্রকাশত্বেব স্যাৎ'। রঙ্গ-রামানুজের সবিশেষ ও সগুণ-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়—যদিও তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ তিনটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাছাড়া রামানুজের মতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের পরমসত্তা একটি, কিন্তু জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যখন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং জীব যখন বহু এবং জীবভোগ্য জগৎ যখন বৈচিত্র্যময়, তখন ব্রহ্মসত্তা এক ও অদ্বিতীয় হলেও বিচিত্র গুণসম্পন্ন বহুসত্তাবিশেষ।

মনে রাখতে হবে যে, রঙ্গ-রামানুজ অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সুতরাং আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত ও নির্বিশেষ-তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বৈশেষিকদের গৌতম ও কণাদের বহুত্ব এবং সাংখ্যকার কপিলের দ্বৈত-বহুত্ব-তত্ত্ব-সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। সেজন্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদনের জন্য তিনি চারটি বিশেষ তত্ত্ব স্বীকার করেছিলেন: (১) ব্রহ্ম নির্গুণ নন,—সগুণ; (২) সৎকার্যবাদ বলতে কার্যের প্রকাশের পূর্বে তার কারণ থাকে; (৩) মুক্তির বা মোক্ষের জন্য ভক্তি ও প্রপত্তির প্রয়োজন, এবং (৪) বিদেহমুক্তি। সুতরাং আচার্য শঙ্করের সঙ্গে রঙ্গ-রামানুজের মতের বহু অমিল আছে। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলেছেন, কিন্তু রঙ্গ-রামানুজ বলেছেন সগুণ ও সবিশেষ। সেজন্য আচার্য শঙ্কর যেখানে নির্গুণ ও সর্বোপরম-ব্রহ্মকে চরমতত্ত্ব বলেছেন, রঙ্গ-রামানুজ সেখানে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরকে (মায়োপহিত পুরুষোত্তম-ঈশ্বরকে) চরমতত্ত্ব বলেছেন। আচার্য শঙ্কর বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে যত-কিছু ভেদ ও অনৈক্য—সকলকেই মিথ্যা অর্থে অসৎ বা যথার্থসত্তাহীন বলেছেন, কিন্তু রঙ্গ-রামানুজ বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে সকল-কিছু বস্তু, পদার্থ ও কার্যকে সত্য ও বাস্তব বলেছেন। আচার্য শঙ্কর এক ব্রহ্মজ্ঞান-ছাড়া আর সকল-কিছুকে জাগতিক ও আপেক্ষিক-জ্ঞানকে মিথ্যা বলতে অনিত্য (impermanent) বলেছেন, কিন্তু রঙ্গ-রামানুজ জ্ঞানমাত্রকেই সত্য বলেছেন—'যথার্থং সর্ববিজ্ঞানং ইতি বেদবিধাং মতম্'। আচার্য শঙ্কর জ্ঞানকে নির্বিষয় বলতে বলেছেন কোন জ্ঞানই বিষয়সাপেক্ষ নয়, যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম নিজেই জ্ঞানস্বরূপ। পুনরায় ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ নয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি—'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ', কিন্তু রঙ্গ-রামানুজ তা স্বীকার করেন না। রঙ্গ-রামানুজের মতে নির্বিষয়-জ্ঞান হওয়া অসম্ভব এবং মুক্তি বা মোক্ষও জ্ঞানের ফলবিশেষ। ডক্টর বালসুব্রহ্মণ্য তাঁর *Some Problems in the Epistemology and Metaphysics of Ramanuja* (1976)-নিবন্ধে বিশেষভাবে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রঙ্গ-রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে বিচার ও তত্ত্ব-পার্থক্যের আলোচনা করেছেন এবং

সেখানে তিনি পরিশেষে এ'কথাই বলেছেন যে, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করাই ছিল রঙ্গ-রামানুজের প্রধান উদ্দেশ্য, সেজন্য উভয় আচার্যদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক।

ডক্টর রমা চৌধুরী বিশেষ ক'রে রঙ্গ-রামানুজের দর্শনমত-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : "Brahman is a real Whole, an organic Whole, a concrete Whole with internal parts, attributes, powers, etc" (vide *The Schools of the Vedanta*, pt. I (1073), p. 44). তিনি পুনরায় বলেছেন : "He (Brahman of Ramanuja) is a Being or a Substance having an infinite number of best, sublime, supreme, auspicious attributes, powers,..... So he is not an abstract Reality like Advaita Brahman, but the best possible concrete or organic Whole, with jiva-jagat as His svagata-bhedas or internal parts" (vide p. 45).

স্বাগতভেদ বলতে বৃক্ষের সঙ্গে যেমন বৃক্ষের শিকড়, ডাল-পালা, পাতা, ফুল ও ফল প্রভৃতির ভেদ। যদিও অবশ্য বৃক্ষের ডাল-পালা, ফুল-ফল প্রভৃতিকে নিয়ে সামগ্রীকভাবে বৃক্ষের সার্থকতা, কিন্তু তাহলে শাখা-প্রশাখাদি স্বরূপে অভেদ অর্থে বৃক্ষেরই অপরিহার্য অংশ বা অঙ্গ হলেও আসল বৃক্ষের সঙ্গে তাদের (স্বগত) ভেদ আছে। আর মনে রাখা উচিত যে, বৃক্ষের সঙ্গে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, শিকড়াদির ভেদ বা ভিন্নতা চিরদিনেরই, সাময়িক বা আপাতিক নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিভঙ্গী এ'সকল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জল ও তার তরঙ্গকে 'জলেরই তরঙ্গ ও তরঙ্গেরই জল' বলেছেন। জল ও তরঙ্গ স্বরূপে কোনদিনই ভিন্ন নয়। তরঙ্গ সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক কোন শক্তি বা বস্তুর আঘাতে বা প্রভাবে,—যেমন প্রবল বাতাস, কোন বস্তুর আঘাত বা প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের কথাও বলেছেন, যেমন বরফ, বাষ্প প্রভৃতি। বিভিন্ন পরিবেশ ও বিচিত্র শক্তির সংস্পর্শে একই জল বরফ হয়, বাষ্প হয়, কিন্তু তাহলেও তারা স্বরূপে জলই, জল ছাড়া অন্য-কিছু নয়। আর জলের মধ্যে বরফ ও বাষ্প কিন্তু চিরদিনই তাদের ভিন্নরূপ নিয়ে আত্মগোপন ক'রে থাকে না—যেমন পাশ্চাত্য-দার্শনিক হেগেলের বিশ্ববৈচিত্র্য কিংবা দার্শনিক ব্র্যাডলের প্রহৃত বা transmutted বা বিকৃতরূপে বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্মের বা এ্যাবসোলিউটের মধ্যে লুকোনো থাকে। বিকৃত-উপাদানের লুকোনো সুপ্তাবস্থার নাম থাকা সত্তা বা অস্তিত্বই। ভারতের অদ্বৈতবেদান্ত এইসকল কথা ও যুক্তি স্বীকার করে না। ভারতের অদ্বৈতবেদান্ত বলে যে, নাম ও রূপের পরিবর্তন আছে, ভাঙা-গড়ারূপ উত্থান-পতন আছে, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংস্করণরূপ বিবর্তন আছে, কিন্তু জ্ঞান বা বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের কোন বিবর্তন নাই ; ব্রহ্মচৈতন্য সর্বকালে, সর্বদেশে ও সর্বরূপে এক ও অভিন্ন। মাটির পাত্র বিচিত্র নামে ও রূপে প্রকাশ পায়, সোনার আকারে ও নামে বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু সকলের মধ্যে আসলে মাটি বা সোনাই থাকে। তেমনি বিরাট, সর্বগত ও সর্বানুস্যূত পরমচৈতন্য-ব্রহ্ম আকাশ বা বায়ুর মতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ও সকল-কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত থেকেও সম্পর্কযুক্ত নন, বরং নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত ও স্বরূপে এবং

স্বসত্তায় প্রতিষ্ঠ। ব্যবহারিক প্রয়োজনে সকল-কিছুর বাস্তব রূপ স্বীকৃত, কিন্তু পারমার্থিক-সত্তায় এক ও অখণ্ড-চৈতন্যই। চৈতন্য চিদ্‌সত্তা বা চিত্তিসত্তা সর্বপ্রকাশক, সকলের প্রতিষ্ঠা ও সকলের ধারক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই তত্ত্ব এবং এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করতেন এবং তাঁর কথায়, আলোচনায়, সকল কাহিনীতে, গল্পে ও গানে ঐ একই অখণ্ডত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্যই বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনদৃষ্টি ও তত্ত্বানুভূতি রঙ্গ-রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, মধ্বাচার্য বা বল্লভাচার্যের মতানুযায়ী নয়, বরং আচার্য শঙ্করেরই অনুসারী। তবে দেশ-কালানুযায়ী প্রকাশভঙ্গী ও উদাহরণে তা কিছু-কিছু আচার্য শঙ্কর থেকে পৃথক হতে পারে, কিন্তু চরমসিদ্ধান্ত এক। অবশ্য এ'সকলের প্রসঙ্গ পরবর্তী আলোচনায় করার চেষ্টা করবো। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈত-দৃষ্টির সামান্য নিদর্শনের কথা এখানে যা উল্লেখ করেছি—জল ও তরঙ্গের কথা, সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে, একই জল কখনও স্থির, কখনও অস্থির, সেজন্য জল সময়ভেদে ও অবস্থাভেদে জল ও তরঙ্গ এই দু'টি নামে ও রূপে প্রকাশ পেলেও তারা স্বরূপে এক জল-ছাড়া অন্য-কিছু নয়। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিঃসঙ্কোচেই বলেছেন যে, জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গেরই জল, বা তরঙ্গই জল। জল ও তরঙ্গের মধ্যে সত্যকারের নিত্য কোন ভেদ স্বীকার তিনি করেন নি, বরং বলেছেন—সাময়িক ভেদ নামে ও রূপে এবং এই ভেদ অনন্তকালের নিত্য ও সত্য নয়।

●

॥ বলরাম-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

ভক্তদের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য। এসেছিলেন শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর।

আজ সোমবার, ১৩ই আশ্বিন, ১২৯১ ; ইংরেজী ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫। মাষ্টার বলরাম-ভবনে এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এসেছিলেন, স্কুলে যাবার পথে। তখন সকাল প্রায় সাড়ে নয়টা। তিনি শ্যামপুকুরে ডেলিপাড়ায় বাস করতেন এবং শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজ করতেন। সে সময়ে স্কুলের ঠিকানা ছিল ১০০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

মাষ্টারমশাই এসে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁকে তেল মাখাবার সময় তিনি মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন : 'কৈ (ডাক্তার) এল না'।

মাষ্টার : (প্রতাপ ডাক্তার) গতকাল বললেন দশটা এগারটার সময় আসবেন।

মেঝেতে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করতে থাকেন। তিনি সেবক হরীশকে বলেন : 'সেই ঘটিটা আন'।

মাষ্টারমশাই ঘটিটা আনবার জন্য এগিয়ে যান। তিনি বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন যে ঘটিটি ঘরের ভিতরে। ইঙ্গিতে বলেন, ঘটিটা ধুয়ে তাঁকে দিতে।

স্নানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলার উত্তর-পূর্ব-কোণের ঘরে নিত্যপূজিত জগন্নাথদেবের দর্শন ও প্রণামের জন্য যান। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজের ঘরে ফিরে আসেন।

তাঁর ঘরে ছিল একখানি ইজিচেয়ার। রাখাল আবদার করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: বসুন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসেন ও পা ছড়িয়ে দেন।

রাখাল: বেশ ধ্যান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ: ঊর্দ্ধিক হয় না।[১]

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন: (এর) দাম কত?

বলরাম: কটকে এর দাম ছয় টাকা, এখানে দশ বার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ হরিশকে জিজ্ঞাসা করেন: খেয়েছিস?

তিনি রাখালকেও বলেন: বল্‌না।

রাখাল: লজ্জা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন। তিনি মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন: খেয়েছ?

রাখাল: উনি ভাত খেয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ সম্বন্ধে বলেন। তিনি মাষ্টারকে বলেন: (পূর্ণকে) পাল্কি করে আনলে হয় না?

মাষ্টার: এখানে পাল্কির লোক দেখবে, তাই ভয়। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সে একদিন বোধ হয় দেখে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন: এখানে আমি কি (ভাল) আছি?

মাষ্টার: নিশ্চয়ই ভাল আছেন।

মাষ্টার রাখালকে লক্ষ্য করে বলেন: ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কিছু খাবেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ সুপুরির থলি, তাঁর মসলার বটুয়া আনবার জন্য বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। রাখালের মনে হয় মহিলারা যেমন স্নানের পর চুল শুকোয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেরূপ করছেন। তিনি বলেন: চুল শুকোচ্ছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): হাঁ।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অখণ্ডাকৃতির পর যে কর্মত্যাগ হয়ে গেছে, সে বিষয়ে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ: আগে (স্নানের পর) বেলপাতা, জগন্নাথের আট কে খেতে হতো, এখন তা গেছে, দেখ্‌চি খোলমাত্র।

১। ঊর্দ্ধিক < ঊর্দ্ধ = উপরদিকে গমনকারী।

সেখানে উপস্থিত হন গিরিশচন্দ্র, গানব ও কয়েকজন।

গিরিশচন্দ্র গতদিনের বৈকবের অভিমত উল্লেখ করে বলেন: বৈকব বলেছেন আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসাই ভাল। আপনি একটা নাম বলুন না।

"যেমন কুকের জ্বর হলে কুকই কবিরাজ হয়ে চিকিৎসা করেছিলেন।

"মহাপ্রভুর জ্বর হয়েছিল ব্রাহ্মণদের পাদোদক নেবার জন্য। তাই বলছিলাম, আপনার ব্যাধির উৎস 'আপদ্ধার'।

গিরিশচন্দ্র মাষ্টারকে বলেন: হলধারী বলেছিল 'অচীনে গাছ'।

এবার গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: আপনার দেশে কোন বৈদ্য থাকে তো বলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন না। হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পীড়ার উপসর্গের কথা বলেন।

গিরিশচন্দ্র মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি (এখন) যাবেন? মাষ্টারমশায়ের ইচ্ছা আরও কিছুক্ষণ থাকেন। মাষ্টার: সাড়ে দশটার দেরী আছে বোধ হয়।

গিরিশচন্দ্র: হাঁ দেরী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে ওঠেন ও মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বর্তমানের পথ্য মুড়কির পায়েস। তিনি সে সম্বন্ধে বলেন: **কোন এক সময়ে মনে উঠেছিল—পায়েস খেয়ে থাকতে হবে—মনে করে কেঁদেছিলুম ভাবে—এ কি খাওয়া?**[২]

খুবই সম্ভবতঃ এইদিনই মাষ্টারমশাই স্কুলে যাওয়ার পরে কয়েকজন খ্যাতিমান কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। এই বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন: "বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে একদিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধি সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই; শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" কবিরাজদিগের নিকটে বিশেষ কোন আশা না পাইয়া এবং অধিক ঔষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতুতে কোনকালে সহে না জানিয়া, ভক্তগণ তাঁহার হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।"[৩] এই বিষয়ে বাড়তি কিছু তথ্য পাই অপর এক

২। মূল-আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৫৭৬-৭৭।

১৮৮৫ খ্রীঃ ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: ভাবে দেখলে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে। এই অসুখে পরিষার পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল। তখন কাঁদলাম এই বলে—এই কি পায়েস খাওয়া। এই কষ্ট।

৩। স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫/পৃঃ ২৭৩।

জীবনীকারের রচনা থেকে। তিনি লিখেছেন: এখানে (বলরামভবনে) আসিয়া তিনি ইংরাজ ডাক্তার দেখাইতে আপত্তি করিলেন: সুতরাং প্রতাপবাবুই ঔষধ বিধান করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের শরীর বালকের অপেক্ষাও দুর্বল ছিল, তদ্নিমিত্ত হোমিওপ্যাথিক একটি দানা সেবন করিলেও তাঁহার শরীর বিকৃত হইয়া যাইত। প্রতাপবাবুকে বিশেষ সাবধানে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইত।"[৪]

* * *

সে'দিন বিকালবেলা। স্কুল থেকে মাষ্টারমশায় সাড়ে চারটার সময় উপস্থিত হয়েছেন। মাষ্টারমশাই ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্য দেখে বালক পূর্ণকে বলেছিলেন, একবার গিয়ে পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করতে। মাষ্টার বলরাম-ভবনে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবসর সময়ে বলেন: পূর্ণ আসবে একদিন, তবে বাড়ীতে একটু···।

বালস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতাপ ডাক্তার আসছেন না দেখে যেন অধৈর্য হয়েছেন।

অকস্মাৎ পূর্ণ উপস্থিত হন। তাঁর ঘর্মাক্ত কলেবর। তাঁর গায়ে ঘাম দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছে দেন। ঠাকুর পূর্ণের ঘাড়ে তাঁর বাম হাতটি রেখে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন এবং ক্রমে স্থির নিশ্চল হয়ে যান। চিত্রার্পিতের ন্যায়।

এই দৃশ্য দেখে মাষ্টারমশায়ের মনে পড়ে যায় মহাভারতের ঘটনা।

'শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যাচ্ছেন। সারথি দারুক রথ নিয়ে উপস্থিত। মর্মস্পর্শী সেই বিদায়ক্ষণ। বিষণ্ণবদন পাণ্ডবগণ মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে থাকেন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়, মুখে কিছু বলতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণও যেন দুঃখিত অন্তরে কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস এবং অন্যান্য ঋষিগণ ও মন্ত্রিগণের অনুমতি নিয়ে এবং সুভদ্রা ও পুত্রসমেত উত্তরাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে সেই গৃহ হতে বের হলেন, রথে আরোহণ করলেন।'[৫]

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে সাম্‌লে নেন। তিনি রাখালের সঙ্গে পূর্ণের পরিচয় করিয়ে দেন, বলেন: **এর নাম পূর্ণ।**

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে হাত দিয়ে মাষ্টারকে লক্ষ্য করে বলেন: **বড় মন কেমন করে।**

পূর্ণের চক্ষু ইত্যাদি সুলক্ষণযুক্ত দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **ভিতরের যিনি, (তিনি) যেন চক্ষু দিয়ে এমন করে (চেয়ে) রয়েছেন।**

পূর্ণকে জলখাবার খেতে দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ হরীশকে বলেন: **জল আন।**

৪। রামচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত, ৭ সং, পৃঃ ১৪৭-১৮।

৫। অঞ্জলিং মূর্ধ্নিসন্ধায় নেত্রৈরশ্রুপরিপ্লুতৈঃ।
নিরন্নঃ সততং কৃষ্ণং মোঘবাক্যতয়ান্তদা॥
কৃষ্ণোঽপি ভগবান্ দেবঃ পৃথামাসাদ্য সান্ত্বয়ন্।
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীং বিদুরং দ্রৌপদীং তথা॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমন্যাংশ্চ মুনিপুঙ্গবান্।
সুভদ্রামাত্মজমুত্তামুত্তরাং পরিষস্বজে॥
নির্গত্য বেশ্মনস্তস্মাদারুরোহ তদা রথম্।—(আশ্বমেধিক-পর্ব/১৫০/৮-১০)

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণকে নিয়ে একপাশে চলে যান এবং মাষ্টারকে ইঙ্গিতে বলেন রাখালকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণকে নিজ হাতে জল খাওয়ান। নিজ হাতে তাঁর হাত ধুইয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণকে বলেন: **রাখালকে তুমি 'দাদা' বলো। ওতে তোমাতে একটা (সম্পর্ক) আছে।**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে পূর্ণকে মৌরী এলাচ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বিছানায় বসে পূর্ণকে বলেন: **পায়ে হাত বুলিয়ে দাও।**

বালক পূর্ণ বাম হাত ব্যবহার করতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেন: **ডান হাতে দাও।**

পূর্ণ মাষ্টারমশায়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। শ্রীরামকৃষ্ণও হাসেন।

কিছুক্ষণ পরে পূর্ণ চলে যান, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও তাকে যেতে দেন।

পূর্ণ চলে যাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আপন মনে মাঝে মাঝে হাসতে থাকেন। তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিলেন। তিনি হঠাৎ সমাধিস্থ হন। উপস্থিত সকলে বিস্ফারিত নয়নে মহাপুরুষকে দেখেন।

ইতিমধ্যে যুবক ভবনাথ ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে তেমন কোন সাড়া না পাওয়াতে বোধ করি হতাশ হন, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আবার কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘরে ঢোকেন এবং বলেন: কি কি—তোমরা যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথকে তক্তাপোষের উপর বসতে বলেন। ভবনাথ কিন্তু মেঝেতেই বসেন। ঠাকুর তাঁকে জলখাবার গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। শেষপর্যন্ত ভবনাথ একটু মিছরি গ্রহণ করেন।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে তাঁর ব্যাধির সব উপসর্গ সম্বন্ধে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **(কোন কোন) স্থান গোল হয়ে ভোব (হয়)—হাওয়া গিয়ে ফিরে আসে—ঢেঁকের পর—**

"রাত্রে কাশী (হয়)—যেন *Castor Oil* (রেড়ির তেলের)—পরে পুঁষ হয়ে ওঠে।

শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা সম্বন্ধে বলেন: **(যেন) ছুরি বেঁধা।**

"কোড়া কাটিয়ে দেবার মত যন্ত্রণা।

"স্নাতটা গিয়ে থাকে থাক্।

"জল দিয়ে স্নান করি···।

ডাক্তার তাঁর ঔষধপত্রের বাক্সটি মাষ্টারের হাতে তুলে দেন। ডাক্তার এখন বিদায় নেবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে ডাক্তারকে নিকটে যেতে বলেন। তিনি ডাক্তারকে বলেন: **তোমার উপর সব নির্ভর আর তুমি আস না।**

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের ঔষধের বাক্সের কাছে এগিয়ে আসেন এবং রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন।

ডাঃ প্রতাপ: আপনার তো ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ: তবে লাল কেন?[৬]

৬। এর মূল আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৩৭৬-৭৮

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ঐতিহাসিক ঘটনার সূচনা ॥

ইংরাজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশ্বধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান হয় আমেরিকার শিকাগোনগরে এবং ভারতবর্ষ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতেও বহু ধর্মপ্রচারক ঐ ধর্মমহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং প্রথমের দিকে নানান্ অসুবিধার সম্মুখীন হইলেও পরিশেষে তিনি তাঁহার সংঘের আচার্যদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত আশীর্বাদে লক্ষ্যে অবিচলিত থাকিয়া তিনি সকল কার্যে ও প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কথা হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় পদার্পণ করিবার পর বহুদিন কালীপ্রসাদ ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁহার কোন সংবাদই প্রাপ্ত হন নাই, সেইজন্য গুরু-ভ্রাতারা বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই একটি ইংরাজী-সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা দেখিলেন যে, মারউইন মেরী হেল নামে জনৈকা মহিলা 'স্বামী বিবেকানন্দ'-নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং সেই প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় কার্যাবলীর যথেষ্ট প্রশংসার উল্লেখ ছিল। কিন্তু কে ঐ স্বামী বিবেকানন্দ? শিকাগো-ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার পূর্বে ও সময়ে তাঁহাদিগের আদরের নরেন্দ্রনাথের নাম ছিল 'স্বামী বিবিদিষানন্দ', কিন্তু আমেরিকার ভূমিতে অবতরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবিদিষানন্দ 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তখন আমেরিকার সর্বত্রই 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেইজন্য কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতারা মেরী হেলের বিবৃতি দেখিয়াও প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে, ইংরাজী-সংবাদপত্রে উল্লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ আর কেহই নন—তিনি তাঁহাদিগেরই অতি-আদরের গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ। পরে তাঁহারা ঐ তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মেরী হেলের প্রবন্ধে বিবিদিষানন্দের বিজয়কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। যাহাহউক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া কালীপ্রসাদ এবং তাঁহার গুরুভ্রাতারা তখন আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন।

যাহাহউক, ইহার কিছুদিন পরে আমেরিকা হইতে নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন কালীপ্রসাদকে তাঁহার শিকাগো-ধর্মমহাসম্মিলনে কার্যাবলীর প্রসঙ্গে ও তাঁহার সাফল্যের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি স্মারক-সভার আয়োজন করিয়া সর্বসাধারণকে ঐ কার্যাবলীর ও তাঁহার উদ্দেশ্যের সাফল্যের কথা জানাইয়া দেওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন: "তোমরা কলিকাতায় একটি সাধারণ-সভার আয়োজন করিয়া আমার কার্যাবলী সমর্থন ও সঙ্গে সঙ্গে আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি—এই কথার উল্লেখ করিয়া ভট্টর ব্যারোজ প্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র প্রেরণ কর। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও

উহার একটি কপি বা নকল পাঠাইয়া দিবে"। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে পত্র পাইয়া কালীপ্রসাদ পরং মহারাজ ও শশী মহারাজের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসাদ স্থির করিলেন যে, কলিকাতার টাউন-হলে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করিবেন এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে তাঁহার ব্যারোজ ও আমেরিকার আরও গণ্যমান্য অনেকের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকেও একটি প্রস্তাব ও অভিনন্দন পাঠাইবেন। ইহা ঠিক করিয়া কালীপ্রসাদ ঐ কাজের সুবিধার জন্য কলিকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে বহু গৃহস্থ-ভক্তগণও তাঁহাকে বিভিন্ন রকমে সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতার পরং মহারাজ ও শশী মহারাজও তখন তাঁহার কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। ক্রমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং অনেকে স্বামী বিবেকানন্দের এই বিরাট কর্ম ও কর্তব্যের জন্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া টাউন-হলে সাধারণ সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে স্বনামধন্য রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমেরিকার কাগজে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কালীপ্রসাদের মুখে শুনেন ও বলেন :—'After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation'.

স্বামী বিবেকানন্দ সংবাদ শুনিয়া একান্তভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকায় গিয়া তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে গর্বের সঙ্গে বলেন :—'India should remain eternally grateful to him'. তিনি আরও বলিয়াছিলেন, সত্যই it is foolishness to send Christian missionaries to this learned Indian nation.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন-হলে চিরস্মরণীয় সাধারণ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সভায় প্রায় চার হাজারের অধিক দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। ঐ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ-লিখিত উক্তিগুলি এখানে তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম: "মাননীয় রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি. এস. আই. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট নাগরিক, পণ্ডিত, সাংবাদিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, তারানাথ বিদ্যাবাগীশ, কামাক্ষ্যানাথ তর্কবাগীশ, উমাচরণ তর্করত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, মহেশচন্দ্র শিরোমণি, মাননীয় বিচারপতি গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার হীনেন্দ্রনাথ রায়, কুমার রাধাপ্রসাদ রায়, বরিশালের জমিদার রাখালচন্দ্র চৌধুরী, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম.এ., বি.এল., ব্যারিষ্টার মন্মথ মল্লিক, ব্যারিষ্টার জে. এন. ব্যানার্জি, এ্যাটর্নী-এ্যাট-ল, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ('ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার সম্পাদক), এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ঐ সভায় যোগদান করেন"।

●

॥ বুদ্ধ ও কপিল ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীকৃপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

সাংখ্যদর্শনে কপিল প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, বুদ্ধ কিন্তু সেরকম কোন নীতি মেনে নেন নি। বুদ্ধ বলেছেন—যাকে উপলব্ধি করা যায় না, অনুমান করা যায় না, তার কোন সত্তা বা অস্তিত্ব নেই, সেজন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি অলীকমাত্র। কপিল কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ময় অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে পুরুষের মুক্তির পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কারণ-অবস্থায় ফিরে যায়; আর পুরুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে তখন প্রলয়ময় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও লয় হবে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিংবা নিজের মুক্তিলাভের পরেও পুরুষের অস্তিত্ব-নীতিকেও কপিল স্বীকার করেছেন। বুদ্ধ কিন্তু পুরুষের মুক্তি বা নির্বাণলাভের পরে তার অস্তিত্বকে মেনে নেন নি। বুদ্ধ নির্গুণ-পুরুষকেও স্বীকার করেন নি। অপরপক্ষে কপিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনধারাকে স্বীকার করেছেন,—পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন হলেই এই বিবর্তন ঘটে এবং পুরুষ-প্রকৃতির এই মিলন "সন্নিকর্ষ" বা "সান্নিধ্য" বলে পরিচিত। কপিল বলেছেন, বিবর্তনশীল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব বলে মনে হয় এবং যখন এর লয় বা ধ্বংস হয় তখন এ তা'র কারণ অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু বুদ্ধ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে ও বিবর্তনে, যথার্থ অস্তিত্বে কিংবা পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত নীতিতে বিশ্বাস করেন নি; পূর্বেই একথা বলা হয়েছে। তিনি বরং প্রকৃতির স্থানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে এবং পুরুষের স্থানে ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধদের চিন্তাধারা কিংবা বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল।

এখন পুরুষ-প্রকৃতি এবং তাদের থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ ছাড়া সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনেই অন্যান্য প্রধান প্রধান ধারণা ও চিন্তাগুলি প্রায় একই রকম দেখা যায়। সাংখ্যদর্শন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, যেহেতু আত্মার মুক্তি ঘটে, সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ও ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের উৎস অহঙ্কারে মিলিয়ে যায়, অহঙ্কার বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে মিলিয়ে যায়। আত্মা তখন শুদ্ধজ্ঞান—"আমার অস্তিত্ব নেই, আমার কিছুই নেই, আমি কিছুই নই"—এমন স্তরে এসে পৌঁছায়। এই "নেতি-নেতি" জ্ঞান ও মাধ্যমিক বৌদ্ধদের দ্বারা প্রচারিত "শূন্যতা" প্রায় সমপর্যায়ের। সুতরাং সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয় চিন্তাধারার প্রকৃত লক্ষ্য এক বলে মনে হয়। যেমন, সাংখ্যদর্শন বলে, যখন প্রকৃতি অদৃশ্য হয়ে যায়, অর্থাৎ পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই আত্মা মুক্তি লাভ করে। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা এক্ষেত্রে আরও অধিক বিজ্ঞানসম্মত, কারণ তারা আত্মাসহ সবকিছুকেই 'শূন্যতায়' পর্যবসিত করেছে; (যদিও আমাদের মনে হয়, বুদ্ধ নিজে আত্মাকে লয় এবং নির্বাণকে 'শূন্যতায়' পর্যবসিত করেন নি)—আর, এজন্য তারা সাংখ্যদর্শনের মতো অনর্থক পুরুষ ও প্রকৃতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয় নি—পুরুষ তার "আমি কিছুই নই, আমার কিছুই নেই" ইত্যাদি দৃঢ়বিশ্বাসে উপনীত হবার পরেও।

●

বিবর্তনের কার্যধারা সম্পর্কে কপিলের সাংখ্যদর্শন বলে যে প্রকৃতি হচ্ছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণান্বিতা এবং প্রকৃতির এই সত্ত্বগুণ থেকেই ইন্দ্রিয় ও তমোগুণ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন বা বুদ্ধের মতবাদও ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব মেনে নিয়েছে। এখন, আমরা যদি সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে তুলনা করি, তবে দেখতে পাব যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন পুরুষ-প্রকৃতি মতবাদের গুরুত্ব স্বীকার করে না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে,—আর সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির স্থান এরাই পূরণ করেছে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সাংখ্যদর্শনের মতবাদ অনুসারে সত্ত্বগুণের কাজ হচ্ছে আলোকিত করা, তমোগুণের কাজ হচ্ছে আচ্ছাদন করা আর রজোগুণের কাজ হচ্ছে সত্ত্ব ও তমোগুণের মধ্যে তারসাম্য আনয়ন করা।

এখন বৌদ্ধদর্শনের বিবর্তন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করছি। বৌদ্ধদর্শন ছয়টি ইন্দ্রিয় ও ছয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কথা বলেছে। সেগুলি থেকে সৃষ্টি হয় 'বেদনা'। এই 'বেদনা' থেকে 'বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান' থেকে 'সংজ্ঞান' আর এই 'সংজ্ঞান' থেকে উদ্ভূত হয় 'সংস্কার'। আত্মাকে বলা চলে নিজ-সম্পর্কে ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে ভাবনিচয়।

এখানে আমরা দু'ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্লেষণ করতে পারি, একটি হচ্ছে আত্মিক আর অপরটি হচ্ছে বৈষয়িক। কথিত আছে, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অজ্ঞেয়বাদ ভিত্তির উপর; সুতরাং এটিকে তার প্রমাণ যায়,—এ নিশ্চয় বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ সসীম না অসীম, নিত্য না অনিত্য—বুদ্ধ সে-সম্পর্কে কিছু বলেন নি। অধিকন্তু উপনিষদ কিংবা বেদান্তে বর্ণিত আত্মার মর্যাদাকেও বুদ্ধ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন; কারণ বুদ্ধ বলেছেন ব্যক্তিত্ব (বুদ্ধের অভিমত অনুসারে ব্যক্তিই হচ্ছে আত্মার সমতুল্য) একক নয়, এ হচ্ছে বস্তুবিশ্ব কারণের একটি যৌগ। এ সকল কারণ হচ্ছে ভৌতিক দেহ, চেতনা, অনুভূতি, ধারণা, সঙ্কল্প ইত্যাদি। এখন, আত্মিক ও বৈষয়িক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে দু'টি উপবিভাগ আছে—একটি প্রাচীন, অপরটি আধুনিক। পরবর্তীযুগের বুদ্ধঘোষসহ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পূর্বতন আত্মিক শ্রেণীবিভাগে ফিরে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন,—তাঁরা অবশ্য বৈষয়িক শ্রেণীবিভাগের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আত্মিক শ্রেণীবিভাগ তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত,—পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতু। (১) পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অঙ্গ, যদিও পরবর্তীযুগের বৌদ্ধধর্মে সেগুলিকে চরম কারণ বলে মনে করা হয় না। যাইহোক্, সমস্ত চরম কারণগুলিকে পাঁচটি ভাগে বা স্কন্ধে বিভক্ত করা হয়েছে, আর সেগুলি হচ্ছে রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞান-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ এবং বিজ্ঞান-স্কন্ধ। আক্ষরিক অর্থে রূপ হচ্ছে আকার বা আকৃতি এবং কখনও কখনও বর্ণ। স্থবিরবাদিগণ বস্তু বা আকার বা আকৃতিকে আরও প্রণালীবদ্ধভাবে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা আণবিক মতবাদ ও চারটি চরম উপাদানকে গ্রহণ করেছেন। তা' থেকেই এগারোটি প্রাথমিক ভৌত কারণ সৃষ্টি হয়েছে। যোগাচারিগণ হচ্ছেন বিজ্ঞানবাদী। তাঁরা সমস্ত বস্তুকে মনের বা ভাবের সৃষ্টি বলে মনে করেন। পরন্তু, বিজ্ঞানবাদী যোগাচারিগণ সর্বাস্তিবাদীদের উল্লিখিত চারটি মুখ্য ও এগারোটি গৌণ উপাদানকে গ্রহণের মূল নীতি

অনুসরণ করেছিলেন; তবু কিন্তু তাঁদের এগারোটি কারণ সর্বাস্তিবাদীদের কারণগুলি থেকে পৃথক। (২) বেদনা দ্বারা বুঝায় অনুভূতি বা মনোভাবকে। তবে এই বেদনা কিন্তু বেদান্তবাদীদের অনুভূতির অনুরূপ নয়,—বরং এ হচ্ছে বৌদ্ধদের বিজ্ঞান। বসুবন্ধু বেদনার অনুবাদ করেছেন 'চেতনার অস্পষ্ট ধারণাসজ্ঞাত অনুভূতি'। (৩) সংজ্ঞা অর্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি, তখনও কখনও ধারণা। যোগাচারিগণ ও সর্বাস্তিবাদিগণ সংজ্ঞা দ্বারা-ধারণাশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যদিও শ্রীযুক্তা রিস্ ডেভিড্স্ (Mrs. Rhys Davids) একে বিজ্ঞানের মতো একটি কল্পনাশক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। (৪) সংস্কার কথাটির কখনও কখনও অনুবাদ করা হয়েছে 'চেতনা'। বস্তুতঃ, এ'টি বেদান্তের ধারণার অনুরূপ। বসুবন্ধু বলেছেন, সংস্কার দ্বারা একটা সৃজনশীল ক্ষমতা বুঝায় এবং এ'টি ছয় প্রকার চেতনা দ্বারা গঠিত,—ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন কোন বৌদ্ধ দার্শনিক বেদনা ও সংজ্ঞাকে সংস্কারেরই অংশ বলে মনে করেন,—যেন নিঃশর্ত দৃষ্টিকোণ হ'তে উক্ত পাঁচটি শ্রেণীকে কমিয়ে নিম্নোক্ত উপাদানগুলিতে আনয়ন করা হয়েছে—দেহ, মানসিক ধর্ম, বা চেতনার সহগামী বস্তুনিচয় এবং চেতনা। চীনমান অভিধর্ম আমলে সংস্কারগুলির বিশদ তালিকা সঙ্কলিত হয়েছিল। স্থবিরবাদিগণ এরকম বাহাত্তরটি সংস্কারের নামোল্লেখ করেছেন। যোগাচারিগণ একান্নটি সংস্কারের উল্লেখ করেছেন,—যদিও তাঁরা কখনও কখনও বাহান্ন বা তেপ্পান্নটি সংস্কারেরও নাম করেছেন। (৫) বিজ্ঞান দ্বারা বুঝায় চেতনা বা বোধশক্তি। কখনও কখনও বিজ্ঞান শব্দটিকে চেতনার বিভিন্ন অবস্থা হিসাবেও অনুবাদ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান হচ্ছে চেতনার অনুভূতি ও ভাব—দুই-ই। বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ ছয় প্রকার বিজ্ঞান স্বীকার করে, যদিও যোগাচারিগণ ও স্থবিরবাদিগণ দার্শনিকদের বিবেচনাতিরিক্ত আরও দু' একটি যোগ করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেছেন, রূপ যেন একখানি থালা, বেদনা যেন ঐ থালার অন্ন, সংজ্ঞা যেন উপাদেয় আচার, সংস্কার যেন পাচক আর বিজ্ঞান যেন ভোক্তা! বৌদ্ধগণ দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতুরও বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশ আয়তন হচ্ছে :

১। দৃষ্টির বিষয়	—জ্ঞানের বিষয়	৭। দর্শনেন্দ্রিয়	—জ্ঞানেন্দ্রিয়
২। শ্রবণের বিষয়		৮। শ্রবণেন্দ্রিয়	
৩। ঘ্রাণের বিষয়		৯। ঘ্রাণেন্দ্রিয়	
৪। আস্বাদনের বিষয়		১০। আস্বাদনেন্দ্রিয়	
৫। স্পর্শের বিষয়		১১। স্পর্শেন্দ্রিয়	
৬। চিন্তার বিষয়		১২। চিন্তার ইন্দ্রিয়	

ধর্মের মতো ধাতুরও সংজ্ঞা হচ্ছে এই যে, ধাতু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন করে। বসুবন্ধু সেগুলিকে বলেছেন ব্যক্তি বা যতি। প্রকৃতপক্ষে, পনেরটি ইন্দ্রিয়জ কারণ আছে,—এগুলির মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানের বিষয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর ছয়টি হচ্ছে পাঁচটি চেতনার জ্ঞানোপলব্ধির বিষয়।

সাংখ্য দার্শনিকদের ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে বহু বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। আবার সাংখ্যবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত বহু বিষয়েও তারা একমত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কপিলের সঙ্গে বৌদ্ধেরাও কালকে (সময়) বস্তু হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছেন; কারণ উভয়ের মতবাদ অনুসারে কাল হচ্ছে একটি বোধ বা জ্ঞান বা চিন্তার রূপমাত্র,—যেমনটি দার্শনিক কান্ট বিশ্বাস করতেন। বৌদ্ধ ও সাংখ্য-দার্শনিকগণ কেউই স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও বেদের প্রামাণিকতাকে স্বীকার করেন না। এখন, অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে বৌদ্ধদর্শন তার শাস্ত্রের বহু মতবাদে লেখার ব্যবহৃত শব্দের জন্য কম হোক, বেশী হোক, সাংখ্য দর্শনের কাছে ঋণী। শাক্যমুনি গৌতম নির্বাণ-আলোকে আলোকিত হবার পরে 'বুদ্ধ' বা 'বোধিসত্ত্ব' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এই 'বোধিসত্ত্ব' পদটি সাংখ্যদর্শনের 'সত্ত্ব'গুণের সঙ্গে জড়িত, আর 'বোধি' শব্দটিও সাংখ্যের 'বুদ্ধিতত্ত্ব' বা 'বুদ্ধি' থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে 'বোধি' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সাংখ্যদর্শনে কপিলও 'বুদ্ধি' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধেরা নিজেদেরকে সত্ত্ব-গুণান্বিত বলে মনে করত এবং তাদেরকে বলা হ'ত বোধিসত্ত্ব কিংবা বুদ্ধি-দীপ্ত প্রোজ্জ্বল বস্তু। সাংখ্য-দর্শনের কণিকা 'তন্মাত্র' হচ্ছে বৌদ্ধদর্শনের 'তথতে' আর তাদের রূপ-তথাত হচ্ছে সাংখ্যে ব্যবহৃত রূপ-তন্মাত্র। এভাবে আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে সাংখ্যদর্শনের কিছু কিছু বিষয়বস্তু, এমন কি পারিভাষিক শব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধেরা গ্রহণ করেছিল।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে, চতুর্থ শতাব্দীতে, মহারাজ কণিষ্ক দেখলেন যে বৌদ্ধগণ আঠেরটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে; আর, ঐ আঠেরটি গোষ্ঠি নিঃসন্দেহে চারটি প্রধান বিভাগের উপবিভাগ মাত্র। এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে। বস্তুতঃ, প্রধান বিভাগগুলি ও গোষ্ঠিগুলি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে, উত্তরের তিব্বত ও নেপাল, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এবং দক্ষিণের সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে। বৌদ্ধ মতবাদ ও ধর্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যও রচিত হয়েছিল, আর সেগুলি লিখিত হয়েছিল প্রধানতঃ পালি, সংস্কৃত (বিশুদ্ধ ও মিশ্র), তিব্বতী ও চীনা ভাষায়। বুদ্ধ যখন দেহত্যাগ করেন, তিনি তখন তাঁর নিজস্ব সেবক-শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ধর্ম ও বিনয় হবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক মত। কথিত আছে যে, বুদ্ধের যাবতীয় শিক্ষা ও বাণী বিনয় ও সূত্রগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধের বাণী ও সেগুলির টীকাটিপ্পনী মুখে মুখে গুরু হ'তে শিষ্যপরম্পরায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে সেগুলি সংগৃহীত হয় এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্মেলনে আলোচনার পরে সেগুলি প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত হয়েছিল,—যদিও আমরা বসুমিত্র ও অজ্ঞাতের তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনুবাদগুলিতে কিছু কিছু ভিন্ন বক্তব্য ও বিবরণ পেয়ে থাকি।

বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়েছিল—হীনযান ও মহাযান। বুদ্ধ বলেছিলেন, 'হে সুভূতি, তোমরা কি তা'হলে মনে কর যে, যারা মহাযান মতে কৃতকার্য হয়েছে, তারা তা' পরিত্যাগ করে হীনযান মতকে সাধনমার্গ হিসাবে বিবেচনা করবে?' এখন প্রশ্ন হচ্ছে,—

কেন হীনযান মতকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে? তার কারণ, এ পথের অনুগামীদেরকে মনে করা হ'ত যে এক আত্মাকে নিরোধ করা, সেই আত্মার শান্তি বিধান করা এবং সেই এক আত্মার নির্বাণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের নিজেদের আত্মার নিরোধ, শান্তি ও নির্বাণের জন্য সমস্ত প্রশংসাযোগ্য কার্যকে তারা নিন্দা করত। উচ্চতর আধ্যাত্মিক বোধিসত্ত্বের সেটিই কি পরম লক্ষ্য হবে? লক্ষ্য হওয়া উচিত তার নিজেকে সত্যে প্রতিষ্ঠা করা, তারপরে সমস্ত সংবেদনশীল প্রাণীকে সত্যে প্রতিষ্ঠা করা, আর এ ভাবেই কল্পনাতীত সংখ্যায় সংবেদনশীল প্রাণীর নির্বাণ ঘটানো। সুতরাং হীনযান মত সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও ত্রুটিপূর্ণ এবং মহাযান মত হচ্ছে উদার, সার্বজনীন ও সংস্কৃতিসম্পন্ন।

এ দু'টি বিভাগ কিন্তু বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞানলাভের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৌদ্ধ চিন্তাধারার কোন কোন শাখা সম্পর্কে গবেষণা বা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করার পূর্বে প্রায় প্রতিটি গোষ্ঠি ও উপগোষ্ঠির কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সেজন্যই আরও তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল: (১) পালি ভাষার ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত সিংহলী শাখাকে প্রাচীনতম বৌদ্ধ মতাবলম্বী বলা হ'ত,—এ শাখার নাম স্থবিরবাদী বা থেরাবাদী। (২) হীনযান মতাবলম্বীদের জ্ঞানী ও দার্শনিকদের শাখার সর্বাস্তিবাদীরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই শাখার ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রথমে সম্ভবতঃ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল,—পরে সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। (৩) যোগাচারিগণও বিজ্ঞানবাদী বা বিজ্ঞামাত্রী নামে পরিচিত ছিল। এ শাখাটি সর্বাস্তিবাদী শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং এ শাখার দার্শনিক ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল। চীনা ও জাপানী গোষ্ঠি দুটিও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা কিংবা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। কিন্তু স্থবিরবাদী, সর্বাস্তিবাদী ও যোগাচারী—এ তিন গোষ্ঠিই বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহশীল ছিল। ডক্টর ভব্লু. এম. ম্যাকগভার্নসহ কতিপয় পণ্ডিত এবং অন্যান্য অনেকে এ মত পোষণ করেন যে স্থবিরবাদী গোষ্ঠির জন্য গৃহীত নির্ধারিত যান ছিল "অভিধর্মার্থ-সঙ্গ" এবং এই প্রসঙ্গে টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি। সর্বাস্তিবাদী-গোষ্ঠির জন্য গৃহীত নির্ধারিত যান ছিল "অভিধর্ম-কোষ" আর এর সঙ্গে ছিল সঙ্ঘভদ্রের 'নয়ানুসার' গ্রন্থে তাঁর সমালোচনা এবং "অভিধর্ম-প্রকরণ"। যোগাচারী গোষ্ঠির জন্য গৃহীত নির্ধারিত যান ছিল ধর্মপালের "বিজ্ঞামাত্রসিদ্ধি" প্রভৃতি এবং তার সঙ্গে ছিল বিশুদ্ধ চীনা ভাষ্য।

কপিলের সাংখ্যদর্শনও ঈশ্বরকৃষ্ণ, অসুরি, পঞ্চশিখ, বিজ্ঞানভিক্ষু ও অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং তাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য সাংখ্যমতাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি সাংখ্য-গোষ্ঠিতে কপিল-প্রদত্ত মূলনীতি ও মূল দর্শন সামান্য পার্থক্যসহ রক্ষিত হয়েছিল।

●

॥ আগমনী গান : কমলাকান্ত ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

বাঙলা এক অদ্ভুত দেশ। বাঙালী এক অদ্ভুত জাতি। এই দেশের মৃত্তিকায় বাঙালী কবি স্বর্গের দেবতাকে বারংবার নিজের করিয়া লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। শাক্তপদসাহিত্যে শক্তিদেবতাকে বঙ্গকন্যা, নগ-নগরীকে বঙ্গভূমির সমাসনে বসাইয়া যাঁহারা কাব্যকৃতিতে চমৎকারিত্ব বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য অন্যতম। কেবল অন্যতম বলিলে কম বলা হয়। কবিতার গুণে কমলাকান্ত বাঙালীর প্রাণের কবি।

বৎসরান্তে ধনি-নির্ধন নির্বিশেষে আপন তনয়াকে গৃহে আনিবার বাসনা প্রত্যেক বাঙালীর। কমলাকান্তের মেনকাজননী গৌরীকে হিমপুরে আনিবার জন্য অধীরা। রাত্রির নিদ্রা কন্যার স্বপ্নে যায় টুটিয়া। নিদ্রাপর হিমালয়কে ডাকিয়া মেনকা বলিতে থাকেন :

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে
গিরিরাজ অচেতনে কতনা ঘুমাও হে।

কারণ তাঁহার দুলালী তনয়া শ্মশানস্থলীতে শিবারবের মধ্যবর্তিনী।

আর শুন অসম্ভব—চারিদিকে শিবারব হে।
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।

মেনাচিত্ত এ স্বপ্নে যেমন কাতর, অন্য স্বপ্নে তেমন আনন্দিত। পদকার সেই কমলাকান্ত। উমামুখ সুষমার অকলঙ্ক চন্দ্রমা, দশনপঙ্‌ক্তিতে সৌদামিনীর বিশদশুভ্র বিভা, বাক্যাবলী সুধাধার :

কাল স্বপনে শঙ্করীমুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, তিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, হসনে চপলা খেলে;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার;
হাসিয়ে না হেরি তারে প্রাণ রাখা ভার।

গিরিরাণী হিমালয়কে বলেন, তাঁহার গৌরী নারদের মুখে অভিমানে কত কথাই না বলিয়াছে। প্রকাশ করিয়াছে মনের দুঃখ। তাহাতো অস্বাভাবিক প্রকৃতির। কী করিয়া যে হিমালয়ের শিবকে ভালো লাগিল কে জানে। শিবের আবার অন্য পত্নী আছে, সেই পত্নীই হইল স্বামী-সোহাগিনী।

ও হে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখে নারদে কত না ক'য়েছে—
বেধ হিমঘরে পাঠিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে॥

আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না মেনা। স্বামীকে উমা আনয়নে ত্বরিত করিয়া তুলেন :

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীকে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।

অন্য পদে সেই একই ব্যগ্রতা। 'যাও গিরিবর হে আন বেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার'।

মেনকার ভাগ্নায় হিমগিরি কন্যা আনিতে হিমপুর হইতে চলিয়াছেন কৈলাসে। কমলাকান্ত পটপরিবর্তন করিলেন। নাটকীয়তা দেখা দিল তাঁহার পদে :

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে স্তব্ধ ক্ষণে চলে ধীরে।

পিতা লইতে আসিয়াছেন বৎসরান্তে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি না লইয়া বা যাইবেন কী করিয়া? কমলাকান্ত উমামুখে তাহা বসাইলেন :

পদ্মাবর হে শিব শঙ্কর কর অনুমতি হর
যাইতে জনক ভবনে।

এখানেও সেই নাটকীয়তা। সংলাপ শিব-শিবানীর মধ্যে। হর-হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাইতে জননীকে স্বপ্নদর্শনের মধ্যে পাইবার কথা বলেন উমা :

বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে।
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমায় কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনো দুঃখ ক'ব কায়,
বল, প্রাণ ধরি কেমনে।

কন্যাকে নিকটে পাইতে মাতৃ-অন্তরের যেমন ব্যাকুলতা মাতৃসন্নিধানে যাইতে কন্যা-অন্তরেরও সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন কমলাকান্ত। প্রকাশ করিলেন চিরন্তন বঙ্গজননী ও তনয়ার মাধুর্যটুকু।

অবশেষে কন্যা উমাকে সঙ্গে লইয়া পিতা হিমাচল ফিরিয়াছেন আপন ভবনে। আসিয়া বলিতেছেন 'গিরিরাণী' এই নাও তোমার উমারে।' এই অংশেও নাট্যমুলক সংলাপ। সংলাপ মেনা ও হিমগিরির।

উমা ঘরে আসিয়াছে। সমগ্র নগ-নগরীতে তখন সে কি ব্যস্ততা। নগরের নগরীবৃন্দ সেই আনন্দে যোগ দিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে বঙ্গপ্রতিবেশিনীর কোনো পার্থক্য নাই। একের দুঃখে দুঃখানুভব এবং একের আনন্দে আনন্দানুভূতি বঙ্গনারীর মধ্যে কমলাকান্ত যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই চিত্রিত করিলেন তাঁহার আগমনী পদে :

'আমার উমা এলো' ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী সারি সারি সারি, দেখি গৌরী-মুখ-পানে চায়।

কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু-বালক বক্ষে,
কারু আধ শিরসি বেণী, কারু আধ অলকা শ্রেণী ;
বলে, 'চল চল চল অচল তনয়া হেরি ওরা, দৌড়ে আয় ॥'

উমা মিলিয়াছেন মেনার সঙ্গে। মাতৃক্রোড়ে বসিয়া স্বামীগৃহের কত কথাই না উমা বলেন। স্বামীগৃহে সুখসৌভাগ্যের কথা বলিতে বঙ্গকন্যার মতো উমারও আনন্দ ধরে না। কমলাকান্তের অকপট সঙ্গীত প্রকাশ :

কে বলে দরিদ্র হর রতনে রচিত ঘর মা,
তিনি কত সুধাকর শত দিনমণি
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥

শ্যামল শরতে বঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে শক্তিদেবতা দুর্গার আগমনী প্রতিটি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আনন্দের প্লাবন আনে। দুর্গা নয়, সে যে আমাদেরই বঙ্গমৃত্তিকার সোহাগিনী সুতা। আগমনীর পদে পদে বাৎসল্যরসান্বিত কমলাকান্তের কবিচিত্তের কোমল কান্ত স্পর্শ। বাঙ্গালী জনক-জননী, পতি-পত্নী, কন্যা-জামাতা, প্রতিবেশি-প্রতিবেশিনী লইয়া কমলাকান্তের আগমনী পদাবলী চিরকালের অমৃতনির্ঝরিণী।

কবির ব্যক্তিমনের পরিচিতিও ইহাতে নিবিড়। সাধক কমলাকান্ত জানেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী উমার চিন্তা কে করিবে, কে করিতে পারিবে ; তাই বলিয়া উঠেন :

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেঁদোনাকো রাণী হও গো শান্ত
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত নিশিদিন সেবা করেন জগজ্জননী দুর্গার চরণদ্বন্দ্ব। সেই দুর্গা হিমালয়-মেনকার কন্যা। কমলাকান্ত একপদে বলিয়া উঠেন 'কমলাকান্ত সেবিত তব শ্রীচরণ, মা ; আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥'

এই ভক্তিবিভাবিত কবির ব্যক্তিত্বের আগমনীতে গলিয়া ঝরিয়া গিয়া তাহাকে মন্ময় তথা গীতিকবিতার সমুত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সমাজের ছবি, নাটকীয়তা, ভক্তিগীতিকাব্য-ধর্ম একত্র মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে কমলাকান্তের আগমনী পর্য্যায়ের শাক্তপদসমুচ্চয়ে।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শশধর তর্কচূড়ামণি ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(এক)

পূর্বভাষ

"তর্কচূড়ামণি আখ্যা নাম শশধর।
পবিত্র সম্বৎশোদ্ভব বঙ্গদেশে ঘর॥
বাল্যি শাস্ত্রপাঠী নন প্রবৃত্ত সাধনে।
হীরকের খণ্ড যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে॥
... ...
অন্তে বাহ্যে সমধারা মাখা সরলতা।
মানুষের মধ্যে যেন মানুষ-দেবতা॥
তেজ তারি নিষ্ঠাচারী আপন ধরমে।
গা ফুটে লাবণ্য উঠে সৎগুরু গুণে॥"—পুঁথি, ৩৭৩

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে শশধর তর্কচূড়ামণি একটি স্বনাম-প্রসিদ্ধ চরিত্র। সাধনোত্তর জীবনে পরমহংসদেবের যে-সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত, বাগ্মী ও ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে সাগ্রহে মিলিত হ'য়েছিলেন, তর্কচূড়ামণি মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম।

এঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, ইনিও তাঁর ভাগবত-জীবনের স্বর্গীয় মহিমা দর্শনে চমৎকৃত হন। ফলে, উভয়ের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা জন্মে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শশধরের সপ্রেম মিলনের কয়েকটি চিত্র এবং উভয়ের নানা তত্ত্বপূর্ণ কথোপকথন পাওয়া যায়। বর্তমান নিবন্ধে আমরা সেই সমস্ত প্রামাণ্য তথ্যাবলম্বনে উভয়ের প্রসঙ্গ অনুধ্যান ক'রব।

জীবনকথা

পণ্ডিতপ্রবর শশধর ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের) অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার মুখডোবা (মুগডোবা) গ্রামে ১২৫৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'পাশ্চাত্য বৈদিক'-শ্রেণীভুক্ত অতিশয় নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পণ্ডিত শশধরের পিতার নাম শ্রীহলধর বিদ্যামণি ও মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। বিদ্যামণি মহাশয় নানা শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশ্বেশ্বরী দেবীও ছিলেন অত্যন্ত সরলা, দয়াবতী, আচারশীলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা। পুত্র শশধরের মধ্যে মাতাপিতা উভয়েরই গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হ'য়েছিল।

উক্ত মুখডোবা গ্রাম নদীর ভাঙনে নিশ্চিহ্ন হ'লে বিদ্যামণি মহাশয় ফরিদপুর জেলার প্রাণপুর (পরাণপুর) নামক গ্রামে সপরিবারে এসে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ এই গ্রামেই ছিল শশধরের মাতুলালয়।

শশধর বাল্যকাল হ'তেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও উদ্যমী। বিদ্যাভ্যাসে ও বহুমুখী জ্ঞানার্জনে এঁর অসাধারণ অনুরাগ ও অধ্যবসায় ছিল। ইনি নিজ পিতার নিকট হ'তে কলাপ ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তার ফলে, ইনি নানা শাস্ত্রবিশারদ ও বিচারদক্ষ সুপণ্ডিত হ'য়ে ওঠেন এবং 'তর্কচূড়ামণি' উপাধিতে বিভূষিত হন।

সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ধীমান শশধর ঐ কালে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। ফলে, ইনি ভারতীয় সমাজের উপর ঐ বিজাতীয় শিক্ষার কুফলগুলি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। বস্তুতঃ, ঐ চাকচিক্যময় শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-ব্যবহার এই দেশের তৎকালীন নব্য শিক্ষিতদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

সে-সময় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ এ-দেশে তাঁদের ধর্মমত ও শিক্ষাধারা বিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। তাঁরা হিন্দুর ধর্মোপাসনা, শাস্ত্রপুরাণাদি ও সামাজিক আচার-পদ্ধতির উপর নানাভাবে আক্রমণ শুরু করেন। ঐ সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে। ব্রাহ্ম প্রচারকেরাও হিন্দুর প্রচলিত ধর্মসাধনা, ধ্যান-ধারণা ও আচার-প্রণালীর উপরে নানা কটাক্ষ ও বিদ্রূপ প্রচার আরম্ভ করেন। তার ফলে, তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিতেরা প্রায় অধিকাংশই হিন্দুধর্ম ও এর চিরাচরিত আচার-পদ্ধতির প্রতি অনুরাগ ও আস্থা হারিয়ে ফেলেন; আবার অনেকে তুমুল দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হন।

হিন্দুধর্ম ও সমাজ-জীবনের ওরূপ দুরবস্থা দেখে স্বধর্মনিষ্ঠ ও মহাতেজস্বী যুবক শশধর অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে ওঠেন এবং খ্রীষ্টান পাদ্রী ও ব্রাহ্মদের ঐ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় হন। ইনি তখন সর্বসাধারণের মধ্যে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও গূঢ় মর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে, ইনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ ক'রে, বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে শাস্ত্রার্থ প্রচারে ব্রতী হন।

"বাক্য সুকৌশল অতি বল রসনায়।
শাস্ত্রের করেন ব্যাখ্যা বিবিধ সভায়।
শ্রুতি রুচিকর কথা মিষ্টভাষ শুণে।
দেশেতে প্রচার নাম হয় অল্প দিনে।"—পুঁথি, ৩৭৩

শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সুঠাম দেহী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও অভিজাত সৌম্যদর্শন ছিলেন। এঁর মনোহর বদনমণ্ডল চারু শ্মশ্রুগুচ্ছে বিভূষিত ছিল। এঁর প্রশান্ত-দৃপ্ত ও লাবণ্য-কান্তিমণ্ডিত মুখশ্রী দর্শনে সকলেই আকৃষ্ট হ'তেন। ইনি বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ক'রে থাকতেন; আবার কখন কখন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর গৈরিক বেশবাসও পরিধান ক'রতেন। এঁর প্রশস্ত ললাটদেশে রক্তচন্দন ও সিন্দূরের উজ্জ্বল তিলক শোভা পেত। এঁর গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে মিষ্ট আচরণ, মিষ্ট আলাপন, সারল্য ও অমায়িকতায় সকলেই মুগ্ধ হ'তেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নানা যুক্তি অবতারণা ক'রে হিন্দুধর্মের প্রণব (ওঁকার), গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি এবং নিত্যকর্তব্য ত্রিসন্ধ্যাকৃত্য, অবগাহন স্নান, সূর্যপ্রণাম, প্রাণায়াম প্রভৃতির একান্ত উপযোগিতা সম্বন্ধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিনব সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিতেন। নিতান্তই উদ্‌ভ্রান্ত-অবিশ্বাসিগণও অনেকে এঁর আশ্চর্য পাণ্ডিত্যে অসাধারণ বাগ্মিতায় ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ সুললিত বক্তৃতায় হিন্দুধর্মে আস্থা ও অনুরাগ ফিরে পান। এমন কি ইংরেজি শিক্ষিত খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন এবং ব্রাহ্মমতানুরাগী নবযুবকেরাও অনেকে এঁর অপূর্ব শাস্ত্রালোচনায় আকৃষ্ট হন।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের সেই দুর্দিনে তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে স্বধর্মালোচনা ও শাস্ত্রার্থ প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী দেখে রক্ষণশীলেরা এঁর ঐ মহৎ কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে আসেন। যা হোক, অল্পদিনের মধ্যে এঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ক'রে ধর্মপ্রচার কালে এঁর সঙ্গে ক্রমশঃ পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন), কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রবক্তাগণের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তখন হ'তে ইনি তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে নানাস্থানে ধর্মসভানুষ্ঠান ও শাস্ত্রার্থ প্রচার আরম্ভ করেন। এঁর এবং উক্ত সহযোগিদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে বহু হরিসভা ও ধর্মসমিতি স্থাপিত হয়।

সৌম্যদর্শন ও বহুশাস্ত্রবিদ শশধর পণ্ডিতকে একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও ধর্মপ্রচারকরূপে গড়ে তোলার জন্য পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দজী সবিশেষ উৎসাহী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি এঁকে কিছু কিছু পরামর্শ দেন এবং সেগুলি সফল ক'রে তোলার জন্য সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাও করেন। কথিত আছে,—কৃষ্ণানন্দজী এঁকে শুভ্র-মনোহর বেশবাস, রুদ্রাক্ষচন্দন প্রভৃতি ধারণ করিয়ে নির্জন কক্ষে একটি বৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড় করিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাত্ত স্বরে বক্তৃতাভ্যাস করিয়েছিলেন। তাঁর প্রযত্নে ইনি সেই প্রণালীতে ভাবপ্রদানের মনোহর কলা-কৌশলগুলি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত ক'রে, অল্পদিনেই আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন।[১]

যা হোক, তর্কচূড়ামণি মহাশয় একবার পূর্বোক্ত কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ ধর্ম-প্রবক্তাগণের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ প্রচারে বর্ধমানে উপনীত হন। সেই সময় মনীষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শশধর পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি উৎসাহী হ'য়ে এঁকে ক'লকাতায় নিয়ে আসেন (সম্ভবতঃ ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)। তিনি মহানগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে এঁর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সূত্রে ইনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তখন হ'তে ইনি কেবল বক্তৃতার মাধ্যমেই নয়, নিপুণ লেখনী আশ্রয়েও ধর্মব্যাখ্যা ও তত্ত্বালোচনাসমূহ নানা নিবন্ধাকারে 'বঙ্গবাসী', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে পরিবেশন ক'রতে থাকেন। মুখ্যতঃ এঁরই প্রেরণায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা হিন্দুধর্মের সপক্ষে প্রচার আরম্ভ করে। ঐ পত্রিকার মাধ্যমে ইনি 'সহবাস সম্মতি'

১। আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট শ্রুত।

(এজ অব্ কন্‌সেন্ট) আইনের (১৮৯০-৯২ খ্রীঃ) বিরুদ্ধতা করেন। সেইজন্য 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রাজরোষে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১ খ্রীঃ)। এঁর ধর্মব্যাখ্যাগুলি নানা পুস্তিকাকারেও বহুল প্রচারলাভ করে। বস্তুতঃ এঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে ও তত্ত্বমূলক নিবন্ধাদি পাঠে ধর্মশীল সুধীগণ স্বভাবতঃই পরম আকৃষ্ট হন। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি দেশের সর্বত্র সুপরিচিত ও খ্যাতিমান হ'য়ে ওঠেন।

"সমাচার পত্র এবে দেশের চলন।
সুযশ গৌরব বুকে করিয়া ধারণ॥
বহিয়া লইয়া যায় দূর দূর দেশে।
পাইয়া খবরটা লোক অগণন আসে॥
আসিতে না পারে যারা অবস্থার আড়ে।
বক্তৃতা বিক্রয় হয় কিনে ঘরে পড়ে॥"—পুঁথি, ৩৭৩

"শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফেরতা বাবুভায়া, স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। আলবার্ট হলে নানাভাবে ঠেলা-ঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিতজীর অপূর্ব ধর্মব্যাখ্যা যদি কতকটা শুনিতে পাই। আমাদের মনে আছে, আমরাও একদিন কিছুকাল ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুই-পাঁচটা কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং ভিড়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কোনরূপে প্রৌঢ়বয়স্ক পণ্ডিতজীর কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি শোভিত সুন্দর মুখখানি এবং গৈরিক-চন্দ্রাকশোভিত বক্ষঃস্থলের কিয়দংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। কলিকাতার অনেকস্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা, শশধর পণ্ডিতের ধর্মব্যাখ্যা।"—লীলাপ্রসঙ্গ, ৮র্থ (২২৮-২২৯)

তর্কচূড়ামণি মহাশয় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ক'লকাতায় এসে কলেজ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে বেশ কিছুকাল বসবাস করেন। ভূধরবাবু এঁর শিষ্য ছিলেন। পরমহংসদেবের লোকপরম্পরায় শশধর পণ্ডিতের সুখ্যাতি শুনে, বিশেষ আগ্রহ সহকারে একদিন[৩] ঐ ভবনে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সাদর আহ্বানে ও সপ্রেম আকর্ষণে তর্কচূড়ামণি মহাশয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি এবং অন্যত্রও তাঁর সঙ্গে অনেকবার মিলিত হন।

শশধর পণ্ডিতসহ শ্রীরামকৃষ্ণের অপর এক দিবসের (১৮ই জুলাই, ১৮৮৪) মিলনের সংক্ষেপিত বিবরণী তৎকালীন ইংরেজি সাময়িক 'The Indian Mirror' ('দি ইণ্ডিয়ান মিরর'-২৬ জুলাই, ১৮৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত দেখা যায় :

"The Venerable Parambansa Ramkissen of Dakhineswar paid a visit to Pandit Sasadhar Tarkachuramani on Friday week last. In the course of conversation the Pandit asked the Paramhansa's opinion about the caste system—whether it ought to be abolished or not.

৩। "রথযাত্রা দিবস—২৫শে জুন মুখবার, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।—কথামৃত-১ম(১১।১।১৭৭ দ্রষ্টব্য।

The Paramhansa replied—when the fruit is ripe it falls from the tree itself. To wrench the unripe fruit is not good."—26 July, 1884[৩]

যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তর্কচূড়ামণি মহাশয় কিছুকাল কামরূপস্থিত ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যা করেন; তারপর আবার ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন। ইনি নিজ ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণায় গোড়া বেদান্তবাদী ও জ্ঞানমার্গী ছিলেন। বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতিও ছিল এঁর অবিচল নিষ্ঠা। নিজ মত ও বিশ্বাসকে ইনি সর্বদাই অপরে আরোপিত করবার চেষ্টা ক'রতেন। এ-ছাড়া ইনি কঠোর রক্ষণশীল এবং স্পষ্টবাদীও ছিলেন।

শশধর পণ্ডিতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ ধর্মব্যাখ্যায় সমাজের নব্যশিক্ষিতেরা যথেষ্ট আকৃষ্ট হ'লেও বিশিষ্টগণের অনেকেরই তা মনঃপূত হয় না। তারফলে, ইনি ঐ ধরণের শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা ক'রে দেশবাসীর অন্তরে ব্যাপক ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেন না।

যে কারণেই হোক, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠপোষক ও সুহৃদগণের সহযোগিতা বেশি দিন পান না। পরে ইনি নিজ প্রচেষ্টায় সুধন্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বেদব্যাস" (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় এঁর বহু নিবন্ধ ও সারগর্ভ আলোচনাসমূহ সযত্নে পরিবেশিত হয়। এঁর বক্তৃতাগুলিও গ্রন্থাকারে প্রচার লাভ করে।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুকাল ধর্মপ্রচার ক'রে পূর্ববঙ্গে ফিরে যান এবং ফরিদপুরে স্বগৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর ইনি আবার এই বঙ্গে ফিরে আসেন। ধর্মপ্রচার উপলক্ষে ইনি মুর্শিদাবাদে উপনীত হ'লে, কাশিমবাজারের তৎকালীন জমিদার রায় অন্নদাপ্রসাদ রায়বাহাদুরের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন ইনি সসম্মানে তাঁর সভাপণ্ডিত পদে অভিষিক্ত হন।

কাশিমবাজারের উক্ত ধর্মপ্রাণ জমিদার মহোদয়ের বদান্যতায় বহরমপুরে খাগড়া নামক স্থানে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারের বসতি স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও সেখানে স্থায়িভাবে নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করেন। ইনি শেষ বয়সে বহরমপুরস্থিত 'জুবিলী টোল'-এর অধ্যক্ষপদে বৃত হন এবং আজীবন ঐ প্রতিষ্ঠানে থেকে নিয়মিত অধ্যাপনা, শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্রার্থ প্রচার ও গ্রন্থাদি রচনা কার্য সম্পাদন করেন।

সেকালের নানা পত্র-পত্রিকায় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনেক মূল্যবান নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁর বিরচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে—১। ভবৌষধ, ২। ধর্মব্যাখ্যা, (১৮০৬ শক), ৩। সাধনপ্রণালী (প্রদীপ ?), ৪। শ্রাদ্ধাম্নবিবেক, ৫। ভক্তিসুধালহরী (১৮২৯ শক-২য় সংস্করণ), ৬। বেদবিষয়ে ইংরেজি মতের প্রতিবাদ (১৮০৭ শক), ৭। চূড়ামণি-দর্পণ (সংস্কৃত অসম্পূর্ণ), ৮। দুর্গোৎসব পঞ্চক, ৯। ভাবকগীতা (১২১৯ বঙ্গাব্দ-১১শ সংস্করণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩। "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস"—পৃঃ ৫১ থেকে উদ্ধৃত।

বঙ্গের এই স্বনামধন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রখ্যাতনামা হিন্দুধর্মপ্রচারক শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহোদয় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন খাগড়াস্থিত নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেন।[৪]

●

ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(১১)

জোর করে কোনো নিয়ম চাপিয়ে বা বাইরে থেকে একত্বের রোলার চালিয়ে না দিয়ে শিক্ষার সাহায্যে এবং উদার ধর্মচেতনার উদ্বোধন করে মানুষের স্বাভাবিক উত্তরণের মাধ্যমে (growth from within) স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ ভারতাত্মারও এই পথ-নির্দেশ। তাই হিন্দুদের ভাষায় 'Conversion' কথার কোনো সমার্থক শব্দ নেই। মানুষকে কোনোভাবেই বহিরঙ্গে ধর্মান্তরিত করার নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। কারণ আমাদের ঘোষণা—"যত মত তত পথ"। এই 'যত মত তত পথ'-তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব মানুষের সমানাধিকার ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। যার যার ভাব ও ক্ষমতানুসারে হয়ে উঠবার অধিকার অনুমোদিত। কেবল ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জগতেই নয়, ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনের সমস্তক্ষেত্রে এই তত্ত্বই একমাত্র সর্বমানবের সর্বাত্মক মুক্তি ও স্বাধীনতার চরমতম গ্যারান্টি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত "কর্ম-পরিণত বেদান্ত" (Practical Vedanta) তত্ত্বের মূল সূত্র এই—'যত মত তত পথ'। তাই মনীষী অধ্যাপক বিনয় সরকার এই ঘোষণাটিকে বলেছেন—"One of the greatest democratic utterness of the World". এই মতবাদই মাত্র সকল স্তরের সর্বকালের, সর্ব ধর্মের, সব চেতনার, সকল মানুষের পরম আশ্রয়। এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যষ্টিগতভাবে যত দুর্বল মানবসন্তান আছেন এবং সমষ্টিগতভাবে যত দুর্বল ও ক্ষুদ্র জাতি বা মানবগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সকলের পক্ষেই এই 'যত মত তত পথ' তত্ত্বটি হল আত্মাধিকার আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের একমাত্র মহান 'মাগনা কার্টা'। প্রসঙ্গটি পরে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

৪। 'জীবনকথা'—অংশটি রচনায় প্রধানতঃ শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত—"বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক-জীবনী"—(১ম খণ্ড) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত—"ভারত কোষ"—(৫ম খণ্ড)—গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"—এই গ্রন্থ তিনটিরও কিছু কিছু বিবরণী গৃহীত হয়েছে। এছাড়া—ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও গোপালচন্দ্র মৌতম মহাশয়গণেরও সহায়তা লাভ করেছি। এপ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মৃত্যুর সন ও তারিখটি প্রথমোক্ত গ্রন্থ থেকে পরিবেশিত। এই গ্রন্থে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অতি বৃদ্ধ বয়সের একটি প্রতিকৃতিও আছে।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ :

নবজাগরণের অন্যান্য মহান রূপকার এবং আমাদের দেশের তৎকালীন দেশপ্রেমিক এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে স্বামীজীর আরো একটি মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য আছে। কর্মে ও কথায় স্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে, এমন কি বিশ্ব ও মহাবিশ্বকেও আলিঙ্গন করে তাঁর মহাসাধনা। এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের যাত্রার তীর্থ-পরিক্রমাও ঐ একই আদর্শের উজ্জ্বল অনুধ্যান এবং বাস্তব সম্প্রয়োগের প্রয়োজনে। শুধুমাত্র বঙ্গদেশ, বা মহারাষ্ট্র বা রাজস্থান বা কেরল কর্ণাটক অন্ধ প্রদেশের কথা নয়, আঞ্চলিক কোন সমস্যার সমাধানমাত্র নয়, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষই আরাধ্যারূপে তাঁর মানসলোকে অধিষ্ঠিতা। তাঁর জীবনের যা-কিছু কর্মপ্রয়াস—সবই হিমালয় থেকে কুমারিকাবধী পর্যন্ত প্রসারিত অখণ্ড এক মহা ভারতবর্ষকে নিয়ে। তিনি শুধু বঙ্গবাসীর পরিত্রাতা নন, তিনি একাধারে ভারতভাগ্যবিধাতা এবং বিশ্ব-জন-গণ-ঐক্যবিধায়কও বটে। প্রসঙ্গতঃ একথাও উল্লেখ্য যে স্বামীজীর এই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে-জনগণপ্রীতি,—এই সার্বিক মানবপ্রেম, বিশেষ করে মুসলমান এবং তথাকথিত হীন জাতি ও অন্ত্যজসমাজ ও ধর্মের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক প্রীতি সহানুভূতি ও অকৃত্রিম ভালোবাসা, তা কিন্তু একালের লোভী ধান্দাবাজ তথাকথিত সমাজসেবী ও লোকহিতৈষী নামধারীদের মত কিংবা ছলসর্বস্ব হৃদয়হীন সুবিধাবাদী রাজনীতি ধুরন্ধরদের মতো কোনো আশু রাজনৈতিক বা অন্য কোনো স্বার্থপর ফলশ্রুতির প্রত্যাশায় বা বিশেষ কোনো মতলব হাসিল করার অমানবিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, পরন্তু এক মহান বিশ্বৈক্যবোধের পরম আকর্ষণে এবং পরিপূর্ণ জীবন-অন্বেষার এক অনন্ত পরাপ্রাপ্তিতে তাঁর অমল উদ্বোধন। এবং এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ ভারতাত্মার পূর্ণ প্রতীক এবং পবিত্রতম প্রতিনিধি। অবশ্য স্বামীজীর এই সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম-সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে সার্বিক দৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে তাঁর সর্বাবগাহী বেদান্তধর্ম। ভারত সংস্কৃতির মৌল ভিত্তিস্বরূপ এই "বেদান্ত এক বিশাল পারাবার-বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত-মহাসাগরে একজন প্রকৃত বৌদ্ধ—একজন পৌত্তলিক বা এমন কি একজন নাস্তিকের সহিতও সহ-অবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত-মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক, সকলেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান"।

বস্তুতঃ এই কর্ম-পরিশুদ্ধ বেদান্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই, সকল মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড অক্ষয় "অস্তির" অনন্ত অধিবাসনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই জাতি-ধর্ম, দরিদ্র-নির্ধন, ছোট-বড়, হীন-অন্ত্যজ—উচ্চবর্ণের সমস্ত বাধাবন্ধন তাঁর কাছে ছিল একান্তভাবেই অর্থহীন। নিজের শুদ্ধ চৈতন্যকে সর্বত্র সকলের মধ্যে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেরেছিলেন বলেই সর্ব-মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও সর্বাত্মক বন্ধনমোচনের সাধনায় এমন করে সর্বসমর্পিত হতে পেরেছিলেন। এদেশে বেদান্তধর্ম নতুন নয়, কিন্তু এযাবৎ এই মহত্তম ধর্ম আবদ্ধ ছিল মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে। "সেই বনের বেদান্তকে স্বামীজী ঘরে ঘরে এনে দিলেন। সুস্পষ্ট-ভাবে দেখালেন যে, এই ধর্মানুসারী জীবন ভারতবাসীর প্রকৃত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন।

এই ধর্মভাবসম্পৃক্ত জীবনের মধ্যেই ভারতবাসীর যাবতীয় আশা-আকাঙ্খার পূরণ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর ধ্যানে-জ্ঞানে, মননে ও প্রাণনে কর্মে-সাধনায় অনুরণিত হচ্ছে এই ধর্মভাব"। এবং এই ধর্মভাবটি মূলতঃ এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের নিজস্ব তত্ত্ব বলেই স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"।—এবং এই বেদান্তভাবের জীবন্ত মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীসারদাদেবী। তাঁদের যৌথ-জীবনাচরণের মধ্য দিয়েই নতুন যুগের মানুষের কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এই শাশ্বত ভাবটি। শুধু তাই নয়, নতুন যুগের কাছে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে সেই পুরানো ভাব সত্যটি, ভাস্বর হয়ে উঠেছে নব নব অর্থ-দ্যোতনায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নববেদান্তের সামগ্রিক সম্প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত আছে জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের মুক্তি এবং বিশ্বৈক্যের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। সর্ববস্তুতে দ্বৈতরহিত ঐক্যোপলব্ধির পথেই যে সমস্ত ধর্মপথ ও সাধনার সমন্বয় বিধায়না সম্ভব তাই নয়, জীবনের ও পরাজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নববেদান্তের সম্প্রয়োগই জীবনকে পরিপূর্ণ করে দিতে সক্ষম। তাই স্বামীজী-প্রবর্তিত বেদান্তধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জননী নিবেদিতা বললেন, "ব্রহ্ম এবং এক যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে—আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ। এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মের মহান প্রচারকে পরিণত করিয়াছে, তবে এই কর্মজ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। পরন্তু উহাদের প্রকাশক। তাঁহার নিকট কারখানা ও পাঠগৃহ, খামার ও ক্ষেত সাধুর কুটির ও মন্দিরদ্বারের মতোই সত্য এবং মানুষের সহিত ভগবানের মিলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁহার নিকট মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোনো প্রভেদ নাই। তাঁহার নিকট গৌরবে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো পার্থক্য নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার সকল বাণীই এই মূল্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়"।—বস্তুতঃ দেশে বিদেশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনের প্রতিটি অন্বেষায় ও আত্মপ্রকাশে প্রতিটি কর্মের মধ্যে স্বামীজী বেদান্তকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এবং বেদান্তের এই সর্বাত্মক অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বিশ্বশান্তি সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। এবং এই কারণেই তাঁর সর্বকল্যাণ প্রযোজনার জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা একই বিন্দুতে মিলে গিয়েছিল। আত্মপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমঙ্গলাকাঙ্খা—এরই কর্মনীতির মাধ্যমে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল স্বামীজীর কাছে। এবং এই বেদান্তের সমগ্র অনুভূতির মধ্য দিয়েই—শিল্পে, সমাজে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, চারুকলায় ভারতবর্ষ আবার মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারবে তার পূর্ণ গৌরবে।

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

(ছয়)

মহম্মদের উত্তর শোনবার ধৈর্য নেই। যেমন হুড়মুড় করে এসেছিল তেমনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। এই আর এক অশান্তি। দরজা খোলা রাখা মানে ক্যামেরা, ঘড়ি, পার্স ইত্যাদি আবার সুটকেশে ভরো। মাতাল হয়ে কেউ আবার মাঝ রাত্তিরে ঢুকেও পড়তে পারে কেবিনে।

ডাইনিং হলের এখন অন্য চেহারা অন্য রূপ। যেন নববর্ষের আয়োজন। রঙীন কাগজের মালায়, রঙীন আলোয় হলঘরটার আগাপাস্তালা মোড়া, গুচ্ছ গুচ্ছ বেলুন ঝুলছে সিলিং থেকে। কিন্তু সবার যে সুট পরে আসবার কথা ছিল? যে যার যেমন খুশী পোষাকে এসেছে। মহম্মদ ত' সেই এক আমাকাপড়েই আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন। দেখবার মত চেহারা। নাবিকের পোষাকে দৃপ্তভংগীতে একের পর এক সবাইকে অভিনন্দন করে চলেছে।

"শুভ-সন্ধ্যা—আমাদের জাহাজে আপনিই একমাত্র ভারতীয়, আমরা আনন্দিত, ধন্যবাদ....."।

"ধন্যবাদ—বলেই লাইনে দাঁড়ালাম। খাবার নেওয়ার লাইন। বুফে ডিনার খাবারের জোড়া টেবিল, চলে গেছে হলঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। শুরুনো প্যাট্রিস্ দিয়ে শুরু করে, স্যাণ্ডুইচ্ রকমারী সালাড, গোটা আটেক রকমারী মাছ ও মাংসের তৈরী খাবার পেরিয়ে, মিষ্টি, কেক্ পুটিং-এর চাই উপকে, আপেল, কলা, আঙুরের পাহাড় ডিঙিয়ে চা কফি অথবা কোলা নিয়ে তবে নিস্তার। যেমনি খাবার ব্যবস্থা তেমনি সবাই নিয়েওছে, থালা ভর্তি করে, এ ব্যাপারে দেখি সবাই এক, খাবার উপচে পড়ছে থালা থেকে। টেবিলের খোঁজে যেতে যেতে কটাস্ চিমটী কোমরে। থালার টাল সামলাতে সামলাতে দেখি মহম্মদ আর ওর তিন সঙ্গী টেবিলে খেতে বসেছে। মহম্মদ খুশীর চোটে এত টগবগ যে হাসির চোটে খাবার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে আর কি। আরবীতে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে চলি। খুঁজে-পেতে একটা জায়গা পাওয়া গেল। টেবিলের অন্যান্য সতীর্থদের কণ্ঠে হাসি দেখিয়ে খাওয়া শুরু করি।

"সুদানিস্" .....

"নো.....নো.....ইণ্ডিয়ান্.....জেহলী.....

"বেট?.....

"হাউমাচ্?

"ফাইভ ডলারস্.....

'ওকে.....

"আপনি ত' সুদানিস্..... ? প্রশ্ন করেন এক সুদর্শন প্রৌঢ়। প্রৌঢ় মানে কপালের ভাঁজে আর কাঁচাপাকা চুলে, নইলে বাংলাদেশের যুবকদের এঁরা শিখে ফেলতে পারেন। পাশেই বসা মহিলা নিশ্চয়ই ওঁর স্ত্রী হবেন, বলে উঠলেন—

"ইণ্ডিয়ান্.....ডেহলি না ?

"আজ্ঞে ক্যালকেসিয়ান"।

"ওহ হাউ বিউটীফুল আমি আমার স্বামীকে আগেই বলেছি এই ড্রেস্ ইণ্ডিয়ান্ ড্রেস্ তবে আমি ভেবেছিলাম তুমি বেহ্লির।"

অষ্ট্রেলিয়ান্ দম্পতি। মেয়ের বিয়ে, ছেলে মানুষ করে, সংসারের দায়িত্ব চুকিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে বছর তিনেক হল দেশ দেখার মন দিয়েছেন। গরমকালে দুজনেই বেরিয়ে পড়েন। আর যতবারই পশ্চিমে আসেন ততবারই হয় বোম্বে না হয় দিল্লীতে দু'তিন রাত কাটান। কলকাতার অনেক নাম শুনেছেন, কিন্তু দেখা হয়নি। এবার ফেরার পথে কলকাতা হয়ে দেশে ফিরবেন ঠিক করেছেন, এমন সময় আমার সাথে আলাপ। অতএব কলকাতার অতি অবশ্য দ্রষ্টব্যস্থানের ফিরিস্তি দাও। খেতে বসে এ আর এক বিপত্তি। এই মনোরম পরিবেশে এত সুখাদ্য ছেড়ে কে আর কলকাতার সাতকাহন গাইতে চায়। ওঁরাও ছাড়বেন না, বাঁচিয়ে দিল বাজনদাররা। কাঁধে গীটার ঝুলিয়ে হাতে বঙ্গো নিয়ে হাজির হল আসরে। নিমেষে গমগমিয়ে উঠল সারা হলঘর। এরই মধ্যে টেবিলে যোগ দিলেন মিঃ পিটার। সদ্য তেলআবিব থেকে আসছেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট সাদাত্ এসেছিলেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কি রকম সিকিউরিটীর জালেলায় পড়েছিলেন তারই বর্ণনা।

অষ্ট্রেলিয়ান্ দম্পতির নাম মনে পড়ছে না। অতএব ওঁদের মনে মনে নাম দিলাম অষ্ট্রেদা, অষ্ট্রেবৌদি। অ্যামেরিকান ভদ্রলোক অর্থাৎ মিঃ পিটার একলা, সঙ্গে স্ত্রী নেই। ইস্রায়েলের মরুভূমিতে কি করে ফসল ফলানো যায় তার জন্যে সরেজমিনে এসেছিলেন। আপাততঃ তিনি যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা এই রকম। মরুভূমির বুকে মাইলব্যাপী এক হাঁটু গভীর দু'হাত চওড়া ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছে। সেই ট্রেঞ্চ-এর দুই পাড়ে আলকাতরা ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে পাড় চট করে ভেঙে না পড়ে। তারপর ট্রেঞ্চ-এর মধ্যে প্লাসটীকের চাদর বিছিয়ে তার ওপর মাটী ঢেলে দেওয়া হয়েছে। জলের সাথে আধুনিক সার মিশিয়ে মাটীকে উর্বর করা হচ্ছে এবং সেইসব জায়গায় বিশেষতঃ শবজীর চাষ হচ্ছে এবং ফলনও হচ্ছে ভালো। প্রবলেম শুধু একটাই জল বেশী দেওয়া হয়ে গেলে গাছের গোড়ায় জমে গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অষ্ট্রেদা, বৌদির এসব কথা কানে ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না। ওঁরা দ্রুত হাত চালিয়ে খাওয়া শেষ করে পরে দেখা হবে বলে সময়ের একটু আগেই উঠে চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম ওঁরা অ্যামেরিকান একদম সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ করে অষ্ট্রেবৌদি, ওঁর অ্যামেরিকানদের উপর অ্যালার্জি আছে। এক-নাগাড়ে বেশীক্ষণ অ্যামেরিকানদের সামনে থাকলে গা গোলায়। টেবিলের অন্য দুজন বুড়ো-বুড়ি কফির কাপ নিয়ে ঝুঁকে এলেন। নাকিসুরে নিজেদের নামও বললেন বোঝা গেল না।

তারপরই আমার দিকে চোখ পিটপিটিয়ে মিঃ পিটারকে বলে উঠলেন—"মরুভূমি সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তবে এই ছোকরাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ও যেখানে চাকরী করে সেখানে জলের ওপর শাক, শবজী তৈরী হচ্ছে। বালি ত' দূরের কথা মাটীরও প্রয়োজন নেই।" কথাটা খুবই সত্যি। আরব উপসাগরের মরুভূমিতে কিভাবে শাকশবজি বিলিতী বেগুন উৎপাদন করা যায় তার উপর অনেক গবেষণা চলছে এবং প্রচুর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। মরুভূমির বুকে লোহার ফ্রেমের ওপর প্লাসটীকের চাদর বিছিয়ে ঘর তৈরী করে। বিরাট বিরাট পামা চালিয়ে সমস্ত ঘরটার ভেতর আর্দ্র আবহাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। শীতকালে হীটার চালিয়ে ঘরের হাওয়া গরম রেখে আধুনিক প্রথায় বালির ওপর কখনও কখনও শুধুমাত্র জলের ওপর গাছের শেকড় ভাসিয়ে রেখে যে ভাবে শবজী বিশেষতঃ টমেটো, শসা যে হারে তৈরী হচ্ছে তা দেখার মত। তবে এসব টমাটো শসা উৎপাদনের জন্য এত বাবুগিরী গরীব গেরস্ত দেশের জন্য নয়, যাদের টাকা উপচে পড়ছে তাদেরই সাজে। আমার চিন্তা অন্য। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা আমার সম্বন্ধে এত খবর পেলেন কি করে? অ্যামেরিকান স্পাই নয়-ত? এদিকে পিটারদা ঢাউস কেকটা নিয়ে চেয়ার টেনে পাশে এসে গেছেন। উনি নিজের সাবজেক্ট ছেড়ে ধরেছেন রাজনীতি। মিশর ইস্রায়েল শান্তি চুক্তিতে আরবদেশের বিশেষকরে তেলওয়ালা শেখেদের কি প্রতিক্রিয়া? মিশরের মত ভবিষ্যতে ইরাক বা সিরিয়ার আমাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার কোন আশা আছে কিনা? ধর যদি লেবাননের গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্রায়েল শুধু সিরিয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে ইরাক কি সিরিয়াকে সাহায্য করবে? নাকি কেবল জর্ডনের মত লিপ্ সারভিস্ দিয়ে যাবে? আমার মন বলছে, হ্যান্ড্ এনাফ্, অতএব হুঁ...হ্যাঁ...করে টেবিল ছেড়ে উঠতেই হয়। প্রথমদিন সবাই ক্লান্ত, প্রচুর বিশ্রামের হেতু আজ রাতে তাই আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান নেই। কেবল জুয়াখেলার ঘরটা খোলা থাকবে, আর আকাশ দেখার জন্য ডেক্ রাত্রি দুটো পর্যন্ত।

ক্রমশঃ

●

॥ সিলিওলচুর পাদদেশে কয়েকটি দিন ॥

শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(তিন)

আমাদের কুলিরা সকালে ক্যাম্পের মালপত্র তাঁবু ইত্যাদি বাঁধাছাঁদা করে অনেক পরে রওনা হয়েও আমাদের পিছনে রেখে অনেক আগে এগিয়ে গেছে। আমরা তাদের জুতোর ছাপ দেখে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রায় সমতলের মতো একটি বিস্তৃত উপত্যকা দিয়ে চলেছি। কোথাও গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। প্রায় ১৫,০০০ হাজার ফুট উচ্চতা। আজ যেন চলার শেষ নেই। কতোটা পথ আরও যেতে হবে জানি না। সাংবা সকালে বলেছিল আজকের পথ দীর্ঘপথ। গত দুদিনের তুলনায় আজকের পথে চড়াই উৎরাই কিছুটা কম। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসে সারাদেহ যেন অসাড় হয়ে আসতে থাকে। সকাল থেকে এক মুহূর্তের জন্য বৃষ্টি থামেনি। এখন বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সূচীতীক্ষ্ণ তীরের মতো মুখে ও হাতে এসে বিঁধছে। সারা দেহ শীতবস্ত্র ও বর্ষাতি দিয়ে ঢাকা। কেবলমাত্র মুখমণ্ডলের ও হাতের সামান্য অংশ অনাবৃত। চোখে চশমা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভিজে জুতো পরে পথচলা খুবই কষ্টসাধ্য হচ্ছে। ঘন কুয়াশার জন্য চলার গতি মন্থর হয়ে আসে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় আমাদের পথচলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কুয়াশায় সমস্ত অঞ্চলটি এমনি অন্ধকার হয়ে যায় যে পথে জুতোর ছাপ লক্ষ্য করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আমাদের কুলিদের জুতোর ছাপ পথে খুঁজতে থাকার সময় লক্ষ্য করি একজন হাই অল্টিচিউড পোর্টার বাঁদিকের সুউচ্চ পাহাড়ের পাশে বসে আছে। সে তার পিঠের রুকস্যাকটি নামিয়ে রেখেছে এবং রুকস্যাক থেকে একটি কম্বল বার করে সারা দেহ ঢেকে রেখেছে। তবুও সে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে রাস্তা হারিয়ে প্রায় ২০/২৫ মিনিট এখানে বসে আছে। আমাদের সঙ্গে কোন কুলি নেই। সবাই এগিয়ে গেছে। কুলিদের সর্দার সাংবাও এগিয়ে গেছে। এমন কেউ দলে নেই, যে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দলের একজন সদস্য বাঁপাশের পাহাড়ের শীর্ষে উঠে চলমান কুলিদের লক্ষ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বিফল হয়ে ফিরে আসে। হিমালয়ের পনের হাজার ফুট উপরে জনমানবহীন এক তুষারশীতল প্রান্তরে আমরা কয়জন নিঃসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি। শত চিৎকারেও কোনরূপ সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। ডানদিকে অল্প দূরে হেমুল্। তার কলধ্বনি কানে আসছে। দুই একজন সত্য সাংবা ও অন্যান্য কুলিদের নাম ধরে আকুলস্বরে ডাক দেয়। সেই ডাকের কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি ওঠে। মৃত্যুমুখাপেক্ষী বিপন্ন কয়েকজন পর্বত অভিযাত্রীর প্রাণলাভের আশায় আর্ত চিৎকারধ্বনি কেবলমাত্র পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এই প্রাণহীন প্রান্তরে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করাই বৃথা। হাই অল্টিচিউড পোর্টারটি যখন আমার পথের কোন নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বিচিত্র এক মর্মান্তিক অনুভূতিতে সারাদেহ অবশ হয়ে আসতে থাকে। হিমশীতল বাতাসের কঠিন স্পর্শে দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে যেতে থাকে। মৃত্যু এলে জীবনের

স্পন্দন শেষ হয়ে যায় এইটুকুই জানি। কিন্তু এখন অনুভব করছি মৃত্যু আসার পূর্বাভাস। কী অসহনীয় অনুভূতি। মানুষ মৃত্যুর আগে কি দেখে জানি না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করছি আমার আপনজনের ও পরিচিতজনের বিষণ্ণ মুখগুলি। যখন প্রত্যেক অভিযাত্রীর বাড়িতে খবর যাবে এতোগুলো প্রাণ হিমালয়ের পনের হাজার ফুট উপরে পথ হারিয়ে চিরকালের মতো হিমালয়ে থেকে গেছে.....আর চিন্তা করতে পারছি না। ঘড়িতে দেখি সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর মাত্র একঘন্টা দিনের আলো আছে, তারপর এই জনহীন প্রান্তরে নেমে আসবে রাত্রির অন্ধকার। জানি না, কী রূপ নিয়ে রাত্রি এসে আমাদের ঘিরে ফেলবে।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সমস্ত শরীর জমে যাবার উপক্রম হয়েছে। পথ চলতে থাকলে ঠাণ্ডায় এতোটা কষ্ট হয় না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ও আসন্ন মৃত্যু যন্ত্রনায় সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আমার অবস্থা দেখে বলনেতা অমূল্য কিছু জ্বালানি ধুপগাছ এনে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে। দমকা হাওয়া ও তুষারপাতের ফলে অমূল্যর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নীরবে আমরা মৃত্যুর প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। হিমশীতল বাতাসের শব্দ ও জেমুহ্রদ কলকলধ্বনি কানে আসছে। পথের জন্য দিশেহারা হয়ে আমরা একঘন্টার ওপর মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তুষারপাত ও বৃষ্টিতে ভিজছি। সঙ্গে তাঁবু নেই, খাদ্য নেই, অতিরিক্ত শীতবস্ত্র নেই। সবকিছু নিয়ে মালবাহকেরা এগিয়ে গেছে। চারিদিক আঁধারে ঢেকে যেতে থাকে। হৃদয়ের তাপ, দেহের শক্তি ধীরে ধীরে বিদ্যুতে নেমে যেতে থাকে। জীবনের যখন আর কোন আশা নেই, ঠিক সেই সময়ে লক্ষ্য করি ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে কে যেন জেমুহ্রদ থেকে উঠে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। হ্যাঁ, একজন মানুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘন কুয়াশার জন্য ৮/১০ ফুট দূরের সবকিছু অস্পষ্ট। বিস্ময়াভীভূত হয়ে দেখি আমাদের একজন হাই অল্টিচিউড পোর্টার। তার এক হাতে একটি বড় কেটলী ও অপর হাতে ৪/৫ প্যাকেট বিস্কুট। কে তাকে পাঠালো আমাদের মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, জিজ্ঞাসা করতে, সে বলে "বিকেল তিনটের মধ্যে আপনারা মূল শিবিরে পৌছে যাবেন আশা করেছিলাম। কিন্তু চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখলাম আপনারা পৌছতে পারলেন না। সেইজন্য আপনাদের সেবার জন্য গরম চা ও বিস্কুট নিয়ে এসেছি।" দার্জিলিংএর এই হাই অল্টিচিউড পোর্টারের নাম সাঙ্গে শেরপা। সাঙ্গেকে ভগবান প্রেরিত দেবদূত মনে হচ্ছে। মরণের দুয়ার থেকে সে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এলো। চা পান করে, নতুন করে দেহে শক্তি সঞ্চয় করে সাঙ্গের সঙ্গে মূলশিবিরের দিকে চলতে থাকি। চারিদিক তখন গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। টর্চ জ্বেলে পথ চলতে হচ্ছে। হাওয়ার বেগ অনেক কমে এসেছে। আকাশে ২/৪টি তারা যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর নির্দয় জটাজাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছেন। মূল শিবিরে যখন গিয়ে পৌছই তখন রাত সাতটা বেজে গেছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পর্বত সিনিওলচুর উচ্চতা ২২,৬২০ ফুট। এই সিনিওলচুর পাদদেশে জেমু হিমবাহের পাশে ১৫,৮১০ ফুট উচ্চে আমাদের মূল শিবির। গতকাল রাতে

মূলশিবিরে এসে পৌঁছেছি। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম ভেঙে যায়। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজেছে। মাথার কাছে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে সিনিওলচুর বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে যাই। বিশ্বের বিখ্যাত পর্বত-অভিযাত্রীরা সিনিওলচুকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর শিখর-গৌরবে অলঙ্কৃত করে গেছেন। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি এ অলঙ্করণ কতখানি বাস্তব, এতোদিন সিনিওলচুর ছবি দেখে এসেছি, আজ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলাম। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে আসি। দিনমণি তখন দৃষ্টির অগোচরে। কিন্তু তাঁর রক্তিম আভায় সিনিওলচু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, সিরামিও প্রভৃতি পর্বতশিখরগুলি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠেছে। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। সিনিওলচুর ওই স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে চিরকালের মত ধরে রাখার জন্য তাঁবু থেকে মূভি ক্যামেরা নিয়ে আসি। আলো মিটিয়ে ছবি তুলি। ঠিক বাঁকা তলোয়ারের মতো সিনিওলচুর শিখর ধীরে ধীরে স্বেতবর্ণে রূপান্তরিত হতে থাকে। কাছের দূরের সমস্ত শিখরগুলি সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জেমু হিমবাহেও সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সারা পরিবেশটি এক স্বর্গীয় সুষমায় অপরূপ রূপে প্রকাশ পেতে থাকে। প্রায় একঘণ্টা ধরে প্রকৃতিদেবীর অতুলনীয় রূপমাধুরী স্তব্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ করি। তারপর ধীরে ধীরে হলদেট মেঘ ঢেকে ফেলে সিনিওলচুর মাধুর্যময় দৃশ্য। একঘণ্টা তাঁবুর বাইরে ছিলাম। প্রকৃতির নয়নানন্দ রূপের আকর্ষণে দেহের স্পর্শকাতর অনুভূতিগুলি যেন এতক্ষণ অসাড় হয়ে ছিল। হঠাৎ তারা সজাগ হয়ে ওঠে। শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে। মূল শিবির স্থানটিতে রোদ আসতে এখনও অনেক দেরী। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে দেহকে প্রকৃতিস্থ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। ইতিমধ্যে সাঙ্গে এসে চা বিস্কুট দিয়ে যায়। সাঙ্গে গতকাল আমাদের মৃত্যুর কঠিন হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। যতদিন বেঁচে থাকবো তাকে কখনও ভুলতে পারবো না। মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় কয়জন পর্বত অভিযাত্রী সাঙ্গের অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধিতে নবজীবন লাভ করে, এই অনিন্দ্যসুন্দর পৃথিবীর রূপসৌন্দর্য দেখার, মানুষের স্নেহ ভালবাসা পাবার আবার সুযোগ পায়। প্রার্থনা জানাই, সে জগতে সারাজীবন বিচরণ করে বেড়াবে। যেখানে প্রতিপদক্ষেপে আছে অনিশ্চয়তা ও মৃত্যুর করাল দংশন, সেখানে যেন তার বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ বার বার ঘটে। পর্বতাভিযানে তার নাম যেন চিরভাস্বর হয়ে থাকে।

আর প্রণাম জানাই দেবতাত্মা হিমালয়কে। চার দিন ছিলাম সিনিওলচুর পাদদেশে। হিমালয়কে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। যিনি চিরক্ষমাসুন্দর, যিনি করুণাময়, যেখানে অনন্ত অপার শান্তি চিরকাল বিরাজ করছে, যেখানে অনাদিকাল ধরে সাধুসন্তরা গেছেন তাঁর কোলে বসে সাধনা করতে, সেই তুষারাবৃত হিমালয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে এতো নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়ে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই দেবতাত্মা হিমালয়কে।

●

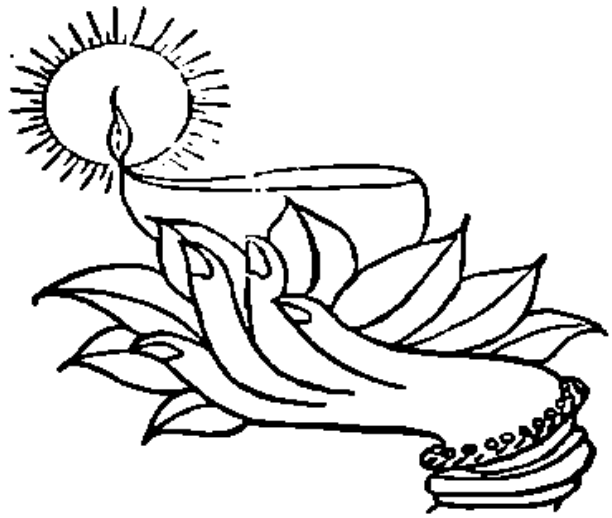

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(তেরো)

শিল্পসৃষ্টিতে অভিনবত্বের সন্ধানে বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা নানান্ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করে থাকেন। এসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে শিল্পিত সিরামিক্‌স্ নির্মাণে কিছু কিছু নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এমনই একটি পদ্ধতির ইংরেজী নাম Sand Casting ; যার বাংলা নামকরণ করা যেতে পারে বালি থেকে ঢালাই। বালি থেকে ঢালাই বলতে বোঝায় বালির তৈরী ছাঁচএ জলমিশ্রিত প্লাষ্টার ঢেলে আঁদরা বানিয়ে ওই আঁদরা থেকে প্লাষ্টারএ ছাঁচ তৈরী করে নিয়ে ওই ছাঁচএ স্লিপ্ ঢালাই করা।

বালিতে ছাঁচ তৈরী ? বালির প্রাসাদ তৈরীর মতোই অবাস্তব ব্যাপার বলে মনে হয়। বালির প্রাসাদ তৈরী করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও বালিতে সিরামিকএর আঁদরার প্রাথমিক ছাঁচটি তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। কি করে সেটা সম্ভব—সেকথা বলছি। মোটা কিংবা মিহি দানার বালি নিয়ে প্রথমে তারের জালের চালুনিতে চেলে নিয়ে বালি থেকে কাঁকর আলাদা করে নিতে হবে। বড় সাইজের কাঁকর হতে ও বালি থেকে বেছে নেওয়া যায়। এবারে একটি পাত্রে পরিষ্কার বালি রেখে ওই বালিতে অল্প জল ঢেলে বালির সঙ্গে জল ভালো করে মেখে বালির মণ্ড তৈরী করতে হবে। বালির মণ্ড তৈরী করবার আগে প্লাইউড্‌এর টুকরো অথবা গাল্‌ভানাইজড্ টিনের পাতে আকাঙ্খিত মাপে একটি ফ্রেম তৈরী করে নেওয়া দরকার। ফ্রেমটির চারিদিকে অবশ্যই দড়ি দিয়ে বেঁধে নিতে হবে ; যাতে ফ্রেমটি খুলে না যায়। দড়িবাঁধা ফ্রেমটি টেবিলের ওপর রেখে বালির মণ্ড ফ্রেমটির ভেতরে হাতে চেপে চেপে ভর্তি করে দেওয়া হলো। লক্ষ্য রাখতে হবে, ফ্রেমএর দেওয়ালের উচ্চতা ভেতরে রাখা বালির মণ্ডের উচ্চতার তুলনায় যেন ৩/৪ ইঞ্চি বেশি থাকে।

ফ্রেমএর ভেতরে বালির মণ্ড দিয়ে যে-জমি তৈরী হলো—তার ওপর এক টুকরো সমান কাঠ এদিক থেকে ওদিকে টেনে জমিটি সমান করে নিয়ে হাঁচ তৈরীর প্রাথমিক কাজ সুরু করা যেতে পারে। ভোঁতা ছুরি কিংবা সরু কাঠিতে বালির সমান জমির ওপর আকাঙ্খিত সিরামিকএর নকশার বহিঃসীমারেখা অগভীর রেখায় টেনে ওই বহিঃসীমারেখার ভেতর কিংবা বাইরের অংশ থেকে আঁদরার গড়নের ডৌল (উচ্চাবচ আকার) অনুযায়ী বালি তুলে ফেলতে হবে একটি ধাতব অথবা প্লাষ্টিকের চামচের সাহায্যে। ওই উচ্চাবচ আকারের ওপর অগভীর রেখায় অলংকরণ করতে হলে তা করা যেতে পারে একটি ভোঁতা ছুরি অথবা ধাতব শলাকা দিয়ে।

একটি এনামেলএর পাত্রে ২ ভাগ জলে ৩ ভাগ প্লাষ্টার অব্ প্যারিস্ মিশিয়ে লেই তৈরী করে ওই প্লাষ্টারএর লেই চামচ অথবা হাতের আঙুলে করে একটু একটু নিয়ে ফ্রেমের ভেতরে ফেলে বালির জমির ওপরে ফ্রেমের দেয়ালের উচ্চতা পর্যন্ত ভরাট করে দিতে হবে। প্লাষ্টারএর লেই একবারে অনেকটা বালির জমির ওপর ঢালা চলবে না; তাতে বালি সরে গিয়ে হাঁচএর গড়ন ও অলংকরণ বিকৃত হয়ে যাবে। ১৫/২০ মিনিট পর প্লাষ্টার জমে গেলে ফ্রেমের দড়ির বাঁধন খুলে ফ্রেম সরিয়ে নিলে প্লাষ্টারএর আঁদরাটি পাওয়া যাবে। বালি থেকে আঁদরাটি তুলে নিলে কিছু বালি আঁদরার গায়ে লেগে থাকতে পারে। একটি শক্ত ব্রুঁচির ব্রাশএ ওই বালি ঝেড়ে ফেলা যায়।

প্লাষ্টারএ আঁদরাটি তৈরী হয়ে গেলে ওই আঁদরা থেকে তৈরী করতে হবে প্লাষ্টারএর হাঁচ—যে-হাঁচএ স্লিপ্ ঢালাই করে নির্মিত হবে সিরামিক। আলোচ্য নিবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আঁদরা থেকে হাঁচ তৈরী এবং হাঁচ থেকে স্লিপ্ ঢালাই পদ্ধতিতে সিরামিক তৈরীর প্রণালী বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ-সম্পর্কে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, নমনীয় মাটিতে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায়ে সিরামিকএর প্রাথমিক আঁদরা যখন তৈরী করা যেতে পারে, তখন বালির হাঁচএ প্লাষ্টার ঢেলে আঁদরা তৈরী করবার সার্থকতা কি? গোড়াতেই বলা হয়েছে, শিল্পীরা স্বভাবতই বৈচিত্র্যসন্ধানী। শিল্পিত সিরামিকএর, বিশেষ করে সিরামিকএর জমিতে বুনোটের বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসেই শিল্পীদের পরীক্ষানিরীক্ষায় উদ্ভাবিত হয়েছে বালি-ঢালাই পদ্ধতির। বালি দিয়ে তৈরী মূল হাঁচএর বালিকণাগুলোর ছাপ প্লাষ্টারএর আঁদরায় সহজেই মুদ্রিত হয়ে যায়। ওই আঁদরা থেকে তৈরী প্লাষ্টারএর হাঁচএ স্লিপ্ ঢালাই করে যে-সিরামিক নির্মিত হয়—সেই সিরামিকএর জমিতেও ফুটে ওঠে বালির সরু-মোটা দানার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপ; যাতে একটি বিশেষ ধরনের বুনোটের সৃষ্টি হয়। সিরামিকএর জমিতে ঠিক এ-ধরনের অমসৃণ অথবা খসখসে বুনোটের সৃষ্টি করা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। তাছাড়া বালির মূল হাঁচএ অগভীর রেখায় খোদাই করে যে-অলংকরণ করা হয়, সে-অলংকরণের রেখাগুলো বালির দানার ওপর টানার ফলে অমসৃণ ও ভাঙা ভাঙা দেখায়; নমনীয় মাটিতে খোদাই করা অলংকরণের রেখার মতো মসৃণ কিংবা তীক্ষ্ণ দেখায় না। অর্থাৎ অমসৃণ বুনোটের জমি এবং ভাঙা ভাঙা রেখায় অলংকরণে বালির হাঁচ থেকে তৈরী সিরামিকএ এক দুর্লভ অভিনবত্ব ফুটে ওঠে।

শিল্পসৃষ্টির প্রতিটি মাধ্যমের মতোই বালির ছাঁচ থেকে তৈরী সিরামিকএর ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা শিল্পীদের মেনে নিতে হয়। এ-পদ্ধতিতে একবারে একটিমাত্র অর্ধবর্তুলাকৃতি আঁদরাই তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য দু'খণ্ড অর্ধবর্তুলাকৃতি প্লাষ্টারএর আঁদরা মুখোমুখি জুড়ে একটি অখণ্ড বর্তুলাকৃতি আঁদরা তৈরী করা যায়। একটি বালির ছাঁচ থেকে একটি মাত্র প্লাষ্টারএর আঁদরাই একবারে তৈরী করা সম্ভব। অর্ধবর্তুলাকৃতি একটি প্লাষ্টারএর আঁদরা থেকে প্লাষ্টারএর ছাঁচ তৈরী করে ওই ছাঁচএ প্লাষ্টারএ নিরেট ঢালাই করলে সম-আকৃতির দ্বিতীয় আঁদরাটি পাওয়া যাবে। দুটো আঁদরা মুখোমুখি একসঙ্গে জুড়ে নিলে একটি বর্তুলাকৃতি সম্পূর্ণ প্লাষ্টারএর আঁদরা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। সম্পূর্ণ আঁদরাটির প্লাষ্টারএর ছাঁচএ স্লিপ্ ঢালাই করলেই পাওয়া যাবে বালিদানার মুনোটযুক্ত জমির একটি বর্তুলাকৃতি সিরামিক। 'ভেন্ড্রাইট্', 'এবিকল্' ইত্যাদি ব্রাণ্ডের যেসব রাসায়নিক আঠা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়—ওই সব আঠার সাহায্যে দু'খণ্ড অর্ধবর্তুলাকৃতি প্লাষ্টারএর আঁদরার মুখোমুখি জোড়ার কাজটি চলবে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা। সংকলন, সম্পাদনা ও ভূমিকা : ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ। পরুল পাবলিশিং হাউস। ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। ১২·০০ টাকা।

'পরাজয়ের মুখোমুখি হও, হতাশাকে আলিঙ্গন করো। আমার ইচ্ছায় জগতে দুঃখ-সুখের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় জগতে প্রবেশ করে তাই আনন্দিত হও। আমার হাসিটির দিকে চেয়ে থাকো। এমনি গোপন গভীরে সন্তানদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরম স্নেহে আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের লালন করি।...'

'যে শ্রমের দায়িত্ব তোমায় দিয়েছি, তাতে একনিষ্ঠ হও। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সার্থক সম্মেলন হোক। সব দাবী পূরণ করো। তবু কোনো দায়ের বোঝা বহন করো না। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা নয়।'

মাতৃকণ্ঠের যে-বাণী ভগিনী নিবেদিতা তাঁর অন্তরে শুনেছিলেন, কবিতার আকারে তার প্রকাশ ঘটে তাঁর 'দি ভয়েস অফ দি মাদার' কাব্যে, যেটি তাঁর 'কালী দি মাদার'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি কলি সেই অনন্ত কাব্যকৃতিরই অংশ—বাংলা অনুবাদে (অনুবাদ : প্রণবরঞ্জন ঘোষ কৃত)। কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে যিনি ভারতবর্ষের সেবায় তথা মানবসেবায় আত্মনিবেদন করেছিলেন, এক জন্মে জন্মান্তর লাভ করে হয়েছিলেন প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী, এ-কবিতা নিঃসংশয়ে তাঁর পরম উপলব্ধিরই ফলশ্রুতি। সেই উপলব্ধির

CALCUTTA

সার্থক প্রতিফলন তাঁর জীবনসাধনায়। 'নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা' কাব্য-সংকলন-গ্রন্থে কবিতাটির অনুবাদ সঙ্গতভাবেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগটি গ্রন্থের ভূমিকারূপে চিহ্নিত। ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণত পাঠকের যা প্রত্যাশা, এক্ষেত্রে প্রাপ্তির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী। আসলে ভূমিকাটি ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে সংকলক-সম্পাদক প্রণবরঞ্জন ঘোষের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, মানবধর্মী প্রবন্ধ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও মননের আলোকে নিবেদিতার ভারতাত্মার অনুধ্যানের পরিচয়টি লেখক এই প্রবন্ধে সবিস্তারে উদ্ঘাটন করেছেন। এই অনুধ্যান তাঁর জীবনসাধনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিবেদিতার রচনাবলী থেকে উদ্ধৃতির সহযোগে তাঁদের বোধের জগৎটি এখানে সুপরিস্ফুটিত। 'আমাদের আজকের ভারত-অনুধ্যান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরই আত্মনিবেদনে অনেকখানি অনুপ্রাণিত'।—লেখকের সুচিন্তিত এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। নিবেদিতা ভারতকে কী দিয়েছেন, স্বভাবতই তার মূল্যায়নের উপাদান আছে এই প্রবন্ধে। আর তাঁর ব্যক্তিত্ব—অথবা সমগ্রভাবে তাঁর চারিত্রিক রূপ? তারও প্রতিভাস এই বিশ্লেষণী, মনোজ্ঞ রচনায় উপস্থিত। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আলোকবিস্তারী। রবীন্দ্রনাথের গোরা-চরিত্রের সঙ্গে নিবেদিতার সাযুজ্য প্রসঙ্গটি যেন অনিবার্যভাবেই এসেছে। এই অংশটি প্রবন্ধে যোজনা করেছে একটি অতিরিক্ত মাত্রা। গ্রন্থের নামকরণে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' শব্দের যোগ কেন, তার উত্তর পেয়ে যাই প্রবন্ধের শেষ অংশে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতার স্বরূপ বুঝি তখন আমাদের অনুভবের গোচরে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে আছে 'দি ভয়েস অব দি মাদার'সহ নিবেদিতার দশটি কবিতার অনুবাদ। শঙ্খ ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তিনটি কবিতা অনুবাদ করেছেন, অবশিষ্ট সাতটির অনুবাদ প্রণবরঞ্জন ঘোষের। সংকলনের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে তৃতীয় বিভাগটি—সেখানে নিবেদিতার উদ্দেশে লেখা প্রায় অর্ধশত কবিতা বা কাব্যোপম রচনা স্থান পেয়েছে। এই বিভাগের অবিস্মরণীয় প্রথম দুটি কবিতার ('শান্তি ও আশীর্বাদ') রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথমটি অনুবাদ করেছেন স্বামী নিরাময়ানন্দ (তাঁর স্বরচিত একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতাও এই বিভাগে আছে), দ্বিতীয়টি প্রণবরঞ্জন ঘোষ (তাঁরও নিজের একটি কবিতা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত)। তৃতীয় কবিতাটি দক্ষিণ ভারতের সুব্রহ্মণ্য ভারতীর—অনুবাদ যশোদাকান্ত রায়ের। অন্যান্য কবিতার রচয়িতার মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নাম: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দিলীপকুমার রায়, অমিয় চক্রবর্তী, বনফুল। এছাড়া আছেন আরও অনেক পরিচিত এবং কিছু যথেষ্ট-পরিচিত-নন এমন কবি। প্রত্যেকটি রচনাই শ্রদ্ধা প্রকাশের আন্তরিকতায় সমুজ্জ্বল। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাব্যনাট্য 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সংকলন-গ্রন্থটি সুসম্পাদিত—এবং অবশ্যই সংগ্রহ করবার মতো।

জ্যোতির্ময় বসুরায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : স্বামী অপূর্বানন্দ। প্রকাশক : স্বামী পরদেবানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগের হাট, খুলনা, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৪২। মূল্য : অনুল্লেখিত।

স্বামী অপূর্বানন্দজীর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বইখানি পড়ে বিস্মৃতে সিন্ধুর স্বাদ পেলাম। বইটি আয়তনে লক্ষ্মীর পাঁচালীর মতো হলেও এর আবেদন অনস্বীকার্য। এই আটপৌরে সহজ সরল পুস্তিকায় কোন বাগাড়ম্বর নেই। তাই বইখানি সকলের প্রিয় গ্রন্থ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উজ্জ্বলতম দিকগুলোকে একটি জমাট যোগসূত্রে গাঁথা হয়েছে এ গ্রন্থে। বলা বেশী যে, তাঁর জীবন হাতীর দাঁতের ওপর চিকন কাজের মত নিখুঁত সুন্দর।

তিনি সংসারে থাকলেও মন তাঁর সংসারে ছিল না। সাধারণের বেশে তিনি অসাধারণ, লৌকিক পৃথিবীর হয়েও সংসারাবদ্ধ নন। জগৎ উদ্ধারের জন্য দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দকে তাঁর সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে তিনি ফকির হয়ে গিয়েছিলেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। ভক্ত ও ভগবান এখানে অদ্বয়রূপে প্রতিভাত। সবশেষে সরল ও আকর্ষনীয় কিছু বাণীমালা সংকলিত হওয়ায় বইয়ের গুরুত্ব বেড়েছে।

বইখানার ছাপা যতই মামুলি, কিন্তু মুদ্রণ প্রমাদও লক্ষণীয়। তবে তা বইটির সামগ্রিক মানের জন্য অগ্রাহ্য করা যায়। ত্যাগ ও জ্ঞানের আভাস প্রচ্ছদে পরিস্ফুট। বর্তমান 'বাংলাদেশে'র সাধারণ পাঠকদের জন্য বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের এ উদ্যোগ সকলেরই সাধুবাদ পাবে।

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য

●

॥ সংঘবার্তা ॥

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের

১১৬-তম জন্মতিথি উৎসব

২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১, কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের ১১৬-তম জন্মতিথি উপলক্ষে।

অতি প্রত্যূষে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মঙ্গলারাত্রিক ক'রে উৎসব শুরু হয় ২২শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। প্রাতে বিশেষ পূজা ও পরে হোম সমাপন হয় এবং এক বাজার ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজী মহারাজের উদ্দেশে আসে ফল-মূল-মিষ্টি-কাপড় ইত্যাদি। বেলুড় ও অন্যান্য শাখা কেন্দ্র থেকে সন্ন্যাসীরা দলে দলে যোগদান ক'রে উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সোদপার্ক রামকৃষ্ণ

মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, বহুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী মুক্তানন্দ (বেলুড় মঠ), স্বামী পুরুষানন্দ (বলরাম মন্দির), স্বামী প্রভানন্দ প্রমুখ। সন্ধ্যা ৬। টায় 'নিবেদন গোষ্ঠী'র শ্রীকৃষ্ণন ভট্টাচার্য্য ও সহশিল্পীগণ স্বামী অভেদানন্দজীর জীবনী-অবলম্বনে 'গীতি-আলেখ্য' পরিবেশন ক'রে এক ভাবঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেন।

পরদিবস সন্ধ্যা ৬।০টায় অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী 'উদ্বোধন'-এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বর্তমান মানবসমাজের বহুবিধ জীবনসমস্যা সমাধানে স্বামীজী মহারাজের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীর মধ্যেই বর্তমান মানবসমাজ খুঁজে পাবে সব সমস্যার সমাধান। সুতরাং তাঁদের অনুসৃত পথে চলে আমাদের জীবনকেও শান্তিময়, আনন্দময় ও সার্থক ক'রে তুলতে হবে। তবেই বর্তমান সমাজে গড়ে উঠবে মানুষ তৈরী হবে যাঁরা সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করবেন।

বিশেষ বক্তা অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী বলেন, শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী গুরুকৃপায় আত্মসাক্ষাৎকার করেছিলেন, তিনি সেই একত্বে জেনেছিলেন যাকে জানলে সকল বস্তুকেই জানা যায়। তাই তিনি যখন ধর্ম, দর্শন, সঙ্গীত, ললিতকলা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের যে-কোন বিষয় আলোচনা করছেন তখন দেখি তিনি বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে সকল অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রকাশ করছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, মানুষের অন্তরে ও বিশ্বে একই বস্তু বিরাজমান। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ধর্ম ও দর্শন বা বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। আবার একই আনন্দময় সত্তার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর কর্মের মধ্যেও। তিনি একাধারে জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত। তিনি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাসানুদাস বলেছেন এবং তাঁর চরণে নিজজীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রামাণ্য উক্তি, 'তুমি যেমন খেয়েছো আমায়, আমিও তেমনি খেয়েছি তোমায়'—গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অভেদবোধ এবং জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর জীবনে। আবার তিনি দেশ-প্রেমিক। তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি দেশ ও দেশবাসীর জন্য আজীবন কর্ম করেছেন। তাঁর রচিত 'India and Her People'-গ্রন্থে ভারত ও ভারতবাসীর কথা অতি মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরেছেন। ভারতবাসীর ঐহিক উন্নতির জন্য যথাযথ চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এসব থেকে এটাই স্পষ্টভাবে হয় যে স্বামীজীদের জীবনে ও কর্মে আধ্যাত্মিকতা ও বাস্তবজীবনবোধের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। নিজ স্বার্থ ত্যাগ করেই তাঁরা মানুষকে ভালবাসতে শেখেছিলেন। ধর্মের যে মূল বস্তু, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সেই ব্রহ্মোপলব্ধি হলে তবেই আসবে প্রেম, কারণ অন্তরের ঐক্য আছে বলেই সকলকে ভালবাসতে হবে। সুতরাং আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে বর্জন নয়, তাকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করেই সকলকে ভালবাসা যায়। শুধু মুখে 'সকলকে ভালবাসি' বললেই ভালবাসা যায় না। জীবনের লক্ষ্য তাই ঈশ্বরলাভ।

বাননীয় প্রধান অতিথি শ্রীঅনিরুদ্ধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বামী অভেদানন্দজীর ত্যাগপূত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তিনি কৌপিনমাত্র সম্বল ক'রে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পরিব্রজন করেন দীর্ঘ সন্ন্যাসীরূপে। আবার অসাধারণ কর্মীরূপে তিনি বেদান্ত প্রচার করেন সুদূর আমেরিকায় যেখানে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করায় স্বামী বিবেকানন্দ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "Thrice I knocked at the door of New York but it did not respond. I am glad that you have established a permanent headquarters. This is for the first time I have found our home in New York." বর্তমান যুগে 'Shankar is archaic'—আচার্য শঙ্করের কথা অচল। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে শ্রুতিত বর্তমান যুগে বাস করছি। তাই স্বামী অভেদানন্দজীও ধর্মকে দেখেছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অংশোদ্ভূত বলতেন। বর্তমান সমাজে ধর্মান্ধতা দূরীকরণে তাঁর দান কম নয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শকে অনুসরণ করতে বলেছেন, তিনি ধর্মের গৌণ ও সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার 'India and Her People'-গ্রন্থে তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, বলেছেন দেশকে স্বাধীন করার আগে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য। ধর্মই তার একমাত্র পথ। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'বহু বল্লিকে দেলে তাঁর সম্পত্তির খবর পাওয়া যায়'। তেমনি জলধারকে যো সো ক'রে লাভ করলে ব্রাহ্মণকে ভালবাসা যাবে। রূপা ঘাতাস অনুকূলে বইছে পাল তুলে দিতে হবে বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ।

সর্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীযুৎ স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী মহারাজ স্বামী অভেদানন্দজীর একটি মূল্যবান জীবন-আলেখ্য তুলে ধরেন বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে। দার্জিলিঙ্-এর N. N. H. P. Hall-এ ১১/১০ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম শ্রুত স্বামী অভেদানন্দজীর বক্তৃতা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, 'দার্জিলিঙ্-এ মহাকাল পর্বত যাওয়ার যেমন অনেক রাস্তা তেমনি ঈশ্বরলাভের অনেক পথ এবং সাধারণের জন্য রাজপথ। সামর্থ্য এবং রুচি অনুসারে লোক পথ বেছে নেয়'। শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সকল অবতার ও দেবদেবীর সম্মিলিতরূপ দেখেছিলেন।

সভায় সম্মিলিত কণ্ঠে গায়োত্রাজ সহযোগে তিনটি ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরোজ সেনগুপ্ত এবং দুর্জয় সঙ্গীত সংস্থার অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ এবং দুইদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

একই সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের দার্জিলিঙ্, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি শাখাতেও শ্রীযুৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের উক্ত অন্তিথি উৎসব পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবার।

●

পিয়ারলেস
ও
পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবন।

সারা ভারতে আজ বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবক কর্মক্ষম হয়েও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জ্জরিত। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আনুপাতিক হার মনে হয় সর্ব্বাধিক।

— • —

সমাজ জীবনের এই নির্ম্মম পরিস্থিতিতে "পিয়ারলেস" শুধু যে আশার বাণীই শুনিয়ে এসেছে তাই নয়, "পিয়ারলেস" তার একক প্রচেষ্টায় এবং বিজ্ঞানসম্মত অভিনব কর্ম্মপদ্ধতির মাধ্যমে আজ আড়াই লক্ষেরও অধিক লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী।

— • —

পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী অর্থনৈতিক সংস্থার ইতিহাসে স্বনির্ভর কর্ম্মসংস্থানের একক এমন বিশাল প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

— • —

জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত "পিয়ারলেস টীম" সুখী ও সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গঠনের কাজে আরো বেশী—আরো সক্রিয়ভাবে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ পেলে ধন্য মনে করবে।

— • —

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ 'পিয়ারলেস ভবন'

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯

নূতন ব্যবসায়ে বিস্ময়কর অগ্রগতি		
১৯৭৮ ৩৩৬ কোটি টাকা	১৯৭৯ ৪৬০ কোটি টাকা	১৯৮০ ৭৮০ কোটি টাকা
মোট সম্পদ :—১৫০ টাকার উর্দ্ধে।		

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুতকারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও 'JECY' ব্রাণ্ড পলিথিন গাইশ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

ডি. রতন এণ্ড কোঃ

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিখাদ হারবিউস প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিংচারেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্পাও-অফ-বিশুদ্ধযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩'০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩'০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

ক্ষুদ্রৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, ঈ-টালা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

Space Donated by—

A WELL WISHER

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	and Vedanta	
My Life Story	12·00	True Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Path of Relization	10.00	Yoga Psychology	16·00
Philosophy and Religion		Yoga : Theory & Practice	10·00
		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South Asian Peoples, Vol. 1	125·00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its From Function and Value	65.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
43rd Year, November 1981
VOL. IX

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

ublished and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
ia Rajkrishna Street, Calcutta-700 006. printed at the New Indian Press, 8,Duff Street, Calcutta-700006
Rs 1.50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১.৫০ টাকা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

বিশ্ববাণী

সম্পাদক : স্বামী অভেদানন্দ
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহকারী সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ

প্রতিষ্ঠিত

তেতাল্লিশ বর্ষ · একাদশ সংখ্যা
পৌষ ১৩৮৮

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ১·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে ত্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। ত্রিকা সাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারা পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

শনিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯·০০মি: থেকে ১১·০০মি: এবং বিকাল ৩·০০মি: থেকে ৬·৩০মি:

॥ নিবেদন ॥

বিশ্ববাণীর সহৃদয় গ্রাহকগ্রাহিকাদের অবগতির জন্য জানাই যে, গত এক বৎসর যাবৎ ছাপার কাগজের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও 'বিশ্ববাণী' প্রকাশিত হচ্ছে গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রেখে। গ্রাহকগ্রাহিকাদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই বিশ্ববাণীর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়। ফলতঃ প্রতিমাসে এই বিভাগের ঘাটতি হয়ে চলেছে, তবুও কাগজের মূল্যহ্রাসের অপেক্ষায় এযাবৎ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববাণীর গ্রাহকমূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেননি। কিন্তু বর্তমানে ছাপার কাগজের দাম ক্রমশই বেড়ে চলায় এবং গ্রাহকমূল্য না বাড়িয়ে ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ আগামী ফাল্গুন ১৩৮৮ অর্থাৎ বিশ্ববাণীর নূতন (৪৪-তম) বর্ষ থেকে বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ১২৲ টাকার পরিবর্তে ১৪৲ টাকা এবং প্রতি ভাদ্র থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত যাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য ৭৲ টাকার পরিবর্তে ৮৲ টাকা ধার্য্য করতে বাধ্য হয়েছেন। পত্রিকা এই অফিস থেকে হাতে সংগ্রহ করলে বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৩৲ টাকা এবং যাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য ৭৲ টাকা জমা দিতে হবে।

তদনুসারে বিশ্ববাণীর বিবেচক গ্রাহকগ্রাহিকাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে বর্ধিত হারে বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ১৪৲ টাকা পাঠিয়ে সর্বজন-সমাদৃত 'বিশ্ববাণী'র প্রকাশন অব্যাহত রাখতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করুন।

ইতি—

বিনীত—

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ

'এ যেন এলেম নতুন দেশে'

শীতের দার্জিলিঙ

গ্রীষ্মের বা শরতের দার্জিলিঙের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশী। কিন্তু এসময়কার দার্জিলিঙ অভিনব। এখন আবহাওয়া চমৎকার। ঝকঝকে আকাশ, বৃষ্টি নেই—কুয়াশাও নেই বললেই চলে। রোদ-ঝলমল পরিবেশে দৃষ্টি চলে অবাধে—বহুদূর। তারই মাঝে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাঞ্চনজংঘার মহিমময়ী রূপ।

শুধু কাঞ্চনজংঘা কেন? দার্জিলিঙ থেকে এই সময় পৃথিবীর সেরা আরও কয়েকটি পর্বতশিখরও আপনি দেখতে পাবেন।

এখন লোকের ভীড়ও কম। শান্ত, নির্জন পরিবেশে মন হয়ে উঠবে স্নিগ্ধ প্রশান্ত।

নিরুত্তাপ রোদ, হিমেল বাতাস। শীতের পোষাকে চলাফেরার কোন অসুবিধাই বোধ করবেন না।

দার্জিলিঙে আছে কয়েকটি ট্যুরিষ্ট লজ। উপরন্তু এসময়ে সেখানে শীতকালীন কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

পাহাড় এবং অরণ্য যাঁদের বার বার হাতছানি দেয়, সেইসব প্রকৃত প্রেমিকদের কাছে এসময়কার দার্জিলিঙ ভ্রমণ এক সুমধুর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। অনেক, অনেক দিন।

আজই আসুন। শীতের কটা দিন দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে কাটিয়ে যান। দেখুন, ছুটির মজা বলে কাকে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইষ্ট)

কলিকাতা-৭০০ ০০১

ফোন : ২৩৮২৭১ গ্রাম : 'TRAVELTIPS'

অথবা দার্জিলিঙ

ফোন : ২০৫০ গ্রাম : DARTOUR

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. পি. এ.—৩১৯/৮২

WE ARE IN THE GOOD BOOKS OF WHOM WE DELIVER THE GOODS
YOUR LARGER OPERATIONS REQUIRE OUR LARGER TRANSPORTATION NET-WORK

INDIAN ROADWAYS CORPORATION

1, SUNYAT SEN STREET,
CALCUTTA-700 012

Telephones : 26-5110 (5 Lines)
26-7551
27-6345

Telex : 021-7010
Gram : INDROADCOR
CALCUTTA

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN.

Cable : CASTINGS

ফোন : ৪৫-৩৩৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

স্নায়বীয় শৈথিল্যের শীতাস্ত্র

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৯

ফোন : ৪৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

ব্রাঞ্চকালাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

পৌষ, ১৩৮৮

সম্পাদক : স্বামী সত্যাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন সোদার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধ দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল সাড়ে চার ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুত কারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও "JECY" ব্রাণ্ড পলিথিন গাইজ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

ডি. রতন এণ্ড কোঃ

ফটো

কেশতৈলে পাতার রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

ইন্দ্রাস পাবফিউম প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৮৮

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৪১৩	
২।	বলরাম-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ	৪১৪	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	মহাকালজয়ী বীরসন্ন্যাসী	৪১৬	রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীবাসুকানাথ স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ, সামুদ্রিক রত্ন
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৪১৭	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৫।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৪১৮	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৬।	পঞ্চতীর্থ পঞ্চকেদার	৪৮১	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
৭।	পুণ্যাহের পুণ্যস্মৃতি	১৮৪	অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮।	গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	৪৮৮	শ্রীতপন কবিরাজ
৯।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৪৯১	
১০।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৪৯৩	
১১।	স্বীকৃতি	৪৯৭	

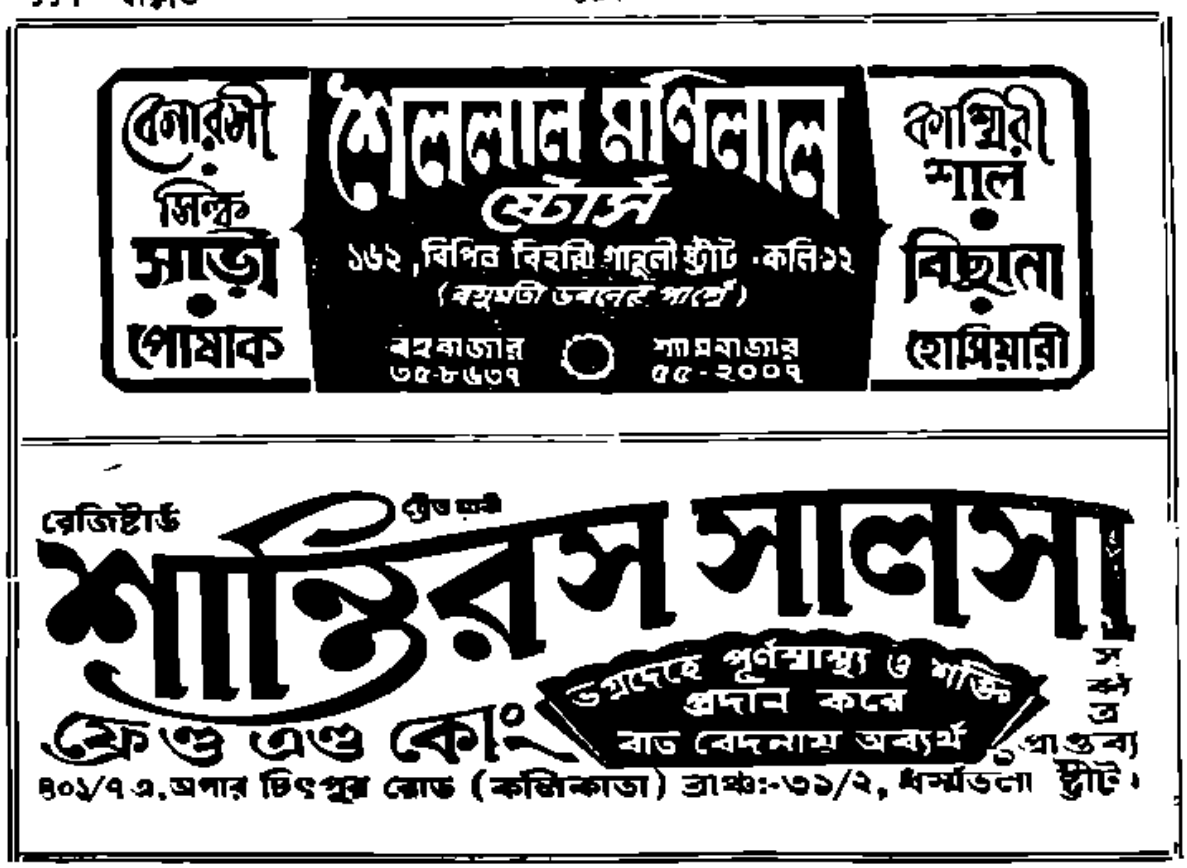

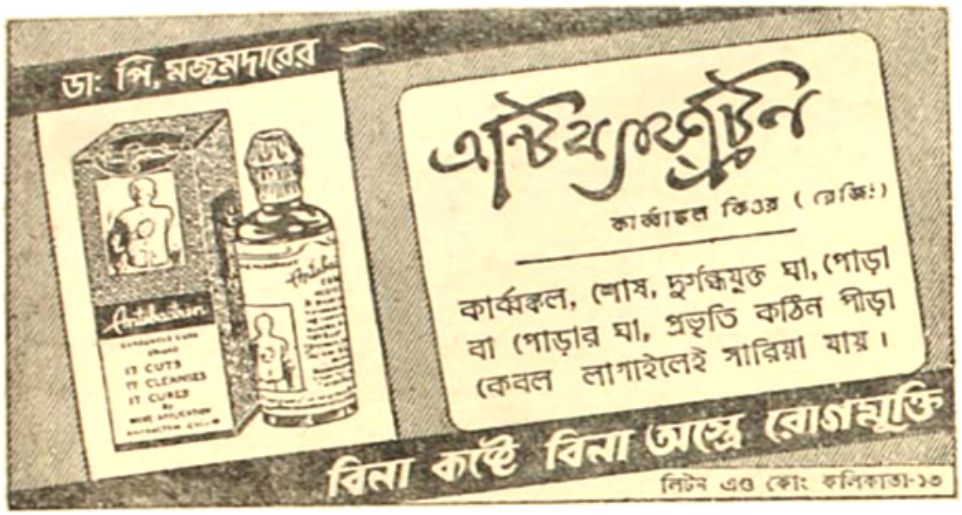

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, NALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

[illegible]

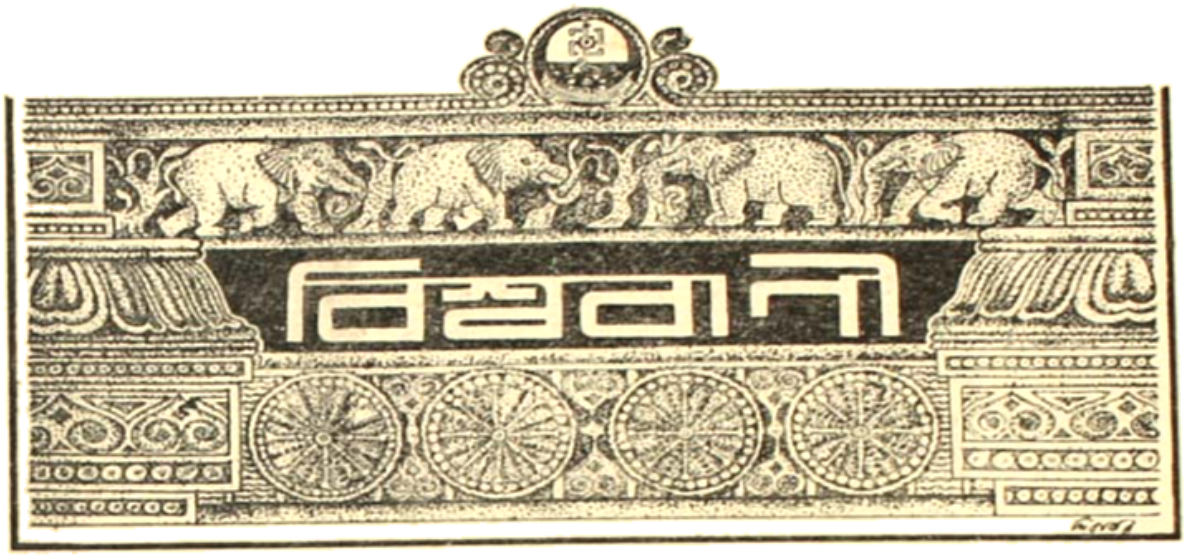

| তেতাল্লিশ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা | পৌষ ১৩৮৮ |

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(অষ্টাদশাংশ)

॥ তত্ত্ববিচার ও সিদ্ধান্ত ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা" এবং সে'কথায় সাধক রামপ্রসাদের মাতৃতত্ত্বের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন—

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতারে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝনা-রে মন ঠারে-ঠোরে ॥

এ'সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করেছি। তাহলেও পুনরায় বলি যে, সাধক রামপ্রসাদের জীবন-সাধনের অনুভূতিরূপ মাতৃতত্ত্ব বা জীবনসিদ্ধান্ত ছিল : 'আমি কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।'[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : "আমি তত্ত্ব করি যাঁরে, অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি, তাঁরেই মা মা ব'লে ডাকছি"। এই রহস্যময় মাতৃতত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থে সগুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব, কেননা সগুণ-ব্রহ্মেরই বিভিন্ন নাম ও রূপের কল্পনা করা সম্ভব, নির্গুণ-ব্রহ্ম সকল-কিছুর পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অনুভূতির কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "সমাধিতে কি বোধ হয়—মুখে (ভাষায়) বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মতো বলা যায়।

১। এ'সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি।

যখন সমাধিভঙ্গের 'ওঁ ওঁ' বলি, (তখন) একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার, মুখে বলা যায় না। সেখানে 'আমি' 'তুমি' নাই" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬১)।

॥ সমাধিতে উপলব্ধি ॥

এই যে 'সমাধিতে কি বোধ হয়—মুখে বলা যায় না'—এটি কোন্ সমাধি? সবিকল্প (সবিতর্ক বা সবীজ)—না নির্বিকল্প (নির্বিতর্ক বা নির্বীজ)? শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে নির্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধির কথা বলেছেন—যেখানে সংকল্পরূপ কোন বীজ ('আমি'-বোধ) থাকে না, কিন্তু সবিকল্পে বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে একটু 'আমি' বা 'অহং'-রূপ বিকল্প বা সূক্ষ্ম-সংকল্প থাকে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সেখান থেকে 'নামা'-র কথা ("নেমে একটু আভাসের মতো বলা যায়", ঠিক ঠিক বলা যায় না)। আবার বলেছেন: "আমি একশো হাত নেমে এসেছি"। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন মাতৃভাবের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: যখন "আমি তত্ত্ব করি যারে",—অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি, "তাঁরেই মা মা বলে ডাকছি", তখন তিনি মায়োপাধিক সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের কথাই বলেছেন, কেননা নির্গুণ-ব্রহ্মের এই বা সেই ব'লে কোন নির্বাচন হ'তে পারে না। মন ও বাক্যের যিনি অতীত, তাঁকে নির্দিষ্ট কোন নামে ও রূপে ডাকা বা চিহ্নিত করা যায় না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব চরমদৃষ্টি নিয়ে যে বলেছেন: "যিনিই সগুণ-ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ-ব্রহ্ম; যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ"। 'অভেদ' বলতে সমজ্ঞান ও অদ্বৈতজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সগুণ ও নির্গুণকে, অর্থাৎ সর্বাতীত সর্বোপরম-ব্রহ্মচৈতন্যকে এক ও অখণ্ডভাবে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—'যিনিই সগুণ-ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ-ব্রহ্ম; যিনিই শক্তি (সগুণ-ব্রহ্মের উপাধি), তিনিই (সর্বোপাধিমুক্ত) ব্রহ্ম'। কথাই তাই যে, সগুণ-ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) দর্শনের অর্থাৎ অনুভূতির পর নির্গুণ-ব্রহ্মের (তুরীয়-ব্রহ্মের) চরম-উপলব্ধি হলেও সেই অনুভূতির মধ্যে একটু সাপেক্ষতা-নিরপেক্ষতার আপাততেদ থাকে। সেজন্য আচার্য শঙ্করও নিরুপাধিক সর্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্যকে দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'—সর্বব্যাপকচৈতন্য বলেছেন। 'সর্বব্যাপকতা'-ও উপাধি বা বিশেষণ, কিন্তু তাহলেও দেশকালযুক্ত আপেক্ষিক জগতের মানুষের মন-বুদ্ধির ধারণার জন্য সর্বব্যাপকচৈতন্য বলেছেন। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—ব্রহ্মের অখণ্ড-ব্যাপকতারই লক্ষণ ও পরিচয়। এই সর্বব্যাপকচৈতন্যই ব্রহ্ম—বৃহৎ ও সীমাহীন, আবার ক্ষুদ্র ও সীমিত—অতিদূরে, আবার অতিনিকটে। এজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১৮।৬১ শ্লোকে) মহাবীর ও মহাজ্ঞানী অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন: 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি',—অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রাণী ও সকল-কিছু পদার্থ সৃষ্টি ক'রে সেই সেই রূপ ধারণ করেছেন (সেই সেই রূপে অন্তর্প্রবিষ্ট হয়েছেন)—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। তিনি (স্বরূপত ব্রহ্ম) বিশ্বাতীত হয়েও বিশ্বগত ও বিশ্বরূপ হন। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে (৬।১১) আছে: 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা'; অথচ তিনি 'সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ'। অর্থাৎ স্বরূপে সর্বগতচৈতন্য-ব্রহ্ম নির্গুণ, কিন্তু তিনি সগুণ হয়েও 'কর্মাধ্যক্ষঃ

সর্বভূতাধিবাসঃ',—তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণীকে ও সকল পদার্থকে পরিচালনা করেন। তিনি কর্ম করেন না, আবার কর্ম করেন; তিনি নিষ্কারণ—কোন-কিছুই করেন না, আবার সকলের ও সকল-কিছুরই কারণ। একমাত্র সর্বাধার ও সর্বাধিষ্ঠান-স্বরূপ ব্রহ্মেই contradictory বা পরস্পরবিরুদ্ধ কথার বা বস্তুর সমাবেশ সম্ভব। আবার সমন্বয়ও দেখা যায়—'তদ্দূরে তদ্বান্তিকে' প্রভৃতি। এজন্য জ্ঞানীরা পরমচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বিন্দু ও সিন্ধু দু'রকমভাবেই নির্বচন ও কল্পনা করেন, কেননা একমাত্র সকল-কিছুর সমন্বয়কেন্দ্র তিনি, মৈত্রী-মিলনের সেতুই তিনি। নির্গুণকে নির্বচন করা যায় না, কিন্তু তথাপি দিব্যচক্ষুষ্মান সাধকরা কখনও কখনও তাঁকে পিতা, মাতা, সখা ব'লে নির্বচন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি ব্রহ্মতত্ত্বের মর্মকথা ও রহস্যতত্ত্ব জানতেন, সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব চরম-অনুভূতির দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন: "ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—সেই প্রতিবিম্বকে (প্রতিবিম্ব-সূর্যকে) ধরে সত্য-সূর্যের (বিম্বের) দিকে যাও (কিংবা মৃন্ময়ী মূর্তিকে ধরে চিন্ময়ী আদ্যাশক্তির দিকে যাও)। সেই সগুণ-ব্রহ্ম—যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁরেই বলো, তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন।.....মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৬৩)। সাধারণ মানুষের ও ভক্তের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এ'কথা একটু অসম্ভব ও অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে পারে, কেননা সাধারণ মানুষ ও ভক্ত অবিদ্যার জগতে অজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে সব-কিছু দেখে এবং সব-কিছু ভাবে, তাই অবিদ্যার পারে জ্ঞানের চিন্ময়ী-দৃষ্টির মূল্য ও সার্থকতা তারা কেমন ক'রে বুঝবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন" —এ'কথা তাই সাধারণ অজ্ঞানবিলাসী মানুষের কাছে সংশয়-সন্দেহের ভাবই সৃষ্টি করে।

সমাজে বহু অভিজাত ও পণ্ডিত মানুষ আছেন—যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মার (আদ্যাশক্তির) উপর নির্ভরতা ও নির্দেশকে তন্ত্রদৃষ্টির প্রভাব ও ফলশ্রুতি বলে দেখেন। তাছাড়া পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধির অবস্থা থেকে উঠা-নামা বা উত্থান-ব্যুত্থানের প্রসঙ্গে অনুলোম ও বিলোম বলেছেন—যে দুটি শব্দ বিশেষভাবে তন্ত্রসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। এ'শব্দদুটি ব্যবহারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনদৃষ্টিকে তাঁরা তন্ত্রদৃষ্টির পরিণতি বা ফলশ্রুতি বলে সিদ্ধান্ত করেন। সেজন্য সেই কথার এখন সামান্য আলোচনা করি প্রথমে তন্ত্রের তত্ত্ব ধারণার পরিচয় দিয়ে।

॥ তন্ত্রসাহিত্য ও তান্ত্রিকদর্শন ॥

তান্ত্রিকসাহিত্যের আলোচনা বলতে তন্ত্রসাহিত্যের পারম্পর্যের আলোচনা নয়, মোটামুটি আগমশাস্ত্র বা তন্ত্রসাহিত্যের বিভাগ কি সেই সম্বন্ধে আলোচনা। শাক্তসাহিত্য সাধারণভাবে আগম ও নিগম দু'টি নামে পরিচিত। কাশ্মীরীয়-অদ্বৈত-শৈবদর্শন বা শৈবসাহিত্য প্রধানতঃ (১) আগমশাস্ত্র, (২) স্পন্দশাস্ত্র, (৩) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র নামে বিভক্ত। এদের মধ্যে (১) আগমশাস্ত্র—মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দ, মৃগেন্দ্র, রুদ্রযামল ও শৈবসূত্র; (২) স্পন্দশাস্ত্র—স্পন্দকারিকা, স্পন্দসন্দোহ, স্পন্দনির্ণয়, প্রভৃতি, এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র—শিবদৃষ্টি, ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, তন্ত্রালোক প্রভৃতি। ভট্ট উৎপল বা উৎপলদেবের 'স্পন্দপ্রদীপিকা' কাশ্মীরীয়-

ত্রিকশাস্ত্রের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শাক্তসম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, শিব ও শক্তি আগম ও নিগমের স্রষ্টা ও প্রবক্তা। আম্নায়ভেদে তন্ত্রসাহিত্যের সংখ্যা অনেক। তন্ত্রসাধকদের অভিমত যে, শৈব ও শাক্ত-ভেদে (শিবের উপাসকরা শৈব ও শক্তির উপাসকরা শাক্ত) দুটি শ্রেণীতে আগমশাস্ত্র বা তন্ত্রসাহিত্য প্রচারিত। শৈবাগম ও রুদ্রাগম দু'টি নামেরও প্রচলন আছে। আগমশাস্ত্র-গুলির মধ্যে কোন-কোনটি দ্বৈতমত ও কোন-কোনটি অদ্বৈতমত সমর্থন করে। অদ্বৈত-মতের শক্তিসাহিত্য (বা শাক্তসাহিত্য) শিব ও শক্তির অবিনাভাবসম্বন্ধ স্বীকার করে এবং এই অবিনাভাবসম্বন্ধই তন্ত্রে অদ্বৈতমতপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। তবে তন্ত্রসাহিত্যের এই অদ্বৈতবাদ শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের প্রচারক। শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদে শিব ও শক্তি উভয়েই চিন্ময়সত্তাবিশিষ্ট ও উভয়েই সত্তা এবং উভয়ের (চপকাকারে) মিলিত রূপই অদ্বৈত। এই শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদে মায়া বা মহামায়া মহাশক্তিময়ী আদ্যাশক্তি—যিনি মায়োপহিত ঈশ্বর সগুণ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তবে তন্ত্রসাহিত্যের মতে মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি কালীই[২] সৃষ্টিময়ী ও সৃষ্টিকারিণী। শিব বা মহাকাল সহায়কমাত্র। অদ্বৈতবেদান্তের মতো তন্ত্রসাহিত্য দুটি শিব কল্পনা করে—সদাশিব ও মহাকাল। সদাশিব নির্গুণ, এজন্য সম্পূর্ণভাবে তিনি 'শব' অর্থে সর্বগুণের ও সকল ক্রিয়ার অতীত অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। মহাকাল সগুণ-ব্রহ্ম, কেননা নৃত্যচঞ্চলা ও গুণময়ী কালী মহাকালের সঙ্গে সমাসক্ত। তন্ত্রের এই তত্ত্ব ও ধারণা আদি বা প্রথম ধারণা। পরে তন্ত্রসাধকগণ একটিমাত্র শিব—মহাকালের কল্পনা করেছেন। এই কল্পনায় মহাকাল নির্গুণ-ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, শব এবং কালী বা মহাশক্তি সগুণ-ব্রহ্ম। মোটকথা চিন্তায়, ধারণায় ও তত্ত্বভাবনায়ই যা ভেদ, আসলে শব বা শিব যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি মহাশক্তি কালীর রূপ ধারণ করেন। তন্ত্রধারণায়—একটি নির্গুণসত্তা ও অপরটি সগুণসত্তা—যা অদ্বৈতবেদান্তেরও মূলকথা।[৩] শারদাতিলকতন্ত্রকার বলেন—

২। এই কালী—দক্ষিণাকালী বা শ্যামাকালী। তাঁহার আছে যামাকালী—যাঁর যামপদ শব-শিবের বক্ষে প্রসারিত। উত্তর-ভারতে কালী সর্বসম্মা দক্ষিণাকালী, দক্ষিণ-ভারতে শ্রীবিদ্যা, ললিতা বা ত্রিপুরসুন্দরী। কামিকীয়তন্ত্রে কালী মহাশক্তি—সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। সকল তন্ত্রের অন্যান্য দেবী কালিকা সৃষ্টিময়ী-সগুণ-ব্রহ্ম এবং মহাচৈতন্যরূপিণী।

৩। অদ্বৈতবেদান্তের অনুযায়ী মহানির্বাণতন্ত্রকার ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণদুটি দ্বারা ব্রহ্মসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, অথচ তন্ত্রকার আদ্যাসম্প্রদায় অনুযায়ী শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে—

'সত্তামাত্রং নির্বিশেষং অখণ্ডৈকরসোদয়ম্।
অনির্দ্দিষ্যোকীদৃশাখ্যং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্।
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
যদ্বাক্যাদৈর্নির্বিকল্পৈর্দেহাদ্যাধ্যাসবর্জিতৈঃ॥
যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্বাণি লীয়ন্তে তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ।
স্বরূপাদুদ্ধা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে। ৩।৭-১০

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥

সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি—যিনি মহাপ্রকৃতি অব্যাকৃতিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে প্রকৃতির অবিনাভাবসম্বন্ধ, কেননা সগুণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ছাড়া ব্রহ্ম (নির্গুণ-ব্রহ্ম) অনভ্র ও অসার্থক এবং ব্রহ্ম ছাড়াও প্রকৃতি অসার্থক, উভয়ে তাই চলকাকারে এক ও অখণ্ড।

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ॥
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্ররক্ষরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ॥

সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি-প্রকৃতির মিলনে নাদ (তন্ত্রের) বা মহৎতত্ত্ব (সাংখ্যের) এবং সেই নাদ থেকে বিন্দুর (অহংকারতত্ত্বের) সৃষ্টি। ঐ বিন্দু পরাশক্তিবিশিষ্ট এবং তা থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিনটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। সাত্ত্বিক-বিন্দু বিন্দু, রাজসিক-বিন্দু নাদ ও তামসিক-বিন্দু বীজ। বিন্দু-নাদ-বীজ-ত্রিতত্ত্বের মিলনে পরমবিন্দুর সৃষ্টি। বিন্দু শিবস্বরূপ চিন্ময়, বীজ শক্তিস্বরূপ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিব ও শক্তির মিলিতরূপ। পরে বিন্দু থেকে রৌদ্রশক্তি, নাদ থেকে জ্যেষ্ঠাশক্তি ও বীজ থেকে বামাশক্তির বিকাশ। পুনরায় রৌদ্রীশক্তি থেকে রুদ্র, জ্যেষ্ঠাশক্তি থেকে ব্রহ্মা ও বামাশক্তি থেকে বিষ্ণুর উদ্ভব। রুদ্র জ্ঞানশক্তি, ব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তি ও বিষ্ণু ক্রিয়াশক্তি। রুদ্র বহ্নিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহার বা ধ্বংস করেন, ব্রহ্মা ইন্দু বা চন্দ্ররূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও বিষ্ণু সূর্যরূপে বিশ্ব পালন করেন। ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান যথাক্রমে গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী—তিনটি শক্তি। তন্ত্রে মহাবাক্য মহাশক্তিকে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াময়ী বলে—Thinking-Feelling-Willing. মহাশক্তি তন্ত্রে ব্রহ্মাণী, মহেশানি, বৈষ্ণবী এই তিন শক্তিতে রূপায়িত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই ব্রহ্মাণী, মহেশানি ও বৈষ্ণবী শক্তিতিনটিকেই সার্থক করে। গোরক্ষসংহিতায়, কুব্জিকাতন্ত্রে, অপরাপর

টীকাকার হরিহরানন্দ ভারতী বলেছেন : "স্বরূপলক্ষণেন তটস্থলক্ষণেন চ বেদিতব্যস্য ব্রহ্মণো ভেদো মায়ীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ…"।

অদ্বৈতবেদান্তের ১।১।২—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে 'যস্মাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি (তৎব্রহ্ম ইতি')—তটস্থলক্ষণে নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। আচার্য শঙ্কর ৩।১ তৈত্তিরীয় উঃ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি শ্রুতির উদ্ধৃতিতে তটস্থলক্ষণের সাহায্যে ব্রহ্মসত্তার আভাস দিয়েছেন।

তন্ত্রে বিশ্বসৃষ্টির কারণ ও উপাদান প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তাছাড়া তন্ত্রে পরপ্রণব ও অপরপ্রণবের উল্লেখ আছে। অ+উ+ম+ৎ (নাদ) + (বিন্দু) + —(কলা) ও = (কলাতীত) এই সাতটি উপাদান বা তত্ত্ব অপরপ্রণবের সাতটি অঙ্গ। এই সাতটি অঙ্গ পুনরায় স্থূল+সূক্ষ্ম+বীজ (কারণ) +সাক্ষী এই চারটি পাদ নামে পরিচিত। জাগ্রৎ+স্বপ্ন+সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা বা স্থান। বিশ্বের সূক্ষ্ম-পঞ্চ-উপাদান ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। এদের মধ্যে আকাশমূর্তি (ether) মহেশ্বর-শিব, বায়ুমূর্তি (wind) ঈশ্বর, তেজোমূর্তি (agni or heat-energy) রুদ্র বা শিব, জলমূর্তি (water) বিষ্ণু এবং ক্ষিতিমূর্তি (earth) ব্রহ্মা—এরা পঞ্চদেবতা।

।। তন্ত্রে পঞ্চদেবতার ধারণা ।।

এই পঞ্চদেবতা পঞ্চীকরণরূপ সৃষ্টির আদিরূপ। অপর-প্রণব অ, উ, ম প্রভৃতি সপ্তাঙ্গ-বিশিষ্ট। পর-প্রণব অনুপহিত-চৈতন্য ব্রহ্ম—যিনি শুদ্ধ ও অবিভ্রিত পরমচৈতন্য। অপর-প্রণব শব্দব্রহ্ম নামেও তন্ত্রে পরিচিত। পর-প্রণব পরমচৈতন্য পরমব্রহ্ম। এই অপর-প্রণব ও পর-প্রণবের সমবেতরূপ মহাপ্রণব। মহাপ্রণবের সাতটি অঙ্গ (সপ্তাঙ্গ) সাতটি আম্নায় নামে তন্ত্রে পরিচিত। তন্ত্রসাধকরা সপ্তাঙ্গ বা সাতটি আম্নায়বিশিষ্ট মহাপ্রণবকে 'শিব' বলেন। সপ্ত আম্নায় শিবের সাতটি মুখ। এদের মধ্যে দুটি মুখ বা বক্ত্র গুপ্ত বা অপ্রকাশিত এবং পাঁচটি প্রকাশিত। শিবকে তন্ত্রে এজন্য 'পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্' বলে। আম্নায়ের অর্থ মুখ বা বক্ত্র—যা থেকে বেদ, বামল ও তন্ত্রের উৎপত্তি। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও ঊর্ধ এই পাঁচটি আম্নায়। পূর্বাম্নায় অঘোর, পশ্চিমাম্নায় সদ্যোজাত, দক্ষিণাম্নায় অঘোর, উত্তরাম্নায় বামদেব ও ঊর্ধাম্নায় ঈশান। তাছাড়া ষষ্ঠ ও সপ্তম আরো দুটি আম্নায় (শিববক্ত্র) তন্ত্রে কল্পনা করা হয়েছে—নীলকণ্ঠ ও চৈতন্য। এই আম্নায়গুলিকে 'ঋষি' ব'লেও কল্পনা করা হয়। তন্ত্রে সাধকরা বিভিন্ন যোগের কল্পনা করেন। সেই যোগগুলিরও সৃষ্টি শিববক্ত্র বা আম্নায় মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ, ২য় আম্নায় ভক্তিযোগ ও লয়যোগ, ৩য় আম্নায়ে ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্যযোগ, ৪র্থ আম্নায়ে জ্ঞানযোগ ও উন্মনীযোগ, ৫ম আম্নায়ে বাসনাযোগ, ৬ষ্ঠ আম্নায়ে শাম্ভবীযোগ এবং ৭ম আম্নায়ে সহজযোগ ও মোক্ষযোগের সৃষ্টি। যোগের অঙ্গ বলতে বিভিন্ন আম্নায়ের করণ—নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, মন, সমাধি। এ'গুলি যোগের অর্থাৎ যোগসাধনার করণ ও অঙ্গ। মহানির্বাণতন্ত্র অনেকটা বেদান্তমতের অনুগামী। মহানির্বাণতন্ত্র উপরিউক্ত করণ, অঙ্গ প্রভৃতির কেন্দ্র সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের অর্থের পরিচয় দিয়ে বলে—

'সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্য প্রকীর্তিতম্ ।।
একমদ্বৈতমীশানি বৃহদ্ব্রহ্ম গীয়তে ।

ব্রহ্ম নিরাকার, আবার সাকার ও নিরঞ্জন। পুনরায় তিনি অঞ্জনরূপ মায়াযুক্ত অবির্ভক্ত—আবার তর্কাতীত; অগোচর—আবার প্রত্যক্ষগোচর। মন্ত্র ও দেবতা ঐ সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের জ্ঞাপক ও প্রকাশক। কিংবা বলা যায় সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম মন্ত্রময় ও দেবতাময়। সেজন্য মন্ত্রচেতনায় দেবতা

প্রদীপ্ত ও প্রকাশিত হন। সেজন্য পূজা, উপাসনা, আহারাদি-বিহিত অনুষ্ঠান, ভাবনা, ধারণা প্রভৃতি বিহিত হয় তন্ত্রে। তন্ত্র ক্রিয়ামূলক, চিন্তা বা ভাবনামূলক ও সিদ্ধিময়।

।। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনজীবনের সূচনা ।।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনের সূচনা হয়, 'তন্ত্রসাধনা' থেকে এবং তাঁর তন্ত্রসাধনার দিশারী (উত্তরসাধিকা) ছিলেন সাধনসিদ্ধা ভৈরবী যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণী। তন্ত্রযোগসিদ্ধা ভৈরবী-ব্রাহ্মণী একটি একটি ক'রে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনায় অভিষিক্ত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তন্ত্রসাধনার চরম ও পরমতত্ত্ব-শিবশক্তিসামরস্য উপলব্ধি ক'রে ভারতীয় তন্ত্রসাধনার আদর্শ ও মহিমাকে বিশ্বসমাজে গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৪]

কিন্তু তন্ত্রসাধনায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার জগতে বিচিত্র রূপের ও ভাবের সাধনার প্রচলন আছে, কিন্তু এই বিচিত্রতা কি শুধু বিচিত্র রুচির সম্প্রদায়ের বা সাধকের মধ্যেই নিহিত—না সকল সম্প্রদায়গত ধর্মের ও ধর্মসাধনার চরমলক্ষ্যের বা পরমপ্রাপ্তির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। সেজন্য প্রত্যক্ষভাবে সাধনার জন্য তিনি ভারতের সকল ধর্মমতের সকল সাধনাকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সাধন-জীবনের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "তাঁকে (ঈশ্বরকে) দর্শন করতে হ'লে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, 'মা দেখা দাও' ব'লে চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৮)। প্রতিটি সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধনপথ এবং সাধনমতই কেবল পৃথক পৃথক, লক্ষ্য ও চরমপ্রাপ্তি সকলেরই এক। পথে ও মতেই কেবল বাদ-প্রতিবাদ, লক্ষ্যে সব শিয়ালের এক রা (রব)। সেজন্য নির্বিবাদচিত্তে ও নিঃসংশয়ে সকল সাধনার পর প্রচার করলেন তিনি "যত মত তত পথ", কিন্তু লক্ষ্য এক। অদ্বৈতবেদান্তসাধনা তিনি করছিলেন নেংটা তোতাপুরীর নির্দেশে এবং বুঝেছিলেন অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিই সর্বমতসহিষ্ণু, উদার ও সমন্বয়সেবী। অদ্বৈততত্ত্বানুভূতিই একমাত্র সকল ধর্মমতের ও সকল তত্ত্বসাধনের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত। এখন প্রশ্ন এই যে, উনবিংশ-বিংশ-শতকের যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শনদৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রদর্শনের অনুযায়ী ছিল কি-না?—যেজন্য তিনি অদ্বৈতসাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রেও মহাশক্তিময়ী কালীর অনুধ্যানে প্রায় নিমগ্ন থাকতেন এবং বলতেন: "যিনিই সগুণ-ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ-ব্রহ্ম; যিনিই শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সগুণ-ব্রহ্ম, নির্গুণ-ব্রহ্ম ও শক্তি এই তিনটি

৪। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুপূর্ব (প্রায় শতাব্দিক বর্ষের পূর্ব) থেকে বাঙলাদেশ তন্ত্রসাধনার প্রধান ক্ষেত্ররূপে পরিচিত। এক বাঙলাদেশেই পাঁচটি শক্তিপীঠ প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ ক'রে তারাপীঠ, বলহাটী, কুলুয়া প্রভৃতি শক্তিপীঠগুলি বিখ্যাত। তদানীন্তন বাঙলাদেশে অধ্যাত্মসাধনা বলতে তন্ত্রসাধনাই বোঝাতো। সাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ এঁদেরকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্বেকার তন্ত্রসাধক বলা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনার সময়ে বিশেষ ক'রে রামপ্রসাদ স্মরণ করতেন।

পরমতত্ত্বকে সমদৃষ্টি দিয়ে সমান জ্ঞান করাকে (সমত্বানুভূতিকে) পূর্ণজ্ঞান বা অভেদজ্ঞান বলতেন। এই পূর্ণজ্ঞান বা অভেদজ্ঞানই মানবজীবনের চরমজ্ঞান ও পরমলক্ষ্য।

॥ তন্ত্রদৃষ্টিতে ব্রহ্মের ও মুক্তির স্বরূপ ॥

পূর্বে তন্ত্রে বিশ্ববিকাশরূপ সৃষ্টির আলোচনা করেছি। আগমশাস্ত্রে বা তন্ত্রে ব্রহ্মরূপ চরমতত্ত্বের এবং মুক্তির স্বরূপ কি সেই সম্বন্ধে 'শারদাতিলকতন্ত্র'-সাহিত্যের প্রথম এবং পঞ্চবিংশ এই দুটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং টীকায় পণ্ডিত রাঘবভট্ট বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩] আগমশাস্ত্রে বা তন্ত্রশাস্ত্রে পরমশিব ও বিমর্শশক্তি এই দুটি চরমতত্ত্ব এবং এ'দুটি তত্ত্বের মিলনে সৃষ্টির সার্থকতা সম্পন্ন হয়। পরমশিব ও শক্তি দুটিই নিত্য ও সত্য তত্ত্ব এবং এ'দুটির মিলনে সৃষ্ট বিশ্বসংসারও সুতরাং নিত্য ও সত্য। বিশ্বসারতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, 'অহং'-প্রকাশ ও 'ইদং'-বিমর্শ দুটিই চৈতন্য বা চিৎস্বরূপ 'অহং' বা শিব—চিৎস্বরূপ এবং 'ইদং' বা শক্তি— চিৎস্বরূপা: "যা অনাদিরূপা চৈতন্যাং ধ্যানেন মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মা স্থিতা"। মহাপ্রলয়েও শক্তি বা মহাশক্তি শিবে (পরমচৈতন্যে) প্রসুপ্ত থাকে। শারদাতিলকতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে আছে —

'নিত্যানন্দবপু-নিরন্তরগলৎপকাশবর্ষৈঃ ক্রমাদ্
ব্যাপ্তং যেন চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থরূপং জগৎ।
শব্দব্রহ্ম বহুচিরে সুকৃতিনশ্চৈতন্যমন্তর্গতং
তদ্‌বোধ্যাদনিশং শশাঙ্কসদনং বাচামধীশং মহঃ ॥'

এই শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্ব ও শব্দব্রহ্মতত্ত্বের মূলকথার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র 'আভাসবাদ' স্বীকার করে এবং অদ্বৈতবেদান্ত 'বিবর্তবাদ' স্বীকার করে। টীকাকার পণ্ডিত

৩। এ'প্রসঙ্গে "শ্রীশ্রীপ্রপঞ্চসারতন্ত্রম্"—ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য-বিরচিত এবং তাঁর শিষ্য পদ্মপাদাচার্য-কৃত 'বিবরণ' ও আচার্য পদ্মপাদ-রচিত 'শিবপঞ্চাক্ষরীস্তোত্রম্'-এর নামোল্লেখ করেছি। 'প্রপঞ্চসারতন্ত্র' ৩৫টি পটলে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। গ্রন্থের আর্থার এ্যাভালন (Arther Avalon)-এর দুটির সম্পাদনা করেছেন এবং কলিকাতা 'আগমানুসন্ধান-সমিতি' থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এই সংস্কৃতগ্রন্থের Introduction-এ আর্থার এ্যাভালন লিখেছেন: "The author of the *Prapancha-sa'ra-vivarana* states that Shiva is the author of this work through his incarnation (Avata'ra) the philosopher Shankara…". 'প্রপঞ্চসারবিবরণ' আচার্য পদ্মপাদ-কৃত ভাষ্য এবং আচার্য পদ্মপাদেরই স্বীকৃতি যে, 'প্রপঞ্চসারতন্ত্র' শিবাবতার আচার্য শঙ্করের রচিত। তাছাড়া 'প্রপঞ্চসার-বিবরণ' ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় টীপ্পণিকাটিও আচার্য পদ্মপাদের রচিত।

এ'সকল ছাড়া আচার্য শঙ্কর রচনা করেছেন: (১) 'দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্' (প্রকাশিত Sa'manta Books, Madras, 1978)।

আচার্য শঙ্কর-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' বা 'আনন্দলহরী'-স্তোত্রে শাক্তদর্শনের বিভিন্ন বিচার আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আচার্য শঙ্করের অন্যান্য স্তোত্রে তাঁর বিভিন্ন দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত যে, আচার্য শঙ্করের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদ 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' রচনা করেছিলেন। গোবিন্দপাদের গুরু আচার্য অজাতীবাদী গৌড়পাদ। অজাতিবাদ বিবর্ত-অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদ।

রাঘবভট্ট বিবর্তবাদ-অনুসারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন : "পরব্রহ্মৈব স্বাত্মবিবর্ত-রূপং সকলং জগৎ সসর্জেতি শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদিতোঽর্থঃ"। শক্তির আধারস্বরূপ মহাশক্তি-রূপিণী কুণ্ডলিনীর মিলনের সার্থকতা এখানে (আগমে বা তন্ত্রশাস্ত্রে) বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে : "যদ্ বা শাস্ত্রে শব্দস্পর্শৈরর্থস্পর্শৈরপি কুণ্ডলিন্যা এবোৎপত্তেস্তস্যা এব 'কুণ্ডলী-পরদেবতা' ইতি পরদেবতাত্বোক্তেস্তদনুসরণমেবোচিতমিতিহৃদয়ংশব্দেন তেজোরূপা কুণ্ডলিনীত্যুচ্যতে।...যদ্বা কুণ্ডল্যা শব্দার্থরূপং পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরীরূপত্বেন শব্দজনকত্বাৎ কার্যে কারণোপচারাৎ শব্দরূপং বিবরত্বাৎ অর্থব্যাপকত্বাবেন চরম্..., এবম্ভূতং গচ্ছতীতি জগদ্ বিনশ্বরং শরীরং ব্যাপ্তম্। যদ্বা যস্যা শব্দার্থরূপং চরাচরাত্মকং বিশ্বং ব্যাপ্তম্"। শব্দার্থ নিয়েই বিশ্বচরাচরের সার্থকতা এবং এই শব্দ ও অর্থের কারণ ও আধার চৈতন্যরূপ শিব ও চৈতন্যরূপিণী শক্তি। শক্তির বাস্তবরূপ 'কুণ্ডকুণ্ডলিনী'-শক্তি—যা সুষুম্নাবর্ত্মে ঊর্ধ্বগা এবং অধোভাগে মূলাধারপদ্মে প্রতিষ্ঠিতা। শারদাতিলকতন্ত্রের ২৫শ অধ্যায়ে শিব ও শক্তির সামরস্যরূপ যোগের (মিলনের) কথা বলা হয়েছে—

'অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গং সদ্বিদ্প্রদায়কম্।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।
• • •
শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং তন্ত্ররাগমবেদিনঃ।'

টীকায় পণ্ডিত রাঘবভট্ট এখানে শিব ও শক্তির সামরস্যরূপ (সমরস) ঐক্যকে অদ্বৈত-বেদান্তসম্মত বলেছেন : 'বেদান্তপক্ষমাশ্রিত্যাহ ঐক্যমিতি', কেননা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-আবর্তের পারে উপনীত হ'তে গেলে শিব-শক্তির ঐক্য অর্থে সামরস্যরূপ মিলনের প্রয়োজন : 'সদ্ভানং যোগমিত্যাহুঃ সংসারোচ্ছিত্তিসাধনম্'। অবশ্য টীকাকার এ'প্রসঙ্গে 'তচ্চ 'তত্ত্বমসি'-ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধম্' বলেও প্রয়োগসারের প্রমাণ উদ্ধৃতি ক'রে বলেছেন : 'নিষ্কলস্যাঽপ্রমেয়স্য দেবস্য পরমাত্মনঃ' এবং কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কথা উদ্ধৃত ক'রে নিষ্কল ও অপ্রমেয় পরমচৈতন্য-দেবতাকে 'শিব'-আখ্যা দিয়েছেন—'শিবেতি'। তারপর 'পরে শৈবাঃ' ব'লে শিবসূত্রবৃত্তিতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। তাছাড়া তিনি পরে 'উত্তরাম্নায়মতমাহ শিবেতি' ব'লে আম্নায়ের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন : 'শিবশক্ত্যাত্মকং জ্ঞানং শিবশক্ত্যোরভেদজ্ঞানমিত্যর্থঃ'—শিব ও শক্তি অভেদ—এই জ্ঞানই আগমমতে মুক্তি। শারদাতিলকতন্ত্রের ২৫।৬২-৬৩ শ্লোক-দুটিতে এ'কথারই সার্থকতা প্রমাণ করেছেন তন্ত্রকার—

'পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা
পদং তু হংসঃ সকলাত্মরাত্মা।
রূপং ভবেদ্বিন্দুরনন্ত (ইন্দ) কান্তি—
রতীতরূপং শিবসামরস্যম্।
পিণ্ডাদিযোগং শিবসামরস্যাৎ
সবীজযোগং প্রবদন্তি সন্তঃ।
শিবে লয়ং নিত্যগুণাভিযুক্তে
নির্বীজযোগং ফলনির্বিশেষম্।'

অকার + উকার + মকার-যুক্ত প্রণবই শিও। কুণ্ডলিনীশক্তি 'তদ্রূপা সৈব শিবাত্মা-সকলান্তরাত্মা হংসঃ।···পরমার্থতত্ত্ব শিবয়োঃ সামরস্যমতীত্যরূপং নীরূপমেব'। টীকাকার পণ্ডিত রাঘবভট্ট এ'প্রসঙ্গে মন্তব্য ক'রে বলেছেন : 'অনেন সাযুজ্যমুক্তির্ভবতীত্যাহ শিতাদীতি। সারূপ্য-মুক্তিমাহ শিব ইতি'। সংশয় ও জিজ্ঞাস্য এই যে, শিও, প্রণব বা কুণ্ডলিনীরূপিণী শক্তির সামরস্যে সাযুজ্যমুক্তি এবং শিবের সামরস্যে সারূপ্যমুক্তি—এই দু'রকম মুক্তি যথার্থ শান্তিকামী সাধকের পক্ষে কাম্য কি-না ? তাছাড়া 'চক্রে চক্রে গলিতসুধয়া···কুণ্ডলিনী-সুধাভিঃ'—এভাবে ষট্‌চক্রভেদ ক'রে সুধার 'অমৃতরূপ মুক্তির' আহরণ ক'রে পরিশেষে পূর্ণসুধা বা অমৃতপূর্ণ শিবে—পরমচৈতন্যে 'সামরস্য' বা 'সামরস্য' অনুভব করার রীতি বা পদ্ধতি অদ্বৈতবেদান্ত স্বীকার করে না। অদ্বৈতবেদান্ত জীবকেই শিবরূপে গ্রহণ করে এবং এই দিব্যমন্ত্রে অভিষিক্ত হয়েই পরিশেষে 'জীব ব্রহ্ম-ছাড়া অন্য-কিছু নয়'—এই চরম ও পরম-তত্ত্ব বোধে বোধরূপ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধিতে সাযুজ্য, সামীপ্য, সারূপ্য প্রভৃতি মুক্তির কোন প্রশ্ন নাই। অদ্বৈত-বেদান্তমতে 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ' বলেছেন অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এবং গীতার গূঢ়ার্থ-দীপিকাভাষ্যে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী, সুতরাং অপরোক্ষ-ব্রহ্মানুভূতিই ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মস্বভাব, এতে সম্পর্কের বা লক্ষণের কোন অপেক্ষা নাই।

॥ আভাসবাদ ও বিবর্তবাদ ॥

সুতরাং আভাসবাদের-সমর্থক আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রের দার্শনিকী-দৃষ্টির সঙ্গে বিবর্তবাদের-সমর্থক অদ্বৈতবেদান্তের এবং সঙ্গে সঙ্গে আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী আচার্যদের মতের মধ্যে যে পার্থক্য সেই সম্বন্ধে ভক্টর নন্দলাল কুণ্ড তাঁর সুলিখিত *Non-dualism in Saiva and Sakta Philosophy*-গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ ক'রে বলি : "According to Sankara, what we sense with our senses, is Māyā, which is practically something, but in a real sense nothing ; which yet appears to be something because it is associated with the Absolute, which alone is Real. Its appearance as an independent Reality is thus borrowed and in this sense an illusion. When, therefore, it is said 'all this is Brahman', what we mean is that what is beyond the empirical, is Brahman. That real as appearance, is Māyā.

"In Saiva philosophy, however denounces nothing. They say if 'to renounce is to denounce ; it is better to ratain'. Everything is real, for everything is in Brahman, or the ultimate Real. for how can there be anything outside of Brahman. Therefore matter, life, mind are, in their essence, Sakti or powers, and Shiva and Sakti are one.....All is Sakti whether as Chitsakti or Māyāshakti....."[6]

6. Vide P. 139

আভাসবাদের সঙ্গে বিবর্তবাদের প্রার্থক্য অনেক। আভাসবাদ স্বীকার করে আগমশাস্ত্র এবং বিশেষ ক'রে কাশ্মিরীয়-অদ্বৈতাগমশাস্ত্র। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই উভয় মতবাদের (আভাসবাদ ও বিবর্তবাদ) একটি সমীক্ষাসূচক আলোচনায় বলেছেন : "That Samvit is free from *vikalpa* and that creation is *vikalpa*, or *kalpana'* is admitted by both *Sákta*-Agama and the Vedanta. But the question is how does creation as a *vikalpa* from Samvit which is pura and free from *vikalpa* ? The Vedanta says it does not so emanate, but is part of a beginningless process (in spite of cyclic beginnings) on within *the domain* of matter or *ma'ya'*, and superimposed (*adhyasta*) on Samvit or Brahman, which reveals it—a process which is not in any initiated by it."

কিন্তু আগমশাস্ত্রের এবং বিশেষ ক'রে কাশ্মিরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আচার্য অভিনবগুপ্ত কাশ্মিরীয় 'তন্ত্রালোক'-গ্রন্থে 'একথাই বলেছেন। মহঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর *Aspect of Indian Thought* (1966)-গ্রন্থে এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন : "But the attitude of Agama is different. It believes in Svātantrya or power in the Samvit to generate movement, *though it is only a'bha'sa*, and externality is only apparent.....When power (*Sakti*) is supposed to be dormant, *vimarsa'* is held to be dissolved in *praka'sa* (*anuttara-vimarsa'* : *Sakti* seems to be sleeping as Kundalini, and Siva (or *Para'-samvit*) is no longer Siva, but a Shāva, the state being not one of spirit, but of lifeless matter".

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী এথেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত। অদ্বৈতবেদান্ত আভাসবাদ স্বীকার করে না, কারণ আভাসবাদ সৃষ্টিরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিদচিদ্‌বিশিষ্ট প্রকাশ-বিমর্শময় এবং অন্তত্তরশিব বা ব্রহ্মসংবিদ্ (চৈতন্য) সগুণ-ব্রহ্ম-ঈশ্বর—যিনি প্রকাশ-বিমর্শময় জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণ ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মোটকথা অদ্বৈতবেদান্তে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ ঈশ্বর—যিনি মায়োপহিত, অথচ মায়াধীশ, আর অন্তত্তর-তত্ত্ব বা পরাসংবিদ্রূপী ব্রহ্মতত্ত্ব নির্গুণ, কিংবা সর্বনিরপেক্ষ-সগুণ-নির্গুণের অতীত পরমচৈতন্য, সুতরাং প্রকাশ-বিমর্শময় জগদ্‌বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্বাতীত বা সর্বোপরম-নিত্য-সত্য-সর্বব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্ম। এই সর্বোপরম-কূটস্থ-চৈতন্য মন-বুদ্ধির অগোচর, অথচ বুদ্ধিভাস্য ও বুদ্ধিনিহিত অজ্ঞান-মালিন্যের অপসারক।

●

॥ বলরাম-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন : "সেবাব্রত অবলম্বনে তাঁহারই অনুধ্যানে এবং ভক্তসহ তাঁহার লীলামৃত অনুশীলনে মালিন্য নাশ ও ভ্রাতৃভাবের পরিপুষ্টি হইবে, বোধহয়, এই অভিসন্ধিতে ঠাকুর যেন পীড়ার চিকিৎসাচ্ছলে অথবা আমাদেরই সংসার বিকার শান্তির জন্য কলিকাতায় আগমন করেন।··· এখানে আপনার রোগ নিরাময় ইচ্ছা করুন বা নাই করুন, নবাগত পিপাসুগণকে কৃপামৃতদানে পরিতৃপ্ত করিতে থাকেন"।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দেহ-রোগের নিরাময় আকাঙ্খা করেছিলেন কি-না বলা কঠিন, কিন্তু রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থাদির ত্রুটি ছিল না।

সেদিন শুক্রবার, ২৯। অক্টোবর, ১৮৮৫।

গত রাত্র মাষ্টারমশাই বলরামভবনে কাটিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি গিয়ে গঙ্গায় স্নান করেছেন। সকাল ছয়টা নাগাদ বলরামভবনে ফিরে এসে দেখেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও ঘুমোচ্ছেন।

সকাল সাতটা নাগাদ ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হয়েছেন বলরাম, মাষ্টার, গোপাল প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামকে লক্ষ্য করে বলেন : **'আর কেন ? কিছু ভোগ, কামনা তো নেই, মিছি মিছি কেন আর শরীর (ধারণ) !'**

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক গোপালকে লক্ষ্য করে বলেন : **'রামলাল (পাঁজী দেখা) খুব জানে'।**

গোপাল : নবমীতে যাত্রা নাই বলে।

এদিকে পণ্ডিতের গণনা আজই যাত্রা শুভ।

শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালকে বলেন : **শোন।** তিনি গোপালকে ইঙ্গিতে বলেন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে রামলালকে কি বলতে হবে, রামলালের যুক্তির বিরুদ্ধেই বা কি বলতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন : গোপালবাবুকে বলে দিলাম যদি সুবিধা হয় সিমেন্ট দেওয়ার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ : **কেন এখন যাচ্ছে ?**

মাষ্টার : এখনই তো ভাল, ওখানে গিয়ে পড়লে আর হবে না।

মাষ্টার বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হন। সে-সময়ে তিনি শুনতে পান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ করুণস্বরে বলছেন : **"ডাক্তার আসুক না !"**

মাষ্টার অপেক্ষা করেন। তিনি বেলা দশটা নাগাদ যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তাঁকে ভুলে যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নানের পর মাষ্টারকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন : **কি রকম (দেখছ) ?**

মাষ্টার : ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন : কোথায় থাবে ?

মাষ্টার : স্কুলের দারবানের কাছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসেন।

এমন সময় কবিরাজ গঙ্গাধর সেন উপস্থিত হন। কবিরাজ এসে গেছেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবরটি সরান : চাদর, বালিশ, গামছা প্রভৃতি গুছিয়ে রাখেন। তিনি ইঙ্গিতে বলেন, জুতা সরিয়ে রাখতে।

কবিরাজ এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার পাশে আসন গ্রহণ করেন। কবিরাজের মুখ রক্তিমাভ, তিনি ভাবগম্ভীর। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন : কেমন আছেন ? কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে হাত বুলিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বিদায় নেবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন।

উপস্থিত দেবেন মজুমদারের প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ বলেন : 'রোগ সাধ্য না অসাধ্য দেখে বলবো···।'

মাষ্টার : ভয় আছে কি ?

গঙ্গাধর দ্বিধাগ্রস্তকণ্ঠে বলেন : না, তবে সব রোগেরই ভয় আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত গিরিশচন্দ্রকে বলেন কবিরাজ গঙ্গাধরের নিকট এগিয়ে যেতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : '(জোড়াসাঁকোর) রাম ডাক্তার মধু খেতে বলেছিল। (খেয়ে শরীর) গরম হ'ল—গা জ্বালা করতে থাকল'।

গঙ্গাধর : তবেই তো—ঔষধ একটু খেতে হবে।

গঙ্গাধর কবিরাজ বিদায় নেবার কিছুক্ষণের মধ্যে ডাঃ প্রতাপ মজুমদার এসে উপস্থিত হন। প্রাথমিক কথাবার্তার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার প্রতাপকে বলেন : 'তুমি রোজ একবার করে আসবে—সকালে ··।'

এবার মাষ্টার স্কুলে যাবার জন্য বিদায় নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন : 'আচ্ছা, এসো'।

মাষ্টারমশায়ের অবর্তমানে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আজ আবার উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য বলেছিলেন : দুই ঘণ্টা সমাধি অবস্থায় মন স্থাপন করলে রোগ সেরে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিকে এগিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন : 'আমি তা ভেবেছিলুম—কিন্তু মন ফিরে যায়। যখন (শরীরের কথা) ভাবি, দেখি (শরীরটা) ঘ্যাড় ঘ্যাড় করছে, খোলটা (পড়ে আছে)'। শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ২৫শে পৌষ, ১৩২৭ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেহত্যাগ করার পূর্বে ৫।৬ মাস পর্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্বক মনোময় কোষে উঠিতে

পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, 'আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে ইষ্ট দেবতার দিকেই লক্ষ্য যাবে; সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না' তাহা হইলেও তিনি যোগশক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন একজন সাধুপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছুদিনপূর্বে তিনি কিছু নাস্তিক্য পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম"।[১]

পত্রিকাতে নবম্যাদি কলারম্ভ দেখে এই দিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় নূতন ভাড়া বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া স্থির হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামভবন থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে ৫৫ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে উঠে যান।[২]

●

॥ মহাকালজয়ী বারসন্ন্যাসী ॥

রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ, সামুদ্রিকরত্ন

পশ্চিমের মোহে দেশবাসী যবে হয়েছে আত্মহারা,
হীন আবিলতা, নীচ অবসাদে রচিছে আপন কারা,
হে যুগমানব, হে তেজস্বী বীর, ফিরালে তা'দের তুমি—
মুখর করিলে মাভৈঃ-মন্ত্রে পুত এ ভারতভূমি।
অধর্মের স্রোতে ভাসিতেছে দেশ, সাধুতা নির্বাসিত—
রুদ্ধ হয়েছে স্বাধের কণ্ঠ, সত্য অপরিচিত—
হে মহাসারথি, জাগাতে আবার জাতিরে জীবন-রণে
পাঞ্চজন্য বাজালে তোমার সত্যের অভিযানে।
এসেছিলে যবে পৃথিবীর কোলে শতবরষের আগে,
ইতিহাসখ্যাত ভক্ত-পরিবারে পুলকের দোলা লাগে।
শত-সহস্র শঙ্খ-নিনাদে মঙ্গল-দীপ জ্বালি'
ভূলোক দ্যুলোক করিল দেবতা-মানবে মিলি'?
নিখিল-বিশ্ব-নন্দন-বনে ফুটি পারিজাত সম
মানব-হৃদয়ে জড়াইছ তুমি পুণ্য সুরভি, মম—
যত তারা আছে আকাশের গায়, সাগরে বালুকাকণা,
ততদিন তুমি করিবে রচন সাহসের আল্পনা।
পৃথ্বী শতধা খণ্ডিত করি, ভূগোলের রেখা 'টানি'
সত্য মানব দানবের মত করিতেছে হানাহানি।
ভেদ-বিষহরা মৈত্রীবাণী তব শোনেও শোনে না কানে—
শত ফণা তুলি' হিংসা-নাগিনী জেগেছে তাদের প্রাণে।

●

১। পরমানন্দ ভট্টাচার্য : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০

২। এই বিষয়ের প্রমাণ আকর পূজনীয় মাষ্টারমহাশয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৩৮২-৮৪।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম ও ব্রত নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সারা জীবনের নিরলস-সাধনায় এই সত্যের উপলব্ধির কথা সার্থকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার উপযুক্ত সহকর্মীকে বেদান্ত-প্রচারের জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় আহ্বান করিয়াছিলেন। লণ্ডনের বুধস্‌বেরী ঘোয়ারে তাঁর প্রথম বক্তৃতা শুনে স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—"Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear lips and the world will hear it." পরবর্তী-কালে এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছিল। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দের পরে স্বামী অভেদানন্দ (কালীপ্রসাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী বিশ্বের সম্মুখে সার্থকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

এখানে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসিলে হয়তো অসঙ্গত বোধ হইবে না বলিয়া মনে হয়, তাই বলিতেছি একবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
যেখানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।

এখানে মনে আসে কবিগুরুর সম্রদ্ধ বাণীর প্রতিটি ছত্র যেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের কর্ম, ত্যাগ ও তপস্যা-দ্বারা সারা বিশ্বে প্রতিফলিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা-সঙ্গমের অমৃতধারা ভিন্ন ভিন্ন স্রোতের প্রবাহে দেশ-বিদেশের ধর্মসংস্কৃতির মহাসমুদ্রে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং নূতন নূতন ভাবতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ এই প্রধান দুটি ধারাই এক ও অবিচ্ছেদ্য। ভগিনী শিবানী তাই এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"These two names Vivekananda and Abhedananda are names as inseparable as the confluence of a stream, as are reverse sides of a single coin."

(ক্রমশঃ)

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(১৮)

পার্বতী-পরমেশ্বরের মত বাক্ ও অর্থ নিত্য সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাণী শিল্পীর হাতে অপৃথক যত্নেই সাহিত্যের form ও content-এর সম্মেলন ঘটে। এদিক থেকে বিচার করলেও সাহিত্যিক বিবেকানন্দের কলাসিদ্ধি বিস্ময়কর। তিনি যখন সাধু গদ্যে লিখেছেন তখনো ধ্বনি-গাম্ভীর্যে, শব্দসম্পদে, গতিময়তায়, বক্তব্যের ঋজুতায় এবং তেজে শক্তিতে এবং সর্বোপরি একটি উদাত্ত মোহন আন্তরিকতায় তা মুহূর্ত মধ্যে পাঠক চিত্তকে দ্রবীভূত করতে সমর্থ। যখন যে রস সঞ্চার করতে চেয়েছেন—সেই রসেরই পূর্ণতা এসেছে তাঁর রচনায়। বীর-করুণ-হাস্য সব নিয়েই তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রসের বাড়াবাড়ি তিনি কখনো সহ্য করতেন না। এই ধরণের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা ও উদ্দাম রসের কারবার জাতির জীবনে যে অসুস্থ প্রভাব ফেলে তার পরিণাম মোটেই রমণীয় হয় না। ক্লীবতা ও দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়ে সমগ্র জাতিকে এই সব মোহন রসের শিল্পীরা সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারে এবং দেয়। তাই স্বামীজীর কণ্ঠে এঁদের সম্পর্কে সাবধান বাণী ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আছে: "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়ে মানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকেবেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না—আর কৃমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন আর বিরহের জ্বালায় হাসান হোসের করেন—ওরা কেন যাক না বাপু।" কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে ওরা যায়নি আজো। বরং ওরা আরো আসর জমিয়ে রয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের রথরজ্জু ঐ সব মিহি আঁতেলদের হাতেই ন্যস্ত। অথচ স্বামীজী এদের হাত থেকে সাহিত্য-শিল্পকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন কবে থেকে। যাই হোক, চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য শোনা যাক: "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না, স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা কেন ও একটা কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর?.....ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না"। চলিত ভাষার স্বপক্ষে কথা বললেও সাধু গদ্যও তিনি প্রয়োজন বুঝে ব্যবহার করেছেন। এবং তা খুব সার্থকভাবেই। অপূর্ব ভাষানৈপুণ্যে, শুদ্ধ আবেগের আত্মপ্রকাশে, বক্তব্যের মহত্বে ও মাধুর্যে 'বর্তমান ভারত'-এর অনেক জায়গা তো ঘন রসসিক্ত কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবে একথা ঠিক মূলতঃ বিবেক-সাহিত্য মননধর্মী। কল্পনার রামধনু-রঙ ছড়িয়ে তিনি কোনো সৃষ্টিধর্মী কাব্য-কাহিনী রচনায় কখনো প্রয়াসী হন নি। চলমান জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা ও তাদের সমাধান তাঁর রচনার মধ্যে বহুল পরিমাণে থাকলেও, সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি এবং মনুষ্যত্বের উদ্বোধনঃ তাঁর জীবনের মত তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়েও এই ধ্রুব সত্য প্রকাশ করে গেছেন। একদিকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ভাব, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বপ্রেম। একদিকে কর্ম, অন্যদিকে ভক্তিবাদ, একদিকে

জীবন রসগ্রাহিকতা, অন্যদিকে নির্দ্বন্দ্ব নিঃশ্রেয়স পরম এষণার অমল উপলব্ধি, এ-সবই তাঁর সাহিত্যে আশ্চর্য এক সমন্বয় ও সমাহারে পুষ্পের মত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর বক্তৃতাবলী ও পত্রগুচ্ছের ভিতরেও ঐ একই সত্য নানা ভাবে প্রকাশ-তন্ময় হয়ে আছে। এই কারণেই ভূয়োদর্শী সমালোচক "তাঁকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) সাধু ও চলতি—এই উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে পরিকৃৎ পন্থশিল্পী" বলে উল্লেখ করেছেন।

সংস্কৃত ইংরেজী ও বাংলা—এই তিন ভাষাতেই স্বামীজী কবিতা রচনা করেছেন। বিশ্বজগৎকে—, দৃশ্যমান এই জগৎ ও জীবনকে তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেন নি। বরং তাকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অদ্বৈততত্ত্বের পরমার্থ চেতনায় প্রভাস্বর করে ঊর্ধ্বায়ন ঘটিয়েছেন। বেদান্তের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতাকে প্রত্যহের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত করে যে আশ্চর্য একটি সমন্বয় ঘটালেন এবং মানব কল্যাণের নানা পথে প্রবাহিত করে দিলেন—সেই সব জীবন সত্যই বিবেকানন্দের কাব্য-কবিতায় একটি ত্রিমাত্রিক ভাবসৌন্দর্যে প্রদীপ্ত ও মহান হয়ে আছে। পেশাদার কবি-সাহিত্যিক না হলেও জীবন ও জগৎজাত কোনো মহোত্তম সত্যের অনুভব ও অভিজ্ঞতার বাঙ্ময় রূপই যদি কবিতা হয়, তাহলে বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই কবি। যে অর্থে উপনিষদ কবিতা, সেই অর্থেই জীবন ও জীবনাতীতের মহৎ সাধক স্বামীজীর রচনায়ও সত্য সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছিল। উপনিষদের ঋষি-কবিদের মত স্বামীজী উপলব্ধির আনন্দেই কবিতা রচনা করেছেন। কোথাও ছাপবার বা কাউকে শোনাবার এবং ছেপে বা শুনিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কবিতা লেখেন নি পেশাদার কবি-সাহিত্যিকদের মত। জাতি-গঠন, জীবন-রচনা ও বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে একদিকে যেমন বিচিত্র কর্মোদ্যোগ, অন্যদিকে আবার আত্মোপলব্ধির মহৎ প্রেরণায় ধ্যান-তপস্যার প্রবর্তনা ও অধ্যাত্মকর্মের নিদিধ্যাসনা—এই দুটি দিক নিয়েই স্বামীজীর সমগ্র জীবন। তাঁর গদ্য-রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী প্রভৃতি প্রধানতঃ প্রথম দিকটি নিয়েই। ঠিক তেমনি অধ্যাত্ম সাধনা ও তপস্যা প্রসঙ্গে নানা প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা ও অভিজ্ঞতা এবং এসবেরই পূর্ণ পরিণাম নিঃশ্রেয়স পরম উপলব্ধি এই সব ছিল তাঁর কাব্য-কবিতার বিষয়বস্তু। ভাবসম্পদে এবং চিত্তপ্রসারণার ক্ষমতায় এবং আত্মস্বরূপ জাগৃতির নিবিড়তায় এগুলি উপনিষদের কাব্যমন্ত্রের মতই গভীর এবং বাংলা সাহিত্যের একগুচ্ছ শ্রেষ্ঠতম ফসল। প্রাণদীক্ষা ও জীবন চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তুলনাহীন এই কবিতাগুলি। স্বামীজী অনেক সময় বলতেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।" বাস্তবিক সমগ্র বিবেক-সাহিত্যের মানুষের কাছে মানবজাতির কাছে এই একটিই মঙ্গল-সমাচার। অতিমাত্র স্বল্পজীবনে নবজাগৃতির বিচিত্র নানা কর্মোদ্যমে যুক্ত থেকে মাঝে মাঝে স্বামীজী ফিরে গিয়ে বসতেন ধ্যানের একান্ত আসনে—আত্মবীক্ষণ এবং আত্মোপলব্ধির মহোত্তম প্রয়োজনে। স্বামীজীর অধ্যাত্ম কবিতাগুলি সেই ধ্যাননিষ্ঠ মহাজীবনের শুভ্র শুদ্ধ ফসল। কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভি শক্তির সমন্বয়ে সমাহারে যেমন নিয়ন্ত্রিত হয় কোনো বস্তুর স্থিতি,—স্বামীজীর সমগ্র জীবন-স্থিতির মধ্যেও তেমনি আমরা প্রত্যক্ষ করি কর্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগের আশ্চর্য এক আলোকিত সমন্বয়। স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীর

মধ্যে এই অধ্যাত্ম কবিতাগুলি যেন তাঁর মহাজীবনের অন্তর্মুখী পরিক্রমণের দিবা সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে; এগুলি তাঁর কেন্দ্রাভি অস্তিত্বের (centripetal existence) দিক। অথবা অন্য ভাষায় বলা চলে—কর্মদীপ্ত তরঙ্গবহুল তাঁর চারিদিকে সমুদ্র-সফেন জীবনের মহাবিস্তারের মাঝখানে স্বামীজীর কবিতাগুলি নিয়ে তাঁর নিঃসঙ্গ একক কবিসত্তাটি যেন নির্জন একটি দ্বীপের মতই মাথা-উঁচু দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে form ও contents দুদিক থেকেই—বিবেচ্য তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি মনে পড়ে: "যে যা বলে বলুক। আপনার পৌরে বলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর—ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out—বল 'আমি সব করতে পারি'। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। খবরদার, No নেই নেই; বল্, হাঁ হাঁ, সোঽহং, সোঽহং, সোঽহং।" এখানে অদ্বৈতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক বেদান্তের সমন্বয়চিত্ত লক্ষ্য করার মত।

স্বামীজীর পত্রাবলীর প্রসঙ্গে সমালোচক উল্লেখ করেছেন, "পরিব্রাজক জীবন থেকে তাঁর অগোচরেই চিঠি-পত্রের মাধ্যমে তাঁর ভাষা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবহ হয়ে উঠেছে।" বস্তুতঃ স্বামীজীর সমগ্র রচনা ও বক্তৃতাবলী সবই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎবহ বলে মানুষের বুকে এমন করে আগুন জ্বালে, এমনভাবে নাড়া দেয়। অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিবেক-সাহিত্যের এখানে সেখানে। 'পরিব্রাজক'-এ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে স্বামীজী বলেছেন, "যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জ্যান্ত কথা হয়, মরে গেলে মরা ভাষা হয়। যখন মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দুই একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।···ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পেতেই এল।···এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনোও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, "জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা-শিল্প-সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দুহাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।" বস্তুতঃ এ ক্ষমতা,—এই প্রাণের উত্তাপ সঞ্চারণার ক্ষমতা চলিত ভাষার উপর নির্ভরশীল নয়,—এ তাঁর নিজস্ব দুর্বার অথচ মহান চারিত্র শক্তির প্রকাশ। স্বামীজীর জীবনের মতই তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও এই প্রাণের স্পর্শই মানুষকে এমন করে আকর্ষণ করে। এই প্রাণের আগুন—দিকে দিকে—মানুষের মনে মনে ছড়িয়ে দেবার দুর্লভ ক্ষমতা বিবেক-সাহিত্যের মহাসম্পদ। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের সঞ্চার—মৃতের বুকে প্রাণের স্পন্দন আনার যে সংকল্প স্বামীজীর কর্মে ও ভাবনায়, তারই বাঙ্ময় বহিঃপ্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। এবং এই জন্যই বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বিবেকানন্দের অনুসরণকারী উত্তরসূরী নেই। কারণ এই অলৌকিক শক্তি সাধারণ কোনো লেখকের অর্জনসাপেক্ষ বা সাধ্যায়ত্ত নয়।

●

॥ পঞ্চতীর্থ পঞ্চকেদার ॥

শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(দুই)

কেদারনাথ অঞ্চলকে কেদারক্ষেত্র বলা হয়। মহাদেব এখানে নিরন্তর অবস্থান করেন। তিনি কেদারক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করবার সময় পার্বতীকে বলেছিলেন—ধাতুর মধ্যে সোনা যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি পদার্থের মধ্যে লবণ, প্রিয়বস্তুর মধ্যে পুত্র, সর্বজ্ঞের মধ্যে ব্যাসদেব, নদীর মধ্যে গঙ্গা, পর্বতের মধ্যে কৈলাস, সতীদের মধ্যে পার্বতী, ভক্তদের মধ্যে নারদ, বেদের মধ্যে সামবেদ, ধামের মধ্যে বদ্রীনাথধাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে কেদারক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চকেদারের দ্বিতীয় কেদার মদমহেশ্বর। মদমহেশ্বর যাবার পথ মাস্তা অথবা জুরানী হয়ে। গৌরীকুণ্ড যাবার পথে মাস্তা অথবা জুরানীতে গাড়ী থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ গেছে কালীমঠ পর্যন্ত। কালীমঠে আছে মহাকালীর বিরাট মন্দির। মাস্তা থেকে কালীমঠের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিঃমিঃ। পথের চড়াই উৎরাই বেশ কষ্টকর। যাত্রীরা সাধারণত কালীমঠে রাত্রিবাস করেন। কেদারনাথ-বদ্রীনাথ টেম্পল কমিটির অধীনে কালীমঠে একটি ধর্মশালা আছে। টেম্পল কমিটির অনুমতিপত্র ছাড়া ধর্মশালার চৌকিদার সেখানে থাকতে দেয় না। কালীমঠ থেকে রাঁসী, গৌণ্ডার, বানতোলী হয়ে মদমহেশ্বর প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ পথ। মদমহেশ্বরের পথে রাত্রি বাস করার অসুবিধা নেই। রাঁসীতে রাকেশ্বরী মন্দিরের পূজারী থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। গৌণ্ডারের স্কুলবাড়িতে রাত্রিবাস করা যায়। এখন বানতোলীতে থাকার সুব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামের শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বানতোলীতে একটি ধর্মশালা তৈরি করে দিয়েছেন। বানতোলী থেকে ৯' কিঃমিঃ চড়াই পথে গেলে দ্বিতীয় কেদার মদমহেশ্বর। বানতোলীতে জলের বোতলে জল ভরে নেবার জন্য সরকারের নির্দেশনামা পথে দেখতে পাওয়া যায়। ৯' কিঃমিঃ চড়াই পথে এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না। কালীকমলীবাবার আশ্রমের ব্যবস্থায় গত বছর থেকে বানতোলীর প্রায় চার কিঃ মিঃ উপরে একটি টিনের ক্যানেস্তারায় পানীয় জল রাখা থাকে। পূর্বে পথ প্রদর্শক ছাড়া মদমহেশ্বর যাওয়া সম্ভব হত না। নির্দিষ্ট কোন পথও ছিল না। ঘাসের চাবড়া ধরে অত্যন্ত সন্তর্পনে যেতে হোত। এখন বনবিভাগ থেকে ইংরাজী জেড্‌এর আকারে পাহাড়ের গায়ে পথ করে দিয়েছে। বর্তমানে পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয় না। একটিমাত্র পথ। পথ ধীরে ধীরে উঠে মদমহেশ্বরের মন্দিরের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

তিনদিকে সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা বিস্তৃত উপত্যকার মাঝখানে প্রদীপশিখার মতো দ্বিতীয় কেদার মদমহেশ্বরের মন্দির। অত্যন্ত শান্ত নির্জন পরিবেশ। উচ্চতা ১১,৪৭৫ ফুট। এখানে মহাদেবের নাভি প্রকাশিত। কেদারনাথ মন্দিরের মতোই মদমহেশ্বরের মন্দিরের গঠন। আকারে ও আয়তনে বেশ ছোট। মন্দিরে স্বয়ম্ভু লিঙ্গমূর্তি। বাম দিকে কিছুটা হেলানো। প্রাচীন কাহিনীতে বলে, হিমালয়ের দিক থেকে প্রত্যহ একটি গাভী এসে শিবলিঙ্গের ওপরে

দাঁড়িয়ে দুধ ঢেলে দিয়ে যেতো। বেশ কিছুদিন গাভীর কাছ থেকে দুধ না পাওয়ায় তার মালিক একদিন তাকে অনুসরণ করে এসে দেখে গাভীটি শিবলিঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে দুধ ঢেলে দিচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে গাভীটির মালিক রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে একটি লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে গাভীটিকে মারে। কিন্তু গাভীটি মুহূর্তের মধ্যে সরে যেতে লাঠিটি শিবলিঙ্গের উপর গিয়ে পড়ে। সেই প্রচণ্ড আঘাতে শিবলিঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়ে বামদিকে হেলে যান। মন্দিরের বাইরের আঙিনায় প্রায় চার ফুট বর্গক্ষেত্রের একটি জায়গায় পাথরের ওপর চারটি ক্ষুরের পরিষ্কার চিহ্ন আছে। ঐখানে নাকি গাভীটি সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মন্দিরের পূজারীজী জানান, তীর্থযাত্রীরা গভীর ক্ষুরের চিহ্নিত জায়গায় তর্পনাদি করে থাকে।

মদমহেশ্বরের প্রধান পূজারী দক্ষিণ-ভারতের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ। তাঁর কাছে শুনি, মদমহেশ্বরে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা আগের তুলনায় বেশ কিছুটা বেড়েছে। এখন প্রায় ১৫০ জন যাত্রী সারা বছরে আসেন। দুঃসহ চড়াই এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য হয়তো তীর্থযাত্রীরা মদমহেশ্বর যেতে সাহস করে না। রাত্রের ঠাণ্ডা বেশ কষ্টকর। মন্দির কমিটির ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা বেশ ভালই। লেপ কম্বল ভাড়া পাওয়া যায়। সময়মতো খাবারের ফরমাস দিয়ে দিলে বেশ ভালভাবে ভোজন সারা যায়।

মন্দিরের বাইরে পাথরের দেওয়ালে বহুকালের পুরানো কিছু লিপি খোদাই করা আছে। সে লিপি আজও উদ্ধার হয়নি। মদমহেশ্বরের প্রধান পূজারী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, ঐ লিপি পাণ্ডবদের সময়ের এবং পঞ্চপাণ্ডব যে সময়ে পঞ্চকেদারের পাঁচটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেইসময় ঐ লিপিগুলি খোদাই করা হয়েছিল। মূল মন্দিরের পিছনদিকে দুইটি ছোট মন্দির আছে। একটিতে চতুর্ভুজ মহাদেবের কোলে পার্বতীর মূর্তি। অপরটিতে কেবলমাত্র পার্বতীর দণ্ডায়মান মূর্তি। শীতের সময় যে ছয় মাস মদমহেশ্বর ও কেদারনাথের মন্দির বন্ধ থাকে, সেসময়ে উখীমঠে পূজা হয়ে থাকে।

তুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের তৃতীয় কেদার। উচ্চতা ১২,০১২ ফুট। গাড়োয়াল হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে তুঙ্গনাথের মন্দির। চোপতা থেকে মাত্র চার কিঃ মিঃ হাঁটা পথ। উখীমঠ থেকে ভোসলতিটা, চোপতা হয়ে রাজপথ চলে গেছে মণ্ডল চটির দিকে। চোপতার বাস থেকে নেমে যাত্রীরা চার কিঃ মিঃ হাঁটা পথে গিয়ে তুঙ্গনাথ দর্শন করে ফিরে আসেন, আবার বাস ধরেন। তুঙ্গনাথে কেউ রাত্রিবাস করে না। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ বেশ চওড়া পথ। চোপতার উচ্চতা প্রায় নয় হাজার ফুট। চার কিঃ মিঃ পথের ব্যবধানে তিন হাজার একশো ফুট উপরে উঠতে হয়। পথের শেষ অংশে চড়াইএর জন্য নিঃশ্বাসের বেশ কষ্ট হতে থাকে। চন্দ্রশিলা পর্বতের নিচে তুঙ্গনাথের মন্দির। তুঙ্গনাথে মহাদেবের বাহুদ্বয় ও হৃদয় প্রকাশিত।

তুঙ্গনাথ মন্দিরের গঠনশৈলী কেদারনাথ মন্দিরের মতো। তবে আকারে বেশ ছোট। মন্দির প্রাঙ্গনে পঞ্চপাণ্ডবের নামে ছোট ছোট পাঁচটি মন্দির ও ভৈরবের মন্দির আছে। স্বল্প পরিসর জায়গায় মন্দির প্রাঙ্গণটি। শীতের সময় তুঙ্গনাথের পূজা উখীমঠ থেকে হয়।

চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ। রুদ্রনাথের পথ সবচেয়ে কঠিন ও দুর্গম। অনসূয়া মন্দির থেকে ১৪ কিঃ মিঃ চড়াই পথ। অনসূয়ার মন্দির মণ্ডলচটি থেকে ৪ কিঃ মিঃ হাঁটা পথ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চড়াই পথ। কোট ১৯ কিঃ মিঃ পথ একদিনে পরিক্রমা করা বেশ কষ্টকর; সেইজন্য যাত্রীরা মণ্ডলচটি থেকে রওনা হয়ে অনসূয়ার মন্দিরে একরাত্রি বাস করে রুদ্রনাথ যাত্রা করেন। ৬,৫০০ ফুট উপরে ঘন বনানীর মধ্যে কিছুটা খোলা জায়গায় অনসূয়া গ্রাম ও মন্দির। সপ্তঋষির অন্যতম অত্রিমুনি, তাঁর স্ত্রী অনসূয়া দেবী। অনসূয়া দেবীর চরিত্রে অসূয়ার অভাব ছিল, তিনি ছিলেন ঈর্ষা, দ্বেষ শূন্য, সেইজন্য তিনি অনসূয়া। অনসূয়ার মন্দিরে বসে অনসূয়া দেবীর নানান্ কাহিনী শুনি।

স্বর্গ, মর্ত, পাতালের সর্বত্রই নারদমুনি যাতায়াত করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কলহের ইন্ধন জোগান। একবার স্বর্গের অন্তঃপুরে গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পত্নীত্রয় সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীকে একত্রে পেয়ে নারদমুনি তাঁদের জানান মর্তলোকে অত্রিমুনির স্ত্রী অনসূয়া দেবীর সতীত্বের ভুবনজোড়া খ্যাতির কথা। মহাসতী পার্বতী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নারদমুনির কণ্ঠে অনসূয়া দেবীর সতীত্বের যশ কীর্তন শুনে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের স্বামীর কাছে গিয়ে অনসূয়া দেবীর সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য আদেশ করেন। ঘরনীর আদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তখুনি রওনা হন এবং ব্রাহ্মণের বেশে অনসূয়া দেবীর কুটীরে পৌঁছে তাঁরা অনসূয়া দেবীকে জানান তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তবে তাঁদের ক্ষুধা সাধারণ খাদ্যে নিবৃত্ত হবে না। তিনজনে তিনটি লোহার গুলি অনসূয়া দেবীকে দিয়ে বলেন, ঐ লোহার গুলি তিনটি সিদ্ধ করে সুস্বাদু খাদ্য তৈরি করে দিতে। লোহার গুলি তিনটি হাতে নিয়ে অনসূয়া দেবী বুঝতে পারেন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কুটীরে এই তিন ব্রাহ্মণের আবির্ভাব। অত্রিমুনি সেসময়ে তাঁর আশ্রমে তপস্যারত। বিপদ বুঝে অনসূয়া দেবী তাঁর স্বামীকে স্মরণ করেন। অত্রিমুনি তখুনি এসে উপস্থিত হন। তাঁকে ব্রাহ্মণদের বিচিত্র আবদারের কথা অনসূয়া দেবী জানান। তপোবলে অত্রিমুনি তিন ব্রাহ্মণের সত্য পরিচয় জানতে পারেন। তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত বারি লোহার গুলি তিনটিতে ছিটিয়ে দেন এবং অনসূয়া দেবীকে লোহার গুলি দিয়ে খাবার তৈরি করতে বলেন। লোহারগুলি সিদ্ধ হয়ে যায় এবং অপরূপ খাবার তৈরি করে অনসূয়া দেবী তিন ব্রাহ্মণকে খাওয়ান। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে তিন ব্রাহ্মণ অনসূয়া দেবীকে আশীর্বাদ করে দেবলোকে ফিরে যান এবং তাঁদের ঘরনীদের কাছে অনসূয়া দেবীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু ঘরনীরা খুসী হন না। তাঁরা আবার তাঁদের পাঠান অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পুনরায় ব্রাহ্মণের বেশে অনসূয়া দেবীর কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হন। অনসূয়া দেবী তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। ব্রাহ্মণরা জানান তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, কিন্তু তাঁরা কেবলমাত্র অনসূয়া দেবীর স্তন্যপান করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চান। ব্রাহ্মণদের বিকৃত প্রস্তাবে অনসূয়া দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। উপায়ন্তর না দেখে তিনি আবার তাঁর স্বামীকে স্মরণ করেন। অত্রিমুনি এসে ব্রাহ্মণদের রুচিহীন অসুন্দর আবদারের কথা শোনেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের আসল স্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন। অনসূয়া

দেবী "বালো তব" বলে তাঁর স্বামীর পাদোদক তিন ব্রাহ্মণের দেহে ছিটিয়ে দেন। ব্রাহ্মণরা মুহূর্তের মধ্যে তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশুতে পরিণত হয়। যাৎদলা হেতু তাঁর স্তন দিয়ে দুধের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। অনসূয়া দেবী মাতৃস্নেহে শিশু তিনটিকে স্তন্যপান করান। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেবতারা দেবলোকে ফিরে না যাওয়ায় তাঁদের স্ত্রীরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে অনসূয়া দেবীর কুটিরে গিয়ে হাজির হন। এদিকে নারদমুনি অন্তরালে তাঁর বীণা বাজিয়ে গুন গুন করে গান করেন আর অবস্থার পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখেন। অনসূয়া দেবীর কুটিরে পৌঁছে ব্রাহ্মণীরা তিন ব্রাহ্মণের খোঁজ করেন। অনসূয়া দেবী জানান—তিনজন ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। তিনি তাঁদের পরমযত্নে ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাঁরা তাঁর কুটিরে পরমানন্দে বিশ্রাম করছেন। দেবীরা আশ্বস্ত হন। তিন ব্রাহ্মণ যে ঘরে বিশ্রামলাভ করছেন, সেখানে নিয়ে যাবার জন্য দেবীরা অনসূয়া দেবীকে অনুরোধ করেন। অনসূয়া দেবী তাঁদের ঘরের মধ্যে নিয়ে যান। দেবীরা ঘরের মধ্যে গিয়ে হতবাক হয়ে যান। তাঁরা দেখেন, তিনটি দুগ্ধপোষ্য শিশু শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে পরমানন্দে খেলা করছে। তিনটি শিশুর আকৃতি একই প্রকার। দেবীরা মহাবিপদে পড়লেন তাঁদের স্বামীদের চিনতে না পেরে। কোন শিশুটি কার, স্বামী চেনা দুঃসাধ্য। তখন তাঁরা নিজেদের রূপ ধারণ করে অনসূয়া দেবীর কাছে গিয়ে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। তাঁরা তাঁদের স্বামীদের স্বরূপে ফিরিয়ে দিতে বলেন। অনসূয়া দেবী অত্রিমুনিকে স্মরণ করেন। অত্রিমুনি আসেন এবং তিন দেবতা স্বরূপ ফিরে পান। স্বর্গের দেবীরা মর্ত্যের দেবীর কাছে হার স্বীকার করেন। সমগ্র ত্রিভুবনে অনসূয়া দেবীর সতীত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অনসূয়া দেবীর মহৎ চরিত্র দেখে দেবতারা বর দিতে চাইলে, অনসূয়া দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে পুত্ররূপে কামনা করেন। সতীর সদিচ্ছা পূর্ণ হল। ব্রহ্মার অংশে সোমদেব, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা মুনি, তিন পুত্রের জননী হলেন অনসূয়া দেবী।

●

॥ পুণ্যাত্মের পুণ্যস্মৃতি ॥

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫শে বৈশাখের (১৩৮৮) কামারপুকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতার দ্যুতি মণ্ডলারতির সঙ্গেই তুলনীয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীমৎ স্বামী বিভূদেবানন্দ মহারাজের আমন্ত্রণে ২৫শে বৈশাখের সেই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ লাভ করে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান মনে করছি। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত দেখলে কার না আনন্দ হয় ?

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক (Doyen of Indian Historians) বর্ষীয়ান্ শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যালয়ই বড় বয়সে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও তাঁর "শিক্ষা-সঙ্কট" প্রবন্ধে

স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, "স্বামীজী শিক্ষাসম্বন্ধে যা বলেছেন বর্তমান যুগে সে আদর্শই আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে পারে"। এরূপ শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত শিক্ষানিয়ন্তা কর্তৃপক্ষ। জীবন সায়াহ্নে ডঃ মজুমদার শিক্ষা-সঙ্কটকেই জাতীয়জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট বলেই মনে করতেন। শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যার্জন নয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন। স্বামীজী বার বার বলেছেন মানুষ গঠনের শিক্ষার কথা। "যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই"। (রচনাবলী ৯:৪২৬)। স্বামীজীর কথাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও আমরা অন্তর থেকে স্বীকৃতি দেইনি একথা শিক্ষাবিদ্‌গণকে বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ডঃ মজুমদার জীবনসন্ধ্যায় তাঁর লেখার মাধ্যমে।

শুধু লেখার মাধ্যমে নয় একদিন এক প্রখ্যাত সাংবাদিকের সঙ্গে সংলাপেও তিনি জাতীয় জীবন উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কৃতির ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে আবেগভরেই বলেছিলেন, "মানবে অনিত্যত্ব, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তিতা এবং চরিত্রই একটি জাতিকে বড় করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এই ত্রিশ বছরের আমাদের moral দিন দিনই নেমে যাচ্ছে"। তারপরই আবার কিছুটা উজ্জীবিতকণ্ঠেই বলেছিলেন, "এখনো দেশে ভাল ছেলে আছে। তাদের মানুষ করার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষক। খাঁটি মানুষ তৈরি করার জন্য চাই একদল খাঁটি শিক্ষক। এটাই ছিল সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মজুমদারের চিরপোষিত অভিমত।

তিনি শিক্ষা বিষয়ে একান্তভাবে বিবেকানন্দ আদর্শানুসারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের শিক্ষক-জীবনে সে আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণই ছিল তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্য। জীবনে আচরণ দ্বারাই তিনি হয়েছিলেন আক্ষরিকভাবে আচার্য রমেশচন্দ্র।

আচার্য রমেশচন্দ্র যে আদর্শ পরিস্ফুট করেছিলেন নিজের জীবনে স্বামীজীর সে শিক্ষাদর্শের কথাই সেদিন বারবার মনে হয়েছিল কামারপুকুরে বসে। স্মৃতিতে এসেছিল মানবজীবনের চিরন্তন শিক্ষক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—কীভাবে তিনি গড়েছিলেন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে, কাশীপুরে এবং সারদামাকে কামারপুকুরে, দক্ষিণেশ্বরে এবং লীলার শেষ পর্যায়ে কাশীপুরে। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে অধ্যাত্মসাধনার বীজ উপ্ত হয়েছিল কামারপুকুরের পর্ণকুটীরে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের প্রথম পাঠগ্রহণের লীলাভূমি সে-দিনের ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত হুগলী জেলার গণ্ডগ্রাম কামারপুকুর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেখানেই দিয়েছিলেন তেরো বছরের বালিকা সারদাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—"চাঁদা মামা সকলের মামা"। 'চাঁদা মামা যেমন সকলের মামা, ঈশ্বর তেমন সকলের ঈশ্বর। তুমি যদি তাঁকে চাও, তুমিও পাবে'। সেখানেই দিয়েছিলেন ঠাকুর সারদাকে গার্হস্থ্য-জীবনে সেবাব্রতের দীক্ষা নানাভাবে—সামান্য প্রদীপের সলিতাটিরও যথাযথ ব্যবহার এবং জীবনের সবচেয়ে সেরা উপদেশ, "যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন"। সংসার অনিত্য সে সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেও, ঠাকুর মাকে সংসারের প্রতি উদাসীন থাকার শিক্ষা কখনও দেন নি।

বিভিন্ন পরিবেশে সবাইয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। সংসারীর পক্ষে এ চিরন্তন চিরনবীন শিক্ষা।

কী সম্পদ, কী সোনার ফসল, কী এক 'আলোর ধনি"ই না সেদিন নিয়ে এসেছি কামারপুকুরের উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে। যে দু'ঘণ্টা কেটেছিল সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথা, কাহিনী-সম্বলিত কবি-পূজাানুষ্ঠানে তা স্মরণ করে 'স্মরামি চ মুহুর্মুহুঃ বন্দামি চ পুনঃপুনঃ'। উৎসব প্রাঙ্গণে কবিস্মরণের পথ দিয়ে আমরা যেন উপনীত হয়েছিলাম এক "আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে" যেখানে "সত্য, শিব, সুন্দর" বিরাজ করেন।"

কামারপুকুরের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকগণই আজ এ শিক্ষাসঙ্কটের দিনে শিক্ষার মাধ্যমে নীতিপরায়ণ, উদ্যমশীল, পরহিতব্রত মানুষ গঠন করে দেশকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাতে পারেন।

আমরা আজ স্মরণ করতে পারি স্বামীজী আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাঁর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমের বালকবালিকাদের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছিলেন, "যাতে তারা নীতিপরায়ণ, উদ্যমশীল, পরহিতব্রত হয়, ইহাই ধর্ম অন্যসব ধর্ম (আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি) 'শিকেয়' তুলে রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আজ সমাজের সর্বস্তরে মনুষ্যত্বের অবনমনে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সবরকমের সুশৃঙ্খলা যেন আজ খান খান করে ভেঙে পড়ার মুখে। এ সঙ্কটের দিনে, এ পরিস্থিতিতে "মানুষ গড়ার কাজে চাই শিক্ষক"—কিন্তু স্বীকার করতে হবে আজ আদর্শ শিক্ষকের অভাব বোধহয় শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এঁরাই ত দূর করবেন ঐতিহ্যের অবজ্ঞা, অতীতের অজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার অবক্ষয়। এর ফলে দূর হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব—'মনুষ্যত্বের অভাব'।

একটি আদর্শ শিক্ষকের Image দেখে এসেছি কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষকের মধ্যে। তিনিই ছিলেন উৎসবের উদ্যোক্তা, প্রধান কর্মিক। ছাত্র, সহকারী শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ব্যতীত এরূপ একটি শিক্ষাপ্রদ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয় তা জানি। তবুও প্রধান শিক্ষক মহাশয়ই যে ছিলেন সর্ববিষয়ে কর্ণধার তা সারাক্ষণই অনুভব করেছিলাম উৎসব প্রাঙ্গণে।

উৎসবের পূর্বদিন স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে আমার ও আমার এক বন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় বিদ্যালয়ে তাঁর ঘরে। ঘরের সামনেই বাগান। কয়েকটি ছাত্র বাগানে কাজ করছিল। বুঝে নিয়েছিলাম 'বাগান করা' সিলেবাস-নির্ধারিত Work Education-এর অবশ্য করণীয় অঙ্গ।

সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিতে এসে গেল রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিরজানন্দের কথা। তিনি শিক্ষানুরাগী ও পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বেলুড় বিদ্যামন্দির শুরু হয় জুলাই ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যখন পূজ্যপাদ বিরজানন্দ স্বামীই ছিলেন ষষ্ঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি একদিন বিদ্যালয়ের স্কুলের বাগানে কাজ দেখে বলেছিলেন, "এই তো চাই—আজকালকার

স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখে ছেলেগুলো একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। Practical (হাতে-নাতে) কোন কাজই জানে না—শিখতেও চায় না।"

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে। একটু তাৎপর্যপূর্ণ বলেই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে হয় একটি Class V অথবা Class VI-এর ছাত্র ঘরে প্রবেশ করেই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ছেলেটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পাঁচ মিনিটে যে আলাপ হল তা দেখে আমরা সত্যিই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। ছেলেটিকে প্রথম সম্বোধনে স্বামীজী বললেন —"কিরে কদিন ধরে তোকে এমন মলিন, বিমর্ষ দেখছি কেন? তোর বাবার খুব শক্তক অসুখ, তাই না?"—আরও কাছে টেনে নিয়ে কত মমতা মিশে তিনি বললেন, "একটা কাজ করবি? রোজ একটু প্রার্থনা করে ঠাকুরকে জানাস্ "ঠাকুর আমার বাবাকে ভাল করে দাও —পারবি তো?" কী স্নেহের পরশ, করুণা মাখা ছিল স্বামীজীর অল্প কথাকটি—আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। তারপরই ছেলেটিকে জানালেন, সেদিন টিফিনের সময় তিনি ওদের ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গেই থাকবেন। বিদ্যালয়ের এটাই নাকি নিয়ম, প্রধান শিক্ষক মহাশয় পর্যায়ক্রমে এক এক দিন এক এক ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে টিফিনে উপস্থিত থাকেন।

"সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ"—বিদ্যারম্ভনের দিনচর্যায় এ মন্ত্রটির প্রতিফলন দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি পূর্বদিন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের এক সুযোগ ঘটেছিল। সে সময় আমাদের বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের সিলেবাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। আলোচনার সময় তিনি তাঁর নিজের শিক্ষা ও শিক্ষণ-নিবেদিত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন।

তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের এক আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখান থেকেই Intermediate পাশ করে বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের সহায়তায় পড়াশুনা চালিয়ে B. A., B. T. হওয়ার সুযোগলাভ করেন। ষোল বছরের অভিজ্ঞতা অর্জনের পর প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হয়েছেন। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত তিনি অন্যান্য বিষয়েও কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। Driving জানেন। তাঁর Driving Licence আছে। Electric সংক্রান্ত কাজকর্মে ও Machine Tools ইত্যাদির ব্যবহারের মোটামুটি জ্ঞান তাঁর আছে।

আমি তাঁর আলাপ, আচরণ এবং বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম, আমি একজন আদর্শ শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁর জীবন "আত্মনঃ মোক্ষার্থং (জগদ্ধিতায়) ছাত্র হিতায় চ"। নিয়ত ছাত্র-কল্যাণে নিয়োজিত শিক্ষক-নিবেদিত জীবনের একটি মূর্ত প্রতীক দেখে সেদিন একটু আপ্লুত উদ্বেলিত হয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, বিচিত্র সৃষ্টিসমৃদ্ধ জীবনকথা এবং বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন ঘটনা—যথা বঙ্গবিচ্ছেদ, রাখীবন্ধন, স্বদেশীমেলা, স্বদেশী আন্দোলন, পরবর্তীকালে জালিওনালাবাগের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন। এ সকলের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চারিত

তাঁর অবিস্মরণীয় বাণীসমূহের মাধ্যমে অতি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এক তথ্যবহুল জীবনালেখ্য।

এক শান্ত সুস্থ পরিবেশে দিবসোপযোগী সংগীত এবং 'প্রশ্ন, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, এবার ফিরাও মোরে, ভারততীর্থ, পরিচয়' এই meaningful (বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ) আবৃত্তিগুলি শুনতে শুনতে সে দিনের আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বসে স্বতঃই মনে হয়েছিল, আমরা যেন আবার উপনিষদের ঋষিবাণীই আরও বর্ণাঢ্য ভাষায় নূতন ঋষির মুখে শুনছি। কখনও জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাঝে দাঁড়িয়ে মহর্ষিতনয় রাজর্ষি কবি রবীন্দ্রনাথ সবাইকে আনন্দযজ্ঞে আহ্বান করে বলছেন, "যা কিছু আনন্দ আছে শব্দে, রসে, গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে"। কখনও বা বিশ্বপ্রকৃতিতে অরূপদর্শনে আমাদিগকে আকৃষ্ট করছেন।

উৎসবশেষে মঞ্চ ছেড়ে যখন মঠাধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দ মহারাজের সঙ্গে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কক্ষাভিমুখে এগুচ্ছিলাম, তখন বলেছিলাম—"এ বিদ্যালয়ে যারা পড়ছে তারা Lucky"—স্বামী নির্জরানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সত্যিই এরা ভাগ্যবান'। এটিই বিফুদেবানন্দজীর শিক্ষণ-নিবেদন জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নয় কি?

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিবিধ বিপর্যয় লক্ষ্য করে কেবলি মনে হয় আমাদের শিক্ষায়তন-গুলি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জীবনচর্যায় কবে আবার, "সহনাববতু, সহনৌভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ—" এ প্রার্থনামন্ত্রের সুরে বেজে উঠবে। সেদিনই হবে প্রকৃত শিক্ষার গোড়াপত্তন।

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

(সাত)

জুয়া খেলার ঘরে বুড়ো বুড়ীদের ভীড়। ওঁরা ডেকের খোলা ছাদে যেতে চান না, হিমেল হাওয়ায় শরীর খারাপ হতে পারে।

ছাদ-ঢাকা ডেকে যেখানে জল ঝড়ের প্রবেশ নিষেধ সেখানে এখন দুটো ভাগ। একভাগ অন্ধকার, অল্পপাশ আলোকিত। অন্ধকারে মানুষ মানুষী গিজ গিজ করছে। সিগারেটের আগুন ইতি উতি জ্বলছে জোনাকির মত।

বোধহয় অমাবস্যার রাত্রি। আকাশে একটা তারাও নেই। চারিপাশে বুক চাপা অন্ধকার। দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র। আকাশের সাথে কোথায় মিলে মিশে এক হয়ে গেছে বোঝা যায় না। অন্ধকারের বুক চিরে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে বুনো মোষের মত একগুঁয়ে বিশালকায় জাহাজটা এগিয়ে চলেছে। জাহাজ দুলিয়ে বাতাস জানান দিচ্ছে তার তীব্র গতিবেগ। শীত কাঁপিয়ে পড়ে শরীরের প্রতিটা রোমকূপে। আলো আর আঁধারের মাঝে আধা আলো আঁধারে কিছু নিঃসঙ্গ পুরুষ। সেইখান থেকে একজন পুরুষের রাগতঃ খ্যানখেনে গলা এই মোহময়ী নিঃস্তব্ধতাকে খান খান করে করে ভেঙে গর্জে উঠল—"সব ব্যাটাচ্ছেলেদের আমি ডাল কুত্তা দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবো। ইতরামো করার আর জায়গা

পারনি। পাহাড়ের চূড়ায় গাইডি চালাতে গিয়েও ইউনিয়নবাজী?" লম্বা শীর্ণ অথচ রুক্ষ চেহারা। কোটরাগত চোখ রাগে জ্বল জ্বল করছে। শার্ট প্যান্ট কোট এমনকি টাই সবই আছে, কিন্তু কোনটার সাথে কোনটার মিল নেই। খোপদুরস্তও নয়। সোনালী, সাদা, লম্বা লম্বা দাড়ি গোঁফ। হাতে জলন্ত সিগার কাঁপছে। এক নজরে মনে হয় কোন দার্শনিক। পাশের ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ওঁর অনুচর। ওঁকে প্রায় জাপটে ধরে শিশু ভোলানো বাক্য শোনাচ্ছেন। "তার টেলিগ্রামে কর্তৃপক্ষ যখন জানাচ্ছেন ওখানে আপনার যাওয়া বিপদজনক, তখন নাই বা গেলেন। আরও কয়েকটা দিন সবুর করুন না অবস্থা একটু শান্ত হ'ক তারপর না হয় যাবেন"। দার্শনিক ভদ্রলোক অর্থাৎ দাত্তদার রাগ প্রশমিত হ'ল বলে মনে হল না। উনি ওঁর সাকরেদের দিকে পিছন ফিরে সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে গজরাতে লাগলেন—"তোমরাও বলেই খালাস। এদিকে আমার হাতে সময় নেই। এত বড় একটা আবিষ্কারের কাছাকাছি এসে কতকগুলো কুলির বেয়াদপির জন্যে আমার কাজ বন্ধ রাখতে হবে? অসম্ভব। অসম্ভব।"

সময় এখানে এতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এদের রাগারাগিতে হঠাৎ যেন কাঁকুনি খেয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। অন্ধকারের মানুষ মানুষীরা অনুমান করা যায় বিরক্ত হয়ে এদের পানে কটাক্ষপাত অথবা মনে মনে গালিগালাজ দিচ্ছিলেন। এসব পরিবেশে একাকীত্ব অসহনীয়। একলা কেউ নেইও অতএব উঠতেই হয়। কাঁচের দরজা ঠেলে বেরুবার মুখেই বাধা। শক্ত সামর্থ নির্লোম চেহারা নিয়ে, সেই জাপানী ভদ্রলোক, অর্থাৎ জাপুদা দাঁড়িয়ে। টাকের মসৃণতায় বৈদ্যুতিক আলো পিছলে পড়ছে। পথ আটকে বিনা পরিচয়ে বলে উঠলেন—"তুমি ত একলা আছ হে ছোকরা। সঙ্গী সাথী যখন নেই তখন চারপাশ দেখার সুযোগ এবং সময় দুই-ই আছে। একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো? এই যে এখানে, তোমার চারিপাশে, গোচরে অগোচরে, ব্যবহৃত অব্যবহৃত, যত সব জিনিষপত্তর, যন্ত্রপাতি, পানীয়, খাবার দাবার আছে। তার মধ্যে এমন কোন জিনিষ আছে, যেটা জাপানের তৈরী নয়? এক কথায় এমন জিনিষগুলোর নাম বলতে হবে যেখানে জাপান একটা নতুন ব্যবসার সুযোগ পাবে।

স্বপ্নলোক থেকে এক ধাক্কায় একেবারে বাস্তবলোকে ফিরে আসি। মনে মনে ভাবি এমন লোকও পৃথিবীতে আছে? এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে আহার বিহার যাবতীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে রাতের মধুর ঘুম নষ্ট করে, মাঝ রাতে একলা একলা দাঁড়িয়ে এইসব উদ্ভট চিন্তা করে?

পথ ছেড়ে পাশে সরে গুরুর গলার ছাত্রকে আদেশ দিলেন—"চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম এর মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে।"

গ্রীস এত বড় দেশ। এত ব্যবসা বাণিজ্য, কিন্তু নিজের দেশের তৈরী জিনিষ অতি অল্প। বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতী থেকে শুরু করে ব্যবহার্য্য বহু নিত্য সামগ্রীও বিদেশ থেকে আনীত। প্রত্যেকটী জিনিষের ওপর কর শতকরা একশ ভাগ। অতএব প্রত্যেক জিনিষের

দাম অত্যন্ত বেশী। পেট্রোলের দাম তাও আবার রেশনে বাড়তে বাড়তে উঠেছে আট টাকা লিটারে। কিন্তু মজার ব্যাপার তাতে গাড়ির অথবা গাড়ি চড়া লোকের কমতি নেই। জাপুলা বলার পর একটা নতুন বাস্তিক দেখা দিয়েছে, কোন জিনিষ দেখলেই খুঁজে খুঁজে দেখি কোন্ দেশের তৈরী। চিহ্ন দেখে দেখে নামতে নামতে কেবিনের দরজায় পৌছানো গেল কিন্তু ঢোকা হল না। মাসীমা পাশের কেবিন থেকে চিঁহি গলায় ডেকে উঠেছেন—"একটু এসো হে ইণ্ডি···(ইণ্ডিয়ান) সবকটা ঘরের আলো জেলে মাঝরাতকে লজ্জা দিয়ে মাসীমা পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। হাতে উল কাঁটা, সোয়েটার বুনছেন। বিছানার ওপর কতকগুলো কমিকের বই।

"আজকাল ঘুম আর আসে না। বয়স হয়েছে ত। তাছাড়া আমার সী সিকনেশও আছে"। উল কাঁটা সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন।

"সী সিকনেস্ আছে তবে সমুদ্রে বেড়াতে এসেছেন কেন ?

মাসীমা উদাস হেসে বললেন—"একাকীত্ব মোচাতে"। এ আবার হেঁয়ালি। ইতিমধ্যে মাসীমা চশমাটা খুলে পাশে রাখা খোলে সযত্নে পুরে রাখলেন। কম্বলটা টেনে নিলেন পায়ের ওপর। বেশ গুছিয়ে বসে অনুনয়ের সুরে বললেন—"একটু গল্প কর হে ছোকরা একলা থাকা আর সহ্য হয় না"।

বলি—"এই মাঝরাত্তিরে বিছানার সুখ ছেড়ে চোখ নষ্ট করে কার জন্য সোয়েটার বুনছেন" ?

"যে চাইবে তার জন্যে"।

আবার হেঁয়ালি মাসীমার কথা শুনতে শুনতে মনে হয় কত বিচিত্র মানুষের জীবন।

অ্যামেরিকার বালটীমরোতে নিজের সুদৃশ্য বাড়ি। বাংকে জমানো কয়েক লাখ ডলার। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী সবই আছে কিন্তু যে যার ছড়িয়ে ছিটিয়ে। স্বামী বিগত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর। বয়সের গুণে শরীরে দেখা দিয়েছে আড়ষ্টতা। সব সময়ই গায়ে ব্যথা। ওষুধ খেয়ে খেয়ে ওষুধে ধরেছে অরুচি, চিকিৎসায় ঘেন্না। সবই সহ্য হয়, সহ্য হয় না একাকীত্ব। এই দুনিয়ায় ওঁর করার কিছু নেই। এককালের নাম করা পদ্মরা। নাটকের নিয়মিত অভিনেত্রী কেবলমাত্র সঙ্গীর অভাবে দিনের পর দিন কারো সাথে কথা না বলে সময় মাড়ায়। মাসীমা বলেন—"কখনও কখনও মনে হয় সময় ত নয়, যেন অথৈ সমুদ্র। একলা সমুদ্রে আমি ভাসছি, ভাসছি। যার শেষ কোথায় আমি জানি না। একটা ঢেউ পেরোয় আর একটা ঢেউ লাফিয়ে আসে। চিবিয়ে চিবিয়ে একটা দিন পার করি, অবধারিত ভাবে আর একটা দিন এসে পড়ে। তিতি-বিরক্ত হয়ে চল্লিশটা হাজার টাকা গচ্ছা দিয়ে এক মাসের জন্যে পালিয়ে এসেছি গ্রীসে। যত দেশে ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসছে তত আমার মেজাজ চড়ছে। এখানে যদিও বা দু-চারজন ভিন্‌দেশী পাচ্ছি কথা বলার, দেশে গিয়ে আবার সেই একাকীত্ব। আমাদের দেশে সকাল সন্ধ্যে চব্বিশ ঘন্টা যে যার ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে ছুটছে। দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কথা বলা ত দূরের কথা ফিরে তাকাবারও সময় নেই। সেই দেশে গিয়ে আমি আবার বসে থাকব চুপ চাপ, একলা একলা দুঁকবো আর সময়ে চোবানো। ক্রমশঃ

●

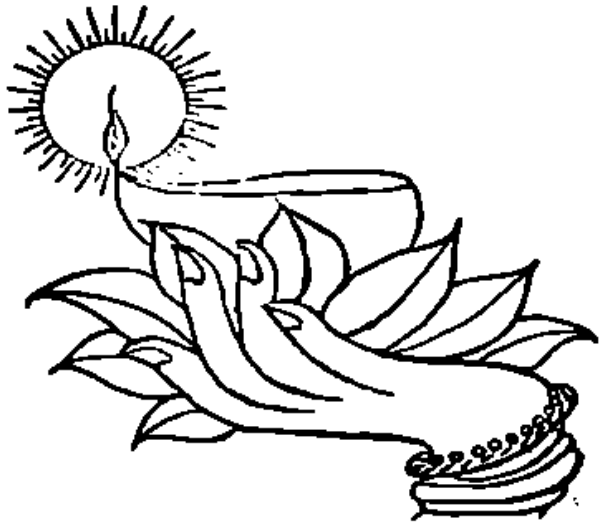

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(পনেরো)

হাওয়া এবং উত্তাপের সংস্পর্শে ভেজা মাটি শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিতও হতে থাকে। সিরামিকনির্মাণে মাটির এই সংকোচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটির সংকোচনের ফলেই সিরামিকএর গঠনাকৃতিতে যেমন বিকৃতি ঘটতে পারে তেমনই ফাটলের সৃষ্টিও হতে পারে। হাওয়া এবং উত্তাপে শুকানোর পর কাঁচা অবস্থায় সিরামিকএর যে-সংকোচন ঘটে—সে-সংকোচনকে ইংরেজীতে বলা হয় drying shrinkage। চুল্লীতে কম আঁচে (৭০০° থেকে ৮০০° সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রায়) সেঁকবার পর সিরামিকএর যে-সংকোচন ঘটে—সে-সংকোচনের ইংরেজী নাম bisque অথবা biscult firing shrinkage। অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তাপে ১২৫০° থেকে ১৩১০° সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রায়) সেঁকলে সিরামিকএর যে-চূড়ান্ত সংকোচন ঘটে—সে-সংকোচনকে ইংরেজীতে বলে firing shrinkage।

মাটির মণ্ডে মিশ্রিত বিভিন্ন উপাদানের তারতম্যের জন্ত এক এক ধরণের মাটির মণ্ডের সংকোচনেরও তারতম্য হয়ে থাকে। শিলাস্তরের ক্ষয়িত এবং চূর্ণীকৃত অংশ দীর্ঘকালের ব্যবধানে মাটিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন শিলার চূর্ণীকৃত কণার গঠনাকৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তাছাড়া মাটিতে মিশ্রিত শিলাচূর্ণের কণাগুলোর আকারও হয় অসমান। কেওলিন অথবা চিনামাটির অতি ক্ষুদ্র কণাগুলো ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ছ'কোণা চ্যাপ্টা পাতের মতো দেখায়। চূর্ণীকৃত কোয়ার্টজ শিলার কণাগুলো কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে অন্ত আকারের দেখায়। কেওলিন-মণ্ডের চ্যাপ্টা পাতসদৃশ কণাগুলো একটির গায়ে আর একটি যেমন সেঁটে থাকে, কোয়ার্টজ কণার আকার অন্ত ধরণের হওয়ায় সেগুলো কিন্তু ওরকমভাবে একটির গায়ে আর একটি সেঁটে থাকে না। কোয়ার্টজ কণার আকার অসমান হওয়ার জন্তই এটি ঘটে থাকে। শুকনো কেওলিনএ জল মেশালে কেওলিনমণ্ডের অতি ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা

পাতসদৃশ কণাগুলোর সৃষ্ট ফাঁকে জল ঢুকে গিয়ে ওই কণাগুলোর মাঝে অতি পাতলা একটি জলের স্তরের সৃষ্টি হয়। সেজন্য কেওলিনমণ্ডে মৃদু চাপ দিলে মণ্ডের ওই কণাগুলো একটির গা থেকে আর একটি সহজেই পিছনে সরে যায়। এজন্যই জলমিশ্রিত কেওলিন-মণ্ড নমনীয় (plastic) হয়ে ওঠে। কোয়ার্টজ-চূর্ণের অতি ক্ষুদ্র অসমান আকারের কণাগুলো ওভাবে একটির গা থেকে আর একটি পিছলে সরে যেতে পারে না বলেই কোয়ার্টজ চূর্ণের মণ্ড কেওলিনমণ্ডের মতো নমনীয় হয় না।

একই কারণে কেওলিন-মণ্ডের সংকোচন কোয়ার্টজ-চূর্ণের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। কেওলিন-মণ্ডের জল শুকিয়ে গেলে কেওলিন-কণাগুলো যেমন পরস্পরের গায়ে সেঁটে যায়, কোয়ার্টজ-চূর্ণের বেলায় তা ঘটে না।

মিশ্রিত মাটির মণ্ডে কেওলিন এবং কোয়ার্টজএর পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে মাটির মণ্ডের সংকোচন বাড়ানো কিংবা কমানো যেতে পারে। সিরামিকনির্মাণে মাটির মণ্ডের এই সংকোচনের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই বলা হয়েছে যে, কোনো মাটির মণ্ডের drying shrinkage এবং firing shrinkage আগে থেকে জানা না থাকলে ওই মাটির মণ্ডে নকশার মাপ অনুযায়ী সিরামিক তৈরী করা সম্ভব হয় না। কোনো মাটির মণ্ডের সংকোচন সঠিকভাবে আগে থেকেই নিরূপিত না হলে ওই মাটির মণ্ডে তৈরী সিরামিক drying এবং firing shrinkage এর পর মূল নকশার মাপের তুলনায় বড়ো কিংবা ছোটো হয়ে যেতে পারে।

কাঁচা (আর্দ্র) অবস্থায় সিরামিক যাতে ধীরে ধীরে শুকোয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাড়াতাড়ি শুকোতে গেলে কাঁচা সিরামিকএর কোনো কোনো অংশ বেঁকে যেতে পারে। তাছাড়া কাঁচা সিরামিকএ ফাটলের সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব। কাঁচা সিরামিকএর বিভিন্ন অংশে মাটি-কণাগুলোর সন্নিবেশের তারতম্য ঘটলে শুকানোর সময়ে ওই সিরামিকএর উল্লিখিত অংশগুলোর সংকোচনেরও হেরফের ঘটে থাকে। অর্থাৎ সিরামিকটির একটি অংশে মৃত্তিকাকণাগুলো যদি ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তবে সেই অংশের মাটি যেমন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তেমনই অন্য কোনো অংশে ওই কণাগুলো যদি ছড়ানো অবস্থায় থাকে—তবে সেই অংশের মাটি শুকোতে সময় লাগবে অপেক্ষাকৃত বেশি। একটি অংশ অপর অংশের তুলনায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেলে ভেজা অংশের মৃত্তিকাকণাগুলো জলকণার সঙ্গে শুকনো অংশের দিকে অতি দ্রুত সরে যেতে থাকে। ভেজা অংশের মাটি এজন্য সামান্য বেঁকে যেতে পারে। একই কারণে শুকোবার পর সিরামিকএ সূক্ষ্ম ফাটলও দেখা দেয়। বেঁকে যাওয়া এবং ফাটল রোধ করতে হলে আর্দ্র সিরামিক ধীরে ধীরে শুকানোর ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে সিরামিকএর সবগুলো অংশই একসঙ্গে শুকোতে পারে।

—দিবাকর সেনরায়

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

॥ তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকা ॥—সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ননীগোপাল সেনগুপ্ত-কর্তৃক ১৮।২, সেলিমপুর লেন, চাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১ থেকে প্রকাশিত, মূল্য ৬৫'০০ টাকা।

বৃহৎ গ্রন্থটি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা তুলনামূলকভাবে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থ-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা-গ্রন্থখানির প্রবন্ধগুলি সৃষ্টি-সংক্রান্ত নানা সমস্যাগুলির এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির সুসমাধান করিয়াছে"। গ্রন্থের আলোচনার বস্তু গভীর ও বিস্তৃত, কিন্তু সুপণ্ডিত লেখক অতি-সহজ-সরল ও স্বল্প-ভাষায় ও ভাবে দর্শনশাস্ত্রের গভীর সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

বৃহৎ-গ্রন্থটির আলোচনার বস্তু কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনি সৃষ্টির সূচনা, লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে ত্রিগুণ, ভূতসৃষ্টি, ব্যোমের অস্তিত্ব, মণ্ডলসৃষ্টি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-সৃষ্টি, অন্তঃকরণ, পরলোক, প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, নির্বিশেষবাদ, নেতি-নেতি-বাদ, বিবর্তবাদ, সাংখ্যমত, জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ, ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও পূর্ণত্ব, উপনিষদে শূন্যবাদ, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান-ঈশ্বর প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা করেছেন।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকার আচার্য বল্লভকে কিংবা পুরাণসাহিত্যকে অনুসরণ ক'রে 'মায়াবাদ'-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন বলে মনে হোল, কেননা অদ্বৈতমতের পরিপোষক আচার্য শঙ্কর তো মায়াবাদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'ব্রহ্মবাদী'। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কারভাবেই বলেছেন: "বয়ং তু ব্রহ্মবাদিনঃ, ন তু মায়াবাদিনঃ"—'আমরা (আচার্য শঙ্কর) ও ব্রহ্মবাদ অর্থে ব্রহ্মসত্তাতেই বিশ্বাস করি এবং তাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করি, মায়াবাদ 'বাদ' মাত্র বা একটি মতবাদ-মাত্র, আমাদের নিজেদের (নিজেরও) মতবাদ নয়।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকার লিখেছেন: "মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণশূন্য), নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয়, মায়াই তাঁহার একমাত্র শক্তি। এই দুইয়ের যোগে সীমাবদ্ধ ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম। তিনি পরব্রহ্মের এক-চতুর্থাংশ। তিনি মায়োপহিত কিন্তু মায়াকে পরিচালনা করেন এবং উহার সহযোগে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন" (পৃঃ ১০৮১)। গ্রন্থকার ঠিকই লিখেছেন, কিন্তু "মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণশূন্য), নির্বিশেষ…"। অদ্বৈতবাদের আলোচনায় একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন সুপণ্ডিত লেখক, "মায়াবাদে ব্রহ্ম নির্গুণ (গুণশূন্য), নির্বিশেষ…প্রভৃতি নন, ব্রহ্মবাদেই গুণাতীত এবং এমন কি আপেক্ষিত গুণ দুটি—'সগুণ-নির্গুণের'-ও অতীত, সকল বিশেষ বা নির্বচনহীন, মায়াশক্তিহীন, সুতরাং স্বভাবতই ক্রিয়াহীন ও কূটস্থ, এবং মায়ার স্পর্শ সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে এবং এখানে তিনি ঠিকই বলেছেন যে, সগুণ-ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্ম-ঈশ্বরের একমাত্র শক্তি মায়া (মায়াশক্তি); কিন্তু তাহলেও ঈশ্বর মায়াধীশ ও মায়াকে বা মায়াশক্তিকে পরিচালনা করেন অর্থে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন এবং তাও সম্ভব হয় মায়াপহিত কারণ-ব্রহ্মরূপী ঈশ্বর কার্য-ব্রহ্মরূপী হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মায় রূপান্তরিত হয়ে, কেননা কারণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ম পরিচালনা করেন না, করেন অব্যাকৃত-মায়া হিরণ্যগর্ভ-

প্রজাপতিকে সহায় ক'রে। সুপণ্ডিত-গ্রন্থকার আলোচনার ধারাকে এখানে একটু বিকৃত করেছেন—অন্তত অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তাছাড়া বহুক্ষেত্রেই সুপণ্ডিত-গ্রন্থকার একটু তাড়াতাড়ি ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশ করার শৈলীতে বেশ-একটু আড়ষ্টতাব আমরা লক্ষ্য করি। জানি না মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থের বিচারের সকল অংশ ধীরভাবে লক্ষ্য করেছেন কি-না ?

তাছাড়া "মায়াবাদ / উপনিষদুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়"—আলোচনায় সুপণ্ডিত গ্রন্থকার তাঁর বিস্তৃত-আলোচনার সুষ্ঠু অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বিচার ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়িভাবে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেছেন ব'লে মনে হয়। উদাহরণ যেমন : "১/১৬ মন্ত্রে (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ) মায়া শব্দ আছে। শঙ্কর স্বামী এই শব্দের 'মিথ্যা ব্যবহার' অর্থ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় উহাকে 'ভুল' বলিয়াছেন। ৬/৪ মন্ত্রে সৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। মায়ার কোন উল্লেখ নাই। পরব্রহ্মই স্রষ্টা" (পৃঃ ১০৯৫)। এভাবে সুপণ্ডিত লেখকের আলোচনা থেকে বহু বিচার-অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যায় যে, তিনি ঠিক স্থির-ধীর-ভাবে মায়া ও ব্রহ্ম তত্ত্বদুটির সুষ্ঠু-মীমাংসা দিতে পারেন নি। তাঁর নিজে ঐ তত্ত্ব ভালভাবে জানা থাকলেও তাদের প্রকাশে বেশ আড়ষ্ট ও অস্পষ্টতাই লক্ষ্য করা যায়।

আর একটি স্থানের কথা উল্লেখ করি। গ্রন্থের ১১০৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "বৈদিক ঋষিগণের জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে কখনই মায়াবাদের পূর্বোক্ত মত (নির্বিশেষবাদ) স্থান লাভ করিতে পারে নাই এবং তাঁহারা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম অনন্ত গুণ-নিধান। অতএব আমরা পাইলাম যে, উপনিষদুক্ত বিশেষণসমূহ ('সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম-সহ) ব্রহ্মের বিশেষণই (গুণই) বটে। উহারা বিশেষণ (গুণ)-ভিন্ন আর কিছুই নহে। নির্বিশেষ-বস্তুর প্রমাণ নাই। স্বীয় অনুভব-সিদ্ধও বলা যায় না"। এখানে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পরিষ্কারভাবে নিজের মতবাদই প্রকাশ করেছেন। তিনি উপনিষদে মায়াবাদের প্রসঙ্গ এনে নির্বিশেষ-সবিশেষ--সমস্যার উপর যথার্থভাবে আলোকপাত করতে পারেন নি এবং উপনিষদ্‌গুলি যে মায়াবাদ-স্বীকার ক'রে সগুণ-ব্রহ্মেরই সমর্থক—একথাই প্রতিপন্ন করেছেন।

সে যাইহোক, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-ছাড়াও বহু চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থ-রচনা করেছেন এবং দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু বর্তমান 'তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা'-গ্রন্থে মনে হয় তিনি বিশেষভাবেই অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থখানিকে নানাভাবের সংগ্রহ-গ্রন্থও বলা চলে। আমরা গ্রন্থের বহুল-প্রচার কামনা করি।

—ব্রহ্মচারী অমিতচৈতন্য

(১) **সাধুভজনসুধা (১ম খণ্ড) পূর্বার্ধ :** শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ; সঙ্কলন : শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী, প্রাপ্তিস্থান : ৮/০৭ কার্ণ রোড, কলকাতা-১৯, মূল্য : ৪০৲ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই প্রকাশ যা সঙ্গীত ও কবিতার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের মধ্যে আদি পর্বে সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে

অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সৎ ও সচ্চিৎএর স্বরূপ ও মহিমার কথাই আমরা পাই। আর মধ্যপর্বে সৎএর ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। পরিশেষে বা শেষপর্বে সৎ ও চিৎএর ভিত্তিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের পরিচয় দেবার চেষ্টা সাধক শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর করেছেন। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যারা এই গ্রন্থ পাঠ করলে সাধনার গূঢ়রহস্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন। বাণী চক্রবর্তীর সঙ্কলন যুগোপযোগী বলে মনে হয়। মুদ্রণ ও বাঁধাই নিখুঁত।

(২) **ভক্তকবয়ত্রী :** শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, প্রাপ্তিস্থান : দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৯/৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, মূল্য দশ টাকা (১০৲)।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের যারা পুরোধা তাদের মধ্যে বিশেষ করে যাদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন : নরসি মহেতা ও মীরাবাঈ। গুজরাতের সমাজ ও সাহিত্যে এদের অবদান তাই অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে এই সাধকদের নিয়ে আলোচনা বিরল বলেই চলে। সেদিক থেকে বাংলা ধর্মসাহিত্যে এই গ্রন্থটি যে নতুনত্বের দাবী রাখে সে বিষয় আমি নিশ্চিত। গ্রন্থটি মোটামুটিভাবে ভক্ত নরসির জীবন-সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনের উপর অল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। ছাপা ভালই কিন্তু গ্রন্থটির আকার অনুপাতে মূল্য বেশি মনে হয়।

(৩) **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয় :** শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার। প্রাপ্তিস্থান : ৮১ অশোক রোড, গাঙ্গুলীবাগান, গড়িয়া (২৪ পঃ) কলকাতা-৮৪, মূল্য পাঁচ টাকা (৫৲)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকাচন্দ্রের সর্বধর্মসমন্বয়-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত। 'যত মত তত পথ' এই দার্শনিক তত্ত্বই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের যে মূলমন্ত্র তাই লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম কি, ধর্মের সঙ্গে জড়বিজ্ঞান ও অজ্ঞেয়বাদ, নীতিবাদ, রামকৃষ্ণ-বিকোনন্দের সর্বজনীন ধর্মাদর্শ নিয়ে খুব সরলভাবে জটিল ও তত্ত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সাধারণ পাঠকের সামনে লেখক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন।

(৪) **জ্ঞানভক্তি :** শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, প্রাপ্তিস্থান : রামকৃষ্ণ আশ্রম, ৬৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলকাতা-১৩, মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকে কেন্দ্র করে যার ভাষা কিন্তু কবিতায়। লেখক রামকৃষ্ণ দর্শনকে অন্তরে উপলব্ধি করে কবিতার রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবী রাখে।

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দেবর্ষি নারদ। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। প্রাপ্তিস্থান 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার', ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। মোট ৪৪ পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজ। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'পত্র' নামের কবিতায় লিখেছিলেন—'বিষম উৎপাত এ কী ! হায় নারদের ঢেঁকি, শেষকালে এ যে দেবি ঝগড়ার মতো।'

এখানে চিরন্তন বাঙালীমানসে নারদকে যে-রূপে ও যে-ভাবে দেখা হয়ে আসছে তারই ছান্দসিক প্রকাশ।

CALCUTTA UNIVERSITY

আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে 'নারদের কলহপ্রিয়তা, কৌতুকপ্রিয়তা, সাংবাদিকতা ও দৌত্য' অধ্যায়ে বলা হয়েছে—'নারদকে কলহপ্রিয় দেবতা বা কলহের দেবতা বলে শুধু বর্ণনা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক'। গ্রন্থকার 'বাংলাভাষার অভিধান' থেকে 'শিবায়ন'-এ উক্ত এক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে—'নারদের চেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূতো' আর 'বলাভিকা'য় দেখা যাচ্ছে বলা হয়েছে—'দেবর্ষি বিঃ (প্রবাদ-কলহের দেবতা)'। কিন্তু পাঠকের একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যাচ্ছে যে, কেন এই প্রবাদ চালু হয়েছে? এবং এর ভ্রৌলাভিত্তি কোথায় ও কোন গভীরে নিহিত।

ইংরাজি-সাহিত্য ও আইন-বিধানের শীর্ষভূমিতে বিচরণের পরও গ্রন্থকার যে সংস্কৃত-শাস্ত্র ও পুরাণাদির প্রাচীনত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নারদ-চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এটাই অবশ্য বিস্ময়ের। তিনি নিপুণ-দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ক'রে অনেক বিষয়কে সিদ্ধান্তরূপে এজাহার দিয়েছেন। তবে মনে হয় বিষয়কে আরো বিস্তৃত করে তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করলে পাঠকের রসোপলব্ধিতে সহায়ক হতো।

তবে নারদকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে গিয়ে প্রাচীন পুরান কাহিনীর সঙ্গে সংগীতশাস্ত্রের সাম্রাজ্যের যে অবদান তাও উল্লেখ রয়েছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ তাঁর 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে 'সঙ্গীতমকরন্দ' নামের শাস্ত্রের সঙ্গে নারদের নাম সংযুক্তির প্রসঙ্গে যা বলেছেন তারও ইঙ্গিত রেখেছেন। সংগীতের জগতেও যে নারদীয় উপস্থিতি তাও উপেক্ষনীয় নয় বলেই পাঠকের কাছে গ্রন্থকার স্মরণ করিয়েছেন।

ছান্দোগ্য, সামবেদ-সংহিতা, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৈবর্তপুরাণ, ভক্তিসূত্র, কথামৃত, সাবিত্রী প্রভৃতি অসংখ্য আকর শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করে গ্রন্থকার আধুনিক যুগে নারদীয় বিশ্বাস-সূত্রেই রচনা করেছেন।

নারদ-বিষয়ে আলোচনার পরিচ্ছন্ন কি-না বলা যায় না, তবে বাংলার দুখণ্ডে 'শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ ও তাঁহার উপদেশাবলী' নামে গ্রন্থ ধনঞ্জয় দাসজী প্রণীত বলে উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থ তা হলে সংক্ষেপে নারদীয় ভাবনা ও ভাবব্যঞ্জনার বিবরণ। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কি তা বলতে গেলে বলতে হয়, বিবরণ গ্রন্থকার যেমন বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছেন তেমনি আবার আমাদের হাল আমলের কবি কুমুদরঞ্জন পর্যন্ত অনুসন্ধানের পরিশ্রম বজায় রেখেছেন। এইখানেই মনে হয় গ্রন্থকার তাঁর অনুভবের মধ্যে যে আধুনিক-মনকে সজাগ রেখেও পৌরাণিক-পুরুষকে নিয়ে কালে-কালে, শাস্ত্রে-শাস্ত্রে বিবর্তিত মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে তা উদ্ভাসিত করেছেন সামান্য রেখায়। বর্ণনা দিয়েছেন নারদের বিভিন্ন জন্ম-জন্মান্তরের ইতিবৃত্তও।

তবে শেষে বলতে হয়, এত সংক্ষেপে বলা হয়েছে এত বড় কিংবদন্তি-পুরুষ বিষয়ে যে, পাঠকের মনে হবে আরো কিছু আরো কথা কি বলার আছে? আরো কিছু জানার বাকি রইল কি?

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

॥ স্বীকৃতি ॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

	দাতার নাম ও ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
৮৩৫	শ্রীবিমলচন্দ্র বসাক—১৭বি, মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলি—৭০০০০৪	১০১.০০
৮৩৬	শ্রীচন্দ্রভূষণ ব্যানার্জী—পো: ও গ্রাম ছোটো কালিকাপুর, ২৪ পরগনা	১০১.০০
৮৩৭	ডা: বিমল বসাক—১৭বি মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলি—৭০০০০৪	১০১.০০
৮৩৮	শ্রী এ. সি. ভট্টাচার্য্য C/o শ্রী আর. পি. রায়চৌধুরী—পো: কাকা, জেলা—মুঙ্গের, পিন-৮১১৩০৪	১০০.০০
৮৩৯	শ্রী এস. পি. মৈত্র—কলি—৭০০০০৯	৭২.০০
৮৪০	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মালাকার—জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া—পো: কালিপাহাড়ি, জেলা—বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৩১	৫১.০০
৮৪১	ডা: আশা দাস এবং শ্রীসুধীর দাস—পি, ২৪৪ লেক রোড, কলি—৭০০০২৯	৫১.০০
৮৪২	শ্রী এস লাহিড়া—ক্যাবাক ষ্ট্রীট, কলি—৭০০০১৬	৫০.০০
৮৪৩	শ্রীঅংশুমান মিত্র—১৭৮/সি শ্রীঅরবিন্দ সরণী, কলি—	৫০.০০
৮৪৪	শ্রী এ. এন. মৈত্র—ধানবাদ	৩৮.০০
৮৪৫	শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী—গ্রাম—হোলসাবেরিয়া, পো: সাসরতাজা জেলা—বীরভূম	২৫.০০
৮৪৬	শ্রীমতী অনুপমা দেবী—পূর্বাশা বি-২২।৮ মানিকতলা রোড, কলি—	১২.০০
৮৪৭	শ্রীমতী উমাশঙ্কর মুখার্জী—২৫, অনন্তরাম মুখার্জী লেন, হাওড়া—১	১০.০০
৮৪৮	শ্রী এ. সি. চৌধুরী—৪৪/এ/৮ এম. আই. ডি রোড, কলি—৭০০০৬০	২০.০০
৮৪৯	শ্রীবিশ্বনাথ সাহা, C/o. শ্রীরাখালচন্দ্র সাহা, প্রাচীন মায়াপুর, পো: নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া	১০.০০
৮৫০	শ্রী এন. সি. কুণ্ডু	১০.০০
৮৫১	শ্রীসুধাংশুকুমার বিশ্বাস—চন্দননগর, হুগলী	১০.০০
৮৫২	শ্রীঅনন্ত দেব ব্যানার্জী—ভঁড়ি (বীরভূম)	১০.০০
৮৫৩	শ্রীমতী চৈতন্যময়ী দেবী—কলি—৭০০০০৬	১০.০০
৮৫৪	শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু—২বি, কার্ত্তিকবোস লেন, কলি—৭০০০০৬	১০.০০
৮৫৫	শ্রীঅসিতবরণ দাস অধিকারী—দেবীপুর, মেদিনীপুর	১০.০০
৮৫৬	শ্রীনকুলচন্দ্র দত্ত—২, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলি—৭০০০০৫	৫.০০
৮৫৭	শ্রী পি. ব্যানার্জী—কলিকাতা	৫.০০
৮৫৮	শ্রীসমরেন্দ্রকুমার ঘোষ—C/o. মেসার্স ষ্টীল রি-রোলিং এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৪৬ সি চৌরঙ্গী রোড, কলি—৭০০০১৬ (দশম তলা)	৫.০০
৮৫৯	শ্রীমতী নন্দীতা দে—আসাম	৫.০০
৮৬০	শ্রীমতী ইন্দুলেখা মৈত্র—পুরুলিয়া	৫.০০
৮৬১	শ্রীসমরেন্দ্রকুমার ঘোষ—C/o. মেসার্স ষ্টীল রি-রোলিং এ্যাণ্ড কোম্পানী, ৪৬ সি চৌরঙ্গী রোড, কলি—৭০০০১৬ (দশম তলা)	৩.০০

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও তদুৎপত্তি	
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৬·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	২৫·০০	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ) প্রকাশের অপেক্ষায়			
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	৫·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ		হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চায়েলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)

১৮-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

বই জ্ঞানের সীমান্তকে প্রসারিত করে। অভিজ্ঞতার নির্ভীক, নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। আর, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যত উপলব্ধ হয়, তাকে সযত্নে লালন করে তোলে।

বিভিন্ন মানুষ ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে অন্তরঙ্গ করার যে সেতুবন্ধ, যার আর এক নাম যোগাযোগ, তার একান্ত প্রেরণার উৎস বই।

বই-এর প্রভাবে বিপুলা এই পৃথিবীর সীমারেখা সংকুচিত হয়ে ওঠে। অপরিচয় সৌহার্দে পরিণত হয়। সর্বত্র সব কিছুই তখন মনে হয় পরিচিত। এমনি করেই তো অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ রচিত হয়। হৃদয়ে হৃদয় যোগ হয়।

এ আমাদের উপলব্ধ সত্য। এই সেতুবন্ধের, এই যোগাযোগের ব্যাপারী তো আমরাও। দূরকে নিকট করার। পরকে আপন করার।

অন্তরঙ্গ সেতুবন্ধ

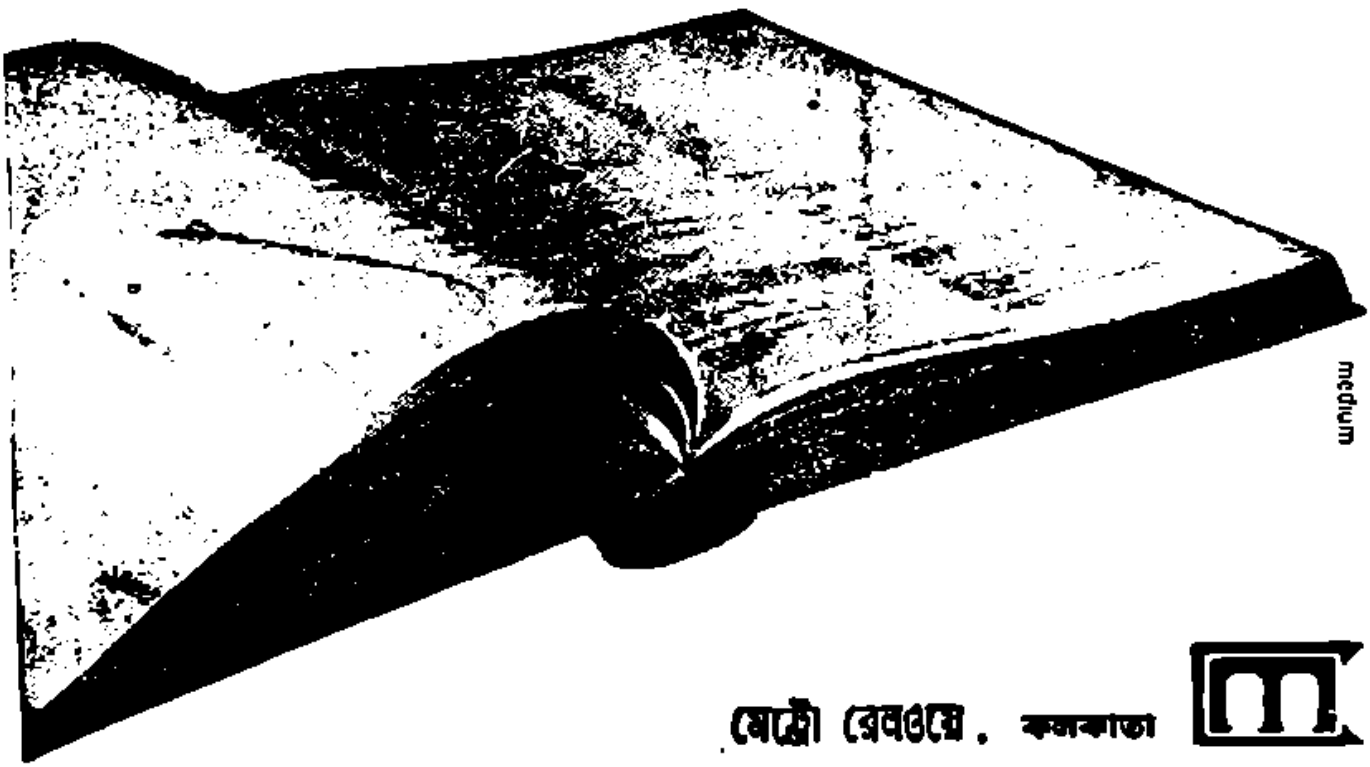

medium

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ফোন : ৪৪-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিবাদী-সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

১২-বি, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৫ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিপ্লবী	৭·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

Phone : 55-2526
54-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004
(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timestar, Shreeshyla, Sandoz Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রলাল মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট গুণার-অফ-মিক্সচারে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, ট্রান্সফারেন্স মেন্স রোড,

কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

Space Donated by—

A WELL WISHER

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. 1 & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization Philosophy and Religion	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2·00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South Asian Peoples Vol 1	125·00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its From, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda
Indian Music in Relation to Art and Culture.
Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

H N 13733 57
43rd Year, January 1982
VOL. XI

Regn. No. WB/NC
PHONE 55-18

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta M
1-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta
RICE Rs. 1.50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১.